লোকায়ত দর্শন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৩

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক
মন্মথ সিংহ রায়
রূপলেখা
১২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
স্মরণে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বারো বছর আগে—ভাদ্র ১৩৬৩-তে—'লোকায়ত দর্শন'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণের মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডর বিষয়বস্তু বর্তমানে সূচিপত্রে সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পার্থক্য প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি মন্তব্যর অবকাশ আছে।

বাংলা প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কয়েক বছর পরে বইটির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়! LOKĀYATA : *A Study in Ancient Indian Materialism*, New Delhi 1959। এই ইংরেজী সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালেই অনুভব করেছিলাম, প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রধানাংশে অক্ষুণ্ণ রেখেও আলোচনার পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। অতএব সেইভাবেই ইংরেজী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলাম। ফলে ইংরেজী বইটি বাংলা সংস্করণের অনুবাদ না-হয়ে প্রায় গ্রন্থান্তরেই পরিণত হয়।

সম্প্রতি ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশক জানান, উক্ত সংস্করণ নিঃশেষ হলেও বইটির চাহিদা সম্পূর্ণ ফুরোয় নি। অতএব দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিশেষত একটি কথা বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। কেননা আমি ইতিমধ্যে অনুভব করেছি যে ইংরেজীতে নূতন করে লেখা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক আলোচ্য-বিষয় বস্তুতপক্ষে পরিসমাপ্ত হয়নি। আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে। অথচ সেই অতিরিক্ত আলোচনা সংযোজন করতে হলে বইটির কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা। তাছাড়া পরিকল্পনাও পরিবর্তন করে আবার আগাগোড়া নূতন করে লেখার প্রয়োজন হয়। অবশ্যই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-অংশে মৌলিক সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করলে পুনর্লিখনের পরিশ্রম স্বীকার্য হতো। কিন্তু আমার বর্তমান ধারণায় এ জাতীয় পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন। এবং যুক্তিবিন্যাস বা তথ্য-সংকলনের দিক থেকে উক্ত ইংরেজী সংস্করণটিতে নানা অপেক্ষাকৃত গৌণ সংশোধনের সুযোগ থাকলেও প্রধানাংশে, আলোচনার রদবদল বরং অবাঞ্ছিতই হবে। এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত করি, প্রস্তাবিত ইংরেজী দ্বিতীয় সংস্করণটি মূলত ইংরেজী প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং আলোচ্য বিষয়ের অসমাপ্ত অংশকে একটি স্বতন্ত্র ও অনুবর্তী গ্রন্থরূপে রচনা করা যুক্তিযুক্ত।

মাস কয়েক আগে যৎসামান্য সংশোধিত রূপে ইংরেজী গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তারই অনুবর্তী ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের জন্য আমি একটি নতুন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছি *Further Studies in Indian Materialism* নামে। অদূর ভবিষ্যতে তা প্রকাশিত হবে।

এই কথাগুলি কিছুটা আত্মপ্রচার মতো শোনালেও এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, বর্তমান সংস্করণটি প্রথম বাংলা সংস্করণের পুনর্মুদ্রণও নয়, ইংরেজী লোকায়তর পরিকল্পনা অনুসারে পুনর্লিখিতও নয়। পক্ষান্তরে বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তাব শুনে মনে হয়েছিল, প্রথম বাংলা সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ যেহেতু একান্তই অসম্ভব—অর্থাৎ, যেহেতু বইটি আগাগোড়া একেবারে নূতন করে লিখতেই হবে—সেই হেতু ইংরেজী লোকায়তর সারাংশ অক্ষুণ্ণ রেখেও তারই সঙ্গে প্রস্তাবিত ইংরেজী অনুবর্তী গ্রন্থটির [*Further Studies in Indian Materialism*-এর] মূল বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করা যেতে পারে। বর্তমান বাংলা সংস্করণে আমি সেই প্রয়াসই করেছি, যদিও তারই ফলে আলোচনা অনেক সময় অনেক দিকে অনিবার্যভাবেই বিক্ষিপ্ত হয়েছে। অতএব এই ভূমিকায় সে-বিষয়ে কিছুটা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়াস করবো।

* * * *

বাংলা প্রথম সংস্করণ—এবং পরিশোধিত পরিকল্পনায় ইংরাজী লোকায়ত—রচনাকালে আমার প্রধান উৎসাহ ছিল, লোকায়ত-মতের উৎস সন্ধান। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন লোকায়ত-মতের স্বরূপ নির্ণয়। কিন্তু লোকায়তর স্বরূপ-নির্ণয়ের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ বলেই প্রতীত হয়েছে। কেননা, ভারতীয় সাহিত্যে লোকায়ত সংক্রান্ত মূলত দ্বিবিধ সাক্ষ্য সংরক্ষিত।

একজাতীয় সাক্ষ্য অনুসারে লোকায়ত বলতে বোঝাতো একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক মত। সেই মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল: ১) ভূতবাদ—ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্ভূতই চরম সত্য, ২) দেহাত্মবাদ—দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা একান্তই অলীক, ৩) প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ—প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান, অতএব অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের অনুমান অবান্তর, ৪) স্বভাববাদ—স্বভাবই জগৎ-বৈচিত্র্যের কারণ, অতএব জগৎস্রষ্টা বা ঈশ্বর অবশ্যই অলীক এবং ৫) পরলোক-বিলোপবাদ—পরলোকগামী আত্মার অভাবে পরলোকের পরিকল্পনাও অবান্তর।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধি নানাভাবে এই দাবিগুলি খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন এবং এগুলিকে লোকায়তিকদের দাবি বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব তাঁদের সকলের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য না করলে মানতেই হবে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে লোকায়ত বলতে উপরোক্ত

বৈশিষ্ট-সম্পন্ন কোন এক দার্শনিক তত্ত্ব অবশ্যই ছিল এবং সেই কারণেই অন্যান্য দার্শনিকেরা তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

শুধুমাত্র দার্শনিক সাহিত্যে সংরক্ষিত এ-জাতীয় সাক্ষ্যর অনুসরণে লোকায়ত-মতের স্বরূপ নির্ণয় তুলনায় সহজ। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের নানা শাখায় লোকায়ত সংক্রান্ত আর একজাতীয় সাক্ষ্য বর্তমান। সেই সাক্ষ্য অনুসারে, লোকায়ত বলতে পরবর্তীকালের অর্থে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক মত বোঝা যায় না। পক্ষান্তরে, নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত কোন একপ্রকার সাধনপদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেয়—পরবর্তীকালে আমরা মূলত সেই সাধনপদ্ধতিকেই আউল-বাউল-সহজিয়া-কাপালিক-তান্ত্রিক প্রভৃতি নামে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত—যদিও, বলাই বাহুল্য, পরবর্তীকালে প্রচলিত এই নামের সাধনপদ্ধতিগুলির মধ্যে সুপ্রাচীনকালের সাধনপদ্ধতিটীর স্বরূপ সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়। গ্রন্থমধ্যে লোকায়ত সংক্রান্ত এজাতীয় বহু সাক্ষ্যর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস করেছি। এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাক্ষ্যগুলির আবিষ্কার নূতন নয়। আধুনিক কালের অগ্রগী বিদ্বানদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টি লোকায়ত সংক্রান্ত এজাতীয় সাক্ষ্যর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এবং সেইকারণেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন, লোকায়ত-মত আজো আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি; সহজিয়া, কাপালিক প্রভৃতি নামান্তরের আড়ালে তা আজো আমাদের দেশে টিঁকে আছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গেই লোকায়তর পুনর্গঠনে আধুনিক গবেষক যে-বিশিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ তা যেন কিছুটা এড়িয়েই গিয়েছেন। অথচ সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। লোকায়ত প্রসঙ্গে উপরোক্ত দ্বিবিধ সাক্ষ্যর সম্মুখীন হলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: লোকায়ত বলতে ঠিক কী বোঝা হবে? কোন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত, না, কোন একপ্রকার সুপ্রাচীন সাধন পদ্ধতি? উভয় সম্ভাবনার পক্ষেই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান। অতএব তার কোন একটি সম্ভাবনাকে ঐকান্তিক সত্যের মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই অসঙ্গত হয়। কেননা, তাহলে দাবি করতে হয় উক্ত দ্বিবিধ সাক্ষ্যর মধ্যে একজাতীয় সাক্ষ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষাযোগ্য। কিন্তু কোন গবেষকই প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করার অধিকারী হতে পারেন না।

লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা বর্তমান থাকলে লোকায়ত সংক্রান্ত আধুনিক গবেষকের সমস্যা অবশ্যই সহজ হতো। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই যে লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা সমস্তই বিলুপ্ত হয়েছে। হয়ত কিছু

প্রামাণিক লোকগাথা এই উক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু শুধু সেগুলিকে অবলম্বন করেই লোকায়তকে সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। অতএব, লোকায়তমতের পুনর্গঠনে আমাদের কাছে বাস্তব তথ্য বলতে মূলতই দ্বিবিধ। এক: ভারতীয় সাহিত্যর বিভিন্ন শাখায় সংরক্ষিত বিবিধ. খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত—যে-ইঙ্গিত অনুসারে লোকায়ত নামটি কোন এক সুপ্রাচীন সাধন পদ্ধতিরই পরিচায়ক। দুই: বিশেযত ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক মত।

অতএব, লোকায়তর বর্তমান আলোচনায় উভয়বিধ সাক্ষ্যর উপরই গুরুত্ব আরোপণের প্রয়াস করতে হয়েছে। কিন্তু সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিতসূচক সাক্ষ্যগুলি মোটের উপর প্রাচীনতর। এই কারণে সেগুলির বিশ্লেষণ থেকেই আলোচনার সূত্রপাত যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে যে-সাধনপদ্ধতিকে সাধারণত আউল-বাউল-সহজিয়া-কাপালিক-তান্ত্রিক প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়, তার আদিরূপ ও আধুনিক রূপের মধ্যে তাদাত্ম্য কল্পনা স্পষ্টতই অবাস্তর। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য সুপ্রাচীন সাধনপদ্ধতিটিকে কোন এক নির্দিষ্ট নামে উল্লেখ করাও প্রয়োজন। এবং এই উদ্দেশ্যে "লোকায়ত" নামই ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকায় বর্তমান আলোচনায় "তন্ত্র" শব্দ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, "তন্ত্র" বলতে এখানে হিন্দুদের তন্ত্রসাহিত্যও নয়, বৌদ্ধদের তন্ত্রসাহিত্যও নয়। সাধন পদ্ধতিটি বস্তুতপক্ষে অতি প্রাচীন। এবং মূলত ওই সুপ্রাচীন সাধনপদ্ধতিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে-সুবিশাল তন্ত্রসাহিত্য রচিত হয়েছিল সে-সাহিত্যে উক্ত আদিম সাধন পদ্ধতিটির নানা বৈশিষ্ট বর্তমান থাকলেও তারই সঙ্গে অনিবার্যভাবে তুলনায় অর্বাচীন নানা বৈশিষ্ট্যর সংমিশ্রণও ঘটেছিল। অতএব সুবিশাল তন্ত্র সাহিত্যর গুরুত্ব অস্বীকার না করেও স্বীকার করা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র এজাতীয় লিখিত সাহিত্য অবলম্বন করেই তন্ত্রসাধনার উৎস ও আদিরূপ সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন আছে।

বর্তমান আলোচনায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে যে-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে তাকে "তুলনামূলক প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পদ্ধতি" আখ্যা দেওয়া যায়। অর্থাৎ, সহজ কথায়, আলোচ্য সাধন পদ্ধতিটি মানব-ইতিহাসের কোন এক আদিম পর্যায়ের পরিচায়ক বলেই আধুনিক পুরাতত্ত্বে ও নৃতত্ত্বে আদিম সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণা সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যর আলোতেই এই সাধন পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য বোঝার সুযোগ আছে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

নৃতত্ত্ববিদেরা এক রকম আদিম আচার-অনুষ্ঠানকে "উর্বরতার কামনায় জাদুঅনুষ্ঠান" (*fertility magic*) আখ্যা দেন। প্রত্নতত্ত্বর ক্ষেত্রেও তার নিদর্শন সুপ্রচুর। এবং এজাতীয় প্রাচীন ও আদিম আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই "তন্ত্র" সাধনার উৎস অনুমেয়। উক্ত আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এই যে মানবীয় প্রজনন ও প্রাকৃতিক উৎপাদন একই সূত্রে বাঁধা। অতএব একটির সংস্পর্শে বা অনুকরণে অপরটিও আয়ত্তাধীন হয়। এই কারণেই আলোচ্য আচার-অনুষ্ঠানে জননাঙ্গ ও প্রজনন পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম :

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এই পর্যায়ের ধ্যানধারণায় দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন কল্পনা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানবদেহের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পিত। অতএব "তন্ত্র"-সাধনায় "দেহতত্ত্ব" ও "কায়াসাধনা"র অপরিসীম গুরুত্ব। তন্ত্রমতে, যা-আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। অর্থাৎ, দেহরহস্যর মধ্যেই বিশ্বরহস্যর পরিচয় বা মূলসূত্র অনুমেয়। এই পর্যায়ের বিশ্বাসে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থান নেই বলেই "পুরুষার্থ" হিসাবেও আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ উল্লিখিত নয়।

পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সম্প্রদায়ান্তরের চিন্তাশীলেরা —বিশেষত আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা—এই সুপ্রাচীন বিশ্বাসকে স্বভাবতই অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। অতএব, তাঁরা নিজেদের দার্শনিক বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেই এই দেহবাদ বা দেহতত্ত্ব খণ্ডনের প্রয়াস করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোন একটি মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রথমে মতটির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই পরিচয়কে "পূর্বপক্ষ" বলা হয়। পূর্বপক্ষ বর্ণনার সময় তাঁরা বিশেষ যত্নের পরিচয় দেন, অর্থাৎ পূর্বপক্ষর সমর্থনে যতো কথা বলা সম্ভব প্রথমে তাই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, প্রথমে এইভাবে পূর্বপক্ষব সমর্থনে সমস্ত বিচার প্রদর্শনের পর পূর্বপক্ষটিকে খণ্ডন করা হলে তাঁদের স্বীয় সিদ্ধান্ত বা প্রতিপাদ্য-বিষয় বিশেষ সুনিশ্চিত হয়। সহজ কথায়, আমার বিরুদ্ধ-মতটির পক্ষে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শনের পরও যদি আমি তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপাদন করি, তাহলে আমার নিজের মতটি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রায়ই পূর্বপক্ষ-বর্ণনাকে বিশেষ পল্লবিত করে থাকেন। ফলে, পূর্বপক্ষবাদী ঐতিহাসিক ভাবে বাস্তবিকই কোন্ বিচার প্রদর্শন করে স্বীয় মত সমর্থন করেন, শুধুমাত্র তারই উল্লেখ অনেক সময় পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি; পূর্বপক্ষর সমর্থনে

আরো কতোপ্রকার বিচার প্রদর্শন করা সম্ভব—অর্থাৎ, আরো কতো যুক্তিতর্কের সাহায্যে পূর্বপক্ষকে সমর্থন করা যেতে পারে—অনেক সময় তাও পূর্বপক্ষ-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লোকায়তিক দেহবাদ বা দেহতত্ত্ব প্রসঙ্গে এই কথাটি বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন। কেননা, লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা পাওয়া যায় না। সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মতের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে শুধুমাত্র সেইটুকুই আজ আমাদের কাছে এই মতের একমাত্র পরিচায়ক। অতএব সুপ্রাচীন "তন্ত্র"-সাধনার পক্ষ থেকে বস্তুতপক্ষে বা ঐতিহাসিক-ভাবে দেহতত্ত্ব-র বা দেহবাদের ঠিক কোন্ সমর্থন প্রদর্শন করা হতো, সে-বিষয়ে আজ আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে বড় জোর অনুমান হয় যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেহবাদীরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে চৈতন্যকে দেহধর্ম বলেই প্রতিপাদনের প্রয়াস করতেন। কেননা প্রামাণিক লোকগাথাগুলিতে মদশক্তির দৃষ্টান্ত বারবার উল্লিখিত হয়েছে এবং দেহবাদ-বিরোধীরাও এই দৃষ্টান্ত বারবার উল্লেখ করেছেন। অতএব, এখানে দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেহবাদীদের মতে দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই। অতএব আত্মবাদীরা যে-গুণকে আত্মার বিশিষ্ট গুণ বলে উল্লেখ করেন, দেহবাদীর মতে তা বস্তুত-পক্ষে দেহরই গুণ। এ-জাতীয় গুণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল চৈতন্য। আত্মবাদীরা দাবি করেন, চৈতন্যকে দেহাতিরিক্ত আত্মার গুণ বলেই মানতে হবে। কেননা, দেহ জড়পদার্থমাত্র এবং জড়পদার্থে চৈতন্যর অভাব অবশ্যই সুপ্রসিদ্ধ। উত্তরে দেহবাদীরা দাবি করতেন, দেহর উপকরণ-গুলি অবশ্যই জড়পদার্থ বা ভূতপদার্থ, এবং নিছক ভূতপদার্থ হিসাবে সেগুলির কোনটিই চৈতন্যবিশিষ্ট নয়। কিন্তু এগুলিরই কোন-একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে দেহ নামের যে-বস্তুটি উৎপন্ন হয়, সেই দেহ চৈতন্য-বিশিষ্ট বস্তুই। কিন্তু কীভাবে তা হতে পারে? দেহবাদীরা বলতেন, মদশক্তির মতো। অর্থাৎ, গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলির কোন একটিও মদশক্তিবিশিষ্ট বা মূর্ছাজনন-সমর্থ নয়; কিন্তু এগুলিরই কোন এক প্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে উৎপন্ন মদ্য অবশ্যই মদশক্তিবিশিষ্ট।

বলাই বাহুল্য, দৃষ্টান্তটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং সুপ্রাচীন কালের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পরিচায়ক। দেহাত্মবাদ খণ্ডনের অঙ্গ হিসাবে অধ্যাত্মবাদীরা নানা ভাবে এই দৃষ্টান্ত খণ্ডন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে বিপক্ষ দার্শনিকদের কাছে লোকায়ত দেহাত্মবাদের পক্ষে নজির বলতে শুধুমাত্র এই মদশক্তির

দৃষ্টান্তটুকুই নয়। পক্ষান্তরে, বিবিধ ও জটিল বিচারবিতর্কও দেহাত্মবাদের সমর্থনে উল্লিখিত হয়েছে, যদিও এমন কোন প্রমাণ নেই যে স্বয়ং লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই বা ঐতিহাসিক ভাবে এজাতীয় জটিল বিচার-বিতর্কের সাহায্যে দেহাত্মবাদ সমর্থন করতেন। তাহলে, এই বিচার-বিতর্ক এলো কোথা থেকে? দেহাত্মবাদ-বিরোধী বা আত্মবাদীদের কাছ থেকেই। অর্থাৎ, আত্মবাদীরাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতি-পাদনের উদ্দেশ্যে প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ বর্ণনা করেছেন এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিচারবিশ্লেষণের পদ্ধতি যতোই জটিল হয়েছে, এজাতীয় পূর্বপক্ষবর্ণনা ততোই সারল্য-বিবর্জিত নবরূপ লাভ করেছে। ফলে, ঐতিহাসিক মানদণ্ডে এই তত্ত্বের স্বরূপ এবং পূর্বপক্ষ হিসাবে দার্শনিক মতটির বর্ণনা—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শেষ পর্যন্ত প্রায় আকাশ-পাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতকের জৈন তার্কিক গুণরত্ন রচিত 'তর্করহস্যদীপিকা' নামের গ্রন্থটির মধ্যেই এই পার্থক্যর চিত্তাকর্ষক নিদর্শন বর্তমান। গ্রন্থের একজায়গায় তিনি লোকায়তিকদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন মূলত তারই উপর নির্ভর করে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তর সঙ্গে সহজিয়া-কাপালিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নিকট সম্পর্ক অনুমান করেছেন: বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৬৭-৮ তে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। বলাই বাহুল্য সহজিয়া-কাপালিক প্রভৃতি সাধন পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিবিধ বিচার-বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের ন্যায়দর্শন-সম্মত বাদ-প্রতিবাদের পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী বলে কল্পনা করার কোনও কারণ নেই। পক্ষান্তরে, সে-কল্পনা উক্ত সাধনপদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ের পরিপন্থীই হবে। কিন্তু, একই গ্রন্থের অন্যত্র স্বয়ং গুণরত্ন স্বীয় আত্মবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা ভারতীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের মানদণ্ডে রীতিমতো কঠিন, জটিল ও উচ্চাঙ্গের বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য: বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৪৬-৬৪-এ এই বর্ণনার সারাংশ ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছি।

একই গ্রন্থে একই লোকায়ত-মতের এই দ্বিবিধ বর্ণনা তুলনা করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে উপরোক্ত দ্বিতীয় বর্ণনাটি—অর্থাৎ পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনাটি—প্রধানাংশেই স্বয়ং গুণরত্নর স্বীয় প্রতিভা-প্রসূত। অর্থাৎ, যে-যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসাবে এই দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছেন তাকে ঐতিহাসিক ভাবে প্রকৃত দেহাত্মবাদীদেরেই উদ্ভাবন বলে বিবেচনা করার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে এগুলি গুণরত্নর মতো বিদগ্ধ

তার্কিকের উদ্ভাবন হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, সহজ কথায়, এই পূর্বপক্ষ বর্ণনাটিতে গুণরত্নর মূল উদ্দেশ্য এই নয় যে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই কোন্ বিচার-বিতর্কর সাহায্যে দেহাত্মবাদ সমর্থনের প্রয়াস করেন শুধুমাত্র তারই উল্লেখ; পক্ষান্তরে তাঁর মূল উদ্দেশ্য হল কতো রকম বিচার-বিতর্কের সাহায্যে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ সমর্থন করা সম্ভব তারই বর্ণনা।

পরবর্তীকালের আত্মবাদীদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে সংরক্ষিত দেহাত্মবাদের বিবিধ সমর্থন প্রসঙ্গে মোটের উপর একই কথা। অর্থাৎ, এই সমর্থনের যুক্তিতর্কগুলিকে ঐতিহাসিকভাবে লোকায়তিকদের উদ্ভাবন বলে বিবেচনা করার পরিবর্তে প্রধানাংশে লোকায়ত-বিরোধীদেরই উদ্ভাবন বলে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে মূল দেহাত্মবাদটিই তাঁদের কল্পনা-প্রসূত। এবং তার মানে এও নয় যে দেহাত্মবাদের সমর্থনে প্রস্তাবিত এ-জাতীয় যুক্তিবিন্যাস ঐতিহাসিক বিচারে প্রধানাংশে লোকায়ত-বিরোধীদের উদ্ভাবন বলেই দেহাত্মবাদের দার্শনিক মূল্যায়নের পক্ষে তা আসলে অবান্তর। দেহাত্ম-বাদের আলোচনায় দুটি কথাই বিশেষ প্রাসঙ্গিক। অতএব এখানে উভয় বিষয়েই কয়েকটি মন্তব্যর সুযোগ বর্তমান।

প্রথমত, রিস্ ডেভিড্স্ দাবি করেছেন, লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনাবলী আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই নিঃসন্দেহে মানতে পারি না যে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই দেহাত্মবাদী ছিলেন। পক্ষান্তরে বরং স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে দেহাত্মবাদ নামের দার্শনিক তত্ত্বটিই লোকায়ত-বিরোধীদের কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু স্বয়ং রিস্ ডেভিড্স্-এর মতো মহান বিদ্বানের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এ-জাতীয় দাবি আমাদের পক্ষে স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। কেননা দাবিটির পক্ষে বা বিপক্ষে স্বয়ং লোকা-য়তিকদের কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান না-থাকলেও, দাবিটির বিপক্ষে লোকায়ত-বিরোধীদের সাক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক লোকায়ত-মত হিসাবেই এই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ প্রয়াস করেছেন; পক্ষান্তরে সমগ্র ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের আর কোথাও এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত হিসাবে গ্রহণ করায় কোনপ্রকার অন্তরায় আছে। এই পরিস্থিতিতে দেহাত্মবাদকে লোকায়ত সম্প্রদায়ের মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করতেই আমরা বাধ্য; অন্যথা ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মৌলিক ভাবে অবজ্ঞা করার প্রসঙ্গ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন হল, কোন্ যুক্তি বা বিচারের সাহায্যে আলোচ্য দেহাত্মবাদের সমর্থন সম্ভব? বলাই বাহুল্য, সাধারণ বা স্বাভাবিক

পরিস্থিতিতে প্রশ্নটির উত্তর স্বয়ং লোকায়তিকদের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, বিশেষত লোকায়ত-প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের পরিস্থিতিটি স্বাভাবিক নয়। কেননা, এ-সম্প্রদায়ের সমস্ত রচনা বিলুপ্ত হয়েছে এবং স্বয়ং লোকায়তিকদের কাছ থেকে পাওয়া দেহাত্মবাদ-সমর্থক নজির বলতে বড়ো জোর মদশক্তির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তটুকুই। কিন্তু সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটি বিচার করেই সন্তুষ্ট থাকেননি। পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকয়তমত বর্ণনার সময় তাঁরা ভেবে দেখতে চেয়েছেন, দেহাত্মবাদের সমর্থনে বস্তুতপক্ষে আরো কী যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করা সত্যিই সম্ভব। অর্থাৎ, তাঁরা যেন সাময়িক ভাবে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই এই দেহাত্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্বেষণ করেছেন। অবশ্যই তাঁদের চরম উদ্দেশ্য বলতে সেই ভিত্তির ধ্বংসমাত্র। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে সাময়িকভাবে তাঁরা লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে দেহাত্মবাদের সমর্থনসাপেক্ষ যে-দার্শনিক যুক্তিতর্ক অন্বেষণ করেছেন, দেহাত্মবাদের সঙ্গে তার কোন বিরোধ বা অসঙ্গতির সম্ভাবনা বর্তমান। বস্তুতপক্ষে, এই যুক্তিতর্কগুলি দেহাত্মবাদেরই সমর্থক যুক্তিতর্ক। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, দেহাত্মবাদের প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি কী হওয়া সম্ভব—এই প্রশ্ন উত্তরের সময় সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা নিজেদের মধ্যে স্বীকৃত দার্শনিক পরিভাষা প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। এজাতীয় পরিভাষার সঙ্গে স্বয়ং লোকায়তিকেরা ঐতিহাসিকভাবে বা বাস্তবিকই পরিচিত ছিলেন কিনা, কিংবা তাঁরা নিজেরা এজাতীয় পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন কিনা,—এজাতীয় প্রশ্নও অনেকাংশে অবান্তর হবে। কেননা, দার্শনিক বিচারের প্রাসঙ্গিকতা একান্তভাবেই কোন পরিভাষা ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হতে পারে না। অতএব, লোকায়ত-বিরোধীদের রচনায় সংরক্ষিত দেহাত্মবাদের দার্শনিক সমর্থনটুকু লোকায়ত দৃষ্টিকোণ থেকেও অবশ্যই অবান্তর বা অসঙ্গত নয়। কিংবা, যা একই কথা, দেহাত্মবাদ আসলে লোকায়ত-মতের পরিচায়ক হলেও, এই দেহাত্মবাদের আধুনালভ্য দার্শনিক তাৎপর্য বা দার্শনিক সম্ভাবনা অনেকাংশে লোকায়ত-বিরোধীদের রচনা থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব এবং লোকায়ত-বিরোধীদের রচনা থেকে উদ্ধার-যোগ্য হলেও তা দেহাত্মবাদের স্বকীয় দার্শনিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর হতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে, প্রাচীন লোকায়ত-মতের আধুনিক আলোচনায় একটি প্রশ্ন উপেক্ষা করা অসঙ্গত হবে। পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর লোকায়ত বিরোধীরা—অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী বা আত্মবাদীরা—যে-ভাবে এই দেহাত্মবাদকে বিচারমূলক ভাবে বর্জনের

প্রস্তাব করেছেন, আধুনিক গবেষকের বিচারেও কি সেই বর্জনের সার্থকতা সত্যিই চরম বা ঐকান্তিক বলেই স্বীকার যোগ্য? অর্থাৎ, সহজ কথায়, আত্মবাদীরা কি সত্যিই দেহাত্মবাদকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে অবধারিত ভাবেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে পেরেছেন?

'লোকায়ত-দর্শন'-এর প্রথম বাংলা সংস্করণে—এবং ইংরেজী *Lokayuta*-তেও—আমি এই প্রশ্ন এমনকি উত্থাপনই করিনি। কিন্তু পরে অনুভব করেছি, এই প্রশ্ন অবজ্ঞা করাই লোকায়ত-সংক্রান্ত আমার পূর্ব-আলোচনার একটি প্রধান দৌর্বল্য ও অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। প্রসঙ্গত, এই অনুভবের জন্য অধ্যাপক ওয়াল্‌টার রুবেন্‌-এর কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা সত্যিই অপরিসীম। জার্মান ভাষায় তিনি আমার ইংরেজী লোকায়তর একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং সেই সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবেই আমার আলোচনার উক্ত দুর্বলতাটি ব্যাখ্যা করেন। পরে তাঁর ভারত-সফরকালে যখন বক্তিগতভাবে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের ও আলোচনার সুযোগ পাই, তখনো তিনি আমাকে এবিষয়ে বিশেষ মূল্যবান উপদেশ দেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর মতো মহান ভারত-তত্ত্ববিদ্ ও বিশেষত ন্যায়দর্শনে মহাপণ্ডিত বিদগ্ধ পুরুষের অত্যন্ত সহৃদয় কিন্তু সুতীব্র সমালোচনা আমার মতো ভারতীয় দর্শনের ছাত্রর পক্ষে বাস্তবিকই কতো মূল্যবান—তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর বহুবিধ ও বহুমুখী উপদেশের মধ্যে এখানে যেটুকু একান্তই প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র সেটুকুর উল্লেখ করার সুযোগ আছে। তাঁরই উপদেশের প্রভাবে আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ভারতীয় দর্শনে দেহাত্মবাদ যতো প্রাচীন পর্যায়ের চিন্তার পরিচায়ক হোক না কেন, তার প্রকৃত দার্শনিক সম্ভাবনার মূল্যায়ন অতি-আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতেও অবান্তর হতে পারে না। পক্ষান্তরে এই মূল্যায়নের প্রয়াস ব্যতিরেকে আজকের দিনে লোকায়ত-মতের যে-কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কেননা, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেহাত্মবাদের আলোচনা যে-ভাবেই হয়ে থাকুক-না-কেন, এই দেহাত্মবাদ গ্রহণ-বর্জন সংক্রান্ত সমস্যা বস্তুতপক্ষে দর্শনের বিশ্বইতিহাসের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই সম্পর্কিত। দর্শনের বিশ্ব-ইতিহাসের এই সমস্যা বলতে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সমস্যা। অর্থাৎ, অন্তত সম্প্রদায়-বিশেষের বিচারে, সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে মূল প্রশ্ন হল: ভূতপদার্থ প্রধান, না চৈতন্য প্রধান? বস্তুবাদী মতে, ভূতপদার্থই প্রধান: এই ভূতপদার্থ থেকেই কোন-না-কোন ভাবে চৈতন্যর বা চেতন পদার্থর উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে, ভাববাদী মতে, চৈতন্য বা চেতনপদার্থই প্রধান: ভূতপদার্থ আসলে হয় অলীক [মায়া বা মিথ্যা], আর-

না-হয়-তো পরব্রহ্মরূপ চেতন-পদার্থেরই কোন এক প্রকার বিকাশ মাত্র।

অতএব, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীদের বিচারে দেহাত্মবাদ যদি সত্যি নিরসিত হয়ে থাকে এবং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সত্যিই যদি প্রবল প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই মানতে হবে যে অন্তত ভারতীয় ইতিহাসে ভাববাদের জয় ও বস্তুবাদের পরাজয় ঘোষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের আত্মবাদীদের বহু যুক্তিবিন্যাসও যদি দেহাত্মবাদ খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত না-হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে অন্তত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদের পরাজয় সত্যিই ঘটেনি। এইদিক থেকে বিচার করলে দেহাত্মবাদ-বনাম-আত্মবাদের সংঘর্ষ আমাদের ইতিহাসে যতো প্রাচীন-কালের পরিচায়কই হোক-না-কেন, বস্তুতপক্ষে অত্যাধুনিক কালেও মূল সমস্যাটির গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

অবশ্যই আমার বর্তমান বিচারে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের সমর্থক বলতে শুধুমাত্র লোকায়ত-সম্প্রদায়ই নয়। এছাড়াও সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নানা অবান্তর প্রতিপাদ্য বিষয় বিচারমূলক ভাবে বর্জন করলে দেখা যায় যে এই দুটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক সারাংশও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদেরই পরিচায়ক। এ-জাতীয় দাবির বিরুদ্ধে সাবেকী বিদ্বানদের পক্ষ থেকে অবশ্যই বহুবিধ আপত্তি উঠবে, যদিও আমার আগামী-প্রকাশ্য *Further Studies in Indian Materialism* গ্রন্থে এই দাবি বিস্তৃতভাবেই ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছি। বর্তমান ভূমিকায় অবশ্যই সে আলোচনা উত্থাপনের সুযোগ নেই। এখানে যেটুকু বিশেষ প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র তারই উল্লেখ করা যাক।

সুপ্রাচীন লোকায়ত সংক্রান্ত নানা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে দার্শনিক মত হিসাবে লোকায়ত বলতে একপ্রকার প্রাচীন বস্তুবাদই উল্লিখিত হয়েছে। এই বস্তুবাদের মূল কথা ছিল, দেহ-গঠনের উপাদান ভূতপদার্থগুলিরই কোন একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অতএব, ভূতপদার্থই প্রধান; চৈতন্য অপ্রধান। মতটি তাই ভূত-চৈতন্যবাদ নামেও উল্লিখিত। নামান্তরে তা দেহাত্মবাদ বলেও প্রসিদ্ধ। কেননা ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট পটভূমিতে চৈতন্যকে দেহাতিরিক্ত আত্মার গুণ বলেই গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ভূত-চৈতন্যবাদ অনুসারে যেহেতু চৈতন্য বস্তুতপক্ষে দেহেরই গুণ সেইহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা অবান্তর মাত্র। দেহ ছাড়া আত্মা নেই; দেহ ও তথাকথিত আত্মার মধ্যে তাদাত্ম্য বর্তমান।

ভারতীয় দর্শনের নানা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানা ভাবে মতটি খণ্ডনের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু, প্রশ্ন হল, দার্শনিক বিচারে এই প্রয়াস কতোখানি সার্থক বলে স্বীকারযোগ্য? প্রশ্নটির বিচার স্বভাবতই দুইভাগে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক: দেহাত্মবাদ-বিরোধীরা দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেছেন তার সাহায্যে দেহাত্মবাদ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয়?

দুই: দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁরা যে-প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন তার সাহায্যে কি আত্মার অস্তিত্ব অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয়?

'লোকায়ত-দর্শন'-এর বর্তমান সংস্করণে আমি বিশেষ করে এই দুটি প্রশ্ন বিচারের প্রয়াস করেছি এবং উভয় প্রশ্নরই নেতিমূলক উত্তরে পৌছেছি। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, আমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

এক: দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে বিরোধী দার্শনিকেরা দেহাত্মবাদ নস্যাৎ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, এই দেহাত্মবাদের মধ্যেই পরবর্তীকালের উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়—যে-জ্ঞান লাভের পথে দেহাত্মবাদ-বিরোধীরা বস্তুতপক্ষে বহুবিধ কঠিন অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন।

দুই: দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মবাদীরা যতো প্রমাণ প্রদর্শন করছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণাভাসমাত্র। অর্থাৎ, সেগুলির সাহায্যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

অতএব, সংক্ষেপে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদ সংক্রান্ত মূল দার্শনিক সমস্যার একটি বিশিষ্ট বিকাশ হল দেহাত্মবাদ-বনাম-আত্মবাদের সমস্যা। সমস্যাটি বিচার করে আমি বর্তমান গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে অন্তত এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের জয় ও বস্তুবাদের পরাজয় ঘোষিত হতে পারে না।

অবশ্যই, বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষপ্রসঙ্গে আরো বহুবিধ সমস্যা ওঠে এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসেই এজাতীয় অনেক সমস্যা বাস্তবিকই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'লোকায়ত দর্শন'-এর বর্তমান খণ্ডে সেগুলির বিশ্লেষন সম্ভব হল না। আশাকরি দ্বিতীয় খণ্ডে তার আলোচনা সম্ভব হবে।

সিটি কলেজ
কলিকাতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা

ডক্টর কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত, অধ্যাপক হরিদাস সিংহরায় ও অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের অকৃপণ সাহায্য ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস অবশ্যই অসম্ভব হতো। এঁদের প্রতি পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা সত্যিই আমার আয়ত্তাতীত।

—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পাদটীকা প্রসঙ্গে

১॥ পাদটীকায় সংক্ষেপে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য গ্রন্থশেষে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

২॥ সংস্কৃত মূল গ্রন্থ বাদে পাদটীকায় সাধারণত অন্যান্য গ্রন্থের শুধু আদ্য-অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে কোন লেখকের একমাত্র গ্রন্থ গ্রন্থপঞ্জীভুক্ত সেক্ষেত্রে সাধারণত শুধু তাঁর নামই উল্লিখিত হয়েছে।

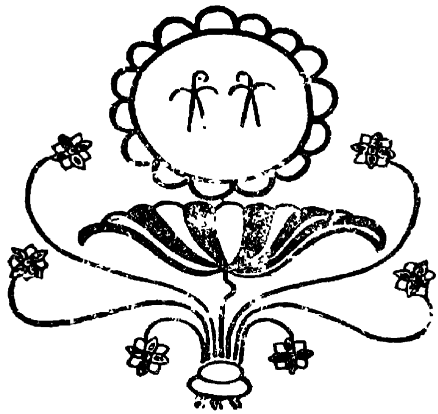
৩॥ কোষগ্রন্থ বা পত্রপত্রিকারও আদ্য-অক্ষরমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। কোন লেখকের কোষগ্রন্থ বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার নির্দেশ দেবার জন্য সাধারণত লেখকের নামের পর এবং কোষগ্রন্থাদির আদ্য-অক্ষরের পূর্বে ইংরেজীতে in শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সূচীপত্র

['লোকায়ত-দর্শন' : দ্বিতীয় সংস্করণ : প্রথম খণ্ড]

[**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**]

[**দ্বিতীয় খণ্ডর সংক্ষিপ্ত সূচি**]



লোকায়ত দর্শন

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসুর-মত

লোকায়ত দর্শনের সমস্যা

১ ॥ অর্থবিচার

ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষার একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আমাদের দেশে 'জনসাধারণের দর্শন' ও 'বস্তুবাদী দর্শন' বোঝাবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি! উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে একটি শব্দ: লোকায়ত। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন, লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শনও। [নামান্তরে অবশ্য এ-দর্শন চার্বাক বা বার্হস্পত্য বলেও প্রসিদ্ধ। কিন্তু লোকায়ত নামটিরই দ্বিবিধ তাৎপর্যের উপর আপাতত দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক।]

লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১] যেমন ব্যাখ্যা করে বলছেন, "লোকায়ত-মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ঐ নাম পাইয়াছে"। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-র তর্জমায় কাওয়েল[২] লোকায়ত শব্দকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৩] বলছেন, নামটির আক্ষরিক অর্থ হল—জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক বিদ্বানদের এ-জাতীয় ব্যাখ্যার পিছনে বৃদ্ধসম্মতি অবশ্যই বর্তমান। দাসগুপ্ত[৪] যেমন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'-এর নজির দিয়েছেন,—সেখানে লোকায়ত নাম এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত। জৈন লেখক গুণরত্ন[৫] বলছেন, সাধারণ লোকের মতো যারা নির্বিচারে আচরণ করে

১। 'বৌদ্ধধর্ম', ৩৭-৮।

২। Cowell & Gough SDS 2n.

৩। Dasgupta HIP i. 78n. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই গ্রন্থেরই তৃতীয় খণ্ডে দাসগুপ্ত বিস্তৃততর ভাবে 'লোকায়ত' শব্দের অর্থ বিচার করেছেন: HIP iii. 512 ff

৪। Ib. iii. 514 n.

৫। 'তর্করহস্যদীপিকা', ৩০০।

তাদেরই নাম লোকায়ত বা লোকায়তিক : "লোকা নির্বিচারাঃ সামান্যা লোকাস্তদ্বদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি"। শঙ্করাচার্যেরও[৬] বক্তব্য এই যে প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহমাত্রকেই আত্মা জ্ঞান করে : "দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতাঃ জনাঃ লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ"। এইভাবে প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকদের একত্রে উল্লেখ করার যেন প্রকৃত তাৎপর্যটুকু স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শঙ্করের অনুগামী মাধবাচার্য[৭] বলছেন, সাধারণ লোকে মনে করে অর্থ ও কামই বুঝি পরম পুরুষার্থ, পরলোক কল্পনামাত্র—তারা চার্বাকমতানুসারী এবং এই কারণে চার্বাকমত লোকায়ত নামেই প্রসিদ্ধ : "নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিক-মর্থমপহ্নুবানাশ্চার্বাকমতমনুবর্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্বাক-মতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্"।

অতএব, লোকায়ত বলতে শুধু যে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তাইই নয়, এই মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র, পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, বস্তুবাদী মত। স্বভাবতই আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়ত শব্দটিকে সরাসরি বস্তুবাদ অর্থেও গ্রহণ করেছেন। যেমন, পিটার্সবার্গ অভিধানে[৮] লোকায়তর শব্দার্থ 'মেটিরিয়ালিস্‌ম্' বা বস্তুবাদ। মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্-এর[৯] মতে পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ বস্তুবাদী দার্শনিক, ক্লীবলিঙ্গে নিরীশ্বর বস্তুবাদী দর্শন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,[১০] পঞ্চানন তর্করত্ন,[১১] রাধাকৃষ্ণণ[১২] প্রমুখের রচনাতেও লোক-বা ইহলোক-সর্বস্ব,—অর্থাৎ বস্তুবাদী,—দর্শন অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত। এই অর্থগ্রহণের সমর্থনে তুচ্চি[১৩] প্রাচীন রচনার নজিরও দেখাতে চেয়েছেন : বুদ্ধঘোষ আয়ত শব্দকে আয়তন বা ভিত্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন, অতএব যে-দর্শনের ভিত্তি বলতে লোক বা ইহলোক তারই নাম লোকায়ত। জৈন গ্রন্থকারদের বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্টতর। 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়'-এ[১৪] উক্ত

৬। 'শারীরকভাষ্য', ১।১।১।

৭। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', ১।

৮। Roth & Bohtlingk v. 235.

৯। Monier-Williams 907; এই অর্থ গ্রহণের সমর্থনে কোল্‌ব্রুকের নজির দেখানো হয়েছে।

১০। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১ : 'ইহলোক ঐ দর্শনের সর্বস্ব, তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়'।

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, চতুর্দশ অধিবেশন, দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ।

১২। Radhakrishnan IP i. 279 n.

১৩। দাসগুপ্ত তুচ্চির এই মত উদ্ধৃত করেছেন : Dasgupta HIP iii. 514-5

১৪। 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ৮১।

হয়েছে, 'এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'—লোক বলতে শুধু সেইটুকুই যা হল ইন্দ্রিয়গোচর। টীকাকার মণিভদ্র ব্যাখ্যা করেছেন, লোক অর্থে পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ।

এতএব সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষগোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। তারই নাম লোক। লোক-সর্বস্ব বলেই দর্শনটি নাম লোকায়ত।

লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা প্রসঙ্গে মণিভদ্র একাধিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তার মধ্যে অন্তত একটি যুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক; কেননা অনুমান, আগম প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে; তাই প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণান্তরের স্বীকৃতি নিরাপদ নয়: "এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিংচিৎ অনুমানাগমাদি-দার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি"।১৪ক

লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা এবং ধর্ম—তথা অধ্যাত্মবাদ-বিরোধিতা ভারতীয় দর্শনে অবশ্যই সুপ্রসিদ্ধ। আমরা পরে উভয় বিষয়েই বিস্তৃততর আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত অর্থবিচার প্রসঙ্গে একটি সাধারণ মন্তব্য করা যায়। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন; লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শনও। অগ্রণী আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় নামটির উভয় অর্থই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। কিন্তু উভয় অর্থের সমন্বয়ে যে-ঐতিহাসিক সত্যের ইংগিত পাওয়া যায় তার স্বীকৃতি একান্তই বিরল। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ এবং ভাববাদের চরম গুরুত্বই প্রায় অভ্রান্তভাবে ঘোষিত—এমনকি, দাবি করা হয় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলতে অধ্যাত্মবাদই।

আধুনিককালে এ-জাতীয় দাবির সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচারক অবশ্যই রাধাকৃষ্ণণ। তাঁর রচনা থেকে মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়: "ভারতের দর্শন মূলতই অধ্যাত্মবাদী। ভারত যে মহাকালের ধ্বংসলীলা এবং ইতিহাসের অঘটনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পেরেছে তার কারণ

১৪ক। 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়'-এর শ্লোক ৮১-র উপর মণিভদ্রর টীকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গুণরত্নও লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষপরায়ণতার ব্যাখ্যায় একই যুক্তি উল্লেখ করেছেন: "তথা বহবোঽপ্যমী বাদিনো ধার্মিকচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনৈকপ্রবণা যৎকিংচিদনুমানাগমাদিভির্দার্ঢ্যমাদর্শ্য জীবাদ্যস্তিত্বং সদৃশমেব ভাষমাণা অপি মুধৈব মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যসুখসংততিপ্রলোভনয়াভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদিসংকটে পাতয়ন্তো বহুমুগ্ধধার্মিকব্যামোহমুৎপাদয়ন্তোঽপি চ সতামবধীরণীয়-বচনা এব ভবন্তীতি"।—'তর্করহস্যদীপিকা', ৩০৪।

কোন বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন নয়—তার প্রকৃত কারণ হল ভারতের গভীর অধ্যাত্মবাদ"।[১৫] "ভারতীয় মনের যে-প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সমস্ত সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে রূপায়িত করেছে সে-বৈশিষ্ট্য বলতে অধ্যাত্মবাদ-প্রবণতা। ভারতের মূল্যবান সংস্কৃতি-ইতিহাসের ভিত্তি হল আধ্যাত্মিক অনুভূতি"।[১৬] ইত্যাদি; ইত্যাদি। বস্তুত রাধাকৃষ্ণণের শুধুমাত্র 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থটি থেকেই এ-জাতীয় মন্তব্য প্রায় রাশিকৃত করা যায়। তবু প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ ভাবে এখানে যে-ভারত, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এবং প্রধানতম শক্তি হিসাবে ঐকান্তিক অধ্যাত্মবাদের উল্লেখ করা হয়েছে সেই ভারত, ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতিতে ভারতীয় জনগণের কোন বাস্তব ভূমিকা স্বীকারযোগ্য কিনা? যদি স্বীকারযোগ্য হয় তাহলে লোকায়ত নামটির সাক্ষ্যই উপরোক্ত অতিশয়োক্তিগুলিকে গ্রহণ করায় বাধা সৃষ্টি করবে। কেননা, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে যে চিন্তাপ্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তারই নাম লোকায়ত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলতে অধ্যাত্মবাদ-বিরোধিতাই।

কিন্তু এইভাবে অধ্যাত্মবাদী মোহভঙ্গের সহায়ক হলেও লোকায়ত নামটির সাক্ষ্যই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সংক্রান্ত আধুনিক অনুসন্ধানকারীর উপর নূতন গুরুত্ব আরোপণ করে। কেননা স্পষ্টই বোঝা যায়, ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাস উপেক্ষা করে লোকায়তের প্রকৃত রূপ সনাক্ত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, একমাত্র ভারতীয় গণ-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের আলোচনা সঙ্গত হবে। অতএব প্রশ্ন ওঠে, 'জনসাধারণ' বলতে কী বোঝা হবে? কোন্ অর্থে এই জনসাধারণের মধ্যে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন স্বীকারযোগ্য হতে পারে? সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন্ অর্থে বস্তুবাদী আখ্যা দেবার সম্ভাবনা আছে?

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আধুনিক অগ্রণী বিদ্বানেরাও এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেননি। এবং আমরা একটু পরেই দেখবো, লোকায়ত-প্রসঙ্গে তাঁরা বিবিধ পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বলাই বাহুল্য, আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যাবলী অবলম্বন করেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে। এবং একথা অবশ্যই সুবিদিত যে এ-জাতীয় তথ্য শুধু খণ্ড ও বিক্ষিপ্তই নয়, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অকিঞ্চিৎকরও। বস্তুত তথ্যের এই অপ্রাচুর্যই লোকায়ত-মতের অনুসন্ধানে প্রধানতম অন্তরায় বলেই সাধারণত উল্লিখিত হয়। কিন্তু বর্তমান

১৫। Radhakrishnan IP i. 24-5.

১৬। Ibid. i. 41.

অনুসন্ধানের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে লোকায়তর সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে আরো জটিল ও কঠিন। কেননা প্রাচীনকাল থেকে বিবিধ ভারতীয় গ্রন্থাবলীতে লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য সংরক্ষিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত দুর্বোধ্যও,—এমনকি অন্তত আপাতদৃষ্টিতে প্রায়ই অসংলগ্ন এবং পরস্পর-বিরোধী। বস্তুত আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়ত-প্রসঙ্গে যে-সব পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার একটি প্রধান কারণ, লোকায়ত-সংক্রান্ত তথ্যের এ-জাতীয় আপাত-অসংলগ্নতা : বিভিন্ন বিদ্বান বিভিন্নজাতীয় তথ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে তাঁদের সিদ্ধান্তে পার্থক্য ও বিরোধ যতই গভীর হোক না কেন, তাঁরা সকলেই মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হল, মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে লোকায়ত-মতের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তারই উপর বিশেষ নির্ভরতা। মাধবাচার্যয় বর্ণনাটির উপর নির্ভর করে তারই সঙ্গে অন্যান্য সূত্রে পাওয়া লোকায়ত-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের সঙ্গতি সাধনের প্রচেষ্টাতেই বিভিন্ন বিদ্বান বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ; কেননা এজাতীয় অন্যান্য তথ্য অন্তত আপাতদৃষ্টিতে প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী, অতএব মাধবাচার্যর বর্ণনার সঙ্গে সেগুলির সঙ্গতিসাধনের প্রয়াসও পরস্পর-বিরুদ্ধতায় পর্যবসিত।

এবিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা উত্থাপন করা যাবে এবং সেই প্রসঙ্গেই দেখা যাবে মাধবের লোকায়ত-বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠার অভাব আশঙ্কার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান। স্বভাবতই বর্তমান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আধুনিক বিদ্বানদের উপরোক্ত পদ্ধতিটি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে নূতন একটি পদ্ধতি। এই নূতন পদ্ধতিটির বিস্তৃততর পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। আপাতত এই প্রসঙ্গে শুধু দুটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, এই নূতন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে এমন কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে লোকায়ত-মতের প্রচলিত আলোচনায় যা উত্থাপিত হয় না—বিশেষত পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা ও তার সাংস্কৃতিক স্মারক, তন্ত্রসাধনা ও দেহতত্ত্ব, সাংখ্যদর্শনের উৎস প্রভৃতি সমস্যার উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে প্রতীত হয়েছে, পরবর্তীকালে লোকায়তিক ও বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদে যতো গভীরই হোক না কেন,—যতো তীব্রই হোক না কেন উভয়ের পারস্পরিক বিদ্বেষ,—বৈদিক সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে উদ্ঘাটন করলে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব বর্তমান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লোকায়ত-মতের পূর্ণতর পরিচিতির উদ্দেশ্যেই বৈদিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিবিধ বিচারেরও প্রয়োজন অনুভূত

হয়েছে। ফলে লোকায়ত-মতের প্রচলিত আলোচনা থেকে বর্তমান আলোচনা নানাভাবে পৃথক হয়েছে। কেন হয়েছে—বর্তমান পরিচ্ছেদে তারই কারণ কিছুটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস প্রাসঙ্গিক হবে।

২॥ লোকায়তিক রচনার বিলুপ্তি

প্রাচীন লোকায়ত প্রসঙ্গে আধুনিক অনিশ্চয়তার মহাসমুদ্রে একমাত্র সুনিশ্চিত মন্তব্য বোধহয় এই যে লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনাবলী বিলুপ্ত হয়েছে[১৭]। কোন এককালে এজাতীয় রচনা বাস্তবিকই বর্তমান ছিল কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরেও আধুনিক বিদ্বানেরা একমত নন। রিস্ ডেভিড্‌স্[১৮] মনে করেন এ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। শঙ্করাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচনায় সংরক্ষিত লোকায়ত-খণ্ডন বিচার করে তিনি মন্তব্য করছেন, এঁদের প্রকাশভঙ্গি থেকেই অনুমান হয় কোনকোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্যান্য মতের সঙ্গে আলোচ্য লোকায়ত-মতও পোষণ করতেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাকারে মতটি কখনোই ব্যাখ্যাত হয়নি; অতএব লোকায়তিক গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকারযোগ্য নয়।

কিন্তু এ-জাতীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে তুচ্চি, গার্বে এবং দাসগুপ্ত নিঃসংশয় সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। তুচ্চি[১৯] বলছেন, একথা অবশ্যই সুবিদিত যে প্রকৃত লোকায়তিক গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি, কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকেই কোনকোন বিদ্বান যে-ভাবে লোকায়ত-গ্রন্থের ঐকান্তিক অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান তাও একদেশদর্শিতারই পরিচায়ক; সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যায় যা-থেকে অনুমান হয় যে প্রাচীনকালে লোকায়তিক গ্রন্থ বাস্তবিকই বর্তমান ছিল। নজির হিসাবে তুচ্চি দেখাচ্ছেন, চন্দ্রকীর্তির 'প্রজ্ঞাশাস্ত্র'-এ এবং আর্যদেবের 'শাস্ত্রাশাস্ত্র'-এ বৃহস্পতি-সূত্র থেকে বাস্তব উদ্ধৃতি পাওয়া যায়—ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই লোকায়ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও আদি-গ্রন্থকার এবং এ-ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, তুচ্চি দেখাচ্ছেন, একটি প্রাচীন পুঁথিতে "চার্বাকমতে-গ্রন্থকর্তা" হিসাবেই পুরন্দর নামক জনৈক দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গার্বে[২০] বলছেন, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' এবং ভাস্করাচার্যর 'ব্রহ্মসূত্র-

---

১৭। সম্প্রতিকালে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-ই লোকায়ত সম্প্রদায়ের অধুনালভ্য একমাত্র গ্রন্থ। আমরা একটু পরে দেখবো, এ-দাবি বিশেষ কষ্ট-কল্পনারই পরিচায়ক।

১৮। Rhys Davids DB i. 166 f.

১৯। Tucci in PIPC-1925, 36.

২০। Garbe in ERE viii. 138: নজির হিসাবে 'মহাভাষ্য' ৮।৩।৪৫ এবং ভাস্করাচার্যর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' ৩।৩।৫৩ উল্লিখিত হয়েছে।

ভাষ্য'-র সাক্ষ্য থেকে অবশ্যই বোঝা যায়, একদা লোকায়তিকদের সূত্রগ্রন্থ ছাড়াও ভাগুরি-রচিত একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও বর্তমান ছিল। লোকায়তিক গ্রন্থের অস্তিত্ব-প্রমাণে দাসগুপ্ত[২১] 'দিব্যাবদান'-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "লোকায়তং ভাষ্য-প্রবচনম্"। অতএব অনুমান হয়, লোকায়তিকদের এমনকি ভাষ্যগ্রন্থ ও প্রবচনগ্রন্থও বর্তমান ছিল। এ-ছাড়াও, পার্বে-উল্লিখিত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'-এর সাক্ষ্যর উপরও দাসগুপ্ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; এই সাক্ষ্যর পূর্ণতর পরিচয় এখানে বাঞ্ছনীয় হবে। পাণিনির অনুগামী কাত্যায়ন আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০০-তে 'বার্তিক-সূত্র' রচনা করেন। একটি 'বার্তিক-সূত্র'-তে উক্ত হয়েছে: 'বর্ণক' শব্দ চাদর ('প্রাবরণ') অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'বর্ণকা' রূপ পায়। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০-এ পতঞ্জলি এই নিয়মের ব্যাখ্যায় বলছেন, শুধুমাত্র প্রাবরণ অর্থে বর্ণকা শব্দ উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে বর্ণক শব্দ অন্য অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'বর্ণিকা' বা 'বর্ত্তিকা' বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বোঝায়; যথা লোকায়ত-র ভাগুরি-কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ: "বর্ণিকা ভাগুরি লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাগুরি লোকায়তস্য"। অতএব, দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, নিঃসংশয়ে প্রতীত হয় যে অন্তত খৃষ্টপূর্ব ১৫০-এরও আগে—বা হয়ত কাত্যায়নের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৩০০-র পূর্বে—লোকায়ত-র কোন-না-কোন গ্রন্থ অবশ্যই প্রচলিত ছিল এবং তার উপর ভাগুরি-রচিত অন্তত একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিশ্চয়ই সুবিদিত ছিল।

কিন্তু একদা এজাতীয় গ্রন্থের প্রচলন সংশয়াতিরিক্ত হলেও স্বীকার করতেই হবে যে পরবর্তীকালে তা বিলুপ্ত হয়েছে; এমনি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে বিপক্ষদল এজাতীয় গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী স্বেচ্ছায় ধ্বংস করেছিলেন[২২]। অতএব লোকায়ত-র পরিচয় প্রসঙ্গে বিরোধী চিন্তাশীলদের খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত নানা উক্তিই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল। অর্থাৎ, লোকায়ত-মত খণ্ডন ও পরিহার করবার উদ্দেশ্যে—বা, পূর্বপক্ষ হিসাবে—অন্যান্য দার্শনিকেরা লোকায়ত-র যেটুকু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র তার উপর নির্ভর করেই বর্তমানে লোকায়ত-মত পুনরুদ্ধারের প্রয়াস সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে রিস্ ডেভিড্স্[২৩] স্বভাবতই দাবি করেছেন, লোকায়তিকদের নিজস্ব কোন রচনা আবিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে লোকায়ত-সংক্রান্ত বড় জোর একটা অস্থায়ী প্রকল্পর উপরই নির্ভর করা সম্ভব। এ-জাতীয় দাবি সহজে প্রত্যাখ্যান

২১। Dasgupta HIP iii. 514.

২২। Nehru 100.

২৩। Rhys Davids DB i. 170-1.

করা স্বভাবতই সম্ভব নয়। বস্তুত, আমরা একটু পরেই দেখবো, আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়ত-সংক্রান্ত নানা প্রকার অস্থায়ী প্রকল্পই গঠনের প্রয়াস করেছেন। অবশ্যই একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রকল্পমাত্রেই কাল্পনিক নয়; অতএব বিবিধ প্রকল্পের মধ্যে কোনটি তুলনায় অধিক সন্তোষজনক—বা, প্রচলিত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে আরো সন্তোষজনক কোন প্রকল্প-গঠনের সুযোগ আছে কিনা—এ-বিচার অবান্তর হতে পারে না।

রিস্ ডেভিড্স্-এর উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তারপর, ১৯২১ সালে 'বৃহস্পতি-সূত্র' নামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—সংগ্রহ, সম্পাদনা ও ইংরেজীতে গ্রন্থটির তর্জমা করেন টমাস্[২৪]। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই লোকায়ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। অতএব, টমাস্-এর এই আবিষ্কার আধুনিক বিদ্বানমহলে লোকায়ত সংক্রান্ত পুরোনো কৌতূহলকে নূতন করে নাড়া দেয়। কিন্তু গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে তার চরিত্র অকৃত্রিম লোকায়তিক হতেই পারে না। রচনাকালের দিক থেকে গ্রন্থটি অত্যন্ত অর্বাচীন বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য এবং এ-গ্রন্থের একটি প্রধান বিষয়বস্তু হল লোকায়তিকদের নানা প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের বিরোধিতাই। গ্রন্থকার লোকায়তিকদের এমনকি চোর, নরকগামী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন[২৫]।

অতএব এই তথাকথিত 'বৃহস্পতি-সূত্র' প্রসঙ্গে তুচ্চি[২৬] মন্তব্য করছেন, গ্রন্থটি বস্তুত ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রণোদিতই। কিন্তু তবুও তাঁর ধারণায় এই গ্রন্থেই কোন এক অধুনাবিলুপ্ত অকৃত্রিম লোকায়তিক গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উক্তি সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ, উক্তি-বিশেষে গ্রন্থটি প্রকৃত লোকায়ত মতেরই পরিচায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ উক্তিকে প্রকৃত লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হবে? কিংবা, কোন-একটি উক্তি বাস্তবিকই লোকায়ত-মতের পরিচায়ক কিনা—কিসের উপর নির্ভর করে তা বিচার করা যাবে? উত্তরে আমাদের পুরোনো মন্তব্যেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়: সম্প্রদায়ান্তরের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল। বেল্‌ভেল্‌কার ও রাণাডের[২৭] ভাষায়, মতটির এমনই দুর্ভাগ্য যে তার পরিচয় শুধুমাত্র বিরোধীদের রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২৪। Thomas BS.

২৫। ঐ—২।৫,৮,১২,১৬,২৯; ৩।১৫।

২৬। Tucci in PIPC-1925, 36.

২৭। Belvalkar & Ranade ii. 459.

৩ ॥ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' ও লোকায়ত-মত

লোকায়ত-সংক্রান্ত উপরোক্ত মন্তব্যটি আধুনিক বিদ্বানমহলে সর্ববাদী-সম্মত সত্যে পরিণত হয়েছিল। এ-হেন পরিস্থিতিতে একালের অগ্রণী জৈন বিদ্বান পণ্ডিত সুখলালজী ঘোষণা করেন, লোকায়ত সম্প্রদায়ের একটি পুঁথি এক জৈন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে এখন আর আমরা লোকায়ত-মতকে নিছক পূর্বপক্ষ হিসাবেই জানতে বাধ্য নই। গ্রন্থটির নাম 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'। লেখকের নাম জয়রাশি ভট্ট। ১৯৪০ সালে 'বরোদা ওরিএন্টাল ইন্‌স্‌টিটিউট'-এর পক্ষে পুঁথিটি প্রকাশিত হয়[২৮]। সম্পাদনা করেন সুখলালজী ও পারিখ্। সম্পাদকের বিচারে[২৯] গ্রন্থটির রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী।

ভারতীয় দর্শনে উৎসাহীমাত্রের কাছেই পণ্ডিত সুখলালজীর মতো অগ্রণী বিদ্বানের এই ঘোষণা স্বভাবতই এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র উপর নির্ভর করে লোকায়ত-মতের সম্যক পরিচিতি-লাভ এতদিনে সম্ভব হল। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর পূর্ববক্তব্য সংশোধন করে ১৯৫৭ সালে মূর-এর সঙ্গে ঘোষণা করলেন,[৩০] চার্বাক মতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলতে "তত্ত্বোপপ্লবসিংহ"। ব্যাশাম[৩১] মন্তব্য করলেন, একটিমাত্র 'বস্তুবাদী দার্শনিক গ্রন্থ' অবিলুপ্ত আছে, সেটির নাম 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ইতিপূর্বেই একাধিকবার একাধিকভাবে চার্বাক-সম্প্রদায়ের এবং চার্বাকদের উপসম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনা করেছিলেন; 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' হস্তগত হবার পর তিনি আরো এক নূতনভাবে চার্বাক-দর্শনের আরো একটি ইতিহাস রচনা করলেন[৩২]।

অবশ্যই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে এমন উৎসাহভরে লোকায়ত বা চার্বাক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও শোনা গিয়েছে। যেমন, ১৯৫৮ সালে ওয়াল্টার রুবেন্ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র মূল বিষয়বস্তু বিস্তৃতভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে লেখক জয়রাশি ভট্টকে আর যাই হোক লোকায়তিক বা চার্বাকপন্থী মনে করার কোন বাস্তব কারণ নেই[৩৩]। কিন্তু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিচারে এই প্রতিবাদ

২৮। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ', বরোদা ১৯৪০ (GOS. lxxxvii)।

২৯। ঐ, ভূমিকা পৃ. x.

৩০। Radhakrishnan & Moore SBIP 227.

৩১। Basham WTWI 297.

৩২। চার্বাকদর্শন প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর বিবিধ ও বিচিত্র মন্তব্য একটু পরে বিচার করা যাবে।

৩৩। Ruben in WZOAIP ii. 5.

যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক-না-কেন আধুনিক বিদ্বানমহলে তা মোটের উপর অবহেলিতই হয়ে থেকেছে; অন্যেরা প্রায় সমস্বরে দাবি করে চলেছেন যে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' অবশ্যই অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় লোকায়তিক গ্রন্থ।[৩৩ ক]

এ-অবস্থায় লোকায়ত-মতের আলোচনায় 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র বিস্তৃত বিচার অবশ্যই অপরিহার্য। গ্রন্থটি যদি প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত সম্প্রদায়েরই হয় তাহলে লোকায়ত সংক্রান্ত নানা অনিশ্চয়তার উপশম ঘটবে এবং এই গ্রন্থ অবলম্বন করেই আমরা লোকায়ত-মতের স্বরূপ জানতে পারবো। কিন্তু গ্রন্থকার কি সত্যিই লোকায়তিক বা চার্বাকপন্থী? গ্রন্থটিতে কি প্রকৃত-পক্ষে লোকায়ত-মত ব্যক্ত বা স্বীকৃত হয়েছে?

বিচারে আমরা সম্পূর্ণ নেতিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। কেননা, সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করলে স্বীকার করতেই হবে যে লোকায়ত-মত মূলতই বস্তুবাদ; পক্ষান্তরে জয়রাশি ভট্টর একমাত্র দার্শনিক আত্মীয়তা ভারতীয় দর্শনের চরম ভাব-বাদীদের সঙ্গেই—যে-চরম ভাববাদের পরিচয় পাওয়া যায় শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মধ্যে। অতএব, চরম ভাববাদের সহায়ক 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' লোকায়ত-সম্প্রদায়ের এক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা ঘটে।

জয়রাশি ভট্টর প্রকৃত দার্শনিক প্রতিপাদ্য বিচারে অগ্রসর হওয়া যাক। প্রথমত মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিদ্বানেরা জয়রাশি ভট্টকে যে-ভাবেই লোকায়তিক বা চার্বাকপন্থী বলে ঘোষণা করার প্রয়াস করুন না কেন, স্বয়ং জয়রাশি গ্রন্থমধ্যে কোথাও নিজেকে লোকায়তিক বা বৃহস্পতি-মতানুসারী বা চার্বাকপন্থী বলে বর্ণনা বা উল্লেখ করেননি। গ্রন্থমধ্যে অবশ্যই বৃহস্পতির নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং এই উল্লেখের তাৎপর্য আমরা অচিরেই বিচার করবো। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে চার্বাক বা লোকায়ত শব্দের ঐকান্তিক উল্লেখাভাবও উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিতীয়ত, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র বর্তমান মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকেরা নানা লেখকের রচনা থেকে জয়রাশি ও তাঁর মতবাদ সংক্রান্ত নানা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু এ জাতীয় কোন উক্তিতেই জয়রাশি চার্বাকপন্থী বলে উল্লিখিত নন বা তাঁর মতবাদ চার্বাক বা বার্হস্পত্য বা লোকায়তর কোন পরিচিত নামেই উল্লিখিত

---

৩৩ ক। সম্প্রতি বন্ধুবর কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচার করে জয়রাশি ভট্টর প্রকৃত দার্শনিক মতবাদ বিচার করেছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারেও জয়রাশিকে চার্বাক মতানুসারী বা লোকায়তিক বলার সঙ্গত কারণ নেই: K. K. Dixit in ISPP iv. 98 ff। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র বর্তমান বিচারের জন্যে আমি তাঁর উক্ত রচনাটি ছাড়াও তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত আলোচনার দ্বারাও বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

নয়। বস্তুত ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিক কোন রচনাতে 'তত্ত্বোপপ্লব-সিংহ'-কে লোকায়তিক গ্রন্থ বা গ্রন্থকারকে লোকায়ত-মতানুসারী বলা হয়নি। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র আভ্যন্তরীণ কোন সাক্ষ্য থেকে বা 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-বহির্ভূত বা রচনান্তরের কোন সাক্ষ্য থেকেই অন্তত সরাসরিভাবে দাবি করা যায় না যে গ্রন্থটি লোকায়ত-মতের ব্যাখ্যায় বা সমর্থনে রচিত হয়েছিল।

সম্পাদকেরা তবুও দাবি করেছেন, সরাসরি ভাবে না-হলেও অন্তত অনুমানমূলক ভাবে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আভ্যন্তরীণ এবং 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-বহির্ভূত সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায় যে গ্রন্থকার প্রকৃতপক্ষে লোকায়তিক বা চার্বাক-মতানুসারীই ছিলেন। এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলতে কী? সম্পাদকদের দাবি অনুসারে তা প্রধানত এই যে গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার বৃহস্পতির নাম বা বৃহস্পতির উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। জয়রাশিকে লোকায়তিক বলার পক্ষে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-বহির্ভূত সাক্ষ্য কী? সম্পাদকদের দাবি অনুসারে প্রধানত দুটি সাক্ষ্য। এক: খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অদ্বৈত-বৈদান্তিক শ্রীহর্ষ রচিত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের একটি উক্তির উপর তাঁর বহু ভাষ্যকারের মধ্যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক ভাষ্যকারের দ্বিবিধ মন্তব্যের বা বিকল্প-মূলক মন্তব্যের মধ্যে একটি মন্তব্য। দুই: চার্বাক-মতের অন্তর্নিহিত অনিবার্য সন্দেহবাদ-প্রবণতা।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র বিস্তৃততর বিচারের পূর্বে সংক্ষেপে এই সাক্ষ্যগুলিরই গুরুত্ব দেখা যাক।

প্রথমত এবিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই চার্বাক বা লোকায়ত-মতের আদি-গুরু। কিন্তু এই ঐতিহ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কেননা, বৃহস্পতি একটি পৌরাণিক নামমাত্র; 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' থেকে শুরু করে সুবিশাল অষ্টাদশ পুরাণ পর্যন্ত বৃহস্পতি সংক্রান্ত বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি উপাখ্যান হল, বৃহস্পতি কর্তৃক চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন। উপাখ্যানটিকে অবজ্ঞা করার প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না; তবুও মনে রাখা দরকার এটি শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক উপাখ্যানই। এবং দার্শনিক বিচারে পৌরাণিক উপাখ্যানের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত গৌণ হতে বাধ্য। শঙ্করাচার্যও[৩৪] সাংখ্য-সম্প্রদায় প্রসঙ্গে এ-জাতীয় একটি মন্তব্যই ব্যক্ত করেছেন: সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক হিসাবে কপিলের নাম অবশ্যই প্রসিদ্ধ এবং শ্রুতি-বিশেষে কপিলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু কপিল একটি নামমাত্র বা শব্দমাত্র—"কপিলমিতি শব্দসামান্যমাত্রত্বাৎ"। অর্থাৎ কপিল শব্দটি ব্যক্তিবিশেষের বোধক নয়, কপিল অনেক; তার মধ্যে কোন্ কপিল সাংখ্য-দর্শন প্রণয়ন

৩৪। 'শারীরকভাষ্য', ২।১।১

করেছেন আর কোন্ কপিল শাস্ত্রবাক্যে প্রশংসিত হয়েছেন তারও স্থিরতা নেই ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্যই আপত্তি উঠবে, চার্বাক বা লোকায়ত-মতের সঙ্গে বৃহস্পতির সম্পর্ক মোটের উপর পৌরাণিক উপাখ্যান জাতীয় হলেও আমরা অনেক সময় বার্হস্পত্য নাম থেকেই চার্বাকমত অনুমান করতে বাধ্য। অতএব, দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে পৌরাণিক উপাখ্যানের গুরুত্ব তুলনায় গৌণ হলেও অন্তত লোকায়ত-মতের আলোচনায় বৃহস্পতি নামের সাক্ষ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। অতএব জয়রাশি ভট্ট যদি একাধিকবার বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করে থাকেন এবং বৃহস্পতির উক্তিও উদ্ধৃত করে থাকেন তাহলে তাঁর দার্শনিক মতের বিচারে এই সাক্ষ্যগুলিকে অবজ্ঞা করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হবে না।

আপত্তিটি স্বীকার্য। তবুও প্রশ্ন তোলা দরকার, জয়রাশি ঠিক কোন্ মনোভঙ্গি নিয়ে বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করেছেন? দ্বিতীয়ত, ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি বৃহস্পতির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন?

প্রথম প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে জয়রাশির গ্রন্থশেষে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে জয়রাশির গ্রন্থারম্ভে।

গ্রন্থশেষে স্বীয় কীর্তির গুণগানে দন্তভরে জয়রাশি ঘোষণা করছেন,

যে যাতা নহি গোচরং সুরগুরোঃ বুদ্ধের্বিকল্পা দৃঢ়াঃ,
প্রাপ্যন্তে নন্থ তেঽপি যত্র বিমলে পাষণ্ডদর্পচ্ছিদি।
ভট্টশ্রীজয়রাশিদেবগুরুভিঃ সৃষ্টো মহার্থোদয়ঃ—
তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এষ ইতি যঃ খ্যাতিং পরাং যাস্যতি॥
পাষণ্ডখণ্ডনাভিজ্ঞা জ্ঞানোদধিবিবর্ধিতাঃ।
জয়রাশের্জয়ন্তীহ বিকল্পা বাদিজিষ্ণবঃ॥৩৫

৩৫। তত্ত্বোপপ্লবসিংহ ১২৫॥ অবশ্যই গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় জয়রাশি 'ভগবান্ বৃহস্পতিঃ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ-জাতীয় সম্মান সূচক 'ভগবান্' বিশেষণের ব্যবহার থেকেই তাঁকে বার্হস্পত্য মতাবলম্বী বলা যায় না। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থে (পৃ. ২৭, চৌখাম্বা সংস্করণ) অদ্বৈত মতের প্রখ্যাত সমর্থক শ্রীহর্ষও 'ভগবতা সুরগুরুণা'...ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এই কারণেই শ্রীহর্ষকে কেউই চার্বাকপন্থী বলবেন না। তর্ক তুলে হয়ত বলা হবে, উক্ত ৪৫ পৃষ্ঠাতেই জয়রাশি একটি প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন: 'পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ'। কিন্তু জয়রাশির রচনা এমনই চিত্তাকর্ষক যে নিজ বক্তব্য সমর্থনে তাঁর পক্ষে গ্রন্থের কোথাও কোন এক সম্প্রদায়ের মত বা উক্তি উদ্ধৃত করা থেকেই তাঁর নিজস্ব দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করা যায় না। যেমন, গ্রন্থের ৪-৭ পৃষ্ঠায় তিনি নৈয়ায়িকদের 'জাতি' বা 'সামান্য' সংক্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেছেন; আবার ৪৬-৫৫ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যে-ভাবে এই 'জাতি' বা 'সামান্য' সংক্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেন সেই খণ্ডনেরও খণ্ডন করেছেন। আমাদের মন্তব্য হল, গ্রন্থের উপসংহারে জয়রাশি যে-সুস্পষ্ট ভাষায় সুরগুরুর উল্লেখ করেছেন বৃহস্পতির প্রতি তাঁর প্রকৃত মনোভাবের অবিসংবাদিত নজির হিসাবে শুধু সেইটিকেই গ্রহণ করা সম্ভব।

—অর্থাৎ, যে-গভীর বুদ্ধিবিকল্পগুলি (বুদ্ধিবিভ্রমগুলি) এমনকি সুরগুরুরও (বৃহস্পতিরও) গোচর হয়নি সেগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায় এই বিমল পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনে। সেই মহানার্থের উদয়স্বরূপ গ্রন্থ দেবগুরু জয়রাশি ভট্ট কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে, যিনি তত্ত্বোপপ্লবসিংহ নামে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি প্রাপ্ত হবেন। জয়রাশির পাষণ্ডখণ্ডনে অভিজ্ঞ জ্ঞানসমুদ্রের বিবর্ধনকারী ও বাদিগণের বিরুদ্ধে জয়ী বিকল্পগুলি জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংক্ষেপে, জয়রাশি দাবি করছেন, যে-সব দার্শনিক বিভ্রান্তি স্বয়ং বৃহস্পতিরও অগোচর ছিল সেগুলি 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-এ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি এমনকি নিজেকেই দেবগুরু বলে ঘোষণা করছেন,—এবং গৌরবে দেবগুরু শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করছেন! আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, স্বীয় কীর্তির প্রধানতম পরিচায়ক হিসাবে তিনি পাষণ্ডখণ্ডন বা পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনই উল্লেখ করেছেন। মহাভারত, পুরাণাদিতে পাষণ্ড শব্দটির প্রধানতম অর্থ নল নাস্তিক বা বেদবিরোধী—যথা, বৌদ্ধ, জৈন এবং অবশ্যই নাস্তিকচূড়ামণি চার্বাক বা লোকায়ত। বস্তুত ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ এবং দার্শনিক সাহিত্যে ব্যবহৃত 'পাষণ্ড' শব্দের তাৎপর্য থেকে নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাকদের বাদ দেবার প্রস্তাব করলে শব্দটির পক্ষে অর্থহীনতার আশঙ্কা ঘটে। স্বভাবতই কোন প্রকৃত চার্বাকপন্থী বা লোকায়তিকের পক্ষে এই ভাবে পাষণ্ডদর্প খণ্ডনের দম্ভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাষণ্ড-খণ্ডনের কথা আপাতত না হয় নাইই তোলা হল; 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে সুরগুরু বা বৃহস্পতির নাম উল্লেখের তাৎপর্যটুকুই বিচার করা যাক।

জয়রাশি বৃহস্পতির উল্লেখ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-উল্লেখের তাৎপর্য ঠিক কী? নিশ্চয়ই এই নয় যে জয়রাশি নিজেকে বৃহস্পতি-মতানুসারী বলেই ঘোষণা করতে চেয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে কোন দার্শনিকের পক্ষেই নিজেকে স্বীয় সম্প্রদায়-প্রবর্তকের তুলনায় প্রখরতর চিন্তাশীল বা বিচার-পারদর্শী বলে ঘোষণা করার সম্ভাবনা অবশ্যই কল্পনাতীত। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-এ বৃহস্পতির উল্লেখ থেকেই প্রমাণ হয় না যে গ্রন্থটি বার্হস্পত্যমতের পরিচায়ক; পক্ষান্তরে বৃহস্পতির উপরোক্ত উল্লেখ থেকে বরং স্পষ্টই বোঝা যায়, বৃহস্পতির অনুগামী হওয়া দূরের কথা জয়রাশি নিজেকে বস্তুত বৃহস্পতির চেয়ে বড়োই মনে করতেন।

অবশ্য জয়রাশি শুধুমাত্র বৃহস্পতির নামই উল্লেখ করেননি, প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতও উদ্ধৃত করেছেন। এ-উদ্ধৃতির তাৎপর্য বিচারের আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র একটিমাত্র হস্তলিখিত পুঁথি উদ্ধার হয়েছে এবং সেটির অনুসরণেই বর্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত। সম্পাদকদের পক্ষে এই পুঁথির আরম্ভাংশের পাঠ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই গ্রন্থারম্ভে প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতটি উদ্ধৃত করার পূর্বে উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য

হিসাবে জয়রাশি যে-প্রাথমিক মন্তব্য করেছিলেন তা আমাদের আছে সুস্পষ্ট নয়। তবুও উদ্ধৃতিটির ঠিক পরেই জয়রাশি যে-মন্তব্য করেছেন তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, বার্হস্পত্য-মতটির সুস্পষ্ট তাৎপর্য প্রত্যাখ্যান করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। যথা, বর্তমান মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ অনুসারে,—

"অথাতস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ"। "পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানি তৎ-সমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়সংজ্ঞা"। ইত্যাদি? ন, অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থম্? প্রতিবিম্বনার্থম্। কিং পুনরত্র প্রতিবিম্ব্যতে? পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি লোকে প্রসিদ্ধানি, তান্যপি বিচার্যমাণানি ন ব্যবতিষ্ঠন্তে; কিং পুনরন্যানি? অথ কথং তানি ন সন্তি? তদুচ্যতে…[৩৬]

—"অতএব অতঃপর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো"। "পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু—এগুলিই হল তত্ত্ব। এগুলির সমুদায়েরই বা মিলনেরই সংজ্ঞা হল শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়"। ইত্যাদি (কথা কি স্বীকার যোগ্য)? তা নয়। কারণ অন্য অর্থ আছে। কী অর্থ? প্রতিবিম্বন-অর্থ। এখানে কী প্রতিবিম্বিত হয়েছে? পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব লোকে প্রসিদ্ধ; কিন্তু বিচারের ফলে এমনকি সেগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব, আর অপর কোন তত্ত্বের প্রশ্ন ওঠে কী করে? কিন্তু এগুলি কেন সত্য নয়? উত্তরে বলা হচ্ছে…

কোন্ বিচারের সাহায্যে বা কী যুক্তি দেখিয়ে স্বয়ং জয়রাশি পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতকে অসত্য প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তার আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র, আমরা একটু পরে সে-আলোচনা উত্থাপন করবো। আপাতত প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতের সঙ্গে জয়রাশির নিজস্ব মতের প্রকৃত সম্পর্ক বিচার করা যাক। পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতই যে প্রকৃত তত্ত্ব—এ-মত অবশ্যই প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মত। অতএব বর্তমানে আমাদের কাছে প্রধানতম প্রশ্ন হল, জয়রাশি এই মত গ্রহণ করেছেন, না, প্রত্যাখ্যান করেছেন? এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব: জয়রাশি সুস্পষ্টভাবেই উক্ত মত বর্জন করেছেন।

৩৬। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ', ১। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জয়রাশিকে বার্হস্পত্য-মতানুসারী বলে প্রমাণ করার উৎসাহে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র সম্পাদকের পক্ষে এই উক্তির কষ্ট-কল্পিত কোন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে হয়েছে। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, Jayarasi thus disposes off the orthodoxy and starts, so to say, with the permission of his Guru, by removing him out of the way, on his campaign of demolishing the doctrines of other schools. (ভূমিকা, পৃঃ xii)। কিন্তু গুরুর সম্মতি লাভের আশায় গুরুকেই হটিয়ে দিয়ে গুরুর প্রসিদ্ধ মতটিকেই খণ্ডন করার তাৎপর্য সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়; কেননা, পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করলেও আলোচ্য উদ্ধৃতিতে জয়রাশি প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য মতই বর্জন করার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর মূল বক্তব্য হল, পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব লোকে প্রসিদ্ধ; কিন্তু বিচারের ফলে এই তত্ত্বগুলিই প্রতিষ্ঠিত হয় না; অতএব অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য জয়রাশির রচনাভঙ্গি এখানে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতকে সরাসরি অলীক বলে ঘোষণা করার পরিবর্তে তিনি প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করছেন: 'ন। অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থম্? প্রতিবিম্বনার্থম্'। এখানে 'প্রতিবিম্বন-অর্থ' বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান তা অবশ্যই সুস্পষ্ট নয়। পরিভাষিক শব্দ হিসাবে কথাটি ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নয়। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মুদ্রিত সংস্করণটির সম্পাদকেরা এই শব্দ ব্যবহারের একটা তাৎপর্য উদ্ভাবনের প্রয়াস করেছেন। তাঁদের মতে, জয়রাশি আসলে বলতে চান যে আলোচ্য উক্তির সাহায্যে বৃহস্পতি শুধুমাত্র সাধারণ লোকের বিশ্বাসটুকুই প্রতিবিম্বিত করছিলেন; কিন্তু জয়রাশির মতে বৃহস্পতির উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, বিচারে বোঝা যায় পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্বও স্বীকারযোগ্য নয়, অতএব আর অন্য তত্ত্বের কথা না-তোলাই ভাল।[৩৭] অর্থাৎ, জয়রাশি যেন বার্হস্পত্য মতটিরই প্রকৃত গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কারের দাবি করছেন। কিন্তু জয়রাশিকে যেন-তেন প্রকারে বৃহস্পতি-মতানুসারী প্রতিপন্ন করার প্রয়াসই এ-জাতীয় ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের প্রকৃত প্রেরণা। বস্তুত, 'প্রতিবিম্বন-অর্থ' কথাটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও জয়রাশির নিজস্ব রচনায় এ-জাতীয় ইংগিতের লেশমাত্র পরিচয় নেই যে তাঁর মতে আলোচ্য উক্তির সাহায্যে বৃহস্পতি নেহাতই সাধারণ লোকের বিশ্বাস প্রতিবিম্বিত করছেন। কেননা তাহলে জয়রাশি বলতেন, 'এখানে কী প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? লোকবিশ্বাস'। কিন্তু এজাতীয় কথার পরিবর্তে জয়রাশি বরং বলছেন, 'কিং পুনরত্র প্রতি-বিম্ব্যতে? পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি লোকে প্রসিদ্ধানি, তান্যপি বিচার্যমানানি ন ব্যবতিষ্ঠন্তে; কিং পুনরন্যানি?' অর্থাৎ 'এখানে কী প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব লোকে প্রসিদ্ধ হলেও বিচারে সেগুলিও অপ্রতিষ্ঠ হয়; অতএব আর অপর কোন তত্ত্বের প্রশ্ন ওঠে কী করে?'

অতএব, 'প্রতিবিম্বনার্থ' শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও একথা কল্পনা করার কোন কারণ নেই যে জয়রাশি এখানে প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতেরই কোন একরকম গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কারের দাবি করছেন। বস্তুত, 'প্রতিবিম্বনার্থ' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বিতর্কসাপেক্ষ ও অনিশ্চিত হলেও জয়রাশি এখানে প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতটির উল্লেখ-পূর্বক প্রত্যাখ্যানই করছেন; কেননা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে এখানে জয়রাশির মূল বক্তব্য হল,

৩৭। ঐ, ভূমিকা পৃ. xii: 'Jayarasi in effect says that Brihaspati is merely reflecting (প্রতিবিম্বনার্থম্) in his statement the belief of the people'.

পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূত সংক্রান্ত বার্হস্পত্য-মতটি লোকপ্রসিদ্ধ হলেও বিচার-সহ নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, গ্রন্থারম্ভেই জয়রাশি প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা একটু পরেই দেখবো, তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মূল দার্শনিক প্রতিপাদ্য স্থাপনের জন্য কেন এইভাবে সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মত—বা বস্তুবাদী মত—খণ্ডন করা একান্তই প্রয়োজন। কেননা, জয়রাশির প্রকৃত প্রতিপাদ্য-বিষয় চরম ভাববাদেরই সমগোত্রীয়; এতএব তাঁর পক্ষে সর্বপ্রথম বস্তুবাদী মতটির প্রত্যাখ্যানই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মূল প্রতিপাদ্য-বিষয়ের আলোচনা তোলবার আগে যে-সাক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে গ্রন্থটিকে প্রকৃত লোকায়তিক বলে দাবি করা হয়েছে সেগুলির বিচার সমাধা করা বাঞ্ছনীয়। আগেই বলেছি, এই দাবির পক্ষে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলতে প্রধানত একটিই: গ্রন্থমধ্যে বৃহস্পতির নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং উদ্ধৃত হয়েছে বার্হস্পত্য-মত বা উক্তি। আমরা দেখলাম, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে প্রকৃত লোকায়তিক গ্রন্থ প্রতিপন্ন করার পক্ষে এই সাক্ষ্যর মূল্য বস্তুত অকিঞ্চিৎকর। কেননা, গ্রন্থশেষে জয়রাশি সুরগুরু বা বৃহস্পতির উল্লেখ করেছেন নিজেকে তাঁর অনুগামী বলে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নয়, বস্তুত নিজেকে বৃহস্পতির চেয়ে বড়ো বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই। এবং গ্রন্থারম্ভেই তিনি প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মত উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তারও উদ্দেশ্য হল মতটির সমর্থন নয়—বরং একথা ঘোষণা করা যে মতটি সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত হলেও আসলে স্বীকারযোগ্য নয়। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করে জয়রাশিকে প্রকৃত বার্হস্পত্য-মতানুসারী বা লোকায়তিক বলা সঙ্গত নয়, বরং আমরা একটু পরেই দেখবো 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র প্রধানতম আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে জয়রাশি প্রকৃতপক্ষে পরম লোকায়ত-বিরোধীই ছিলেন।

এছাড়া, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে লোকায়তিক আখ্যা দেবার পক্ষে প্রধানত দুটি সাক্ষ্য প্রস্তাবিত হয়েছে; উভয় সাক্ষ্যই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-বহির্ভূত—অর্থাৎ রচনান্তরের সাক্ষ্য। তার মধ্যে যেটির উপর সম্পাদকেরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রথমে সেইটিরই বিচার করা যাক। এবিচার অনিবার্যভাবেই কিছুটা দীর্ঘ হবে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অদ্বৈত-বেদান্ত বা মায়াবাদের সমর্থনে শ্রীহর্ষ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নামটির অর্থ হল, খণ্ডনরূপ মিষ্টান্ন; তাৎপর্য এই যে লেখকের কাছে খণ্ডনই পরম উপাদেয়—সোজা কথায় 'খণ্ডন'ই আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। কিসের খণ্ডন, বা, কী খণ্ডন? মূলতই প্রমাণ-খণ্ডন। প্রমাণ শব্দের অর্থ হল, প্রমা বা নির্ভুল

জ্ঞানের সাধকতম কারণ ; সহজ কথায় যে উপায়ে নির্ভুল জ্ঞান পাওয়া যায় তাকেই প্রমাণ বলে। যেমন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতি। 'খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য'-র মূল প্রতিপাদ্য হল, প্রমাণ-খণ্ডন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতি জ্ঞানের উৎসগুলি খণ্ডন করা। অদ্বৈত-বৈদান্তিক বা মায়াবাদীর পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলিকে খণ্ডন করার উৎসাহ কেন? কেননা, এই মতে আত্মা বা চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অতএব জগৎ মিথ্যা—মায়া বা অজ্ঞানের ফলেই এই মিথ্যা জগৎ পরিকল্পিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতির সাহায্যে আমরা জগৎকেই জানি ; অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতিকে প্রমাণ বা নির্ভুল জ্ঞানের সাধক বলে স্বীকার করলে এই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করার আশঙ্কা ঘটে। অতএব, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রমাণ-খণ্ডনের প্রয়োজন হয়। এই কারণে মায়াবাদের প্রধানতম প্রচারক শঙ্করাচার্য তাঁর 'শারীরকভাষ্য'-র ভূমিকাতেই ঘোষণা করেছেন, সর্বপ্রকার প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার অবিদ্যা বা অজ্ঞানাশ্রিত।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ন্যায় সম্প্রদায়ের—বা, পরবর্তীকালে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের—দার্শনিকেরা। স্বভাবতই 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-কার শ্রীহর্ষ প্রধানতম প্রতিপক্ষ হিসাবে এই ন্যায় বা ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করেছেন। মায়াবাদীদের পক্ষে সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা সর্বপ্রথম যে-আপত্তি উত্থাপন করবেন শ্রীহর্ষ গ্রন্থারম্ভেই তার একটি উত্তর দিতে চেয়েছেন। নৈয়ায়িকেরা বলবেন, মায়াবাদী যদি কোন প্রমাণই স্বীকার না-করেন তাহলে তাঁর পক্ষে দার্শনিক বিচার বা বিতর্কে যোগ দেওয়াই অসাধুতা ও প্রবঞ্চনার সমতুল্য হবে। কেননা তর্কে প্রবিষ্ট হওয়া মানেই অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা—অনুমানের সহায়তাতেই পরপক্ষ-খণ্ডন ও আত্মপক্ষ সমর্থন সম্ভব। যে ব্যক্তি কোন প্রমাণই মানেন না তিনি কিসের নজির দেখিয়ে পরমত খণ্ডন বা নিজমত সমর্থনের প্রয়াসী হন? মায়াবাদী যদি দার্শনিক বিচার-বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রমাণ আছে,—অর্থাৎ তাঁকে সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের উৎসাহই পরিত্যাগ করতে হবে।

এজাতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে শ্রীহর্ষ প্রাথমিক ভাবে একটি উত্তর দিয়েছেন এবং প্রধানত সেই উত্তরটি অবলম্বন করেই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র সম্পাদকেরা জয়রাশি ভট্টকে প্রকৃত চার্বাকপন্থী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। শ্রীহর্ষ বলছেন,

তদনভ্যুপগচ্ছতোঽপি চার্বাকমাধ্যমিকাদের্বাগ্মিস্তরাণাং প্রতীয়মানত্বাৎ। ...সোঽয়মপূর্বঃ প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগমাত্মা বাক্স্তম্ভমন্ত্রো ভবতাভ্যূহিতো নূনং যস্য প্রভাবাদ্ ভগবতা সুরগুরুণা লোকায়তিকানি সূত্রাণি ন

প্রণীতানি, তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টাঃ, ভগবৎপাদেন বা বাদরায়ণীয়েষু সূত্রেষু ভাষ্যং নাভাষি ।[৩৮]

—প্রমাণে অনাস্থা সত্ত্বেও চার্বাক ও মাধ্যমিক প্রভৃতিদের বাক্‌জাল যেহেতু প্রতীয়মান সেই হেতু।···আপনি যে-অপূর্ব প্রমাণ প্রভৃতির সত্তায় অনাস্থা সংক্রান্ত বাক্‌স্তম্ভমন্ত্র বলেছেন তার প্রভাবেই ভগবান বৃহস্পতি লোকায়তসূত্রাবলী রচনা করেননি, তথাগত (বুদ্ধ) মাধ্যমিক শাস্ত্রের উপদেশ দেননি, শঙ্করাচার্যও 'বাদরায়ণ-সূত্র'-র ('ব্রহ্মসূত্র'-র) ভাষ্য রচনা করেননি।

অর্থাৎ, শ্রীহর্ষ তীব্র বিদ্রূপ সহকারেই বলছেন, প্রমাণের উপর আস্থা বা বিশ্বাস দার্শনিক বিচার-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার অনিবার্য সর্ত হতে পারে না। চার্বাক, মাধ্যমিক বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা প্রমাণে আস্থা ব্যতিরেকেই দার্শনিক বিচারবিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রমাণে আস্থা এবং বিচার-বিতর্কে অংশগ্রহণ করার মধ্যে কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। যদি অনিবার্য সম্বন্ধ থাকতো তাহলে তারই প্রভাবে কোন মন্ত্রবলে দেবগুরু বৃহস্পতি লোকায়ত-সূত্র প্রণয়নে অসমর্থ হতেন, তথাগত বা বুদ্ধ মাধ্যমিক মতের উপদেশ দিতে পারতেন না এবং শঙ্করাচার্য 'ব্রহ্মসূত্র'র ভাষ্য রচনা করতে পারতেন না।

শ্রীহর্ষর এই যুক্তির প্রকৃত গুরুত্ব বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তার পরিবর্তে বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হল: শ্রীহর্ষর উপরোক্ত উক্তির মধ্যে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র সম্পাদকেরা কী ইংগিত পেয়েছেন যার উপর নির্ভর করে তাঁরা জয়রাশিভট্টকে অবধারিত ভাবেই চার্বাক বা লোকায়তিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান? সে ইংগিত বলতে এই যে, শ্রীহর্ষ এখানে চার্বাক-পন্থীকেও (মাধ্যমিক বা) শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের সমগোত্রীয় হিসাবেই প্রমাণে আস্থাহীন বলে উল্লেখ করেছেন। এ-ইংগিত জয়রাশিকেও চার্বাকপন্থী বলে বিবেচনা করার সহায়ক কেন? কেননা, জয়রাশির মূল প্রতিপাদ্য বলতেও প্রমাণ-খণ্ডনই।

জয়রাশির প্রমাণ-খণ্ডনের পরিচয় অচিরেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। তার আগে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেখা দরকার। এক: শ্রীহর্ষর উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য ঠিক কী? দুই: সে-তাৎপর্য যদি বাস্তবিকই এই হয় যে চার্বাকেরা আসলে কোন রকম প্রমাণই স্বীকার করতেন না, বা, তাঁরাও সর্বপ্রমাণ খণ্ডনে উৎসাহী ছিলেন, তাহলেও তারই নজির থেকে জয়রাশিকে চার্বকপন্থী বিবেচনা করার বাস্তব বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সত্যিই কতটুক?

৩৮। ঐ ভূমিকা পৃ. iii-তে উদ্ধৃত।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখা দরকার, আলোচ্য উক্তিতে শ্রীহর্ষ শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর সঙ্গে চার্বাক বা লোকায়তর উল্লেখ করে যতোই বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিন না কেন, তাঁর পক্ষেও বাস্তব বা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে চার্বাককে অন্তত সরাসরিভাবে সর্ব-প্রমাণ বিরোধী বলে বর্ণনা করার বাধা আছে। কেননা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে চার্বাকেরা অন্তত প্রত্যক্ষর প্রামাণ্য স্বীকার করতেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এই প্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করেই মণিভদ্র প্রমুখ বলেছেন, লোকায়ত-মতে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলে স্বীকৃত। এবং শ্রীহর্ষের নিজের সম্প্রদায়ের আরো পরবর্তী দার্শনিক মধ্বাচার্যও চার্বাককে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী বলেই বর্ণনা করেছেন। [তাছাড়া অবশ্যই জয়ন্তভট্টর সুবিখ্যাত উক্তি বর্তমান: "প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্বাকাঃ" ('ন্যায়মঞ্জরী' ১।২৬) ; যদিও আমরা পরে দেখবো, জয়ন্তভট্টর ব্যাখ্যা অনুসারে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ-অনুগৃহীত বা প্রত্যক্ষ-অনুসারী অনুমানও প্রমাণ বলেই স্বীকৃত।] এতএব শ্রীহর্ষর মতো বিদ্বানের পক্ষে সরাসরিভাবে এমন দাবি করা সম্ভবই নয় যে লোকায়তিকেরা শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর মতো সর্বপ্রমাণে আস্থাহীন ছিলেন। ফলে 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র টীকাকারেরা শ্রীহর্ষর আলোচ্য উক্তির ব্যাখ্যায় বস্তুত কিছুটা বিব্রতই বোধ করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র টীকাগ্রন্থ বলতে একটি নয়, অনেক। যথা: পরমানন্দ রচিত 'খণ্ডন-মণ্ডন,' ভবনাথ রচিত 'খণ্ডন-মণ্ডন', রঘুনাথ শিরোমণি রচিত 'খণ্ডন-ভূষামণি', বর্ধমান রচিত 'প্রকাশ,' বিদ্যাভরণ রচিত 'বিদ্যাভরণী', বিদ্যাসাগর রচিত 'বিদ্যাসাগরী', পদ্মনাভ পণ্ডিত রচিত 'খণ্ডন-টীকা', শুভঙ্কর রচিত 'শ্রীদর্পণ', চরিত্রসিংহ রচিত 'খণ্ডন-মহাতর্ক,' প্রগল্ভ মিশ্র রচিত 'খণ্ডন-খণ্ডন', পদ্মনাভ রচিত 'শিষ্য-হিতৈষিণী', গোপুসনাথ উপাধ্যায় রচিত 'খণ্ডন-কুঠার' এবং শঙ্কর মিশ্র রচিত 'আনন্দবর্ধন'।

এতোগুলি টীকার তালিকা উল্লেখের কারণ হল, তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা জয়রাশি ভট্টকে লোকায়তিক প্রমাণ করার উৎসাহে উপরোক্ত অনেক টীকার মধ্যে শুধুমাত্র শেষ টীকাটির—অর্থাৎ শঙ্কর মিশ্র রচিত 'আনন্দবর্ধন'এর—একটি কাল্পনিক উক্তির উপরই প্রায় ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণের প্রস্তাব করেছেন ; অর্থাৎ, শ্রীহর্ষর বাকি টীকাকারেরা 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র আলোচ্য উক্তিটির একরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ; শঙ্কর মিশ্রও সে-ব্যাখ্যা বর্জন করেননি ; কিন্তু তার সঙ্গে একটি স্পষ্টতই কাল্পনিক কথা সংযুক্ত করেছেন এবং 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা সেই কথাটি অবলম্বন করেই জয়রাশিকে চার্বাকপন্থী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

অন্যান্য টীকাকারদের ব্যাখ্যা কী? মাধবাচার্য প্রমুখ অনেকে মন্তব্য

করেছেন যে চার্বাকেরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, তাঁরা অনুমানের প্রামাণ্য মানেন না। অবশ্য একথা ঐতিহাসিকভাবে কতখানি স্বীকার্য তার আলোচনা আমরা পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই উত্থাপন করবো। আপাতত দ্রষ্টব্য এই যে শ্রীহর্ষর টীকাকারেরা প্রায় সকলেই চার্বাক সংক্রান্ত এ-জাতীয় কোন প্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করেই শ্রীহর্ষর আলোচ্য উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে শ্রীহর্ষর উদ্দেশ্য চার্বাককে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী বলে বর্ণনা করা নয়; কিন্তু চার্বাকেরা যেহেতু অনুমানকে প্রমাণ বলে মানেন না এবং অনুমান ছাড়া যেহেতু প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভব নয় সেইহেতু চার্বাকেরাও প্রকৃতপক্ষে প্রমাণে আস্থাবান হতে পারেন না।

বস্তুত এজাতীয় একটি যুক্তিই শ্রীহর্ষের অভিপ্রেত হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, দার্শনিক বিচার-বিতর্কে যোগদানের অধিকার-প্রসঙ্গেই তিনি আলোচনাটি উত্থাপন করেছেন এবং বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য মানা-না-মানার চেয়ে বড়ো কথা হল অনুমানের প্রামাণ্য মানা-না-মানা। অতএব, প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেও যেহেতু চার্বাকেরা অনুমান অস্বীকার করেন সেই হেতু, শ্রীহর্ষ বলছেন, দার্শনিক বিচার-বিতর্কে যোগদানের অধিকারের দিক থেকে চার্বাকের অবস্থাও শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর মতোই।

বলাই বাহুল্য, শ্রীহর্ষর উক্তি এই অর্থে গ্রহণ করলে তাঁর নজির দেখিয়ে জয়রাশিভট্টকে চার্বাকপন্থী বলে প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। কেননা জয়রাশি শুধু অনুমানই খণ্ডন করেননি, প্রত্যক্ষও খণ্ডন করেছেন। তিনি সর্বপ্রমাণ বিরোধী; প্রমাণমাত্রের খণ্ডনই তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকদের পক্ষে শ্রীহর্ষর উক্তিটির ব্যাখ্যান্তর অন্বেষণের প্রয়োজন হয়েছে। তাঁরা এ-জাতীয় ব্যাখ্যান্তরের ইংগিত পেয়েছেন শঙ্কর মিশ্র রচিত 'আনন্দবর্ধন' টীকায়। এই টীকায় শঙ্কর মিশ্র উপরোক্ত সর্বটীকাকার-সম্মত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করার পর আরো একটু কথা জুড়ে দিয়েছেন: 'চার্বাকৈকদেশী বা চার্বাকাঃ'। অর্থাৎ, শঙ্কর মিশ্রর মতে এমন এক বিকল্প-সম্ভাবনাও বর্তমান যে এখানে শ্রীহর্ষ চার্বাকদেরই কোন-এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন,—সেই সম্প্রদায়ের মতে প্রমাণমাত্রই অসম্ভব, প্রত্যক্ষও প্রমাণ নয়।

অতএব, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা ঘোষণা করেছেন, চার্বাকদেরই সর্বপ্রমাণ বিরোধী কোন এক সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। এবং জয়রাশিরও যেহেতু প্রধানতম উৎসাহ বলতে সর্বপ্রমাণ-খণ্ডনই সেইহেতু জয়রাশিকে সুপ্রসিদ্ধ এবং 'গোঁড়া' প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বাদী চার্বাক বলে গ্রহণ করার সুযোগ না থাকলেও উক্ত সর্বপ্রমাণ-বিরোধী কোন এক চার্বাক-সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি বলতে হবে।

আমরা একটু পরেই দেখবো, চার্বাক বা লোকায়ত সংক্রান্ত মৌলিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আধুনিক বিদ্বানেরা অনেক সময় অত্যন্ত তুচ্ছ নজিরের কষ্টকল্পিত অর্থ উদ্ভাবন করেই দ্বিধাহীন ভাবে চার্বাকদের নানা রকম সম্প্রদায়-ইতিহাস উল্লেখ করে থাকেন; যেমন অন্যেরা অত্যন্ত সহজেই 'ধূর্ত' ও 'সুশিক্ষিত' নামে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন, সে-উল্লেখের পক্ষে প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ যতো অকিঞ্চিৎকরই হোকনা কেন। কিন্তু আপাতত শঙ্কর মিশ্রের উপরোক্ত উক্তিটি বিচার করা যাক: এ-উক্তির বাস্তব গুরুত্ব সত্যিই কতটুকু? তার উপর নির্ভর করে চার্বাকদেরই কোন এক সর্বপ্রমাণ-বিরোধী সম্প্রদায়ের বাস্তব অস্তিত্ব কল্পনা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত? এবং যদিই বা চার্বাকদেরই এ-জাতীয় কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকারযোগ্য হয় তাহলেও জয়রাশিকে সেই সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি বলে স্বীকার করার কোন কারণ আছে কি?

চার্বাকদেরই সর্বপ্রমাণ বিরোধী কোন সম্প্রদায়-বিশেষের বাস্তব অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন। এবং এ-জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে শঙ্কর মিশ্রও যদি নিঃসন্দেহ হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে সরাসরি সেকথা উল্লেখ করাই স্বাভাবিক হত—অর্থাৎ তাহলে তাঁর পক্ষে শ্রীহর্ষর আলোচ্য উক্তির ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এই ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখটুকুই পর্যাপ্ত হতো। কিন্তু শঙ্কর মিশ্র তা করেন নি। বস্তুত শ্রীহর্ষর অন্যান্য টীকাকারেরা প্রায় একবাক্যে শ্রীহর্ষর উক্তিটি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্কর মিশ্রও প্রথমে সেই ব্যাখ্যারই পুনরুল্লেখ করেছেন এবং তারপর নেহাতই বিকল্প-সম্ভাবনা হিসাবে চার্বাকদেরই এ-জাতীয় কোন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব অনুমান হয়,—জয়রাশিকে চার্বাকপন্থী বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে শঙ্কর মিশ্রর নজির দেখিয়ে কোন কোন আধুনিক বিদ্বান সর্বপ্রমাণ-বিরোধী কোন এক চার্বাক-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে সুনিশ্চিত হলেও স্বয়ং শঙ্কর মিশ্র এ-বিষয়ে অমন সুনিশ্চিত ছিলেন না।

কিন্তু যদিই বা শঙ্কর মিশ্র সুনিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করতেন যে চার্বাকদেরই সর্বপ্রমাণ-বিরোধী কোন এক সম্প্রদায় বর্তমান ছিলো,—তাহলেও তাঁর সেই ঘোষণার বাস্তব গুরুত্ব কতোটুকু হতে পারতো? সুদূর অতীত থেকে শুরু করে ভারতের দার্শনিক ও অদার্শনিক বহু গ্রন্থে চার্বাক, বার্হস্পত্য বা লোকায়তর কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু অন্যত্র কোথাও সর্বপ্রমাণ-বিরোধী চার্বাকদেরই কোন সম্প্রদায়-বিশেষ উল্লিখিত হয়নি। অপরপক্ষে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে শঙ্কর মিশ্রর কাল নির্ণয় করা হয়েছে[৩৯]। অথচ একথা কল্পনাতীত যে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে কোন গ্রন্থকারই চার্বাকদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব

৩৯। Kaviraj GHBNVL 45, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', ২৯।

অবগত ছিলেন না; পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি একমাত্র শঙ্কর মিশ্রর কাছেই এই ঐতিহাসিক তথ্যটি ধরা পড়লো। এখানে বিশেষত মনে রাখা দরকার যে শঙ্কর মিশ্র ছিলেন মিথিলার নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—বস্তুত মিথিলার নব্যন্যায়ের প্রচারক হিসাবে গঙ্গেশের পর পক্ষধর ছাড়া শঙ্কর মিশ্রর সমকক্ষ হিসাবে আর কারুর নাম উল্লেখ করা যায় না। এবং নব্যন্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই হল, দার্শনিক সমস্যাকে এমনই নূতন ভাবে উত্থাপন করা যাতে প্রাচীনতর দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নব্যন্যায়ের ঐতিহ্যের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ নব্যন্যায়ের প্রচারকেরা অনেকাংশেই প্রাচীনতর ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ৪০। এই পরিস্থিতিতে নব্যন্যায়ের প্রখ্যাত প্রচারক শুধুমাত্র মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের কাছেই সুপ্রাচীন লোকায়ত-সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি তথ্য জানা ছিল—যে-তথ্য শঙ্কর মিশ্রের পূর্বে অন্তত দু'হাজার বছর ধরে আর কারুরই জানা ছিল না—এহেন কল্পনার পক্ষে লেশমাত্র সম্ভাবনাও স্বীকারযোগ্য নয়। অতএব শঙ্কর মিশ্র যদি বিশেষ জোর দিয়ে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী কোন এক চার্বাক সম্প্রদায়ের কথা

৪০। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'পরে কালবশে ক্রমশ অধ্যেতা ও অধ্যাপকগণের শক্তির হ্রাস এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির নব্যন্যায় গ্রন্থের বহুল চর্চা ও প্রবল প্রভাবে ক্রমে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের পঠনপাঠনা বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শান্তিপুরের মহানৈয়ায়িক ও স্মার্তপ্রবর রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই "ন্যায়সূত্র-বিবরণ" রচনা করেন। কিন্তু তিনিও ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন নাই, ইহা কাশীধামে মুদ্রিত তাঁহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পরন্তু তিনি ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহারও নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত আর কোন ব্যাখ্যাকারই উক্তরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুত মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" এইরূপ সূত্র বলিতেই পারেন না। গোস্বামী ভট্টাচার্য উক্তরূপ সূত্র কোথায় পাইলেন, ইহাও তিনি বলেন নাই।' (ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ভূমিকা পৃ. ১১)। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সভাষ্য ন্যায়দর্শনের ভূমিকায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মন্তব্য করেছেন, 'ন্যায়ভাষ্যমিদং পূর্বং বিরলং লুপ্তবৎ স্থিতম্'...। আমাদের মন্তব্য হল, নব্যন্যায়ের সমর্থক পরবর্তী দার্শনিকেরা যদি এইভাবে ন্যায়সম্প্রদায়েরই ঐতিহ্যর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাহলে সম্প্রদায়ান্তর প্রসঙ্গে—বিশেষত চার্বাক সম্প্রদায় সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রসঙ্গে—তাঁদের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। কিংবা, রাধামোহন গোস্বামী যদি এমন কি ন্যায়সূত্রের সঙ্গেই "তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" বলে একটি কাল্পনিক সূত্র জুড়ে দিতে পারেন তাহলে শুধুমাত্র শঙ্কর মিশ্রর "চার্বাকৈকদেশী বা চার্ব্যাকাঃ" উক্তির উপর নির্ভর করে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী চার্বাকদেরই কোন এক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

ঘোষণা করতেনও তাহলেও আমাদের পক্ষে সেই ঘোষণার উপর নির্বিচারে নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত হোতো না। কিন্তু, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, স্বয়ং শঙ্কর মিশ্র বস্তুত এজাতীয় কথার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপণ করেননি—'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা কথাটিকে যতো বড়ো ধ্রুব সত্য বলেই কল্পনা করুন না কেন।

পরিশেষে আর একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে। তর্কের খাতিরে নাহয় ধরেই নেওয়া হল যে ভারতীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে বাকি সকলের কাছে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী লোকায়তর সম্প্রদায়-বিশেষ অজ্ঞাত থাকলেও একমাত্র শঙ্কর মিশ্র—এবং এমনকি নাহয় শ্রীহর্ষও—সে-বিষয়ে অবগত ছিলেন। কিন্তু তারই নজির থেকে কি অবধারিত ভাবে প্রমাণ হয় যে জয়রাশি-ভট্ট উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অর্থে চার্বাকপন্থী ছিলেন? অবশ্যই নয়। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা যদি দেখাতে পারতেন যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একমাত্র ওই চার্বাক-সম্প্রদায়টিই সর্বপ্রমাণ-বিরোধী ছিল তাহলে আমরা সর্বপ্রমাণ-বিরোধী জয়রাশিকেও উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হতাম। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্বাকদেরই কোন সম্প্রদায়-বিশেষ সর্বপ্রমাণ-বিরোধী হোক-আর-নাই-হোক, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অপর দুটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রমাণ-খণ্ডনের অত্যন্ত প্রকট উৎসাহ অবশ্যই সুবিদিত। যথা: নাগার্জুন প্রবর্তিত শূন্যবাদী সম্প্রদায় এবং শঙ্করাচার্য-প্রচারিত মায়াবাদী সম্প্রদায়। এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস-গত বিরোধ যতো গভীরই হোক-না-কেন, দার্শনিক প্রতিপাদ্যর দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য স্বীকৃত হয়েছে। কেননা, উভয়-মতেই জগৎ মিথ্যা। বস্তুত জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই উভয় সম্প্রদায়ে সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের আয়োজন দেখা যায়। জয়রাশির মতেও জগৎ মিথ্যা কিনা—সে প্রশ্নর উত্তর একটু পরেই দেখা যাবে। আপাতত মন্তব্য হল, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী দুটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সুবিদিত বলেই শঙ্কর মিশ্র উল্লিখিত কোন এক সর্বপ্রমাণ-বিরোধী চার্বাক সম্প্রদায়ের নজির দেখালেও একথা অবশ্যই প্রমাণ হয় না যে জয়রাশিও যেহেতু সর্বপ্রমাণ-বিরোধী সেইহেতু জয়রাশিও উক্ত চার্বাক-সম্প্রদায়েরই প্রচারক ছিলেন। কেননা সর্বপ্রমাণ-বিরোধী অর্থেই জয়রাশির পক্ষে দার্শনিক হিসাবে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর সমগোত্রীয় হবার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুত আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, চার্বক বা লোকায়ত তো দূরের কথা জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক আত্মীয়তা বলতে ওই শূন্যবাদী ও মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অনুমেয়।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে লোকায়তিক গ্রন্থ বলার পক্ষে প্রধানতম সাক্ষ্য

হিসাবে যে-ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে তা বিচার করা গেল। এবং দেখা গেল, উভয় সাক্ষ্যর মূল্যই প্রকৃতপক্ষে যৎকিঞ্চিৎ। এছাড়াও 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা আরো একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। সেই যুক্তি হল, চার্বাকমতে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্নিহিত সন্দেহবাদ-প্রবণতাই জয়রাশির রচনায় চূড়ান্ত-রূপ গ্রহণ করেছে। এই যুক্তির মূল্য বিচার করার আগে চার্বাক বা লোকায়ত সংক্রান্ত অধুনালভ্য তথ্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে চার্বাক-মতে স্বাভাবিক ভাবে অন্তর্নিহিত সন্দেহবাদ-প্রবণতার কথা সত্যিই স্বীকার্য কিনা। ফলে এ-যুক্তির মূল্য বিচার আমরা আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য; লোকায়ত সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ করার পরই আমাদের পক্ষে এই প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে। কিন্তু লোকায়ত সংক্রান্ত অন্য যে-কোন তথ্য বিচারের পূর্বে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র পূর্ণতর বিচার প্রয়োজন। কেননা 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-ই যদি একমাত্র লোকায়তিক গ্রন্থ হয় তাহলে মূলত এই গ্রন্থ অবলম্বন করেই লোকায়ত সংক্রান্ত অধুনালভ্য বাকি সমস্ত তথ্য বোঝাব চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত হবে।

অতএব 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র বিচার শেষ করা যাক। এ-বিচারের প্রথমার্ধ সমাধা হয়েছে; অর্থাৎ আমরা দেখেছি, কী সাক্ষ্য অনুসারে গ্রন্থটিকে লোকায়তিক বলে দাবি করা হয়েছে এবং সে-সাক্ষ্যর গুরুত্ব কতটুকু এবং প্রকৃত তাৎপর্যই বা কী। এবারে সে-বিচারের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশ করা যাক—অর্থাৎ দেখা যাক, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে লোকায়তিক আখ্যা দেবার উৎসাহে অন্যান্য কতো সাক্ষ্য স্বেচ্ছায় অবহেলা করার প্রয়োজন হয়েছে।

৪ ॥ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' ও চরম ভাববাদ

জয়রাশিভট্টকে চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা একান্তই সঙ্গত কিনা এ-প্রশ্নর মীমাংসায় 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। জয়রাশি রচিত গ্রন্থান্তর আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি অবশ্য 'লক্ষণসার' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, বলছেন 'অব্যপদেশ খণ্ডন প্রসঙ্গে "লক্ষণসার" দ্রষ্টব্য'[৪১]। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরা বিচারমূলক ভাবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে উক্ত 'লক্ষণসার' জয়রাশির নিজস্ব রচনা না-হওয়াই সম্ভব[৪২]। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনা হোক আর নাই হোক, গ্রন্থটি এখনো অনাবিষ্কৃত; অতএব জয়রাশির দার্শনিক মত বিচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি কোন রকম আলোকপাত করে কিনা এ-প্রশ্ন

৪১। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' পৃঃ ২০।

৪২। ঐ, ভূমিকা পৃঃ xi-xii.

আমাদের পক্ষে অবান্তর। অন্যান্য লেখকেরা জয়রাশি বা তাঁর মতবাদ সংক্রান্ত যে-সব উক্তি করেছেন সেগুলির কথা বাদ দিলে জয়রাশির দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-ই আমাদের একমাত্র সম্বল।

প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন, স্বীয় গ্রন্থের নামকরণে জয়রাশি চার্বাক বা লোকায়ত বা বার্হস্পত্য-মতের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্বের আভাস দেননি। সহজ ভাষায় 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র অর্থ হল: তত্ত্ব বা দার্শনিক মতমাত্রেই ধ্বংস বা ধূলিসাৎ বা উৎখাত-কারী সিংহ। তার মানে, স্বীয় ঘোষণা অনুসারে জয়রাশি সিংহ-বিক্রমে তত্ত্ব-উপপ্লব বা সর্বমত-খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। এজাতীয় নামকরণে অবশ্যই বিনয়ের আভাস নেই। যিনি গ্রন্থশেষে সদর্পে নিজেকে দেবগুরু বৃহস্পতির চেয়ে বুদ্ধিমান বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর গ্রন্থের নামকরণে কোন সবিনয়ভাবের প্রত্যাশা করাও সঙ্গত নয়। কিন্তু বিনয়-দম্ভের বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর হবে। তবু উক্ত নামকরণের মূল তাৎপর্যটুকু অবশ্যই অবান্তর নয়। এই নামকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তত্ত্ব-উপপ্লবই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য-বিষয়; অর্থাৎ তিনি এই কথাটিই প্রতিপন্ন করতে চান যে, কোন রকম দার্শনিক মতই গ্রহণযোগ্য বা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। এই কারণে,—আমরা একটু পরেই দেখবো,—মধ্যযুগের যে-দার্শনিকেরা জয়রাশির মতবাদটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে মতবাদটিকে "তত্ত্বোপপ্লববাদ" নামেই উল্লেখ করেছেন।

যে-লেখক স্বীয় গ্রন্থের নামকরণেই ঘোষণা করেন যে কোন রকম দার্শনিক মতই স্বীকারযোগ্য নয় তাঁর কাছে লোকায়ত-মতের গ্রহযোগ্যতাও অবশ্যই সুদূর-পরাহত হতে বাধ্য। অর্থাৎ, দার্শনিক মত মাত্রেরই এ-জাতীয় প্রত্যাখ্যান চার্বাক বা লোকায়ত-মতেরও প্রত্যাখ্যানসূচক হওয়াই স্বাভাবিক। স্বভাবতই জয়রাশিকে চার্বাক-মতাবলম্বী বলে প্রমাণ করার প্রস্তাব সবিশেষ আয়াস-সাধ্যই হয়েছে এবং এই প্রস্তাবের পক্ষে নেহাতই তুচ্ছমূল্য কয়েকটি সাক্ষ্যকে অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে।

আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, চার্বাক বা লোকায়ত নাম কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বর পরিচায়ক নয়; তাই জয়রাশির পক্ষে সর্বতত্ত্ব-প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ায় বাধা ছিল না। কিন্তু এ-জাতীয় দাবির বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উঠবে। প্রথমত, দাবিটিই স্ববিরোধী হবার আশঙ্কা। চার্বাক বা লোকায়ত নামে কোন দার্শনিক মত যদি একান্তই না থাকে তাহলে জয়রাশিকে চার্বাকপন্থী বা লোকায়তিক বলে ঘোষণা করার প্রয়াস ব্যক্তিবিশেষকে গগনকুসুম-গোত্রীয় বা বন্ধ্যাপুত্র-কুলীয় বলার মতোই হাস্যকর হবে। কিংবা, যা একই কথা, জয়রাশিকে চার্বাকপন্থী বা লোকায়তিক বলা মানেই চার্বাক বা লোকায়তকে একটি

নির্দিষ্ট মতের নির্দেশক বলে স্বীকার করা। কিন্তু যে-লেখক স্বীয় ঘোষণা অনুসারেই সিংহ-বিক্রমে সর্বমত খণ্ডনে উদ্যত তাঁকে সেই নির্দিষ্ট মতের সমর্থক বলবার সুযোগ কোথায়? দ্বিতীয়ত, চার্বাক বা লোকায়ত নামে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ আমাদের দেশে বাস্তবিকই প্রচলিত ছিল কিনা—এ-প্রশ্ন মূলতই একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন। তার মীমাংসায় ভারতীয় দর্শনের প্রাসঙ্গিক নজিরগুলির বিচার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এ-জাতীয় সমস্ত নজির উল্লেখ ও বিচার না-করেও শুধুমাত্র একটি সাধারণ মন্তব্যই পর্যাপ্ত হবে। কেননা, বাস্তব ঘটনা এই যে, সম্প্রদায়ান্তরের নানা দার্শনিক নানা-ভাবে লোকায়ত-মত প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব বা খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। স্বভাবতই পূর্বপক্ষ হিসাবে তাঁরা লোকায়ত-মতের উল্লেখও করেছেন। তাঁরা সকলেই অলীক কিছুর সঙ্গে দার্শনিক দ্বন্দ্বে অগ্রসর হয়েছিলেন—এ-জাতীয় কল্পনা তাঁদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধারও পরিচায়ক হবে না। অতএব স্বীকার করতেই হবে, লোকায়ত নামে কোন মত অবশ্যই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহলে আরও স্বীকার করা দরকার, জয়রাশির সর্বমত-খণ্ডনে এই মতটির খণ্ডনও অভিপ্রেত বা উদ্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য, সুখের বিষয়, 'তত্ত্বো-পপ্লবসিংহ'-র আলোচনায় আমরা শুধুমাত্র এ-জাতীয় যুক্তির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য নই। কেননা, এ-বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রকট প্রমাণ বর্তমান। ইতিপূর্বেই দেখেছি, জয়রাশি অবশ্যই প্রসিদ্ধ বার্হস্পত্য-মতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এই বার্হস্পত্য-মতে পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতই পরম সত্য। এবং গ্রন্থারম্ভেই জয়রাশি সেই মত উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যান করেছেন—লোক-প্রসিদ্ধ পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্বও যেহেতু স্বীকারযোগ্য নয় সেইহেতু তত্ত্বান্তরের প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, জয়রাশির সর্বতত্ত্ব-প্রত্যাখ্যানও তো কোন দার্শনিক মতেরই পরিচায়ক। এই দার্শনিক মতকেই সাধারণত সংশয়বাদ বা স্কেপ্‌টিসিস্‌ম্‌ আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্যই, চরম সংশয়বাদের আত্ম-সংলগ্নতার অন্যায্য প্রকাশিত হয়েছে। তর্ক তুলে বলা হয়েছে, সর্বসত্যের অসারতাকেই হয় চরম সত্যের মর্যাদা দিতে হবে, আর না হয় সর্বসত্যের অসারতাকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। প্রথম ক্ষেত্রে সর্বসত্যের বর্জন প্রস্তাব সত্য-স্বীকৃতিতেই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ তাহলে সংশয়বাদই প্রত্যাখ্যাত হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংশয়বাদী আত্মপক্ষকেও সত্যের মর্যাদাদানে অক্ষম হয়ে দার্শনিক আত্মঘাতেই নিপতিত হবেন।

উত্তরে বলা যায়, প্রকৃত দার্শনিক বিচারে চরম সংশয়বাদের আত্ম-সংলগ্নতা স্বীকৃত হোক-আর-নাই-হোক, অন্তত এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে সংশয়বাদের নানা সমর্থক দেখা দিয়েছেন এবং দর্শনের ইতিহাস-প্রণেতারা তাঁদের অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারেননি।

অর্থাৎ, অন্তত ঐতিহাসিকভাবে সংশয়বাদও একটি দার্শনিক মতবাদ বলেই স্বীকৃত। অতএব একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে জয়রাশিভট্টও এই সংশয়বাদেরই প্রচারক ছিলেন।

কিন্তু এই ভাবে জয়রাশিভট্টকে চরম সংশয়বাদী বলে গ্রহণ করার ফলাফল কী হবে? প্রথমত, তাঁকে চার্বাকপন্থী বা লোকায়তিক বলার আগ্রহ ত্যাগ করতে হবে। কেননা, সংশয়বাদ ও বস্তুবাদ এক নয় এবং সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিক ঐতিহ্যকে অত্যন্ত স্থূলভাবে অবজ্ঞা না-করে কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না যে চার্বাক বা লোকায়ত নাম বস্তুবাদেরই পরিচায়ক। মনে রাখা দরকার, এমন কি 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরাও অস্বীকার করেননি যে চার্বাক নামটি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পরায়ণ বস্তুবাদেরই পরিচায়ক; এবং এমনকি তাঁরাও এই মতের সমর্থক হিসাবেই জয়রাশিকে চার্বাকপন্থী বলার সুযোগ পাননি। অতএব তাঁদের পক্ষে কল্পনা করার প্রয়োজন হয়েছে যে গোঁড়া বা 'অর্থোডক্স্'[৪৩] চার্বাক পন্থী ছাড়াও চার্বাকদেরই কোন-এক অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সংশয়বাদী উপসম্প্রদায় প্রচলিত ছিল এবং জয়রাশি ছিলেন সেই উপ-সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, এ-জাতীয় উপসম্প্রদায়ের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে কতো তুচ্ছ সাক্ষ্যর উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণের প্রয়োজন হয়েছে!

কিন্তু জয়রাশিকে চরম সংশয়বাদের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করার আরো গভীর তাৎপর্য বর্তমান। জয়রাশি যেহেতু ভারতীয় দার্শনিক সেইহেতু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের মূর্ত পটভূমিতেই তাঁর বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ, দেশান্তরে সংশয়বাদী দার্শনিকদের চরম পরিণতি কী হয়েছে সে-প্রশ্ন উত্থাপন করার চেয়েও আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল: স্বয়ং জয়রাশি যে-ভাবে এবং যে-অর্থে চরম সংশয়বাদ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ভারতীয় দর্শন-ইতিহাসের মূর্ত পটভূমিতে তা বিচার করলে কোন্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত দার্শনিক আত্মীয়তা প্রতিপন্ন হয়? এই বিচারে প্রবিষ্ট হয়ে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি: চার্বাক বা লোকায়ত নামে প্রসিদ্ধ বস্তুবাদ তো দূরের কথা, শূন্যবাদ ও মায়াবাদ নামে প্রসিদ্ধ চরম ভাববাদের সঙ্গেই জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক আত্মীয়তা প্রতিপন্ন হতে পারে।

আগেই বলেছি গ্রন্থের নামকরণ থেকেই অনুমান হয় স্বমতকে 'তত্ত্বোপ-প্লববাদ' আখ্যা দেওয়াই জয়রাশির প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল। অবশ্যই ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে তত্ত্বোপপ্লব বা তত্ত্বো-পপ্লববাদ প্রভৃতির প্রচলন তুলনায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র

৪৩। ঐ, ভূমিকা পৃ. xi xii.

মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকেরা বিশেষত জৈন দার্শনিকদের রচনাবলী থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নানা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন; এই উক্তিগুলিতে সুস্পষ্টভাবেই তত্ত্বোপপ্লববাদ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন 'অষ্টসহস্রী' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক বিদ্যানন্দিন্ বলছেন, "একে হি তত্ত্বোপপ্লববাদিনঃ" ইত্যাদি; তারপর পাঁচ পৃষ্ঠা ধরে এই তত্ত্বোপপ্লব-বাদের সুদীর্ঘ খণ্ডন করে ৪২ পৃষ্ঠায় পুনরায় মন্তব্য করছেন, 'তত্ত্বোপপ্লবাদিনঃ স্বয়মেকেন প্রমাণেন স্বপ্রসিদ্ধেন পরপ্রসিদ্ধেন বা বিচারোত্তরকালমপি প্রমাণ-তত্ত্বং প্রমেয়তত্ত্বং চোপপ্লুতং সংবিদন্ত এবাত্মানং নিরস্যন্তীতি ব্যাহতিঃ"। 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক' নামে গ্রন্থান্তরের পৃঃ ৮০-তে বিদ্যানন্দিন্ পুনরায় তত্ত্বোপপ্লব-বাদের উল্লেখ করেছেনঃ "তত্ত্বোপপ্লববাদিনঃ পরপর্যনুযোগমাত্রপরত্বাদিতি কশ্চিৎ"। এবং এখানে বিদ্যানন্দিন্ একপৃষ্ঠা ব্যাপী তত্ত্বোপপ্লববাদের বিচার করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে 'তত্ত্বার্থশ্লোক-বার্তিক' গ্রন্থেরই পৃঃ ৩৫-৩৭-এ--অর্থাৎ, তত্ত্বোপপ্লববাদ বিচারের অনেক পূর্বে—তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক চার্বাক-মতও দীর্ঘভাবে খণ্ডন করেছেন। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরাই এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই সাক্ষ্য থেকে অবধারিত ভাবেই প্রমাণ হয় যে অন্তত বিদ্যানন্দিন্-এর বোধ অনুসারে জয়রাশির তত্ত্বোপপ্লববাদ এবং চার্বাক-মত সম্পূর্ণ পৃথক। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা স্বভাবতই এই সাক্ষ্যটির গুরুত্ব স্বেচ্ছায় অবজ্ঞা করতে বাধ্য হয়েছেন।

জৈন দার্শনিকদের রচনায় তত্ত্বোপপ্লব-বাদ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের বিচারে পরে প্রত্যাবর্তন করা যাবে। তার আগে তত্ত্বোপপ্লব-বাদের স্বরূপ আরো স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক। জয়রাশি অবশ্যই সর্বপ্রকার তত্ত্ব বা দার্শনিক মত ধুলিসাৎ বা উৎখাত করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দার্শনিক মত বিচারমূলক ভাবে খণ্ডন করার পরিবর্তে তিনি এক অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হল, প্রমাণ-খণ্ডন। অর্থাৎ সহজ কথায় জয়রাশি দেখাতে চেয়েছেন, নির্ভুল জ্ঞানের কোন উৎসই বস্তুত স্বীকার করা সম্ভব নয়—সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি যে-সব প্রমাণের উল্লেখ করেন সেগুলি আসলে প্রমাণ নয়। প্রমাণ-খণ্ডনই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'র প্রধানতম বিষয়বস্তু; প্রমাণ-খণ্ডনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই জয়রাশি দাবি করেন, অতএব কোন প্রকার দার্শনিক সত্যও সম্ভব নয়। সত্যজ্ঞান লাভের কোন উপায়ই যদি সার্থক না-হয় তাহলে দার্শনিক সত্যের প্রশ্ন ওঠে কী করে? গ্রন্থারম্ভেই জয়রাশি এই যুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ চার্বাক-মত উল্লেখ করে তিনি বলছেন, বস্তুত এগুলির কথাও মানা যায় না। কেন

মানা যায় না? কেননা, প্রমাণের লক্ষণ বা নির্ভুল সংজ্ঞা নির্ণয় সম্ভব হলে পরই প্রমাণ-ব্যবস্থা স্বীকার্য হবে এবং প্রমাণ-ব্যবস্থা স্বীকার্য হওয়ার উপরই প্রমেয় (জ্ঞেয়) নির্ভরশীল; কিন্তু তার অভাবে (অর্থাৎ প্রমাণের লক্ষণ বা নির্ভুল সংজ্ঞা নির্ণয় অসম্ভব বলেই) এগুলিকে কী করে সত্য বা বাস্তব বলা যায়? "অথ কথং তানি ন সন্তি? তদুচ্যতে—সল্লক্ষণনিবন্ধনং মানব্যবস্থানম্, মাননিবন্ধনা চ মেয়স্থিতিঃ, তদভাবে তয়োঃ সদ্ব্যবহার-বিষয়ত্বং কথম্'...

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মূল প্রতিপাদ্য যে প্রমাণ-খণ্ডনই এ-কথা গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হবে। এই তালিকা বলতে:

১॥ ন্যায়-দর্শন সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা ও খণ্ডন (পৃঃ ২-২২),

২॥ মীমাংসা-দর্শন সম্মত প্রমাণ-লক্ষণের পরীক্ষা ও খণ্ডন (পৃঃ ২২-২৭),

৩॥ তথাগত-সম্মত (অর্থাৎ, বৌদ্ধ-দর্শন সম্মত) প্রমাণ-লক্ষণের পরীক্ষা ও খণ্ডন (পৃঃ ২৭-৩২),

৪॥ সৌগত-সম্মত (অর্থাৎ, বৌদ্ধ-সর্শন সম্মত) প্রত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা ও খণ্ডন (পৃঃ ৩২-৫৮),

৫॥ মীমাংসা-দর্শন সম্মত প্রত্যক্ষর খণ্ডন (পৃঃ ৫৮-৬১),

৬॥ সাংখ্য-দর্শন সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের খণ্ডন (পৃঃ ৬১-৬৪),

৭॥ ন্যায়-দর্শন সম্মত অনুমানের খণ্ডন (পৃঃ ৬৪-৭৪),

৮॥ —প্রসঙ্গত, আত্মার অনুমান খণ্ডন (পৃঃ ৭৪-৮৩)

[আত্মার অনুমান খণ্ডন হিসাবে জয়রাশি আত্মা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সম্প্রদায়ের মতাবলী খণ্ডন করেছেন—

ক॥ ন্যায়,

খ॥ জৈন (প্রসঙ্গত, অনেকান্তবাদ খণ্ডন),

গ॥ সাংখ্য,

ঘ॥ বেদান্ত (কিন্তু শঙ্করাচার্যর মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ নয়; তার পরিবর্তে 'আনন্দরূপং কৈবল্যং' হিসাবে বর্ণিত আত্মা সংক্রান্ত কোন এক-প্রকার বৈদান্তিক মতবাদ),

ঙ॥ মীমাংসা।]

৯॥ তথাগত-সম্মত অনুমান খণ্ডন (পৃঃ ৮৩-১০৯),

১০॥ মীমাংসা-সম্মত 'অর্থাপত্তি' খণ্ডন (পৃঃ ১০৯-১১০),

১১॥ উপমান-প্রমাণ খণ্ডন (পৃঃ ১১০-১১২),

১২॥ অভাব-প্রমাণ ('অনুপলব্ধি') খণ্ডন (পৃঃ ১১২-১১৩),

১৩॥ 'সম্ভব' ও 'ঐতিহ্য'র প্রামাণ্য খণ্ডন (পৃঃ ১১৩),

১৪॥ শব্দ-প্রমাণ খণ্ডন (পৃঃ ১১৩-১১৫)॥

উপরের তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায়, জয়রাশির প্রধানতম

প্রতিপাদ্য বলতে প্রমাণ-খণ্ডনই। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বীকৃত সর্বপ্রকার তথাকথিত প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন করেই তিনি তত্ত্বোপপ্লববাদ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। একমাত্র অনুমান খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি আত্মা সংক্রান্ত কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্ব সরাসরিভাবে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরাই জয়রাশির এই আত্মতত্ত্ব নিরসনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: আত্মা সংক্রান্ত ন্যায়, জৈন, সাংখ্য, মীমাংসা এবং কোন-একরকম ঔপনিষদ বা বৈদান্তিক মত খণ্ডন করলেও জয়রাশিভট্ট শঙ্করাচার্য-সমর্থিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেননি[৪৪]। মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের এই অভাব থেকে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা শুধুমাত্র একটি কথা অনুমান করতে চেয়েছেন: জয়রাশির রচনাকাল নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্ববর্তী ছিল, কেননা শঙ্করের পরবর্তী কোন দার্শনিকের পক্ষেই মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের মতো প্রবলপ্রতাপ দার্শনিক মতকে অগ্রাহ্য করার বা উপেক্ষা করার কথা কল্পনাতীত[৪৫]। অনুমানটির বিষয়বস্তু অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা; এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে জয়রাশি শঙ্করের পূর্ববর্তী ছিলেন, না, পরবর্তী ছিলেন—এ-বিষয়ে আমরা বর্তমানে কোন বিতর্ক উত্থাপন করতে চাই না। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই এখানে আমাদের পক্ষে আরো একটি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মায়াবাদের প্রবল-প্রতাপশালী প্রচারক হলেও শঙ্করাচার্যই যে মায়াবাদের প্রবর্তক ছিলেন এ-জাতীয় কথা শঙ্কর নিজে দাবি করেননি; পক্ষান্তরে আধুনিক অগ্রণী বিদ্বানেরা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বস্তুত অনেক প্রাচীন—অর্থাৎ, শঙ্করাচার্যের রচনাকালের অনেক আগে থাকতেই এই মত আচার্য-পরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে এসেছিল[৪৬]। অতএব, জয়রাশিভট্টকে শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিক বলে স্বীকার করলেও এ-কথা স্বীকার করার কোন কারণ নেই যে জয়রাশি মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অপরিচিত হতে বাধ্য ছিলেন। অর্থাৎ, মায়াবাদ সম্বন্ধে পরিচয়ের অভাবই জয়রাশির পক্ষে মায়াবাদ খণ্ডন না-করায় একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

কিন্তু মায়াবাদের সঙ্গে জয়রাশিভট্ট বাস্তবিকই পরিচিত ছিলেন কিনা—ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্রান্ত এই প্রশ্ন ছাড়াও দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে অপর একটি প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আছে। জয়রাশিভট্টর স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের প্রয়োজন

৪৪। ঐ ভূমিকা পৃঃ ix: 'We also find that the Mayavada and the Kevala Advaitavada as developed by Samkaracarya are conspicuous by their absence'.

৪৫। ঐ ভূমিকা পৃঃ x.

৪৬। Gough PU 239 ff.

বা প্রকৃত দার্শনিক তাগিদ সত্যই ছিল কি? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে পুনরুল্লেখ করা দরকার, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র প্রধানতম প্রতিপাদ্য বলতে প্রমাণখণ্ডনই। অতএব, জয়রাশির পক্ষে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের কোন দার্শনিক তাগিদ থাকা সম্ভব কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহার প্রসঙ্গে মায়াবাদীর বা অদ্বৈতবাদীর মূল বক্তব্য মনে রাখা প্রয়োজন। সুখের বিষয় স্বয়ং শঙ্করাচার্য 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্য-ভূমিকাতেই সুস্পষ্টভাবে সে-বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই ভাষ্য-ভূমিকার নাম 'অধ্যাস-ভাষ্য'। অধ্যাস মানে ভ্রম—এক বস্তুতে অপর বস্তুর অবভাস বা জ্ঞান হলেই তাকে অধ্যাস বলা হয়। শঙ্করাচার্যর মূল বক্তব্য হল, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক বা অজ্ঞান বা অবিদ্যার প্রভাবে অত্যন্ত-বিলক্ষণস্বভাব বা অত্যন্ত পৃথক আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বোধগম্য না-হওয়ায় আত্মাতে অন্যের ও অন্যধর্মের এবং অন্যতে (দেহাদিতে) আত্মার ও আত্মধর্মের অধ্যাস (আরোপ) করেই লোকে 'আমি', 'আমার', 'এই আমি', 'এটা আমার', ইত্যাদি উল্লেখ ও ব্যবহার করে থাকে। স্বভাবতই এ-জাতীয় সমস্ত উল্লেখ ও ব্যবহারই অজ্ঞানজনিত বা অবিদ্যামূলক। এবং শঙ্কর স্পষ্ট ভাষাতেই বলছেন, এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হল সর্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের প্রকৃত ভিত্তি। শঙ্করের বক্তব্যটি এখানে কিছুটা দীর্ঘ ভাবেই উদ্ধৃত করা প্রয়োজন:

> তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি? উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষহংমমাভিমান-রহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হি ইন্দ্রিয়াণ্যনু-পাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্বস্মিন্নসতি অসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্ব-মুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাব-দ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। পশ্বাদিভিশ্চা-বিশেষাৎ—যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্তন্তে—যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়মিচ্ছতীতি পলায়িতু-মারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবাবিবেকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্ব্যুৎপত্তি-মতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে।

—অর্থাৎ, প্রমাণ-ব্যবহার, প্রমেয়-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে-কোন ব্যবহার, সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধশাস্ত্র ও সমস্ত মোক্ষশাস্ত্র সবকিছুই এই অবিদ্যা নামের আত্মা-অনাত্মার অধ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন উঠবে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সবকিছুই কী করে অবিদ্যা-বিষয়ক হতে পারে? উত্তরে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে 'আমি' ও 'আমার' মনে করে না তার পক্ষে জ্ঞাতৃত্বভাব এবং প্রমাণপ্রবৃত্তি সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা ছাড়া প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার সম্ভব নয়। দেহের আশ্রয় ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে সক্ষম নয়। যে-দেহে অহং-মমাদি-ভাবের অধ্যাস নেই সেই দেহের দ্বারা কোন জীব কোন কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। এই অধ্যাসভাব ব্যতীত অসঙ্গ-স্বভাব আত্মার পক্ষে প্রমাতৃত্ব সম্ভব নয় এবং (আগেই উক্ত হয়েছে) প্রমাতৃত্ব ব্যতীত প্রমাণ-প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্র সমস্তই অবিদ্যাশ্রিত। মানব-ব্যবহার এবং পশু প্রভৃতির ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যের অভাব থেকেও বোঝা যায় (মানুষের প্রমাণ ব্যবহারও অবিদ্যা বা অজ্ঞানাশ্রিত)। শব্দাদির সঙ্গে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলে পশু প্রভৃতিও যেমন শব্দাদি জানতে পারে এবং এই শব্দাদিকে অনুকূল বুঝলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, প্রতিকূল বুঝলে নিবৃত্ত হয়, মানুষও তেমনি শব্দাদি জেনে থাকে এবং জানবার পর তারাও অনুকূল বুঝলে প্রবৃত্ত হয়, প্রতিকূল বুঝলে নিবৃত্ত হয়। পশুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মানুষকে নিজেদের অভিমুখে আসতে দেখলে 'আমাকে মারতে আসছে' বুঝে পলায়ন করে, আবার তৃণপূর্ণ হস্তে কাউকে আসতে দেখলে তার অভিমুখী হয়, মানুষও তেমনিই আপন-অভিমুখে রোষকষায়িত নেত্র খড়্গহস্ত পুরুষকে আসতে দেখলে পলায়ন করে এবং তদ্বিপরীত দেখলে তার অভিমুখী হয়। অতএব পশু এবং পুরুষের প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার একই রকম। পশুদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার অবিবেক বা অজ্ঞানমূলক একথা সুবিদিত; অতএব তারই সঙ্গে উচ্চতর বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ব্যবহারের সাদৃশ্য থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে অবিদ্যা-প্রভাব কালে মানুষের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও একই রকম।[৪৭]

৪৭। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে শঙ্করাচার্যের এই সুস্পষ্ট উক্তি অনুসরণ করে মায়াবাদকেও 'স্বতঃ অপ্রামাণ্য বাদ' বলে বর্ণনা করাই যুক্তি-সঙ্গত হবে, যদিও প্রচলিত গ্রন্থাদিতে এ-বর্ণনা বিশেষত বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের প্রতিই প্রযোজ্য হয়েছে। অবশ্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর নবীন বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র 'বেদান্তপরিভাষা' নামে একটি গ্রন্থে বেদান্ত-মত অনুসারে প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি মোট ছয়টি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন এবং মূলত এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেই আধুনিক বিদ্বানবিশেষ সুদীর্ঘভাবে বেদান্তসম্মত প্রমাণতত্ত্ব আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। যথা: Dutta SWK। কিন্তু অদ্বৈত মতের এ-জাতীয় নবীন ব্যাখ্যাকারদের মন্তব্যকে প্রকৃত অদ্বৈতমত বলে আমরা বুঝতে পারি না। পক্ষান্তরে প্রমাণ প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের প্রকৃত প্রামাণ্য আলোচনা বলতে আমাদের কাছে শঙ্করের অধ্যাস-ভাষ্য এবং শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-ই। আত্মপক্ষ সমর্থনে নবীন বৈদান্তিকেরা অবশ্যই একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করবেন: "ব্যবহারে ভাট্ট-নয়ঃ"।

এই উদ্ধৃতি থেকে অন্তত একটি কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এ-হেন দার্শনিক সম্প্রদায় অবশ্যই বর্তমান ছিল। যে-সম্প্রদায় মতে এমন কি প্রত্যক্ষও অপ্রমাণ, কেননা অন্যান্য সমস্ত

ব্যবহারক্ষেত্রে ভাট্টমতই গ্রহণযোগ্য। অতএব, অদ্বৈতমতে যদিও পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারই অজ্ঞানাশ্রিত বা মিথ্যা তবুও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাট্ট-মীমাংসা-সম্মত ছয়টি প্রমাণই স্বীকার্য। কিন্তু ভাট্ট-মতের প্রবর্তক স্বয়ং কুমারিলের কাছে এযুক্তির গুরুত্ব কী হতে পারে এখানে তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখা দরকার, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র অদ্বৈতবেদান্তেই প্রস্তাবিত হয়নি। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বা শূন্যবাদীরাও হুবহু একই পার্থক্য উল্লেখ করেছেন, কেবল তাঁদের পরিভাষায় "ব্যবহারিক সত্যের' পরিবর্তে "সংবৃতি সত্য" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত, জগৎ-মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে "পারমার্থিক সত্য" এবং "ব্যবহারিক বা সংবৃতি সত্য"র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজন সুস্পষ্ট। কেননা জগৎ মিথ্যা হলেও লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ, অতএব তা বন্ধ্যাপুত্র অর্থে অলীক বা রজ্জু-সর্প অর্থে প্রাতিভাসিক মাত্র নয়। অতএব, অলীক বা প্রাতিভাসিকের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা জগৎকে "ব্যবহারিক বা সংবৃতি সত্য" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এই "ব্যবহারিক বা সংবৃতি সত্য" প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, মিথ্যাই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন রকম যাথার্থ্যই স্বীকার্য নয়

উত্তরে কুমারিল মন্তব্য করেছেন —

সংবৃতেন তু সত্যত্বং সত্যভেদঃ কুতোঽয়ম্ ।
সত্যা চেৎ সংবৃতিঃ কেয়ং মৃষা চেৎ সত্যতা কথম্
সত্যত্বং ন চ সামান্যং মৃষার্থপরমার্থয়োঃ ।
বিরোধান্ন হি বৃক্ষত্বং সামান্যং বৃক্ষসিংহয়োঃ।
তুল্যার্থত্বেঽপি চৈতাভ্যাং মিথ্যাসংবৃতিশব্দয়োঃ
বঞ্চনার্থ উপন্যাসো লালাবক্রাসবাদিবৎ ॥...
তস্মাৎ যৎ নাস্তি নাস্ত্যেব যৎ তু অস্তি পরমার্থতঃ
তৎ সত্যম্ অন্যৎ মিথ্যা ইতি ন সত্যদ্বয়কল্পনা ॥

('শ্লোকবার্তিক' নিরালম্বনবাদ, কারিকা ৬-১০ ।)

অর্থাৎ, সংবৃতি বা ব্যবহারিক সত্য যদি আসলে সত্যই না হয় তাহলে এইভাবে দ্বিবিধ সত্যের উল্লেখ অর্থহীন, যদি তা মিথ্যাই হয় তাহলে তাকে কোন এক অর্থে সত্য বলার কারণ কী? বৃক্ষ ও সিংহ বিরুদ্ধ বলেই উভয়ের মধ্যে সাধারণভাবে বৃক্ষত্ব কল্পনা যেমন অর্থহীন তেমনি সত্য ও মিথ্যা বিরুদ্ধ বলেই উভয়ের মধ্যে সাধারণভাবে সত্যত্ব কল্পনা করা যায় না,— অর্থাৎ উভয়কেই সত্য বলা যায় না। লোকবঞ্চনার উদ্দেশ্যে "লালা" শব্দ ব্যবহার না করে যেমন "বক্রাসব" শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তেমনি একই অর্থবোধক হওয়া সত্ত্বেও "মিথ্যা" ও "সংবৃতি" এই দুটি শব্দ রচনা করা হয়েছে। যার অস্তিত্ব নেই তার অস্তিত্ব নেই, যার অস্তিত্ব আছে তাই-ই পারমার্থিক বা সত্য: কিন্তু একটিকে মিথ্যা ও অপরটিকে সত্য বলে দ্বিবিধ সত্যের উল্লেখ করা যায় না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভাট্ট-মতের প্রবর্তক স্বয়ং কুমারিলের দৃষ্টিকোণ থেকে "ব্যবহারে ভাট্ট-নয়ঃ" কথাটিই "বঞ্চনার্থ উপন্যাসো লালাবক্রাসবাদিবৎ" বলেই পরিত্যাজ্য হবে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী ৫৪ নং পাদটীকাও দ্রষ্টব্য

তথাকথিত প্রমাণের মতোই প্রত্যক্ষও অজ্ঞানাশ্রিত বা অবিদ্যাশ্রিত। কিন্তু এই দার্শনিক সম্প্রদায়টিকে সনাক্ত করার জন্ম শ্রীহর্ষর ভাষ্যকার শঙ্কর মিশ্রর একটি সংশয়াত্মক উক্তি অবলম্বন করে "চার্বাক বা হয়তো কোন এক সম্প্রদায়ের চার্বাকদের" কথা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রকট ঘোষণার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখাই যুক্তিসঙ্গত। "পাষণ্ডদর্পচ্ছেদনকারী" জয়রাশিভট্টর প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব বিচারের পক্ষে এই সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবং সর্ব-প্রমাণ-ধ্বংসের "সিংহবিক্রম" সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে কেন মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের বিশেষ আগ্রহ থাকা আসলে প্রাসঙ্গিকই ছিলো না— এই প্রশ্নরও উত্তর পাওয়া হয়ত সুকঠিন নয়। কেননা মায়াবাদীরাও সর্বপ্রকার প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারকেই অজ্ঞানমূলক বলে বর্জন করার উপদেশ দিয়েছেন।

শঙ্করাচার্যর এই সর্ব-প্রমাণ-প্রমেয় বর্জনের সমর্থনে তাঁর অনুগামীরা অবশ্যই উন্নততর বিচার-বিশ্লেষণের বা দার্শনিক কৌশলের প্রয়োজন অনুভব করেন। তারই সুবিখ্যাত নিদর্শন শ্রীহর্ষর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'। যে-কৌশল অবলম্বন করে তিনি প্রধানত ন্যায়মত খণ্ডনে উদ্যত হয়েছেন তা বস্তুত অদ্বৈত-বেদান্ত এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদ ছাড়া সমস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রসঙ্গ একটু পরেই উত্থাপন করা যাবে। তার আগে শ্রীহর্ষর মূল কৌশলটির পরিচয় দেখা যাক। সর্বপ্রমাণ বর্জনের উৎসাহে শ্রীহর্ষ দেখাতে চান, প্রমাণের কোন রকম লক্ষণ বা সংজ্ঞাই সম্ভব নয় এবং সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যে-সব তথাকথিত প্রমাণের উল্লেখ করেন তার কোনোটিরই যুক্তিসঙ্গত বা সমর্থনযোগ্য লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। প্রমাণের ঐ দার্শনিকগণের প্রয়াসমাত্র ন্যায়-দর্শনের মানদণ্ডেই দোষদুষ্ট হতে বাধ্য। অতএব, সংক্ষেপে, তথাকথিত প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় অসম্ভব।

অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত প্রচারক শ্রীহর্ষর এই দার্শনিক কৌশলের কথা মনে রাখলে ভট্ট জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে। আসলে, 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র প্রতিপাদ্য-বিষয় এবং প্রতিপাদন-কৌশলও প্রায় হুবহু 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'র মতোই। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র মূল বিষয়বস্তুর উপরোদ্ধৃত তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যাবে, প্রমাণ-ধ্বংসই জয়রাশির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এই প্রমাণ-ধ্বংসের কৌশল হিসাবে জয়রাশিও সাধারণভাবে প্রমাণ পদার্থের এবং বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের লক্ষণ নিরসন করতেই উদ্যত হয়েছেন। অতএব জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব অদ্বৈত-বৈদান্তিক শ্রীহর্ষর সঙ্গেই অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরাও অবশ্য 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র সঙ্গে জয়রাশির এই গ্রন্থটির অত্যন্ত গভীর সাদৃশ্য উপেক্ষা করতে চাননি। তাঁদের মতে, শ্রীহর্ষর পক্ষে এমন কি 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' দ্বারা সরাসরি ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াও অসম্ভব নয়।[৪৮] কিন্তু আলোচ্য দুটি গ্রন্থের মধ্যে এ-জাতীয় নিকট সাদৃশ্য থেকে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা জয়রাশির দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণের কোন প্রয়াসই করেননি; কেননা, শুরু থেকেই তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে জয়রাশিভট্ট চার্বাকদেরই "কোন এক" সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। অতএব শ্রীহর্ষর পক্ষে জয়রাশি দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করেও তাঁরা শুধুমাত্র মন্তব্য করেছেন, অবশ্যই শ্রীহর্ষর সিদ্ধান্তর সঙ্গে জয়রাশির পার্থক্যও ছিল। কেননা, সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের সাহায্যে শ্রীহর্ষ অনির্বচনীয় ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে জয়রাশি সর্বপ্রমাণ খণ্ডন করেই আলোচনা পরিসমাপ্ত করেছেন। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখবো, তাঁদের এই মন্তব্যও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা বস্তুত সর্বতত্ত্ব খণ্ডনের দম্ভ সত্ত্বেও জয়রাশিভট্ট প্রকৃতপক্ষে তাঁর সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বরই ইংগিত দিয়েছেন এবং মায়াবাদী শ্রীহর্ষর দার্শনিক সিদ্ধান্তর সঙ্গে এই তত্ত্বটির গভীর সাদৃশ্য বর্তমান।

কিন্তু সে-আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে শ্রীহর্ষ প্রসঙ্গে আর কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাক। শ্রীহর্ষ অবশ্যই মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী—অতএব শঙ্করাচার্যর অনুগামী—ছিলেন। এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য সর্বপ্রকার বৌদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করেছেন; নাগার্জুন-প্রবর্তিত মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা বিশেষ কঠোর: "শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব-প্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হ্যয়ং সর্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারোহন্যৎ তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুং, অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ"।[৪৯] অর্থাৎ, "শূন্যবাদীর মত সর্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ, সুতরাং সে-মত খণ্ডনের জন্য বিশেষ যত্ন করা হল না। এই যে সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত লোকব্যবহার—এর বিলোপকারী কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না-হলে বা না-দেখালে এর বিলোপ করা যাবে না। কারণ, বিশিষ্ট ব্যবস্থান্তরের অভাবে সাধারণ ব্যবস্থা অবশ্যই সিদ্ধ থাকে।"

শঙ্করাচার্যর এই মন্তব্য যতো তীব্র বৌদ্ধ-বিদ্বেষের নিদর্শক হোক না কেন, দার্শনিক আত্মসংলগ্নতার পরিচায়ক হিসাবে একে গ্রহণ করায় বাধা ওঠে। কেননা, সম্প্রদায়ান্তরের কোন দার্শনিক—বিশেষত কোন নৈয়ায়িক—স্বমত-সম্মত ভাবেই দাবি করতে পারেন যে সর্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ

৪৮। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ', ভূমিকা, পৃ. iv.

৪৯। 'শারীরক-ভাষ্য' ২।২।৩১।

বলেই শূন্যবাদ এমন কি বিচারেরও অযোগ্য এবং সর্বপ্রমাণ-সিদ্ধ লোক-ব্যবহারের বিলোপ সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, শঙ্করাচার্যর মুখে এ কথা কতোখানি শোভা পায়? এই প্রশ্নর একটিমাত্র উত্তরই সম্ভব: শোভা পায় না। কেননা মাধ্যমিক বা শূন্যবাদীর মতোই মায়াবাদীর মতেও প্রমাণ-মাত্রই অসিদ্ধ এবং তথাকথিত সর্বপ্রমাণ-সিদ্ধ লোকব্যবহারও অজ্ঞান বা অবিদ্যাবিষয়ক[৫০]। এ-বিষয়ে চেরবাট্স্কয়-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক্:

> মাধ্যমিকদের বিরুদ্ধে শঙ্কর সর্ব-প্রমাণ পরিহারের অভিযোগ এনেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করেছেন। শঙ্করের অবস্থা চিত্তাকর্ষক। কারণ অন্তত প্রধানতম বিষয়ে তিনি মনেপ্রাণে মাধ্যমিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত: কেননা উভয়ের মতেই সত্য এক এবং অদ্বিতীয় এবং বহুর জগৎ মরীচিকা মাত্র। কিন্তু শঙ্করের মতো প্রবল বৌদ্ধ-বিদ্বেষীর পক্ষে একথা স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। অতএব তিনি অত্যন্ত ঘৃণাভরেই মাধ্যমিকদের সমালোচনা করেছেন…এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে তাঁদের মতে প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসারে পরম সত্তার জ্ঞান সম্ভব নয়।…একথা সুবিদিত যে শঙ্কর নিজেও এই অভিমতই পোষণ করেন। পরম সত্তার জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে তিনিও প্রমাণ-শাস্ত্রর উপযোগিতা মানেন না, কিন্তু তাঁর ধারণায় শ্রুতির সমর্থন আছে বলেই বৈদান্তিকের পক্ষে প্রমাণ-শাস্ত্র অবজ্ঞা করার যেন বিশেষ অধিকার বর্তমান। অপরপক্ষে, বিরুদ্ধ মতবাদী সকলের কাছেই তিনি সুনিশ্চিত প্রমাণ পদ্ধতি দাবি করেন[৫১]।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের ইতিহাস-প্রসঙ্গে আমরা পরে শূন্যবাদ ও মায়াবাদের মধ্যে প্রকৃত দার্শনিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করবো এবং দেখবো আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই[৫২] দেখিয়েছেন যে

৫০। তব তুলে হয়ত বলা হবে, পারমার্থিক সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে লোকব্যবহার-সিদ্ধ জগৎ মিথ্যা হলেও বেদান্তমতে এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত। উত্তরে বলব, অদ্বৈত সম্প্রদায়ে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে পার্থক্যসূচক মতবাদটিই বস্তুত বৌদ্ধ ভাববাদীদের কাছ থেকেই গৃহীত। কেবল 'ব্যবহারিক সত্তা' শব্দের বদলে বৌদ্ধরা সাধারণত সংবৃতি সত্তা শব্দ ব্যবহার করতেন। পরে, ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা এই আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো।

৫১। Stcherbatsky BCN 38.

৫২। Bhattacharyaya in IHQ xi. 111, Jacobi in JAOS xxxiii 31ff, Valle-Poussin in JRAS-1910, 128ff; Stcherbatsky BCN 36f, Dasgupta HIL. i. 423ff, ii 163ff, cf Mukherjee in NNMRP i. 105 ff, ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্ব (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।২।২৯) সরাসরি মন্তব্য করেছেন, শূন্যবাদীদের শূন্যও যা মায়াবাদীদের ব্রহ্মও তাই, "যৎ শূন্যবাদিনঃ শূন্যং তদেব ব্রহ্ম মায়িনঃ।" এবং একথা অবশ্যই সুবিদিত যে পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করে বিজ্ঞানভিক্ষু মায়াবাদীদের "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলে উল্লেখ করেছেন।

এই দুটি বস্তুত সমানতন্ত্র। আপাতত শ্রীহর্ষর দৃষ্টিভঙ্গিটুকু বিচার করা যাক। শঙ্করাচার্যর পরম অনুগামী হলেও তিনি মাধ্যমিকদের প্রতি কোন কৃত্রিম দার্শনিক বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি; পক্ষান্তরে সবিনয়েই স্বীকার করেছেন যে মাধ্যমিকদের সঙ্গে তাঁর স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের পার্থক্য সামান্যই[৫৩]।

শ্রীহর্ষর এই স্বীকৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, মায়াবাদের সমর্থনে শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকেরা যে-ভাবে সর্ব-প্রমাণ প্রত্যাখ্যানের দাবি করেছেন,—এবং যে-প্রমাণ-প্রত্যাখ্যানই শ্রীহর্ষর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'র প্রধানতম বিষয়বস্তু—তার প্রাথমিক বা কোন একরকম অস্পষ্ট ইংগিত উপনিষদ-সাহিত্যে অনুমিত হলেও[৫৪] প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নাগার্জুনের রচনাতেই সর্বপ্রথম তার প্রকৃত দার্শনিক অভিব্যক্তি ঘটেছিল। অর্থাৎ, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নাগার্জুনই সর্বপ্রথম প্রকৃত দার্শনিক বিচারের সাহায্যে সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের প্রস্তাব করেন। যে-গ্রন্থে তিনি এই প্রস্তাব করেন তার নামই হল 'প্রমাণ-বিধ্বংসন'[৫৫]; স্বভাবতই নাগার্জুনকে প্রমাণ-বিধ্বংসবাদী বলেও উল্লেখ করার প্রথা আছে।

অতএব, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রমাণ-বিধ্বংস-বাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হিসাবে বলা যায়, উপনিষদ্ সাহিত্যে এই মতের প্রাথমিক আভাস বা ইংগিত, শূন্যবাদী নাগার্জুনের রচনায় তার প্রথম দার্শনিক অভিব্যক্তি, 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্য-ভূমিকায় মায়াবাদী শঙ্করাচার্যর পক্ষে এই মতবাদটিরই ঘোষণা এবং শঙ্করাচার্যর অনুগামী শ্রীহর্ষর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-তে এই মতবাদেরই চড়ান্ত দার্শনিক অভিব্যক্তি দেখা যায়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শুধুমাত্র শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীরাই সর্বপ্রমাণ খণ্ডনের বা প্রমাণ-ধ্বংসর প্রয়াস করেছেন।

৫৩। Stcherbatsky BL. i. 22; Dasgupta HIP ii. 127, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-র ব্যাখ্যামূলক তর্জমায় মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "Nagarjuna the paragon of metaphysical sceptics and Samkaracarya the protagonist of absolute monism, have unequivocally declared that their loyalty to the logical and epistemological schemes is necessarily provisional in character, necessitated by the limitations of the human intellect and the exigencies of the social environment. They make use of the logical instruments and the accepted categories, and by exposure of their innermost self-contradiction, show their inefficiency to solve the metaphysical puzzles, which inevitably visit the thinking mind". Mukherjee in NNMRP i. 77.

৫৪। এখানে উল্লেখ করা যায়, সর্বপ্রমাণ বর্জনের প্রাথমিক ইংগিত উপনিষদ সাহিত্যেই অনুমেয়। যথা, ছান্দোগ্য ৭।১।২ এবং তারই ব্যাখ্যায় Deussen PU 74-5 দ্রষ্টব্য।

৫৫। গ্রন্থটি নামান্তরে 'বৈদল্য-সূত্র' বা 'প্রমাণ বিচ্ছেদন' বলেই উল্লিখিত—Stcherbatsky BL i. 28n দ্রষ্টব্য।

জয়রাশিভট্টর দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব বিচারে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রমাণ-ধ্বংস-বাদের এই ইতিহাস অবশ্যই অবান্তর নয়। কেননা, প্রমাণ-খণ্ডনই 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র প্রধানতম প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই উপরোক্ত পটভূমিতে বিচার করলে আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত হবে যে, চার্বাক বা লোকায়ত তো দূরের কথা—ভট্ট জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব ছিল শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীদের সঙ্গেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মধ্যযুগের ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে কেউই আধুনিক বিদ্বানদের মতো জয়রাশিকে চার্বাকদেরই "কোন এক" সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেননি। তার বদলে তাঁদের রচনায় শূন্যবাদের সঙ্গেই তত্ত্বোপপ্লববাদের প্রকৃত দার্শনিক ঘনিষ্ঠতা স্বীকৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের জৈন লেখক মল্লিষেণ সূরি শূন্যবাদের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, প্রমাণ-খণ্ডনের বিস্তৃততর পরিচয়ের জন্য 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' দ্রষ্টব্য : "বিস্তরতস্তু প্রমাণখণ্ডনং তত্ত্বোপপ্লবসিংহাদ্ অবলোকনীয়ম্"[৫৬]। শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের একটি মৌলিক প্রতিপাদ্য-বিষয়ের বিস্তৃততর পরিচিতির জন্য 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' উপদিষ্ট হবার তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল, প্রমাণ-খণ্ডনের দিক থেকে তত্ত্বোপপ্লববাদ ও শূন্যবাদ সমানতন্ত্র এবং আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অন্তত এই প্রমাণ-খণ্ডনের দিক থেকে শূন্যবাদ এবং মায়াবাদের মধ্যেও পার্থক্য অবান্তর বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য। অতএব, মল্লিষেণের উপরোক্ত মন্তব্য অনুসারেও তত্ত্বোপপ্লববাদী জয়রাশিভট্ট প্রকৃতপক্ষে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীদেরই সমগোত্রীয়।

জয়রাশিভট্টকে প্রকৃতপক্ষে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করার আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান। তারই বিচার করে আমরা 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আলোচনা শেষ করবো।

প্রশ্ন হল, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শুধুমাত্র শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর পক্ষেই সর্বপ্রমাণ-খণ্ডনের এই উৎসাহ কেন? কারণ, শুধুমাত্র এই দুটি সম্প্রদায়েই জগৎ-মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করলে প্রত্যক্ষলব্ধ, অনুমানসিদ্ধ বিষয়-গুলিকে সত্যের মর্যাদা দিতে হয়; অতএব জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সুযোগ থাকে না। অথচ শূন্যবাদী এবং মায়াবাদী জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর; ফলে উভয়ের পক্ষেই প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য খণ্ডনের প্রয়োজন হয়েছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অন্তত প্রমাণ-খণ্ডনের দিক থেকে জয়রাশিকে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর সমগোত্রীয় বলার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান। কিন্তু শূন্যবাদ এবং মায়াবাদে প্রমাণ-খণ্ডন যেহেতু জগৎ-মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনেরই

৫৬। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' ভূমিকা, পৃ. iv.

উপায়মাত্র সেইহেতু জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আরো সুনিশ্চিত হবার জন্য আমাদের পক্ষে আর-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রয়োজন আছে। প্রশ্নটি হল: জগতের যাথার্থ্য বা মিথ্যাত্ব বিষয়ে জয়রাশি কি কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে সে-মন্তব্য শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর সমতুল্য কিনা?

পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বোপপ্লব বা তত্ত্বোপপ্লববাদ অবশ্যই সুপ্রচলিত নয়। কিন্তু সুখের বিষয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে স্বয়ং জয়রাশি দু'বার তত্ত্বোপপ্লব শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তা থেকে আমাদের পক্ষে শব্দটির অন্তত জয়রাশি-অভিপ্রেত তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। যথা:

১॥ নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে জয়রাশি বলছেন: "যদি চ ভাবজ্ঞানং ভাবব্যবস্থাং ন করোতি তদা সর্বভাবেষু অনাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। তৎপ্রসক্তৌ অভাবস্থাপ্যনবস্থিতিঃ, তনবস্থিতৌ চ তত্ত্বোপপ্লবঃ স্যাৎ"[৫৭]। অর্থাৎ, ভাবজ্ঞান বা অস্তিত্বসূচক জ্ঞান থেকে যদি ভাবব্যবস্থা বা অস্তিত্ব প্রতিপাদন না হয় এবং যদি অভাব জ্ঞান থেকে অনস্তিত্ব প্রতিপাদন না হয় তাহলে আমরা সর্ববিষয়ে অনিশ্চয়তায় পতিত হব—এবং তাহলে তত্ত্বোপপ্লবই ঘটবে। অতএব স্বয়ং জয়রাশি তত্ত্বোপপ্লব শব্দকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করছেন এই উক্তি থেকেই তার একটি নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। কেননা, তাঁর মতে "তত্ত্বোপপ্লব"র একটি তাৎপর্য হল, সর্ববিষয়ে ঐকান্তিক অনিশ্চয়তা—ভাবজ্ঞান এবং অভাবজ্ঞান উভয়েরই অর্থহীনতা।

২॥ নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধেই তর্ক প্রসঙ্গে তিনি আর-এক জায়গায় বলছেন, তর্কের খাতিরে নৈয়ায়িকেরা যদি একটি বিশেষ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন তাহলে সর্বমিথ্যাত্বই প্রতিপাদিত হবে, এবং যদি সর্বমিথ্যাত্বই প্রতিপাদিত হয় তাহলে তত্ত্বোপপ্লবই ঘটবে: …"সর্বস্য মিথ্যাত্বমাপদ্যতে ততঃ তত্ত্বোপপ্লবঃ স্যাৎ"।[৫৮] অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, "তত্ত্বোপপ্লব" শব্দের আর-একটি অভিপ্রেত তাৎপর্য হল, সর্বমিথ্যাত্ব। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র সম্পাদকেরা দাবি করছেন, জয়রাশিভট্ট প্রমাণখণ্ডন করেই আলোচনা পরিসমাপ্ত করছেন, পক্ষান্তরে শ্রীহর্ষ প্রমাণ-খণ্ডন অবলম্বন করে জগৎমিথ্যাত্ব-মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু এ-দাবি সম্পূর্ণভাবে স্বীকারযোগ্য নয়; কেননা জয়রাশি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, তাঁর তত্ত্বোপপ্লববাদ অনুসারে সর্ব্বমিথ্যাত্বও স্বীকার্য। অতএব সিদ্ধান্ত হয় শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর মতোই জয়রাশিভট্ট প্রমাণ-খণ্ডন এবং জগৎমিথ্যাত্ব—উভয়ই প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন।

৫৭। ঐ ১৪।

৫৮। ঐ ৯।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য উল্লেখ করা যাক। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-কে লোকায়তিক গ্রন্থ বলে গ্রহণ করার উৎসাহ যত প্রবলই হোক না কেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যাঁরা জয়রাশির মোটামুটি সমসাময়িক ছিলেন তাঁরা কিন্তু তত্ত্বোপপ্লববাদকে সরাসরি শূন্যবাদ এবং মায়াবাদের সমগোত্রীয় বলেই গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ হিসাবে জৈন দার্শনিক বিদ্যানন্দিনের 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক'-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৮০০ বলেই স্বীকৃত; অর্থাৎ গ্রন্থকার ছিলেন জয়রাশির সমসাময়িক বা সামান্য পরবর্তী। তিনি বলেছেন, শূন্যবাদী, তত্ত্বোপপ্লববাদী এবং ব্রহ্মবাদীর মতে জাগ্রদুপলব্ধির বাধকপ্রত্যয় বর্তমান: "সর্বথা শূন্যবাদিনস্তত্ত্বোপপ্লববাদিনো ব্রহ্মবাদিনো বা জাগ্রদুপলব্ধার্থক্রিয়ায়াং কিং ন বাধকপ্রত্যয়ঃ"।[৫৯] এখানে শুধু যে শূন্যবাদী, তত্ত্বোপপ্লববাদী এবং ব্রহ্মবাদীকে দার্শনিক হিসাবে সমগোত্রীয় বিবেচনা করা হয়েছে তাইই নয়,—জগৎমিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর একটি সুবিখ্যাত দার্শনিক যুক্তি (যথা: জাগ্রত-উপলব্ধির বাধক-প্রত্যয় বর্তমান। স্পষ্টভাবেই তত্ত্বোপপ্লববাদীরও অভিপ্রেত বলেই উক্ত হয়েছে। পরে—ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের ইতিহাস প্রসঙ্গে—যুক্তিটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। আপাতত সংক্ষেপে দেখা যাক, যুক্তিটির অর্থ ঠিক কী এবং শূন্যবাদী ও মায়াবাদী কেন এই যুক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন। জগৎমিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদীরা জগৎবিষয়ক আমাদের সাধারণ সমস্ত উপলব্ধিকে স্বপ্ন উপলব্ধির সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন: স্বপ্নাদির দৃষ্টান্তে উপলব্ধ বিষয়গুলি মিথ্যা অতএব জগৎ-উপলব্ধিও যদি স্বপ্নাদিরই সমতুল্য হয় তাহলে জগৎ-উপলব্ধির বিষয়ও—অর্থাৎ উপলব্ধ জগৎও—মিথ্যা হবে। উত্তরে ভাববাদ-বিরোধীরা তর্ক তুলেছেন, জগৎ-উপলব্ধি স্বপ্নাদির সমতুল্য হতে পারে না; কারণ স্বপ্নাদি বাধিত হয়, বা, স্বপ্নাদির বাধক-প্রত্যয় বর্তমান: জেগে উঠলে বুঝতে পারি স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা ছিল, অতএব এক্ষেত্রে জাগ্রৎউপলব্ধি বা জাগ্রতজ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের বাধক-উপলব্ধি বা বাধক-জ্ঞান বা বাধক-প্রত্যয়। অর্থাৎ, ভাববাদ-বিরোধীদের মতে স্বপ্নাদির বাধক-প্রত্যয় বর্তমান বলেই স্বপ্নাদির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু জাগ্রত-উপলব্ধির কোন বাধক-প্রত্যয় বর্তমান নেই, অতএব জাগ্রত-উপলব্ধিকেও স্বপ্নাদির সমতুল্য মিথ্যা মনে করার কারণ নেই। স্বভাবতই চরম ভাববাদীদের পক্ষে জগৎমিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়েছে যে জাগ্রত-উপলব্ধিরও বাধক-প্রত্যয় বর্তমান।[৬০]

৫৯। ঐ, ভূমিকা পৃ. vii

৬০। চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন', ২৯০-৯৪ দ্রষ্টব্য।

কীভাবে তাঁরা একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে-আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র। আপাতত আমাদের মন্তব্য এই যে শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর মতোই তত্ত্বোপপ্লববাদীও যেহেতু সর্বমিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতে চান সেইহেতু তাঁর পক্ষেও জাগ্রৎ-উপলব্ধির বাধক-প্রত্যয় স্বীকার করা শুধু স্বাভাবিকই নয়, বস্তুত অপরিহার্যও। অতএব বিদ্যানন্দিনের উপরোক্ত উক্তিকে মনগড়া মনে করার কোন কারণ নেই। আর যদি তা না-থাকে তাহলে, 'তত্ত্বোপপ্লব-সিংহ'-কে লোকায়তিক গ্রন্থ বিবেচনা করার বাস্তব সুযোগ সত্যিই কতটুকু? কিংবা, জয়রাশিভট্টকে চার্বাকদেরই "কোন এক" সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে হলে আরো স্বীকার করা দরকার যে চার্বাকদেরই "সেই সম্প্রদায়টি" (ক) সর্বপ্রমাণ খণ্ডনে, (খ) জগৎমিথ্যাত্বে এবং (গ) জাগ্রৎ-উপলব্ধির বাধক-প্রত্যয়ের অস্তিত্বে আস্থাবান ছিল। চার্বাক-দেরই এজাতীয় কোন এক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে আস্থা স্থাপনের পক্ষে যে-প্রবল কল্পনাবলের প্রয়োজন আমাদের তা নেই। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে আমাদের এইটুকুই জানা আছে যে ভারতীয় দর্শনে শুধুমাত্র শূন্যবাদী ও মায়াবাদীরাই এই তিনটি নির্দিষ্ট দাবি করেছেন। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত হল, চার্বাক বা লোকায়ত তো দূরের কথা—জয়রাশিভট্টর প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব শূন্যবাদী ও মায়া-বাদীদের সঙ্গেই।

৫ ॥ প্রাচীন বস্তুবাদ সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ

অতএব সিদ্ধান্ত হয়, ভট্ট জয়রাশি রচিত 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' আবিষ্কৃত হবার ফলে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত হলেও প্রাচীন বস্তুবাদ বা লোকায়ত সংক্রান্ত পরিস্থিতিটি অপরিবর্তিতই থেকেছে। কেননা, শূন্যবাদী নাগার্জুন এবং মায়াবাদী শ্রীহর্ষের প্রমাণ-বিধ্বংসন-প্রয়াসেরই অন্তর্বর্তী কোন এক স্তরের পরিচায়ক হলেও এ-গ্রন্থ লোকায়ত সম্প্রদায়ের হতে পারে না। তাই জয়রাশির রচনা সত্ত্বেও স্বীকার করা প্রয়োজন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকায়ত-বিরোধীরা লোকায়ত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে মতটির যেটুকু পরিচয় রেখে গিয়েছেন আধুনিক বিদ্বানদের কাছে লোকায়ত সংক্রান্ত বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য বলতে আজো শুধু সেইটুকুই। অর্থাৎ, তারই উপর নির্ভর করে আজ লোকায়তর পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারে।

অবশ্যই এই পুনর্গঠন-প্রয়াসের নানা সমস্যা আছে। প্রথমত, লোকায়তর এ-জাতীয় অধুনালভ্য বর্ণনাবলী সবসময়ই নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। লোকায়তর প্রতি গভীর বিদ্বেষের ফলে অনেকেই মতটিকে পরিহাসের বিষয় করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, নানা সম্প্রদায়ান্তরের

নানা প্রতিনিধি বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে লোকায়তর উল্লেখপূর্বক বর্জন ও খণ্ডনের প্রস্তাব করেছেন। ফলে তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রায়ই খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন—লোকায়তর কোন ধারাবাহিক বা সামগ্রিক বিবৃতি নয়। অবশ্যই, বিশেষত মাধবাচার্যর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-র প্রথম পরিচ্ছেদ এবং হরিভদ্র সূরির 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়'-এর শেষ পরিচ্ছেদ এই কথার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কেননা, বিশেষত এই দুটি গ্রন্থে (এবং অবশ্যই হরিভদ্রর টীকাকার মণিভদ্র ও গুণরত্নর রচনায়) লোকায়তর কোন একরকম সামগ্রিক বর্ণনা প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু এই দুটি বর্ণনার মধ্যে অংশবিশেষে সাদৃশ্য সত্ত্বেও অংশবিশেষে গভীর পার্থক্য—এমনকি বিরোধও —বর্তমান। ফলে উভয় বর্ণনাই সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু মাধবাচার্য এবং হরিভদ্রর রচনাই নয়। আমরা পরে দেখবো, বিভিন্ন সূত্রে লব্ধ লোকায়ত সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য আপাতদৃষ্টিতে প্রায়ই অসংলগ্ন; এমনকি তথ্যবিশেষ দুর্বোধ্য ও অর্থহীন বলেও প্রতীত হতে পারে।

এ-হেন পরিস্থিতিতে লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রয়াসে আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা বর্তমান। সে-সম্ভাবনার ফলে যে-বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখা যাক।

রাধাকৃষ্ণণ৬১ ও মুয়ার৬২ উভয়েই লোকায়তকে প্রাচীন ভারতে চিন্তাস্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু লোকায়ত ও চিন্তাস্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত কার্যকারণ-সম্বন্ধ দুজনের মতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধই। রাধাকৃষ্ণণের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাকাব্যর যুগে ভারতে শ্রুতিশাসনের কঠোরতা ভেঙে চিন্তার মুক্তি ঘোষিত হয়েছিল এবং তারই পরিণামে উদ্ভব হয় চরম লোকায়তিক নাস্তিক্য। পক্ষান্তরে মুয়ার অনুমান করেন, অতি প্রাচীন কাল থেকেই এমনকি আস্তিক বা বেদপন্থীদের মধ্যেও চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কালক্রমে নাস্তিকদের নাস্তিক্যবাহুল্যে আস্তিকেরা বিশেষ শঙ্কিত বোধ করেন। এই কারণেই ভারতের ধ্যানরাজ্যে কঠোর শ্রুতিশাসন প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ, রাধাকৃষ্ণণের মতে যে-লোকায়ত শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়ার পরিণাম, মুয়ার-এর মতে সেই লোকায়তই কঠোর শ্রুতিশাসন প্রবর্তনের একটি অন্যতম কারণ।

দাসগুপ্ত৬৩ অবশ্য এ-সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি যে লোকায়তিক বা নাস্তিকদের প্রবল তর্কপ্রবণতাই আস্তিক-শিরোমণি 'ব্রহ্মসূত্র'-কারকে

৬১। Radhakrishnan IP i. 271ff.

৬২। Muir in JRAS-1862, 299 ff.

৬৩। Dasgupta HIP iii, 517.

নেতিমূলকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তারই ফলে বাদরায়ণ ঘোষণা করেছিলেন, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; শাস্ত্র বা শ্রুতিই প্রকৃত প্রমাণ। কিন্তু দাসগুপ্তর[৬৪] মতে লোকায়তর প্রকৃত উৎস অন্যত্র অনুমেয়। আদিতে লোকায়ত ছিল একরকম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস। এই সংকার-পদ্ধতি আসলে ভারতীয়ও নয়। ভারতের পরিবর্তে তা প্রচলিত ছিল প্রাচীন সুমেরিয়ায়। কালক্রমে সংকারপদ্ধতি-গত বিশ্বাসটি ভারতে এসে পড়ে এবং ভারতের জমিতে তার কিছু পরিবর্তনও ঘটে। তারই পরিণামে উদ্ভব হয় লোকায়ত-মতের।

আবার, তুচ্চির[৬৫] সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়তর আদিরূপটির সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের চিন্তা-স্বাধীনতা কিংবা সুমেরীয় ইতিহাসের সংকার-পদ্ধতি-গত বিশ্বাস—কোন কিছুরই সম্পর্ক অনুমেয় নয়। লোকায়ত বলতে আদিতে বোঝাতো রাজোপদেশক পুরোহিতদের প্রজ্ঞা। তখনো পুরুষার্থ হিসাবে ধর্ম ও অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু কালক্রমে এ-বিরোধ প্রকট রূপ গ্রহণ করে—তুচ্চির বর্ণনায়, অর্থ যেন বিদ্রোহ করে ধর্মর বিরুদ্ধে। তারই পরিণামে দেখা দেয় ভোগসর্বস্ব নিরীশ্বর লোকায়ত-দর্শন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[৬৬] সিদ্ধান্ত অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অনুমান করেছেন, লোকায়তর সঙ্গে কামসাধনার—অতএব, বামাচারী কাপালিকাদি সম্প্রদায়ের—কোন এক গভীর সম্পর্ক, এমনকি ঐক্যও, স্বীকারযোগ্য। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়ত-মত শুধুমাত্র প্রাচীনকালেরই পরিচায়ক নয়; ভারতভূমি থেকে আজো তা বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত, সহজিয়া প্রভৃতি বিবিধ নামান্তরের আড়ালে দেহবাদী ও কামসাধক সম্প্রদায় হিসাবে লোকায়ত এখনো এদেশে প্রচলিত আছে।

রিস্ ডেভিড্স্[৬৭] অনেকদিন আগেই যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা স্বীকার করতে পারলে আজ আর অবশ্য আমাদের পক্ষে লোকায়ত নিয়ে এতোরকম মতবাদের আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত বোধ করতে হতো না। কেননা, তাঁর মতে লোকায়ত নামে কোন সম্প্রদায় বা কোন দার্শনিক মত কোনকালে বাস্তবিকই ছিল না। অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আমরা যদি লোকায়তর সমস্যাটিই অস্বীকার করতে পারতাম তাহলে সহজেই মুক্তি পেতাম সে-সমস্যার সমাধান-অনিশ্চয়তা থেকেও।

৬৪। *Ib* iii 529 ; 531

৬৫। Tucci in PIPC-1925, 40.

৬৬; Sastri L 5-6

৬৭। Rhys Davids DB ii. 172

৬॥ আধুনিক বিদ্বানদের পদ্ধতি

বলাই বাহুল্য, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে উপরে যাঁদের মতামত উদ্ধৃত হয়েছে ভারততত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁরা সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধেয়। তাই কারুর কথাই অসংকোচে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সকলের সিদ্ধান্তই সমানে স্বীকার করবার সুযোগও সংকীর্ণ। কেননা, সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন সহজ নয়। এই পরিস্থিতিতে সুযোগ্য বিদ্বানদের সুচিন্তিত অভিমত সম্বন্ধেও সন্দিহান হবার অপ্রিয় দায়িত্ব বর্তমান। আরো মনে রাখা দরকার, ভারততত্ত্ববিদ্ হিসাবে যাঁরা এমন শ্রদ্ধেয় তাঁরা কেউই বিনা-তথ্যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করেননি। তথ্যগুলি অবশ্যগ্রাহ্য, যদিও সেগুলির পুনর্বিচার-প্রস্তাব অবান্তর নয়। অর্থাৎ এ-সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা যায় না যে লোকায়তর পুনর্গঠনে আধুনিক বিদ্বানেরা যে-সব বিভিন্ন তথ্যের উপর বিভিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ করে উপরোক্ত বিচিত্র সিদ্ধান্তাবলী প্রস্তাব করেছেন সেগুলিরই পুনর্বিচার করলে লোকায়ত সংক্রান্ত একটি সুসংহত মতবাদে উপনীত হবার সুযোগ ঘটতে পারে। কেননা, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ান্তরের প্রতিনিধিদের পক্ষে লোকায়ত নামে একই ধ্যানধারণার উল্লেখ করাই স্বাভাবিক—যদিও সেই ধ্যানধারণার বিবিধ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বিপক্ষবাদীর রচনায় প্রাধান্য পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই তথ্যাবলী পুনর্বিচারের জন্য একটি নূতন ও সন্তোষজনক পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রস্তাবও অবান্তর হবে না। কেননা, আধুনিক বিদ্বানেরা মূলতই যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে উক্ত তথ্যাবলীর ব্যাখ্যা খুঁজেছেন তাঁদের সিদ্ধান্তাবলীর পরস্পর-বিরোধিতা থেকেই সেই পদ্ধতিটির সন্তোষজনকতায় সন্দিহান হবার কারণ ঘটে।

পদ্ধতির কথা বিশেষ করে কেন ওঠে সংক্ষেপে তার দু'একটি কারণ উল্লেখ করা যাক।

প্রাচীন লোকায়ত সংক্রান্ত আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তাবলী বিচারে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের পরস্পরের সিদ্ধান্তে পার্থক্য ও বিরোধ যতো গভীরই হোক-না কেন, তাঁরা মূলত একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ, মূলত একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা বিভিন্ন সূত্রে লব্ধ বিভিন্ন তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপণ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত এই পদ্ধতি বলতে আসলে কী?

'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য লোকায়ত বা চার্বাক নাম দিয়ে একটি দার্শনিক মত বর্ণনা করেছেন। এই (বা এজাতীয়) বর্ণনা থেকেই আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়ত সংক্রান্ত মূল ধারণা সংগ্রহ করেন এবং তারই আলোয় অন্যান্য সূত্রে লব্ধ লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের

ব্যাখ্যা অন্বেষণ করেন। গার্বে[৬৮] যেমন সরাসরি ঘোষণা করেছেন, 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-র প্রথম পরিচ্ছেদই লোকায়ত সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের প্রধানতম উৎস। অর্থাৎ আধুনিক বিদ্বানদের কাছে লোকায়তর পুনর্গঠনে সাধারণভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির প্রথম কথা হল, মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনার উপর বিশেষ নির্ভরতা। অবশ্যই রিস্ ডেভিড্স্[৬৯] সচেতনভাবে এই পদ্ধতি বর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-র লোকায়ত বর্ণনা স্পষ্টতই মাধবাচার্যর কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু আপাত-বিরুদ্ধ শোনালেও বিচারে প্রতিপন্ন হয়, রিস্ ডেভিড্স্-এর পক্ষে লোকায়ত-সম্প্রদায়ের বাস্তব অস্তিত্বে অনাস্থার একটি প্রধান কারণ হল মাধবাচার্যর এই বর্ণনাটিরই বিশেষ প্রভাব।

মাধবাচার্যর বর্ণনা থেকে শুরু করায় অবশ্যই দুটি সুবিধা আছে।

প্রথমত, তার লোকায়ত-বর্ণনায় কোন অনিশ্চয়তা বা অসংগতি নেই। বরং তিনি লোকায়তিকদের প্রমাণতত্ত্ব, প্রমেয়তত্ত্ব ও পুরুষার্থর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য ও সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার থেকেই তা স্পষ্ট হবে ঃ

লোকায়ত-মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া লোকায়তিকেরা জ্ঞানের আর কোন উৎস স্বীকার করেন না। প্রামাণ্যাভাববশত অনুমানাদি প্রমাণ নয় ঃ অর্থাৎ অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য নেই, অতএব অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্ভূতই তত্ত্ব; অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু—শুধু এই চার প্রকার জড়পদার্থই সত্য বলে স্বীকার্য, কেননা প্রত্যক্ষমূলকভাবে শুধু এই চতুর্ভূত সংক্রান্তই জ্ঞান হয়। কিণ্ব প্রভৃতির মিশ্রণে যেমন মদশক্তি উৎপন্ন হয় তেমনি এই চতুর্ভূত দেহাকারে পরিণত হলে উদ্ভব হয় চৈতন্যর। অর্থাৎ, সুরা বা মদ্য প্রস্তুতের জন্য কিণ্ব প্রভৃতি বিবিধ উপাদান ব্যবহৃত হয়, এই উপাদানগুলিতে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও এগুলিই মদ্যরূপে পরিণত হলে মদশক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্ভূত চৈতন্য বিহীন হলেও সেই চতুর্ভূতই দেহাকারে পরিণত হলে আবির্ভাব হয় চৈতন্যর। চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা-মাত্র। অতএব, 'আমার দেহ' বা 'আমার শরীর' প্রভৃতি কথা 'রাহুর মাথা' ইত্যাদির মতোই ঔপচারিক মাত্র। অর্থাৎ যদিও আমরা কথায় বলি 'রাহুর মাথা' তবুও 'মাথা' ও 'রাহু' অভিন্ন; মাথা ছাড়া রাহুর কোন সত্তা নেই। অতএব রাহুই মাথা, বা, মাথাই রাহু। তেমনি 'আমার দেহ' মানে আমিই দেহ, বা, দেহই আমি। দেহ বিনষ্ট হলে

৬৮। Garbe in ERE viii 138

৬৯। Rhys Davids DB ii. 172

আত্মাও বিনষ্ট হয়। অতএব, পরলোকগামী আত্মা এবং, স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতির কল্পনাও ভিত্তিহীন বা অলীক। ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া ফলদায়ক হতে পারে না। অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞর কথা এবং তিনটি বেদ—বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্যক্তিদের উদ্ভাবিত জীবিকা-উপায় মাত্র। সংক্ষেপে, পরলোকাদি কল্পনামাত্র; পরলোকে সুখের প্রলোভন প্রবঞ্চনামাত্র। "অঙ্গনাদির আলিঙ্গনজন্য সুখই" একমাত্র পুরুষার্থ। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মাধবাচার্যর এই লোকায়ত-বর্ণন সর্বাংশে ঐতিহাসিক সত্যের পরিচায়ক হোক আর নাই হোক এর মধ্যে অন্তত একরকম সামগ্রিকতা বা সংহতি বর্তমান। অতএব, এ-বর্ণনার উপর নির্ভর করতে পারলে লোকায়ত-প্রসঙ্গে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, লোকায়তর এজাতীয় বর্ণনা আধুনিক বিদ্বানদের কাছে মোটের উপর একরকম পরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেননা, সাধারণভাবে তাদের মধ্যে বস্তুবাদ সংক্রান্ত যে-ধারণা—বিশেষত বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষ—মাধবের বর্ণনাটি তার সঙ্গে সহজেই খাপ খায়। এ-ধারণা অনুসারে লোকায়তিকেরা কোন রকম উচ্চ বা সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের অধিকারীই নয়। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জড়পদার্থই তাদের কাছে একমাত্র সত্য এবং স্থূল সুখসম্ভোগই তাদের কাছে একমাত্র পুরুষার্থ। অর্থাৎ, অনুমানাদি-লব্ধ উচ্চতর জ্ঞান তারা অবহেলা করে এবং জ্ঞানের কোনরকম উচ্চতর আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের উৎসাহমাত্র নেই। প্রাকৃতজনের স্থূল চিন্তাই ঐ স্থূলবাদ। আধুনিক বিদ্বানেরাও প্রায়ই সাধারণভাবে বস্তুবাদের প্রতি এজাতীয় একটি বিদ্বেষ-মূলক মনোভাবই পোষণ করে থাকেন। বিশেষত তাঁদের ধারণা, বস্তুবাদীদের পক্ষে স্থূল সুখভোগ ছাড়া উন্নততর কোনো পুরুষার্থ স্বীকার্য হতে পারে না।

এই বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

লোকায়তিকদের সম্বন্ধে একটি লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল; বিভিন্ন গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়[৭০]। জনৈক নাস্তিক ব্যক্তি নিজ পত্নীর আস্তিক মত নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তর্ক করতেন, কিন্তু কিছুতেই পত্নীকে স্বমতে দীক্ষিত করতে পারছিলেন না। অতএব তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করে পত্নীকে দেখাতে চান, বহুশ্রুত পণ্ডিতেরাও অনুমানাদির উপর নির্ভর করে যে-ভাবে স্বর্গ, নরক, পরমেশ্বর, জন্মান্তর প্রভৃতি প্রত্যক্ষর আগোচর অলৌকিক বিষয়াদির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান তা বস্তুত অন্তঃসারশূন্যই। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাত্রিকালে পত্নীকে নিয়ে নিজেদের নগরের বাইরে যান এবং রাজপথের উপর স্বহস্তে কৃত্রিম ব্যাঘ্রপদচিহ্ন অঙ্কিত করেন। পরদিন

৭০। লোকশ্রুতিটির বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'তর্করহস্যদীপিকা' ৩০৩-৪ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য গ্রন্থে লোকশ্রুতিটির উল্লেখের জন্য Valle Poussin in ERE viii. 494n দ্রষ্টব্য।

প্রত্যূষে রাজপথে ব্যাঘ্রপদচিহ্ন দেখে নগরবাসীরা ভীড় করেন ; বহুশ্রুত পণ্ডিতেরাও সেখানে সমবেত হন এবং সকলেই বলতে থাকেন, "দেখ, বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখ। রাত্রিকালে নিশ্চয়ই বন থেকে নগরাভিমুখে বাঘ এসেছিল !" ঘটনাটির প্রতি পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে লোকায়ত-পন্থী বলেন, "ভদ্রে, এই বৃকপাদ দেখ। এর থেকে নগরে বাঘ আসার অনুমান যে-রকম কৃত্রিম ও মিথ্যা, বহুশ্রুতগণ অনুমানাদির সাহায্যে স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, জন্মান্তরাদি যে-সব প্রত্যক্ষ-অগোচর অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ করেন সেগুলিও তেমনি কৃত্রিম ও মিথ্যা। বস্তুত এইভাবেই পরবঞ্চন-প্রবণ ধার্মিকছদ্মধূর্তের দল অনুমান, আগম প্রভৃতির নজির দেখিয়ে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত সুখের প্রলোভন জাগায় এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য গম্যাগম্য হেয়োপাদের বিষয়ে মুগ্ধ ধর্মমোহের সঞ্চার করে।"

ভদ্রে বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ ॥৭১

স্বর্গাদি অলৌকিক বিষয়ে অনুমান-খণ্ডন-মূলক এই লোকশ্রুতিটি অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দ্রষ্টব্য হল, সাধারণভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক বিদ্বানদের তীব্র বিদ্বেষ। তারই নিদর্শন হিসাবে বলা যায়, উপরোক্ত জনশ্রুতিটির উল্লেখ-প্রসঙ্গে জনৈক বিদ্বান[৭২] মন্তব্য করেছেন, "এক ব্যক্তি একটি নারীকে বস্তুবাদে মতান্তরিত করার উদ্দেশ্যে —কিংবা, বরং বলা উচিত, নারীটির 'মতবিকার উৎপাদনের' উদ্দেশ্যে— বলেছেন…" ইত্যাদি। অর্থাৎ লেখকের বিচারে, বস্তুবাদে মতান্তরিত করা মানেই মতবিকার উৎপাদন করা ; বস্তুবাদ একরকম মতবিকৃতি মাত্র। এই কারণেই লেখক বস্তুবাদীদের বর্ণনা হিসাবে অনায়াসেই বলতে পেরেছেন, "দর্শনবিহীন এই দার্শনিকেরা"[৭৩]…ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, চতুর্ভূতবাদী দেহাত্মবাদী স্বভাববাদী দার্শনিকদের আসলে কোন দার্শনিক মতই নেই, কিংবা, যা একই কথা, এ-মতকে দার্শনিক মতের মর্যাদা দেওয়া যায় না। বস্তুবাদ প্রসঙ্গে এজাতীয় মন্তব্যকে স্বভাবতই বস্তুবাদের প্রতি কোন একরকম অন্ধ বিদ্বেষের পরিচায়কই মনে করতে হবে।

বস্তুবাদের প্রতি মোটের উপর একই মনোভাব পোষণ করেন বলেই রাধাকৃষ্ণণও[৭৪] অনায়াসেই মন্তব্য করেছেন, কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামে রূপক নাটকটির একটি চরিত্রের উক্তি থেকেই লোকায়ত-

৭১। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়' শ্লোক ৮১। বিশেষত গুণরত্নর টীকা দ্রষ্টব্য।

৭২। Valle Poussin in ERE viii. 494 : "A man who wanted to convert—let us say 'pervert'—a woman to his materialistic opinions"……

৭৩। *Ib.* : …"Those philosophers without philosophy"…

৭৪। Radhakrishnan IP i. 278 : the "substance of this doctrine is summed up by a character in the allegorical play of *Prabodhacandrodaya*" ….

মতের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। লেখক নিশ্চয়ই সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, এজাতীয় প্রস্তাব অ্যারিস্টোফেনিস্-এর নাটক থেকে সক্রেটিসের মতবাদ ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করার প্রস্তাবের মতোই অবান্তর ও অর্থহীন। কেননা, অ্যারিস্টোফেনিস্ যেমন সক্রেটিসের মত ও চরিত্র নিয়ে নেহাতই স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণমিশ্রও কিছুটা সেইভাবেই তাঁর এই রূপক নাটকটিতে বুন্দেলখন্দ-রাজ কীর্তিবর্মার চিত্তপরিতোষের উদ্দেশ্যে এবং অদ্বৈত-বেদান্ত-মতের গৌরব প্রচার কল্পে বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত, কাপালিক প্রভৃতি বেদান্তবিরোধী কিন্তু জনপ্রিয় নানা মতবাদ নিয়ে অত্যন্ত স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপেরই প্রয়াস করেছিলেন। অর্থাৎ, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর উদ্দেশ্য হল প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা এবং এই প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমিশ্র লোকায়তকে যে কতখানি কদর্যরূপে চিত্রিত করেছেন নাটকটি থেকে যৎকিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করলেই তা বোঝা যাবে :

মহামোহ ......[দেখিয়া সানন্দে] অহো ! প্রিয়বন্ধু চার্বাক যে।

চার্বাক : [দেখিয়া] এই তো মহারাজ মহামোহ। [নিকটে গিয়া], মহারাজের জয় হোক। এই চার্বাক আপনাকে প্রণাম করিতেছে।

মহামোহ : শুভাগমন হোক, হে চার্বাক। এখানে বসুন।

চার্বাক : [বসিয়া] কলির এই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করুন।

মহামোহ : হে কলি, আপনার ভদ্রকার্যসমূহ অব্যাহত তো ?

চার্বাক : আপনার প্রসাদে সর্বত্রই কুশল। সমস্ত কর্তব্য সমাপন করিয়া কেবল মহারাজের পাদপদ্ম দর্শনই অবশিষ্ট আছে। যেহেতু —মহতী আজ্ঞা পাইয়া শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিয়া প্রত্যাবর্তনান্তে শীঘ্র যশ ও প্রসাদ লাভ করিয়া এবং সরল আনন্দ ও আপনার অনুমোদিত দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়া প্রভুর পাদপদ্মে নমস্কার করিতেছে।

মহামোহ : তাহা হইলে এই কলিতে কী সংঘটিত হইল ?

চার্বাক : মহারাজ! বেদনিরূপিত পথ হইতে বিপুল প্রচেষ্টা দ্বারা মহাজনকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারের কারণ কলিও নহে, আমিও নহি; মহারাজের প্রভাবই পৌরুষকে বর্ধিত করিয়াছে। এই বিষয়ে পূর্বতন পথিকগণ এবং পাশ্চাত্যগণকে ত্রয়ী বিদ্যা ত্যাগ করানো হইয়াছে। শম দম প্রভৃতির কথা বাহুল্যমাত্র। অন্যত্রও প্রায়ই ত্রয়ী বিদ্যার ফল জীবিকামাত্র। আচার্য যেমন বলিয়াছেন :

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতি ॥

অতএব, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও মহারাজ স্বপ্নেও বিদ্যা অথবা প্রবোধের উদয় আশঙ্কা করিবেন না।

মহামোহ : উত্তম করিয়াছেন। সেই মহৎ তীর্থকে ব্যর্থ করিয়াছেন।[১৫]

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, এই নাটকটিতেই কৃষ্ণমিশ্র বৌদ্ধ ও জৈন মতেরও ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছেন। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করে বৌদ্ধ ও জৈন মতের সারমর্ম সনাক্ত করার প্রস্তাব কেউ করেন না, রাধাকৃষ্ণণও অবশ্যই তা করেননি। কিন্তু লোকায়তর বেলায় অন্য রকম। মতটির সারমর্ম এবং মতটি নিয়ে প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে সচেতন থাকার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। কেননা, তাঁর রুচি ও বিচার অনুসারে মতটিই প্রহসনের মতো।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকের মনেই সাধারণভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই রকম এক বিজাতীয় বিদ্বেষ বর্তমান। এবং এই কারণেই অদ্বৈতমতাবলম্বী মাধবাচার্যের লোকায়ত-বর্ণন তাঁদের কাছে একরকম পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু মাধবাচার্যর বর্ণনা থেকে শুরু করার এই দুটি আপাত-সুবিধা সত্ত্বেও বর্ণনাটিকে সর্বাংশে ঐতিহাসিক সত্যর পরিচায়ক বলে স্বীকার করতে আমরা দ্বিধা বোধ করেছি। তার মানে এই নয় যে রিস্ ডেভিড্‌স যে-রকম মাধবের লোকায়ত-বর্ণনাকে সামগ্রিকভাবে কল্পনাপ্রসূত বলে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন আমাদের বিচারেও তা স্বীকারযোগ্য প্রতীত হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের বিচারে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না-হলেও মাধবের বর্ণনাটি সর্বাংশে কাল্পনিক হওয়াও সম্ভব নয়। তার একটি প্রধান কারণ হল, লোকায়তর বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি অনেকগুলি লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। এই লোকগাথাগুলি তাঁর স্বরচিত হতে পারে না; কেননা তাঁর পূর্ববর্তী নানা লেখকের রচনাতেও একই (বা অন্তত একজাতীয়ই) লোকগাথা উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব লোকগাথা হিসাবে এগুলি প্রামাণিক হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লোকায়ত-মতের ব্যাখ্যায় মাধব এমন কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করেছেন লোকায়ত-প্রসঙ্গে যেগুলির বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে; অন্যান্য নানা লেখকের রচনাতেও এই যুক্তিগুলিরই (বা অন্তত এ-জাতীয় নানা যুক্তিরই) পরিচয় পাওয়া যায়। তাই মাধবের বর্ণনাকে সামগ্রিকভাবে বা সর্বাংশে কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হবে না। তবুও এ-বর্ণনা সামগ্রিকভাবে বা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না। তাঁর রচনার আভ্যন্তরীণ নানা সাক্ষ্য এবং তাঁর

১৫। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', ২য় অঙ্ক। স্বাধীন তর্জমা।

রচনা-বহির্ভূত নানা সাক্ষ্যও বর্ণনাটিকে সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠার পরিচায়ক বলে গ্রহণ করার পরিপন্থী। সে-আলোচনা স্বভাবতই কিছুটা দীর্ঘবিস্তৃত হবে। কিন্তু এই দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার বিশেষ প্রয়োজন হিসাবে প্রথমে দেখা দরকার, লোকায়ত-সংক্রান্ত আধুনিক বিদ্বানদের বিবিধ ও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তাবলীর জন্য মাধবের উপর নির্ভরতা বস্তুত কতোখানি দায়ী।

৭ ॥ রাধাকৃষ্ণণের মত

রাধাকৃষ্ণণের মতে মহাকাব্যের যুগে—অর্থাৎ, তাঁর হিসাবে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০-র মধ্যে—ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় নানা রকম বিপর্যয় ঘটেছিল। তারই ফলে এই যুগটিতে ভেঙে পড়েছিল অনেক শতাব্দীর পুরোনো বিশ্বাস, টলে উঠেছিল শ্রুতির শাসন। অতএব ভারতের চিন্তাকাশেও উদিত হয় বিবিধ দার্শনিক মত ও নিষ্ফল কল্পনা। একদিকে দেখা গেল, লোকায়তিকেরা নিছক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষর উপরই নির্ভর করছেন, নিছক ইন্দ্রিয়-সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করছেন। অপরদিকে দেখা গেল বৌদ্ধরা উচ্চাঙ্গ নীতিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। প্রকৃত দার্শনিক বিচারে লোকায়তিকদের দাবি অবশ্যই নিষ্ফল এবং একদেশদর্শিতারই পরিচায়ক। কিন্তু উপরোক্ত সামাজিক পরিস্থিতি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, লোকায়তিকদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকাও স্বীকারযোগ্য। রাধাকৃষ্ণণের বিচারে সে-ভূমিকা হল, পুরোনো কালের অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম এবং জাদুবিশ্বাসের প্রভাব বর্জন করে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার ভূমিকা। অতীতের যে-বোঝা তখনো মানুষকে নিষ্পেষিত করে রেখেছিল তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় লোকায়ত-মত যেন একরকম উন্মত্ত-ব্যবহার; তবুও এ-দর্শন কূপমণ্ডুকতা দূর করে মানবাত্মার মহান সৃজনী সম্ভাবনাকে মুক্তি দেবার পক্ষে সহায়কও হয়েছিল। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, উন্মত্ত বিক্ষোভের মতো হলেও লোকায়ত-মতের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনও ছিল; যদিও সে-প্রয়োজন নেহাতই নেতিবাচক।

এই সিদ্ধান্তর প্রধান গুণ অবশ্যই সারল্য এবং সে-সারল্যর প্রধান কারণ মাধবাচার্যর উপর প্রায় ঐকান্তিক নির্ভরতা। মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনার সঙ্গে অন্যান্য সূত্রে লব্ধ লোকায়ত-সংক্রান্ত যে-সব তথ্যর সংগতি হয় না লেখক অনায়াসেই সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করেছেন। এই কারণেই তিনি লোকায়তর আলোচনায় 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ছাড়া শুধু 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' এবং 'সর্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ'[১৬] নামের একটি গ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে সম্মত হয়েছেন: 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'র মতোই এই দুটি গ্রন্থও

১৬। গ্রন্থটি অনেক সময় শঙ্করাচার্য রচিত বলেই উল্লিখিত হয়। কিন্তু বস্তুত তা ভিত্তিহীন। Sarvasiddhantasarasamgraha, Tr. Rangacarya, Intro. দ্রষ্টব্য।

বিশেষ অর্বাচীন, 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'র মতোই এই দুটি গ্রন্থও বেদান্ত মতের সমর্থনে রচিত, এবং 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'র, মতোই এই দুটি গ্রন্থেও লোকায়ত নেতিবাচকভাবেই বর্ণিত: লোকায়তিকেরা অনুমান মানে না, শাস্ত্র মানে না, আত্মা মানে না, ঈশ্বর মানে না, পরলোক মানে না, কর্মফল মানে না, মোক্ষ মানে না—কিছুই মানে না। লোকায়তর এজাতীয় শুধু নেতিমূলক বর্ণনাকে গ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন বলেই এবং উপনিষদ্, বৌদ্ধশাস্ত্র, জৈন-শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে লোকায়ত সংক্রান্ত-অন্যান্য যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন বলেই রাধাকৃষ্ণণের কাছে লোকায়তর আলোচনায় প্রধানত দুটি প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে এ-জাতীয় চূড়ান্ত নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব কী করে সম্ভব হয়েছিল? দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে তার সার্থকতাই বা কতোটুকু? প্রথমে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন এক যুগের কথা কল্পনা করেছেন যখন প্রচণ্ড সামাজিক বিপর্যয়ের ঝড়ে পুরোনো কালের সমস্ত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ভেঙেচুরে মিশমার হয়ে যাচ্ছিল—এহেন কোন যুগেই চরম অবিশ্বাস বা চরম নেতিমূলক মনোভাবের অভ্যুত্থান সম্ভব বা এমনকি স্বাভাবিক। লোকায়তিকেরা তাই ঘোষণা করেছিলেন, কিছুই মানি না—অনুমান নয়, আত্মা নয়, পরলোক নয়, ঈশ্বর নয়, অপবর্গ নয়। কিন্তু এজাতীয় মতবাদের স্বকীয় দার্শনিক মূল্য কতটুকু? রাধাকৃষ্ণণের বিচারে মতটি অবশ্য নিষ্ফল ও অন্তঃসারশূন্য; আস্তিক্যবুদ্ধির বিরুদ্ধে উন্মত্ত বিদ্রোহের মতো। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে মতটির কোনরকম ঐতিহাসিক অবদান ছিল না। যে-যুগে মতটির উদ্ভব তারই পরিপ্রেক্ষায় বিচার করলে বোঝা যায়, অতীতের বোঝা থেকে মানবমনকে মুক্ত করার পক্ষে,—স্বাধীন চিন্তার সৃজনী সম্ভাবনাকে সহায়তা করার পক্ষে,—অতীতের বিরুদ্ধে এ-হেন অন্ধ আক্রোশেরও কোন একরকম ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করা প্রয়োজন।

৮॥ মুয়ার-এর মত

মূলত মাধবাচার্যর বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন বলেই মুয়ার-এর কাছেও লোকায়তর সারমর্ম বলতে শ্রুতিশাসন-বিমুখতা, এবং এই অর্থে চিন্তার মুক্তি বা স্বাধীনতা। কিন্তু তিনি রাধাকৃষ্ণণের মতো অনায়াসে এই চিন্তা-মুক্তি বা শ্রুতিশাসন-বিমুখতাকে পরবর্তীকালের কোন এক সামাজিক বিপর্যয়ের পরিণাম বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তার কারণ, মাধবাচার্যর উপর বিশেষ নির্ভরতা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য সূত্রে লব্ধ কয়েকটি তথ্যর উপর গুরুত্ব আরোপণ করতে সম্মত হয়েছেন। যেমন, তিনি ঋগ্বেদেও নাস্তিক

বা অবিশ্বাসী মনোভাবের সন্ধান পেয়েছেন।[৭৭] নজির হিসাবে তিনি বিশেষ করে নিম্নোক্ত ঋকৃটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

> হে সংগ্রামেচ্ছুগণ, ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাকে স্তুতি করিব?[৭৮]

তাছাড়াও 'নিরুক্ত'-তে যাস্ক কৌৎস (বা কুৎস-পুত্র) নামে জনৈক লেখকের কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁর মতে বেদমন্ত্রগুলি প্রায়ই অর্থহীন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ।[৭৯] এমনকি সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে যে অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল তার আরো প্রমাণ হিসাবে মুয়ার বলেছেন,[৮০] তখনো বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-বংশীয়দের পক্ষে বিভিন্ন বেদের—এমন কি একই বেদের বিভিন্ন শাখার—আনুগত্য অঙ্গীকারে বাধা হয়নি। কিন্তু শুধু বৈদিক যুগই নয়। 'রামায়ণ'-এর অযোধ্যাকাণ্ডেও দেখা যায়, জাবালি রামচন্দ্রকে যে-উপদেশ দিচ্ছেন তাও নাস্তিকতায় ভয়ংকর; বস্তুত মুয়ার-এর বিচারে জাবালির এই উপদেশের সঙ্গে মাধবাচার্য-বর্ণিত লোকায়ত-মতের সাদৃশ্য এমনই ঘনিষ্ঠ যে জাবালিকেও প্রকৃতপক্ষে লোকায়তিক বা লোকায়তপন্থী বলাই সঙ্গত।[৮১] তবুও, এহেন ঘোর নাস্তিককেও 'রামায়ণ'-এ বিপ্রশ্রেষ্ঠ বলেই স্বীকার করা হয়েছে। অতএব মুয়ার মনে করেছেন, সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে 'রামায়ণ' রচনার যুগ পর্যন্ত আস্তিক বা বেদপন্থীদের কাছে কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান পালনই আস্তিকতার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু মতাদর্শ বা ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে কোন রকম কঠোর শাসন প্রবর্তিত হয়নি।

অতএব মুয়ার-এর মতে ভারতীয় ইতিহাসে চিন্তা-স্বাধীনতার পরিচয় অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে পরবর্তীকালে—বিশেষত 'মনুস্মৃতি' প্রভৃতি আইনগ্রন্থে—বেদনিন্দক নাস্তিক, পাষণ্ড প্রভৃতির বিরুদ্ধে

৭৭। Muir in JRAS-1862, 311; cf. Muir OST iii, 151.

৭৮। ঋগ্বেদ ৮।১০০।৩; অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত।

৭৯। নিরুক্ত ১।১৫। Muir in JRAS-1862, 311; cf, Muir OST ii. 180 ff; Macdonell & Keith VI i, 191.

৮০। Muir in JRAS-1862. 311.

৮১। *Ib.* 308. কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনে জাবালি বলেন, "আমি আসলে নাস্তিক নই—সময় বুঝে নাস্তিক হই, আবার সময় বুঝে আস্তিক হই।" ('রামায়ণ', অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯।৩৮-৯।) অতএব তাঁকে লোকায়তিক মনে করার কোন কারণ নেই।

কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই উপদিষ্ট হয়েছিল।[৮২] তাই স্বীকার করতে হবে, চিন্তাস্বাধীনতার প্রতি সুপ্রাচীন সহিষ্ণুতার কালক্রমে অবসান ঘটে। মুয়ার প্রশ্ন তুলেছেন, এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা কী? উত্তরে তিনি অনুমান করেছেন, পরবর্তীকালে নাস্তিকদের নাস্তিক্যবাহুল্যে আস্তিকেরা বিশেষ শঙ্কিত বোধ করেন। ফলে আস্তিকদের উৎসাহে প্রবর্তিত হয় প্রবল শ্রুতিশাসন।[৮৩]

৯ ॥ দাসগুপ্ত : লোকায়ত ও অসুর-মত

ঋগ্বেদের নেম ঋষি ইন্দ্রের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, কৌৎস সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বেদের আত্মসংলগ্নতায়। মুয়ার-এর মতে এগুলি বৈদিক যুগের চিন্তা-স্বাধীনতার বা নাস্তিকতার পরিচায়ক হলেও এবং নাস্তিকতা বা শ্রুতিবিমুখতাই লোকায়ত-মতের মূল লক্ষণ হলেও—তিনি অবশ্য নেম বা কৌৎসকে লোকায়তপন্থী বলেননি। অর্থাৎ, তিনি অন্তত সরাসরিভাবে দাবি করেননি যে লোকায়ত-মত বেদের মতোই প্রাচীন। কিন্তু আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে এজাতীয় দাবির অভাব নেই। দাসগুপ্ত[৮৪] বলেছেন, "আমরা বুঝতে পারি যে লোকায়ত-মত অত্যন্ত প্রাচীন,—সম্ভবত বেদের মতোই প্রাচীন, কিংবা হয়ত প্রাচীনতর; কেননা, আর্য-পূর্ব যুগে সুমেরবাসীদের মধ্যে এই মত প্রচলিত ছিল।"

অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে প্রতীত হতে বাধ্য, বিশেষত স্বয়ং দাসগুপ্তও যখন দাবি করেননি যে সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্বে লোকায়ত-মতের কোন রকম সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক হিসাবে দাসগুপ্তর প্রতিষ্ঠার কথাও মনে রাখা দরকার; মনে রাখা দরকার, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভারতীয় সাহিত্যে সংরক্ষিত লোকায়ত-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত তথ্যই পর্যালোচনা করার প্রস্তাব করেছেন। অতএব তাঁর এই উক্তিটি সহজে সমালোচনা করা বা প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে বোঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন, কেন তিনি এ-জাতীয় আপাত-আশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন।

দাসগুপ্ত-রচিত 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২২-এ; তৃতীয় খণ্ডর প্রকাশকাল ১৯৫২। এই দীর্ঘ তিরিশ বছরের ব্যবধান উল্লেযোগ্য—বিশেষত এই কারণে যে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি লোকায়ত-সংক্রান্ত আলোচনার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করেননি, বৌদ্ধ ধর্মর অভ্যুত্থানের পটভূমি হিসাবে মূলত মাধবাচার্য-বর্ণিত

৮২। *Ib.* 309.

৮৩। *Ib.* 311.

৮৪। Dasgupta HIP iii. 531

চার্বাক-মতের সংক্ষিপ্তসারমাত্রই উল্লেখ করেছেন।[৮৫] স্পষ্টই বোঝা যায়, পরে তাঁর নিজের কাছেই এই আলোচনা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলে প্রতীত হয়েছে; কেননা, গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের শেষে "প্রথম খণ্ডর পরিশিষ্ট" হিসাবে তিনি "লোকায়ত, নাস্তিক এবং চার্বাক" সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনা সংযোজিত করেন।[৮৬] এবং এই পরিশিষ্টটিতেই তিনি ভারতীয় সাহিত্যে সংরক্ষিত লোকায়ত-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত তথ্য পর্যালোচনার প্রয়াস করেছেন—সে-প্রয়াস বস্তুত তাঁর মতো বিদ্বানের পক্ষেই সম্ভব।

উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকেই অনুমান হয়, মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনা দাসগুপ্তর কাছে প্রাথমিক ভাবে সন্তোষজনক বলে প্রতীত হলেও তুলনায় পরবর্তীকালে লোকায়ত-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যর উপর গুরুত্ব আরোপণের ফলে তিনি আর এই বর্ণনাটির উপরই নির্ভর করতে পারেননি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি মাধবাচার্যর বর্ণনাটি সমালোচনা-মূলকভাবে বর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে, পরবর্তী আলোচনাতেও তিনি এই বর্ণনা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থেকেছিলেন—অর্থাৎ লোকায়ত বলতে মূলতই মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শনটির কথাই মনে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়ে উপনিষদ্, বৌদ্ধশাস্ত্র, জৈনশাস্ত্র প্রভৃতিতে শুধুমাত্র লোকায়ত নামই নয়, তাছাড়াও কোন একরকম সুস্পষ্ট বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও উল্লেখ বর্তমান। অথচ এ-জাতীয় গ্রন্থাবলী এমনই এক সুপ্রাচীন যুগের পরিচায়ক যখন পরবর্তীকালের উন্নততর দার্শনিক বিচার তো দূরের কথা—এমনকি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূত্রগ্রন্থগুলি রচিত হবার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে লোকায়ত-মতের বর্ণনায় (বিশেষত লোকায়তিকদের অনুমান-খণ্ডন প্রসঙ্গে) মাধবাচার্য অত্যন্ত পরবর্তীকালের দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবেই বিশেষ পরবর্তীকালের দার্শনিক বিচারেরও অবতারণা করেছেন। এ-হেন পরিস্থিতিতে লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যর ব্যাখ্যায় আধুনিক বিদ্বানের পক্ষে দুটি স্বতন্ত্র পথ অনুসরণের সম্ভাবনা বর্তমান। হয় অনুমান করা প্রয়োজন যে মাধবের বর্ণনাটিই অল্পবিস্তর অবাস্তব; না হয় অনুমান করা প্রয়োজন যে লোকায়তর কোন এক আদিম বা আদি সংস্করণ কালক্রমে বা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশ উত্তীর্ণ হয়ে মাধবাচার্য-বর্ণিত লোকায়ত মতে পরিণত হয়েছিল। দাসগুপ্ত মোটের উপর দ্বিতীয় পথটিই অনুসরণ করেছেন।

৮৫। *Ib.* i. 78-9, অবশ্যই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রথম খণ্ডের এই আলোচনায় মাধবাচার্যর বর্ণনা ছাড়াও তিনি মাত্র দু'জন লেখকের উক্তি গ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন। যথাঃ গুণরত্ন-কে অনুসরণ করে তিনি বলছেন, "চর্ব" শব্দ থেকে চার্বাক নামের উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত, জয়ন্তভট্টর উক্তির উপর নির্ভর করে তিনি "ধূর্ত" এবং "সুশিক্ষিত" নামের চার্বাকদের দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় কল্পনা করেছেন। অবশ্য এজাতীয় কল্পনার গুরুত্ব আমরা পরে বিচার করব।

৮৬। *Ib.* iii. 512-550.

অতএব লোকায়তর আদিরূপটি সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এমন কোন-এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধান করেছেন যার পক্ষে কালক্রমে মাধবাচার্য-বর্ণিত-বস্তুবাদী দর্শনে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল।

দাসগুপ্ত[৮৭] মনে করেন, 'সূত্র-কৃতাঙ্গ-সূত্র' নামের জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,' 'কঠ উপনিষদ্' এবং 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এ লোকায়তমতের এজাতীয় আদি বা আদিম সংস্করণের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে তিনি অবশ্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপণ করেছেন 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-বর্ণিত "প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ"-এর[৮৮] উপর। এখানে তার উল্লেখ করা যাক:

একদা প্রজাপতি বলেছিলেন, "যে-আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অসনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত,—যে-আত্মা সত্যকাম ও সত্যকল্প—তারই অনুসন্ধান করতে হবে, তাকেই বিশেষরূপে জানতে হবে। যিনি তাকে অনুসন্ধান করে অবগত হন তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন।" দেব ও অসুরগণ উভয়েই লোকপরম্পরায় একথা শুনেছিলেন। তাঁরা বললেন, "যে আত্মাকে অন্বেষণ করলে সর্বলোক ও সর্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায় আমরা তারই অন্বেষণ করব।" দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন পরস্পরকে না জানিয়ে এবং সমিৎপাণি হয়ে প্রজাপতির কাছে গেলেন। তাঁরা উভয়েই বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করে বাস করলেন। তারপর প্রজাপতি তাঁদের প্রশ্ন করলেন, "কী ইচ্ছা করে তোমরা দু'জন বাস করলে?" তাঁরা বললেন, "ভগবানের বাক্য বলেই শুনেছি,—যে-আত্মা পাপরহিত, ইত্যাদি, সেই আত্মাকে যিনি জানেন তিনি সর্বলোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন। আমরা দুজনে সেই আত্মাকে জানবার ইচ্ছা করে বাস করেছি।"

প্রজাপতি সেই দুজনকে বললেন, "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন ইনিই আত্মা"। তিনি আরো বললেন, "ইনিই অমৃত অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম"। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "হে ভগবন, এই যে-পুরুষ জলে দৃষ্ট হয় আর এই যে-পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়—এ কে?" প্রজাপতি বললেন, "এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।"

প্রজাপতি তাঁদের বললেন, "জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (নিজেকে) দেখ; দেখে আত্মার বিষয় যা বুঝবে না তা আমাকে বোলো।" জলপূর্ণ পাত্রে তাঁরা নিজেদের দেখলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী দেখলে?" তাঁরা বললেন, "হে ভগবন, আমরা এই আত্মার সবই দেখলাম—লোম থেকে নখ পর্যন্ত প্রতিরূপ দর্শন করলাম।"

প্রজাপতি তাঁদের বললেন, "সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, সুবসন পরিধান করে, পরিষ্কৃত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে (নিজেদের) দর্শন কর।" তাঁরা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, সুবসন পরিধান করে এবং পরিষ্কৃত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে (নিজেদের) দর্শন করলেন। প্রজাপতি প্রশ্ন করলেন, "কী দেখলে?" তাঁরা বললেন, "হে ভগবন, এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত,—হে ভগবন, তেমনি জলের মধ্যে এই দুজন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত

৮৭। *Ib*. iii, 528.

৮৮। 'ছান্দোগ্য' ৮।৭-৮॥

এবং পরিষ্কৃত।" প্রজাপতি বললেন, "ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত ও অভয়- ইনিই ব্রহ্ম।"

অনন্তর দুজন শান্তহৃদয়ে চলে গেলেন।

তাঁদের চলে যেতে দেখে প্রজাপতি মনে মনে বললেন, "(এরা) আত্মাকে উপলব্ধি না করেই, আত্মাকে অবগত না হয়েই চলে গেল। এদের মধ্যে যে একেই উপনিষদ্ (গুহ্যজ্ঞান) বলে গ্রহণ করবে, সে দেবতাই হোক আর অসুরই হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হবে।"

বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরদের কাছে গমন করলেন এবং তাঁদের এই উপনিষদ্ শিক্ষা দিলেন: "পৃথিবীতে এই আত্মারই (অর্থাৎ দেহরই) পূজা করবে এবং এই আত্মারই সেবা করবে। এই আত্মার পূজা করলে এবং এই আত্মার সেবা করলে এই লোক এবং ওই লোক, উভয় লোকই প্রাপ্ত হয়।" এই কারণে আজও দানবিহীন, শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞবিহীনকে অসুর বলা হয়। এই হল অসুরগণের উপনিষদ্। তারা প্রেতের (মৃত ব্যক্তির) শরীর গন্ধমাল্য ও অন্নাদির দ্বারা বিভূষিত করে, মনে করে এই উপায়েই ওই লোক জয় করবে।

উপনিষদের উপাখ্যানটি অবশ্য এইখানেই পরিসমাপ্ত নয়। কেননা, অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন উপরোক্ত দেহাত্মবোধেই সন্তুষ্ট থাকলেও এবং উপরোক্ত দেহাত্মবোধই অসুরদের মধ্যে গুহ্যজ্ঞান বা উপনিষদ্ বলে স্বীকৃত হলেও 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এ এর পরেই বলা হয়েছে, দেবগণের প্রতিনিধি ইন্দ্র দেবগণের কাছে প্রত্যাবর্তনের আগেই হৃদয়ঙ্গম করলেন, উক্ত দেহাত্মবোধ অমঙ্গলজনক। অতএব তিনি প্রজাপতির কাছে ফিরে গেলেন এবং প্রজাপতি তাঁকে আত্মা-সংক্রান্ত চরম-ভাববাদী জ্ঞানেই দীক্ষিত করলেন। কিন্তু উপাখ্যানটির এই অংশ আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, দাসগুপ্ত উপরোদ্ধৃত অংশর উপর নির্ভর করেই প্রাচীন সুমেরবাসীদের মধ্যে লোকায়তর উৎস-সংক্রান্ত মতবাদে উপনীত হয়েছেন। কীভাবে তাই দেখা যাক।

উপাখ্যানটির প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্যর প্রতি দাসগুপ্ত বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত, এখানে সুপষ্টভাবেই একরকম দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উল্লিখিত হয়েছে এবং লোকায়তিক বস্তুবাদেরও মূল কথা হল দেহাত্মবাদই। অতএব স্বীকার করতে হবে, উপরোক্ত উপাখ্যানটিতে লোকায়ত-মতের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই দেহাত্মবাদকে সুস্পষ্টভাবেই অসুরদের উপনিষদ্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে: "অসুরাণাং হি এষা উপনিষদ্।" অর্থাৎ এই দেহাত্মবাদ বেদপন্থী বা "আর্যদের" মতবাদ নয়; তার পরিবর্তে "অসুর" নামে উল্লিখিত ও নিন্দিত অন্য কোন জাতির মধ্যে এ-মতবাদ প্রচলিত ছিল। তৃতীয়ত, অসুরদের এই উপনিষদ্-এর সঙ্গে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই কোন একরকম মৃতসংকার পদ্ধতিকেও সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে: "প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া

বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।"[৮৯] অতএব এই প্রসঙ্গে দাসগুপ্তর কাছে প্রধানতম প্রশ্ন হয়েছে: "অসুর" নামে এখানে আর্যেতর এমন কোন জাতি উল্লিখিত হতে পারে যাদেয় মধ্যে আলোচ্য অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি এবং তারই অন্তর্নিহিত আলোচ্য বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়? উত্তরে তিনি মনে করেছেন, সুপ্রাচীন সুমেরবাসীরাই এখানে "অসুর" নামে উল্লিখিত; অতএব লোকায়ত-মতের আদি বা আদিম রূপটি সুপ্রাচীন সুমেরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বলেই অনুমেয়। তবুও একটি সমস্যা থাকে। উপনিষদের উপাখ্যানে অসুরদের অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতির সঙ্গে কোন একরকম অপর লোকে (পরলোকে?) বিশ্বাসের সম্পর্ক দেখা যায়: মৃতের শরীর বসন-অলঙ্কারে বিভূষিত করে তারা কল্পনা করে এই উপায়েই ওই লোক ("অমুং লোকম") জয় করা যাবে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন সুমেরীয় দেহাত্মবাদের সঙ্গে পরলোকে বিশ্বাসও সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে লোকায়ত মতের যে-পরিচয় পাই তার একটি প্রধান কথা হল, "পরলোকীর অভাবে পরলোকের অভাব"—পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ। অতএব দাসগুপ্ত অনুমান করেছেন, সুপ্রাচীন সুমেরীয় দেহাত্মবাদ বা লোকায়ত মত ভারতে আসার পর এই মতবাদ থেকে পরলোকে বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়। এবং তার কারণ হল এদেশে প্রচলিত অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতি বা শবদাহ-পদ্ধতি: দেহই আত্মা, অতএব দেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও শেষ হয়, তাই পরলোকেরও প্রশ্ন ওঠে না। দাসগুপ্ত[৯০] বলছেন,

"ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এর এই অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীত হয়। এর থেকে দেখা যায়, "অসুর" নামে উল্লিখিত কোন এক আর্যেতর জাতি বর্তমান ছিল, তারা শবদেহকে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত করতো এবং তার সঙ্গে খাদ্যবস্তুও দিয়ে দিতো, যাতে মৃতদেহগুলির পুনরুজ্জীবনের পর ওই খাদ্য, বসন ও অলঙ্কারের সাহায্যে পরলোকে তাদের সমৃদ্ধি সাধিত হয়; এবং এদেরই ধারণা ছিল যে দেহই আত্মা। পরবর্তীকালের লোকায়তিক বা চার্বাকদের মতেও দেহই আত্মা; কিন্তু তাদের সঙ্গে 'ছান্দোগ্য'-এ উল্লিখিত দেহাত্মবাদীদের পার্থক্য এই যে সেই প্রাচীন দেহাত্মবাদীরা "অন্য লোক"-এ বিশ্বাসী ছিল—সেই অন্য লোকেই শবদেহগুলি মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়ে তাদের যে বসন, অলঙ্কার ও খাদ্য দেওয়া হয় সেই বসন, অলঙ্কার ও খাদ্যের সাহায্যে সমৃদ্ধ হবে। এই প্রথাটিকে অসুরদের প্রথা বলা হয়েছে। অতএব মনে হয়, সম্ভবত প্রাচীনতর সুমেরীয় সভ্যতায় তদানীন্তন প্রচলিত শবদেহ বিভূষিত করার প্রথায় এবং মৃত্যুর পরেও শারীরিক অস্তিত্বের বিশ্বাসেই লোকায়ত-মতের সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মতটিতে এমনই পরিবর্তন দেখা দেয় যে তর্ক তুলে বলা হয়: যেহেতু আত্মা ও দেহ অভিন্ন এবং যেহেতু মৃত্যুর

৮৯। শঙ্করাচার্য এখানে 'ভিক্ষয়া' শব্দর অর্থ করেছেন, "গন্ধমাল্য, অন্নাদি দ্বারা"। দাসগুপ্তও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন।

৯০। Dasgupta HIP iii. 528-9.

পর দেহ ভস্মীভূত হয় সেইহেতু মৃত্যু-উত্তীর্ণ কোন সত্তা সম্ভব নয়, অতএব মৃত্যু-পরবর্তী কোন "লোকও" সম্ভব নয়।

প্রাচীন সুমেরিয়ায় লোকায়তর সূত্রপাত সংক্রান্ত এই মতবাদটি গ্রহণ করতে হলে অন্তত দুটি কথা স্বীকার করা প্রয়োজন। এক: উপনিষদের আলোচ্য অংশে—তথা বৈদিক সাহিত্যে—"অসুর" শব্দ দ্বারা সুপ্রাচীন সুমেরবাসীরাই উল্লিখিত হয়েছে। দুই: সুমেরবাসীদের মধ্যেই আলোচ্য অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। আমরা পরে দেখবো, উভয় স্বীকৃতিই বাস্তব-বিরুদ্ধ বলে প্রতীত হয়। অতএব দাসগুপ্তর আলোচ্য সিদ্ধান্তটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে লোকায়ত-প্রসঙ্গে দাসগুপ্তর আলোচনাটিই গুরুত্বহীন। বস্তুত তার বিপরীতই। প্রথমত, আগেই বলেছি, লোকায়ত-সংক্রান্ত অধুনালভ্য প্রায় যাবতীয় তথ্য তিনি যে-ভাবে সংকলন ও পর্যালোচনা করেছেন তা শুধুমাত্র তাঁর সমকক্ষ বিদ্বানের পক্ষেই সম্ভব, এবং এবিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে অন্তত ভারতীয় দার্শনিক রচনাবলীতে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ বিদ্বান একান্তই দুর্লভ। কিন্তু শুধু তথ্য সংকলনই নয়, লোকায়ত-মতের ব্যাখ্যায় তিনি যে-বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাও সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এবিষয়ে বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই লোকায়ত বারবার অসুর-মত হিসাবে উল্লিখিত বা নিন্দিত হয়েছে। অতএব, আধুনিক কালে লোকায়ত-মতের সুস্পষ্ট পরিচিতি-লাভের পক্ষে একটি প্রশ্নকে কিছুতেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না: অসুর বলতে—বিশেষত অসুর-মত বলতে—প্রাচীনেরা ঠিক কী বুঝে-ছিলেন? আমরা পরে দেখবো, অসুর-মত বলতে তাঁরা অবধারিতভাবেই কোন একরকম দেহতত্ত্ব বা দেহবাদ বা দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু এই দেহবাদ এবং মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শন সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। এই কারণে আধুনিক কালে প্রাচীন লোকায়ত-মতের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মাধবাচার্যর বর্ণনাটির প্রভাবমুক্তি বিশেষ প্রয়োজন। দাসগুপ্ত কিন্তু মাধবাচার্যর বর্ণনাটিকে সমালোচনা করার পরিবর্তে এইটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সুদীর্ঘভাবেই তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।[৯১] ফলে তিনি কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন, সুপ্রাচীন কালে "অসুর-মত" নামে নিন্দিত মতবাদটিই কালক্রমে মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শনে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা পরে দেখবো, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অসুর-মতনামে নিন্দিত মতবাদটির বাস্তব ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবে

৯১। *Ib* iii. 533 ff.

মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শনটির পরিবর্তে অপর একটি দার্শনিক মতই অনুমিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু এই আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে লোকায়ত-সংক্রান্ত আধুনিক বিদ্বানদের অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে—অর্থাৎ, লোকায়ত-প্রসঙ্গে বিবিধ ও বিচিত্র মতবাদ প্রচলিত আছে বলেই,—এগুলিকে উপেক্ষা করে লোকায়তর আলোচনা সম্ভব নয়।

১০ ॥ তুচ্চির মত

তুচ্চি ভারতীয় বস্তুবাদের একটি ইতিহাস[৯২] রচনা করেছেন। গ্রন্থটি ইতালীয় ভাষায় রচিত বলেই তিনি ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার্থে এই গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্তসার হিসাবে একটি ইংরেজী প্রবন্ধও[৯৩] রচনা করেন স্বভাবতই ইতালীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ আমাদের পক্ষে এই ইংরেজী প্রবন্ধটিই অনুসরণ করা সম্ভব।

তুচ্চি বলছেন, লোকায়তিকদের কোন রচনা পাওয়া যায়নি বলেই সিদ্ধান্ত হয় না যে লোকায়তিকদের কোন রচনা কোন কালেই বর্তমান ছিল না। কেননা, লোকায়ত-মতে-গ্রন্থকর্তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া, ঐতিহ্য অনুসারে এ-মত বৃহস্পতি-প্রবর্তিত এবং এই মতের সূত্রগ্রন্থ বৃহস্পতি-প্রণীত; ঐতিহ্যটিকে অগ্রাহ্য করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটি প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থকদের পক্ষে তাঁদের স্বর্গীয় প্রতিনিধি (সুরগুরু) বৃহস্পতিকে এই নাস্তিক্য-মত প্রবর্তনের এবং এ-মতের সূত্রগ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার উৎসাহই স্বাভাবিক; কিন্তু সে-জাতীয় কোন প্রয়াসেরই পরিচয় কেন পাওয়া যায় না?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে তুচ্চি অপেক্ষাকৃত জটিল অপর একটি সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেছেন। যে-সব গ্রন্থে বার্হস্পত্য-মতের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও উদ্ধৃতিগুলিতে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়; অতএব অনুমান হয় অধুনালুপ্ত কোন গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। সে-গ্রন্থ কোন্ সম্প্রদায়ের হওয়া সম্ভব? তুচ্চির মতে, সমস্যাটি সহজ নয়, কেননা নানা মতের নানা সম্প্রদায় 'বস্তুবাদ' আখ্যা পেতে পারে, ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ নানা নামেই উল্লিখিত হয়েছে—'নাস্তিক', 'চার্বাক', 'লোকায়ত', 'বার্হস্পত্য', 'স্বাভাবিক,' 'ভূতবাদী', 'ইচ্ছাস্তিক' ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এজাতীয় নানা

৯২। *Linnee di una stovia del materialismo, indiano* in memorie della R. Accademia del Lincei, Ser V, Vol. xvii, fasc. vii, 1924, (part i).

৯৩। G. Tucci, *A Sketch of Indian Materialism*, in PIPC-1925, 34ff.

নাম প্রতিশব্দ মাত্রে পরিণত হলেও প্রাচীনকালে তা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও তুচ্চি মনে করেন, উক্ত নামে উল্লিখিত নানা মত "কয়েকটি মূলসূত্রের কোন এক সাধারণ ভাণ্ডার" থেকে আহৃত হওয়াই স্বাভাবিক এবং সম্ভবত এই কারণেই মতগুলি সাধারণভাবে "নাস্তিক" পদবাচ্য হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ব্যবহৃত এই নাস্তিক শব্দের তাৎপর্য ঠিক কী? কোন্ নির্দ্দিষ্ট বিষয় অস্বীকার করার ফলে এই জাতীয় মতবাদগুলি সাধারণভাবে নাস্তিক পদবাচ্য হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে নানা সম্ভাবনা বিচার করে তুচ্চি সিদ্ধান্ত করছেন, নাস্তিক্যের মূল লক্ষণ ছিল কর্মবাদের অস্বীকৃতি—পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায়, "নত্থি সুকতদুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো",—সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল বা পরিণাম বলে কিছু নেই। তুচ্চির মতে এই হল ভারতীয় বস্তুবাদের মূল কথা। কেননা, কর্মফল বলে যদি কিছু না-থাকে তাহলে আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্বও স্বীকার্য হতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষের বিষয়ই একমাত্র সত্য, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু, তুচ্চি বলছেন, তার মানে এই নয় যে প্রাচীন ভারতে লোকায়তিকেরাই নিসর্গ ও নৈসর্গিক নিয়মের সন্ধানেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই অর্থে তাঁরাই ছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃৎ। কেননা, সংস্কৃতে নিসর্গ বা *nature* অর্থে 'লোক' শব্দ ব্যবহৃত নয়; তার জন্য সাধারণত 'প্রধান,' 'প্রকৃতি' বা 'স্বভাব' শব্দই ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে, 'লোকযাত্রা', 'লোকোক্তি', 'লোকবাদ', 'দেবলোক' প্রভৃতি শব্দের সাক্ষ্য থেকে তিনি অনুমান করতে চেয়েছেন যে লোকায়তের আদি উদ্দেশ্য ছিল লোকযাত্রা বা লোকাচারের আলোচনাই। অর্থাৎ, লোকায়ত আদিতে ছিল 'নীতি' (বা দণ্ডনীতি) এবং অর্থশাস্ত্রেরই পথিকৃৎ। অর্থাৎ, তুচ্চির মতে, লোকায়তের আদিরূপ বলতে ক্ষাত্রবিদ্যা, এবং এই অর্থেই পুরোহিত শ্রেণীর প্রজ্ঞা। তখনো অবশ্যই লোকায়তের সঙ্গে আস্তিক-মতের সংঘর্ষ দেখা দেয়নি; কেননা স্বর্গে যেমন বৃহস্পতি ছিলেন ইন্দ্রের সহায়ক মর্ত্যেও তেমনি পুরোহিতেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়দের বা রাজাদের সহায়ক। অতএব কিছুদিন ধরে পুরোহিতদের পুরুষার্থ "ধর্ম" এবং ক্ষত্রিয়ের পুরুষার্থ "অর্থ"—এই দুইএর মধ্যে সংহতি বর্তমান ছিল। কিন্তু কূট রাজনীতির সঙ্গে ধর্মমূলক পবিত্রতার সহাবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না; অর্থ ও ধর্মের মধ্যে প্রাচীনকালেই সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়। কালক্রমে রাজনীতির সমর্থকদের মধ্যে নিশ্চয়ই এই মনোভাবই প্রবল হয় যে লোকযাত্রা পরিচালনার ব্যাপারে পুরোহিত ও ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, এবং এইভাবে "অর্থ" নামের পুরুষার্থ "ধর্ম"র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর পরবর্তী কাল থেকে দণ্ডনীতির ঐতিহ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়, বা দণ্ডনীতির দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় দেখা দেয়। আস্তিক স্বীকৃত সম্প্রদায়টির মতে অর্থ ধর্মেরই অনুগত হয়ে থাকে; এই সম্প্রদায়

থেকেই ধর্মশাস্ত্রগুলির উদ্ভব হয়। অপর পক্ষে, নাস্তিকদের সম্প্রদায়টিতে শুধুমাত্র অর্থ এবং কামই পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হয়, অস্বীকৃত হয় ঈশ্বর ও কর্মফল; এবং কালক্রমে এই সম্প্রদায়টিই বিভিন্ন বস্তুবাদী ও সুখবাদী উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এজাতীয় নাস্তিকদের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে আস্তিকেরা দাবি করেন, কর্মফল না-মানলে জগতে পরিদৃষ্ট বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। উত্তরে নাস্তিকেরা স্বভাববাদের নজির দেখান—বলেন, জগৎবৈচিত্র্য স্বভাবেরই ফল। তাছাড়া, প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নাস্তিকেরা নানা রকম জটিল যুক্তি-তর্কেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এইভাবেই শেষ পর্যন্ত উদ্ভব হয় চরম বস্তুবাদী ও প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের—'সর্বদর্শনসংগ্রহ', 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়' প্রভৃতি গ্রন্থে তারই নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় তুচ্চির যুক্তি ও নজিরগুলি সর্বত্রই সমান সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া, পুরুষার্থ হিসাবে ধর্ম ও অর্থের মধ্যে তিনি যেভাবে একদা সহাবস্থান ও পরবর্তী সংঘর্ষের ইতিহাস অনুমান করেছেন তার সমর্থনেও কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেননি। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে রচিত সুবিশাল ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসেও এজাতীয় কোন ঘটনার কোন রকম আভাস ও ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তুচ্চি-প্রস্তাবিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু আপাতত তাঁর যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমালোচনা করার পরিবর্তে সংক্ষেপে তাঁর সিদ্ধান্তটি বিচার করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে লোকায়ত-সংক্রান্ত প্রাচীনতর তথ্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপণের আয়োজন করেছেন বলেই তুচ্চির পক্ষে লোকায়তর আদিরূপ বলতে মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শনটি—বা পরবর্তীকালের অর্থে কোন রকম দার্শনিক মতবাদই—বোঝা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে লোকযাত্রা, লোকোক্তি প্রভৃতি শব্দের সাক্ষ্য থেকে তিনি অনুমান করেছেন, লোকায়ত বলতে লোকাচার-সংক্রান্ত কোন শাস্ত্রই বোঝানো সম্ভব—সে-শাস্ত্রেরই পরবর্তী সংস্করণ নীতি, দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র। এই অর্থে লোকায়ত ছিল ক্ষত্রবিদ্যা; এবং তখনো পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরাই রাজা বা ক্ষত্রিয়দের উপদেশক ছিলেন বলেই লোকায়ত বলতে পুরোহিতদের প্রজ্ঞাও বোঝাতো। এই যুগটিতে, তুচ্চির মতে ধর্ম ও অর্থের মধ্যে কোন সংঘাত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে, অর্থ যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধর্মের বিরুদ্ধে। ফলে সুপ্রাচীন দণ্ডনীতির ঐতিহ্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়—আস্তিক পথানুগামীরা রচনা করেন পরবর্তী কালের ধর্মশাস্ত্র, নাস্তিক পথানুগামীরা শুধু অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেন। নাস্তিকপক্ষ থেকে কর্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ প্রয়াস হয়; কর্মবাদ

বর্জন করেও জগৎ-বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁরা স্বভাববাদের অনুগামী হন। ফলে তাঁরা অস্বীকার করেন ঈশ্বর, পরলোক—প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সমস্ত কিছুই। অতএব তাঁদের পক্ষে যুক্তিমূলকভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় যে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা নানা রকম যুক্তি-বিদ্যামূলক বিচারের অবতারণাও করেন। এবং এইভাবেই লোকায়ত শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় মাধবাচার্য-বর্ণিত অনুমানবিরোধী, বস্তুবাদী ও চরম ভোগসর্বস্ব দর্শনটিতে।

বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য উপেক্ষা করে ইতিহাস-রচনার যে-ক'টি মূল বৈশিষ্ট্য তুচ্চির এই আলোচনায় তার প্রায় সবকয়টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম প্রশ্ন হল; লোকায়ত বলতে বাস্তবিকই কি দণ্ডনীতির বা অর্থশাস্ত্রর কোন আদি-সংস্করণ—এবং এই অর্থে ক্ষাত্রবিদ্যা—বোঝাত? মনে রাখা দরকায়, এ-প্রশ্ন ঐতিহাসিক ঘটনা-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারেই তার উত্তর পাওয়া সম্ভব। অতএব দেখা যাক, এ-বিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলতে ঠিক কী? তুচ্চি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে লোকায়ত নামটির প্রাচীনতম উল্লেখ পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেই সংরক্ষিত হয়েছে এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-তেও নামটি সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। অতএব, আদিতে লোকায়ত বলতে যদি কোন অর্থে দণ্ডনীতি বা ক্ষাত্রবিদ্যাই বোঝাতো তাহলে লোকায়ত-সংক্রান্ত এজাতীয় প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্তত সে-অর্থের কোন আভাস প্রত্যাশা করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে পালি 'ত্রিপিটক'-এ বা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এর কোথাও এজাতীয় কোন আভাসও পাওয়া যায় না। আমরা একটু পরে—লোকায়ত-সংক্রান্ত রিস্ ডেভিড্‌স-এর মতবাদটির আলোচনা প্রসঙ্গে—প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রর নজিরগুলি আলোচনা করবো[৯৪] এবং সুস্পষ্টভাবেই দেখবো এই নজিরগুলিতে ক্ষাত্রবিদ্যার কোন রকম ইঙ্গিত আবিষ্কার করাও বিশেষ কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ[৯৫] সাংখ্য ও যোগের সমগোত্রীয় হিসাবেই এবং "আন্বীক্ষিকী" হিসাবেই লোকায়ত নামটি উল্লিখিত হয়েছে। আন্বীক্ষিকীর তাৎপর্য যাই হোক না কেন, কোন অর্থেই তা ক্ষাত্রবিদ্যার বা শাসনবিদ্যার আদিসংস্করণ হওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখা দরকার, কৌটিল্য[৯৬] সুস্পষ্ট-ভাবেই চারটি স্বতন্ত্র বিদ্যার উল্লেখ করেছেন: আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। "ত্রয়ী" মানে তিনটি বেদ—ঋক্, সাম ও যজুঃ। "বার্তা"

৯৪। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে রিস্ ডেভিড্‌স্ অনেকদিন পূর্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে লোকায়ত-সংক্রান্ত যে-নজিরগুলি সংকলিত করেছিলেন তুচ্চি মোটের উপর সেইগুলির উপরই নির্ভর করেছেন—Dasgupta HIP iii. 512n. দ্রষ্টব্য।

৯৫। 'অর্থশাস্ত্র' ১।২।

৯৬। 'অর্থশাস্ত্র' ১।১।

মানে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বিদ্যা—সেকালের *economics*। "দণ্ডনীতি" মানে রাজ্যশাসন-বিদ্যা—সেকালের *politics*। আন্বীক্ষিকী মানে কী? জ্যাকবির[৯৭] মতে দর্শন বা *philosophy*। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করলে স্বীকার করা প্রয়োজন যে কৌটিল্য শুধুমাত্র সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তকেই প্রকৃত দার্শনিক মতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সম্প্রদায়ান্তরের প্রতিনিধিদের পক্ষে তা স্বীকার করা স্বভাবতই অস্বস্তিকর। অতএব তাঁরা কৌটিল্যর মন্তব্যটির ব্যাখ্যান্তর প্রস্তাব করেছেন। যেমন, আধুনিক কালের মহানৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ[৯৮] মন্তব্য করেছেন, আন্বীক্ষিকী মানে তর্কবিদ্যা—মুখ্যত অবশ্য বেদমূলক তর্কবিদ্যাই, যদিও গৌণত বেদবিরোধী তর্কবিদ্যাও; এবং কৌটিল্যর আলোচ্য উক্তিতে "যোগ" শব্দ দ্বারা বেদমূলক তর্কবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই উল্লিখিত হয়েছে, কেননা প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্রই (বা, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ই) "যোগ" নামে পরিচিত ছিল।

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যর পক্ষে "আন্বীক্ষিকী", "যোগ" প্রভৃতি শব্দর প্রকৃত তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনার জটিলতায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তুচ্চির সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্যই পর্যাপ্ত হবে যে স্বয়ং কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী অর্থেই লোকায়তর উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতি সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র বিদ্যা। অর্থাৎ, কৌটিল্যও লোকায়ত বলতে কোন রকম ক্ষাত্রবিদ্যা, বা শাসনবিদ্যা, বা দণ্ডনীতি—বা তারই কোন রকম আদি-রূপ—বোঝেননি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, লোকায়ত-সংক্রান্ত প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির মধ্যে তুচ্চি-প্রস্তাবিত লোকায়তর প্রাচীন তাৎপর্যর আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, তিনি লোকায়তর যে-ইতিহাস রচনা করেছেন তার আদিপর্বটিই কাল্পনিক বলে প্রতীত হয়। এবং এই কারণেই সে-ইতিহাসের উত্তরপর্বগুলিরও বিস্তৃততর বিচার অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। লোকায়ত বলতে আদিতে যদি কোন রকম ক্ষাত্রবিদ্যাই না-বুঝিয়ে থাকে তাহলে সেই কাল্পনিক ক্ষাত্রবিদ্যাটি কালক্রমে কীভাবে মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী দর্শনে পরিণত হয়েছিল তার বিচার অবশ্যই বৃথা। তাছাড়া, কোন্ কালে পুরুষার্থ হিসাবে ধর্ম ও অর্থর মধ্যে বিরোধের অভাব ছিল? কোন্ কালে সূচনা হয় এই বিরোধের? কোন্ কালে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অর্থর পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন? —তুচ্চি তাঁর প্রস্তাবিত লোকায়তর ইতিহাস-প্রসঙ্গে এজাতীয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির কোন রকম উত্তরই দেননি; শুধুমাত্র কল্পনা করেছেন যে

৯৭। Jacobi in IA xlvii. 102 ff.

৯৮। 'ন্যায়পরিচয়', ভূমিকা ৩৩-৪।

কোন-না-কোন কালে এজাতীয় ঘটনাবলী নিশ্চয়ই ঘটেছিল। এই কারণে, তুচ্চি-প্রস্তাবিত লোকায়তর ইতিহাসটি বিচার করার এমনকি বাস্তব সুযোগও সত্যিই নেই। তবুও এই প্রসঙ্গে মাত্র দু একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা যেতে পারে। প্রথমত, তুচ্চির মতে যতদিন পর্যন্ত ধর্ম ও অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি ততদিন পর্যন্ত প্রাচীন ক্ষাত্রবিদ্যা অর্থে লোকায়ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হয়নি; কালক্রমে সেই ক্ষাত্রবিদ্যার নাস্তিক ধারাটি বস্তুবাদে (এবং অতএব অনিবার্যভাবেই ভোগবাদে) পরিণত হয় এবং তখন নাস্তিকপক্ষ থেকে কর্মবাদের খণ্ডনে স্বভাববাদের নজির দেখানো হয়। কিন্তু, আমরা পরে বিস্তৃতভাবেই দেখাবো, লোকায়ত সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী আজো সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলিতে (বিশেষত লোকায়ত-সংক্রান্ত প্রামাণিক লোকগাথাগুলিতে) লোকায়ত-মতের চারটি বৈশিষ্ট্য বারবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়: (১) দেহাত্মবাদ, (২) স্বভাববাদ (৩) প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ এবং (৪) পরলোক-বিলোপ-বাদ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই কোন একরকম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক—যদিও তা মাধবাচার্য-বর্ণিত বস্তুবাদী-ভোগবাদী দর্শনের পরিচায়ক না হতেও পারে। এবং উপনিষদ্‌-গ্রন্থাবলীতেই দেহাত্মবাদ ও স্বভাববাদের উল্লেখ-পূর্বক বর্জনের আয়োজন[৯৯] থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে এগুলি উত্তরকালের উদ্ভাবন মাত্র নয়। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদ ও স্বভাববাদ সুপ্রাচীন বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য। লোকায়ত-মতও বিশেষ প্রাচীন এবং একথা অনুমানেরও কোন কারণ নেই যে পরবর্তীকালে লোকায়ত-মতের সঙ্গে দেহাত্মবাদ ও স্বভাববাদ সংযোজিত হয়েছিল। অতএব তুচ্চির সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব যে লোকায়ত আদিতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ছিল না, একমাত্র পরবর্তী কালেই তা বস্তুবাদে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তুচ্চি[১০০] কল্পনা করেছেন, প্রাচীন ক্ষাত্রবিদ্যা অর্থে লোকায়তর পক্ষে বস্তুবাদ-ভোগবাদে পরিণত হবার কারণ হল, শাসন-কুটিলতা ও ধর্ম-পবিত্রতার সহাবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয় এবং এই কারণেই ক্ষাত্রবিদ্যার পক্ষে ধর্ম-পবিত্রতা বর্জন করে বস্তুবাদ-ভোগবাদে পরিণত হবার প্রবণতাই স্বাভাবিক। অবশ্যই, "লোকেষু আয়তঃ" এই অর্থে লোকায়তকে গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই তুচ্চির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়; কেননা ক্ষাত্রবিদ্যার

৯৯। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এ দেহাত্মবাদের নিদর্শন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে; উপনিষদ্‌-সাহিত্যে উল্লিখিত দেহাত্মবাদের অন্যান্য নিদর্শন পরে আলোচিত হবে। উপনিষদ্‌-এ স্বভাববাদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে 'শ্বেতাশ্বতর' ১।২ দ্রষ্টব্য।

১০০। Tucci in PIPC-1925, 41.

পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত হবার কারণ নেই। তাছাড়া, ক্ষাত্রবিদ্যার ভোগ-পরায়ণতা থেকেই কালক্রমে বস্তুবাদের উদ্ভব হয়েছিল—এ-জাতীয় কল্পনার বিরুদ্ধে উপনিষদ্-সাহিত্যেরই চিত্তাকর্ষক সাক্ষ্য বর্তমান। কেননা, যে-ভাববাদ বা ভাববাদের অঙ্কুর উপনিষদ্-সাহিত্যে চরম জ্ঞান বলে বিবেচিত তা উপনিষদ্-সাহিত্যেই শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়দের গুহ্যজ্ঞান হিসাবেই ঘোষিত হয়েছিল এবং এমনকি দাবি করা হয়েছিল যে এই গুহ্যজ্ঞানের অধিকারী হিসাবেই ক্ষত্রিয়রা শাসন-ক্ষমতারও অধিকারী। এ বিষয়ে বর্তমানে শুধুমাত্র 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর[১০১] একটি সাক্ষ্য উল্লেখ করাই পর্যাপ্ত হবে। গৌতম নামের জনৈক ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের কাছে গুহ্যজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ-প্রার্থী হয়েছিলেন; রাজা তাঁকে বললেন: "যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূৎ"—হে গোতম, আপনি আমাকে সেই যে-বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, আপনার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করেননি; এই কারণে সর্বলোকে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা প্রবর্তিত হয়েছিল। অবশ্যই উপনিষদের ভাববাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সম্পর্ক—এবং উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রির শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কও—বিস্তৃততর ভাবেই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তুচ্চি যে-ভাবে কল্পনা করেছেন যে ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণীর পক্ষে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই কোন স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার্য তার বিরুদ্ধে উপনিষদের এজাতীয় একটিমাত্র সাক্ষ্যই পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এই সাক্ষ্যটি থেকেই প্রমাণ হয় যে ভারতীয় দর্শনের সুপ্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বস্তুবাদ তো দূরের কথা—বস্তুবাদের চরম বিরোধী ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ক্ষাত্রবিদ্যার বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

অতএব তুচ্চি-প্রস্তাবিত ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসটির উপর গুরুত্ব আরোপণের সুযোগ অত্যন্ত সংকীর্ণ। এবং একথা অনুমান করাও অসংগত হবে না যে ভারতীয় বস্তুবাদের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ফলেই বস্তুবাদের এই ইতিহাসটি এমন তুচ্ছ হয়েছে। বস্তুবাদের প্রতি তাঁর এই তাচ্ছিল্যের কিঞ্চিৎ নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। আলোচনার প্রারম্ভেই[১০২] তিনি নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ভাববাদীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্তব্য করেছেন, এদের ভাববাদ ক্রোচি, জেন্টিলে প্রমুখ আধুনিক য়ুরোপীয় দার্শনিকদের ভাববাদের তুলনায় কোন অর্থেই হেয় নয় এবং একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়

১০১। 'ছান্দোগ্য' ৫।৩।৭।—উপনিষদ ভাববাদের সঙ্গে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সম্পর্ক অন্যত্র আলোচনা করেছি—Chattopadhyaya IP 85-92.

১০২। Tucci in PIPC-1925, 34-5.

যে ভাববাদই হল ভারতীয় চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য—যদিও অবশ্য ভাববাদের এই দেশে অত্যন্ত স্থূল ভোগবাদ ও কুটিল শাসনবিদ্যারও আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং আলোচনার উপসংহারে—যেন কিছু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেই তিনি বলছেন, "পরবর্তীকালে লোকায়ত-মত বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সবদেশেই যেমন মাঝেমাঝে নাস্তিক ও বস্তুবাদীর পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি ভাববাদের এই জন্মভূমিতেও কালেভদ্রে কেউকেউ লোকায়ত-মতের সমর্থন করেছেন। এবং সম্প্রদায় হিসাবে চার্বাক বিলুপ্ত হবার পরও ন্যায়শাস্ত্রকারেরা নেহাতই প্রথাগতভাবে চার্বাক-মত খণ্ডন করেছেন"।[১০৩]

১১॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত : লোকায়তিক ও কাপালিক

কিন্তু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করলেন, লোকায়ত আজো এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি—সহজিয়া প্রভৃতি নামান্তরালে লোকায়ত-মত এখনো আমাদের দেশে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে আছে।[১০৪] ভারততত্ত্ববিদ্ হিসাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মহান প্রতিভার বিস্তৃত পরিচয় অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তর তাৎপর্যগুলি বিস্তৃতভাবেই বিচারের প্রয়োজন আছে। কেননা, সিদ্ধান্তটি স্বীকারযোগ্য হলে একদিকে যেমন মাধবাচার্য প্রমুখের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল লোকায়ত সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা মৌলিক সংস্কারসাপেক্ষ হয়, অপরদিকে তেমনিই প্রয়োজন হয় সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির তত্ত্বগত ভিত্তি নূতন আলোয় বিচার করার।

প্রথমে দেখা যাক, কোন্ সাক্ষ্য ও যুক্তির উপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আমরা ইতিপূর্বে টমাস্ সম্পাদিত 'বৃহস্পতি-সূত্র'-র উল্লেখ করেছি। টমাস্ নিজে অবশ্য সূত্রগুলিকে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেননি; তাঁর মতে অনেক সূত্রই বিষয়বস্তুর বিচারে বিশেষ অর্বাচীন বলেই প্রতীত হয়। আমরা আরও দেখেছি, গ্রন্থটিতে সংকলিত সূত্রবিশেষে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে চোর, নরকগামী প্রভৃতি নানা কটূক্তি করা হয়েছে। অতএব সংকলনটি সামগ্রিকভাবে বার্হস্পত্য বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের হতে পারে না। কিন্তু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাচ্ছেন, এই গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য সূত্র অত্যন্ত প্রাচীন বলেই স্বীকৃত হতে বাধ্য এবং সূত্রবিশেষে লোকায়ত-মত বিশেষ প্রশংসিতই হয়েছে।[১০৫] অতএব লোকায়তর আলোচনায় সূত্র-

১০৩। *Ib.* 43.

১০৪। H. P. Sastri L 6.

১০৫। *Ib.* 4.

সংকলনটির সাক্ষ্য সামগ্রিকভাবে পরিত্যক্তও হতে পারে না। এই সূত্রসংকলনটি থেকেই লোকায়ত সংক্রান্ত বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব। এবং হরপ্রসাদের মতে এ-জাতীয় তথ্যর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল লোকায়তিক এবং কাপালিকদের মধ্যে কোন এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত।[১০৬] কেননা, 'বৃহস্পতি-সূত্র'-তে বলা হয়েছে, "অর্থসাধন প্রসঙ্গে লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র," এবং সেই সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়—"যেন একই নিঃশ্বাসে"—উক্ত হয়েছে, "কামসাধনার প্রসঙ্গে কাপালিকই (একমাত্র শাস্ত্র)"

> "সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে।
> কাপালিকমেব কামসাধনে॥"[১০৭]

অবশ্যই লোকায়তিক এবং কাপালিকদের মধ্যে এ-জাতীয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কর ইঙ্গিত সত্ত্বেও 'বৃহস্পতি-সূত্র'-তে সম্প্রদায় দুটি স্বতন্ত্রভাবেই উল্লিখিত। কিন্তু, হরপ্রসাদ দেখাচ্ছেন, জৈন লেখক গুণরত্ন স্পষ্টভাবেই কাপালিক ও লোকায়তকে অভিন্ন বিবেচনা করেছেন। লোকায়ত-মতের ব্যাখ্যার ভূমিকাতেই গুণরত্ন বলছেন ঃ

> প্রথমং নাস্তিকস্বরূপমুচ্যতে। কাপালিকা ভস্মোদ্ধূলনপরা যোগিনো ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্যজাতাশ্চ কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ জীবপুণ্যপাপাদিকং ন মন্যন্তে। চতুর্ভূতাত্মকং জগদাচক্ষতে। কেচিত্তু চার্বাকৈকদেশীয়া আকাশং পঞ্চমং ভূতমভিমন্যমানাঃ পঞ্চভূতাত্মকং জগদিতি নিগদন্তি। তন্মতে ভূতেভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুৎপদ্যতে। জলবুদ্বুদবজ্জীবাঃ। চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি। তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যাগমনমপি কুর্বতে। বর্ষে বর্ষে কস্মিন্নপি দিবসে সর্বে সংভূয় যথা-নামনির্গমং স্ত্রীভিরভিরমন্তে। ধর্মং কার্মাদপরং ন মন্বতে। তন্নামানি চার্বাকা লোকায়তা ইত্যাদীনি। গলচর্ব অদনে। চর্বন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতো ন মন্যতে পুণ্যপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্বাকাঃ।[১০৮]

অনুবাদ :—"প্রথমে নাস্তিকমত বলা হচ্ছে। ব্রাহ্মণাদি এবং নীচজাতীয় ভস্মলেপনকারী যোগী কাপালিদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক। তারা জীব (আত্মা), পুণ্যপাপ ইত্যাদি মানে না। তাদের মতে জগৎ চতুর্ভূতাত্মক।

১০৬। *Ib.* 5 : 'But the most important piece of information the *Brihaspati-sutras* give us is the close connection of the Lokayatikas with the Kapalikas.'

১০৭। 'বার্হস্পত্যসূত্রম্' (ed. Thomas), ২।২৫-৬।

১০৮। 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ. ৩০০।

কোন কোন চার্বাক আকাশকে পঞ্চম ভূত বলে বিবেচনা করে; তাদের মতে ভূত (বা জড়বস্তু) থেকেই মদশক্তির মতো চৈতন্য উদ্ভূত হয়। জীব জল-বুদ্‌বুদের মতোই। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ। তারা মদ্যমাংস ভোজন করে এবং এমনকি মাতা প্রভৃতি নিষিদ্ধার সঙ্গেও মিলিত হয়। প্রতি বৎসর কোন একটি দিনে তারা সকলে একত্র মিলিত হয়ে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সঙ্গম করে। কাম ছাড়া কোন ধর্ম তারা মানে না। তাদেরই নাম চার্বাক, লোকায়ত, ইত্যাদি। গল ও চর্ব শব্দের অর্থ ভক্ষণ। চর্বন করে, অর্থাৎ ভক্ষণ করে,—পুণ্য পাপ প্রভৃতি পরোক্ষ বস্তুগুলিকে তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করে না—এই কারণে তাদের নাম চার্বাক।"

লোকায়ত বা চার্বাক প্রসঙ্গে গুণরত্নর এই উক্তির তাৎপর্য অবশ্যই বিশদভাবে আলোচনীয়। আপাতত দেখা যাক, 'বৃহস্পতি-সূত্র'-র উপরোক্ত সাক্ষ্য এবং গুণরত্নর এই নাস্তিক-বর্ণনার উপর নির্ভর করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঠিক কী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে আজো লোকায়তিক ও কাপালিকদের প্রভাব বিশেষ প্রবল। আজো নানা সম্প্রদায় প্রচলিত আছে যার অনুগামীরা মনে করে, দেহই হল একমাত্র সত্য এবং যাদের মতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনই একমাত্র অনুষ্ঠান—এই মিলনের দীর্ঘস্থায়িত্বর উপরই নির্ভর করে সিদ্ধি। তারা নিজেদের বৈষ্ণব বলে: কিন্তু বিষ্ণু কৃষ্ণ বা তাঁর কোন অবতারই তারা মানে না। তারা শুধু দেহতেই বিশ্বাস করে। তাদের আর একটি নাম হল সহজিয়া—ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মহাযানের শেষ চার শতাব্দীর ইতিহাসে মহাযান থেকেই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল।"[১০৯]

সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতটি অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। আপাতত সে-বিচারে অগ্রসর না হয়ে লোকায়ত-প্রসঙ্গে উপরোক্ত সিদ্ধান্তর প্রধানতম তাৎপর্য আলোচনা করা যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্যই উল্লেখ করেছেন, ভবভূতির 'মালতীমাধব' ও কৃষ্ণমিশ্রর 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রর 'কপালকুণ্ডলা' পর্যন্ত কাব্য-নাটক-উপন্যাসে কাপালিক অত্যন্ত বীভৎসভাবেই চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র এ-জাতীয় বর্ণনাতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পক্ষান্তরে, কাপালিক ও লোকায়তিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কর—এবং এমনকি অভিন্নতার—ইঙ্গিত থেকে তিনি কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এমন কোন তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যর উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন যে-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে 'লোকায়ত-মতের প্রকৃত সংগতি সম্ভব হতে পারে। এবং এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি দেহতত্ত্ব, কায়াসাধনা, কামসাধনা (বামাচার) প্রভৃতিরই উল্লেখ

১০৯। H. P. Sastri T. 6.

করেছেন। দেহতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে আত্মা, অপবর্গ প্রভৃতি অধ ভাববাদী ধ্যানধারণায় পরিচয় নেই; এই অর্থে দেহতত্ত্ব বা দেহবাদ কোন-একরকম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।[১১০] এবং এই তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যর দিক থেকেই কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ও লোকায়তিক বলেই বিবেচিত হয়েছে।

লোকায়তর বিচারে মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রকৃতই যুগান্তকারী। কেননা, আমরা দেখবো, লোকায়ত সংক্রান্ত বহুবিধ সুপ্রাচীন—কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বা অর্থহীন—তথ্য বস্তুতপক্ষে এই সিদ্ধান্তর আলোতেই বুঝতে পারা সম্ভব। আপাতত এই সিদ্ধান্তর দুটি প্রধান তাৎপর্য উল্লেখ করা যাক। প্রথমত, লোকায়ত-মত কোন এক অর্থে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হলেও তা মাধবাচার্য-বর্ণিত ভোগবাদী-বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় সাধারণত ধর্মসম্প্রদায় বা সাধন সম্প্রদায় হিসাবে হলেও এগুলির মূল তত্ত্বগত ভিত্তি আসলে কোন এক অর্থে দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। দ্বিতীয়, তাৎপর্যটিকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করলেও স্বয়ং হরপ্রসাদ মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনার সমালোচনা করেননি; বরং অন্যান্য আধুনিক বিদ্বানদের মতোই তিনিও মাধবাচার্যর বর্ণনা থেকেই লোকায়তর আলোচনা শুরু করেছেন এবং অন্তত আলোচনার প্রথমাংশে এই বর্ণনার উপরই বিশেষ নির্ভরশীল হয়েছেন।[১১১] ফলে, তাঁর 'লোকায়ত' নামে ক্ষুদ্র কিন্তু দুর্মূল্য পুস্তিকাটির প্রথমাংশর সঙ্গে সিদ্ধান্তাংশর সুস্পষ্ট অসংগতি ঘটেছে। অর্থাৎ তথ্যান্তরের নির্দেশে লোকায়ত সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নূতন একটি ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি মাধবাচার্য প্রমুখের প্রভাবে এই ইঙ্গিতের তাৎপর্যগুলির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপণ করতে পারেননি। অতএব তাঁর সিদ্ধান্তর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিচারে প্রবিষ্ট হবার পূর্বে আমাদের পক্ষেও একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া প্রয়োজন: মাধবাচার্যর লোকায়ত বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে কতখানি নির্ভরযোগ্য?

১২॥ রিস্ ডেভিড্স্-এর মত

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে একমাত্র রিস্ ডেভিড্স্ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং উত্তরে বর্ণনাটিকে সামগ্রিকভাবে অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন: "মাধবাচার্যর বর্ণনাটি যে তাঁর স্বীয় কল্পনা-প্রসূতই

১১০। অবশ্যই দেহতত্ত্ব প্রভৃতির অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা দুর্লভ নয়; আমরা পরে তন্ত্রতত্ত্বর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাবো, এ-জাতীয় ব্যাখ্যা কেন কষ্টকল্পনারই পরিচায়ক।

১১১। H. P. Sastri L 1.

সেবিষয়ে বর্ণনাটির মধ্যেই সর্বপ্রকার সাক্ষ্য বর্তমান।[১১২] কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে শুধুমাত্র এই বর্ণনাটিই কাল্পনিক নয়; লোকায়ত নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়, সে-সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট দার্শনিক মত এবং সে-মতের ব্যাখ্যায় কোনকালে কোন পুঁথি রচিত হবার সম্ভাবনা—সবকিছুই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই যে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বিবিধ গ্রন্থে লোকায়ত নামটি উল্লিখিত হয়েছে। কোন্ অর্থে উল্লিখিত হয়েছে? উত্তরে রিস্-ডেভিড্স্ বলছেন, 'ফোক্‌লোর বা 'নেচারলোর' (folklore, nature-lore) অর্থে। অতএব, সংক্ষেপে, দার্শনিক সম্প্রদায় বা দার্শনিক মত হিসাবে লোকায়তর কোন অস্তিত্ব ছিল না; তাই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে লোকায়তর কোন বাস্তব স্থান নেই। প্রাচীনেরা 'লোকায়ত-বিদ্যা', বা 'লৌকৈতিহ্যবিদ্যা' বা 'নিসর্গ-বিদ্যা' জাতীয় কোন অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিংবা, রিস্ ডেভিড্স্ নিজেই (nature-lore) শব্দটিকে —অতএব লোকায়তকেও—যে অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন এখানে তার উদ্ধৃতিই বাঞ্ছনীয় হবে ঃ

> Wise sayings, riddles, rhymes, and theories handed down by tradition as to cosmogony, the elements, the stars, the weather, scraps of astronomy, of elementary physics, even of anatomy, and knowledge of the nature of precious stones, and of birds and beasts and plants.[১১৩]

প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, লোকায়ত শব্দটি এই অর্থে গৃহীত হলে তার কোন দার্শনিক মর্যাদা স্বীকৃত হোক আর নাই হোক, প্রাচীন লোকায়তিকেরাই ভারতীয় ইতিহাসে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত হবেন।[১১৪] কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে দুটি প্রশ্ন বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, কী নির্দেশের উপর নির্ভর করে রিস্ ডেভিড্স্ এই অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন? দ্বিতীয়ত, মাধবাচার্যর লোকায়তবর্ণনাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে ঘোষণা করলেও তিনি নিজে এই বর্ণনার প্রভাব থেকে প্রকৃতই মুক্ত কিনা।

আধুনিক কালে যে-বিদ্বানেরা প্রাচীন (বা পালি) বৌদ্ধ শাস্ত্রর সঙ্গে নূতন করে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রিস্ ডেভিড্স্ অবশ্যই অগ্রগণ্য। এই প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রর আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি

১১২। Rhys Davids DB i. 172.

১১৩। *Ib.* 171

১১৪। Tucci in PIPC-1925, 39 দ্রষ্টব্য।

লোকায়ত সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।[১১৫] স্বভাবতই তাঁর আলোচনায় প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়তর নজিরগুলিই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে—বস্তুত আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে তিনিই প্রথম লোকায়তর ব্যখ্যায় এই নজিরগুলির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের ফলেই তিনি মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনাকে কাল্পনিক বলে বিবেচনা করেছেন। কেননা, পালি 'ত্রিপিটক'-এ লোকায়ত শব্দ বহুবারই ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঠিক কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে-বিষয়ে অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা সত্ত্বেও অন্তত একথায় কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই যে তা মাধবাচার্য-বর্ণিত চরম বেদবিরোধী-অনুমানবিরোধী-ধর্মমোক্ষবিরোধী-ভোগবাদী-বস্তুবাদী দার্শনিক মত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব। প্রমাণ হিসাবে রিস্ ডেভিড্স্ নিজে যে-নজিরের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রথমে তারই পরিচয় দেখা যাক। রিস্ ডেভিড্স্ বলছেন, 'ত্রিপিটক'-এ বিদ্বান বা বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের যেন একরকম ছকে-বাঁধা বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এ-বর্ণনা সুস্পষ্টভাবেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমর্থিত। সেই বর্ণনায় বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির উল্লেখ আছে; তার মধ্যে একটি শাস্ত্র হল লোকায়ত। যথা:

'দীঘনিকায়'-র 'অম্বট্‌ঠসুত্ত'-তে পোক্খরসাতী (বা পোক্খরসাদি) নামক জনৈক ধনী ও সম্মানিত ব্রাহ্মণের শিষ্য অম্বট্‌ঠ নামক বিদ্বান ব্রাহ্মণের বর্ণনায় উক্ত হয়েছে:

অজ্‌ঝায়কো মন্তধরো, তিণ্ণং বেদানং পারগূ সনিঘণ্ডুকেটুভানং সাক্খর প্পভেদানং ইতিহাসপঞ্চমানং, পদকো, বেয্যাকরণো, লোকায়ত মহাপুরিস-লক্খণেসু অনবয়ো…"।[১১৬]

—অর্থাৎ, মন্ত্রবিদ্ (ও মন্ত্র) আবৃত্তিকারক, তিন বেদে পারদর্শী, অনুক্রমণী-যজ্ঞানুষ্ঠান-ধ্বনি-ও-ব্যাখ্যাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, ইতিহাসবিদ্, পদজ্ঞ, ব্যাকরণবিদ্, লোকায়ত ও মহাপুরুষলক্ষণে অভিজ্ঞ…

'সোণদণ্ডসুত্ত'-তে সোণদণ্ড নামের বিশেষ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায়[১১৭] এবং অঙ্গক নামে তারই ভাগিনেয়র বর্ণনায়[১১৮], কূটদন্তসুত্ত'-তে কূটদন্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের[১১৯] বর্ণনায় এবং রাজা বিজিত-র উপাখ্যানে

১১৫। Rhys Davids DBi. 14n, 22n, 110n, 166-167; Rhys Davids & Oldenberg in SBE xx. 152n; Rhys Davids in SBExxxv. 7; ইত্যাদি।

১১৬। 'দীঘনিকায়' ১।৩।১।৩।

১১৭। 'দীঘ', ১।৪।১।৪, ১।৪।৩।১২।

১১৮। 'দীঘ' ১।৪।৩।১৭

১১৯। 'দীঘ' ১।৫।১।১৯

পুরোহিত ব্রাহ্মণের বর্ণনায়[১২০] হুবহু একই কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্যত্রও ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গে এই বর্ণনাই পাওয়া যায়, কেবল বর্ণনাটি শুরু হয়েছে "তিণ্ণং বেদানং পারগূ" থেকে[১২১]।

বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ-সমর্থিত বর্ণনায় 'তিনি বেদে পারদর্শী' প্রভৃতির উল্লেখ অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই সঙ্গেই লোকায়তে পারদর্শিতা বা লোকায়ত-বিদ্যায় পারদর্শিতা কোন্ অর্থে উল্লিখিত হতে পারে? রিস্ ডেভিড্স্ স্বভাবতই অনুমান করেছেন, লোকায়ত বলতে এখানে বেদনিন্দক ভোগবাদী-বস্তুবাদী দার্শনিক বোঝানো অসম্ভব।

ব্যাখ্যা হিসাবে পালি ভাষ্যকারদের বক্তব্য তাঁর কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। আলোচ্য অংশর ব্যাখ্যায় বুদ্ধঘোষ বলছেন, লোকায়ত হল বিতণ্ডা-বাদ শাস্ত্র। বিতণ্ডা মানে বৃথাতর্ক[১২২]। রিস্ ডেভিড্স্ মনে করেন, লোকায়তর স্বরূপ বোঝার পক্ষে বুদ্ধঘোষের এই উক্তিটি আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় না[১২৩]। কিন্তু 'দীঘনিকায়'-তেই অন্যত্র "লোকক্‌খায়িকা" শব্দ উল্লিখিত হয়েছে[১২৪]। তার ব্যাখ্যায় বুদ্ধঘোষ বলেছেন, "মুর্খেরা লোকায়ত বা বিতণ্ডা অনুসারে কথা বলে। যথা: 'কার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে? অমুক দ্বারা'; "কাক সাদা, কেননা তার হাড় সাদা'; "বক লাল, কেননা তার রক্ত লাল'।" খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'অভিধানপদীপিকা'-য় মোটের উপর বুদ্ধঘোষের অনুসরণেই উক্ত হয়েছে, "বিতণ্ডসত্থং বিঞ্ঞেয্যং যং তং লোকায়তম্"। এর চেয়ে প্রায় একপুরুষ আগে রচিত 'অগ্গবংস'-তেও লোকায়তর পরিচায়ক হিসাবে মোটের উপর প্রায় একই রকম বৃথাতর্ক বা বিতণ্ডা প্রদর্শিত হয়েছে: "সবই উচ্ছিষ্ট, সবই অনুচ্ছিষ্ট। কাক সাদা, বক কালো। এই কারণে বা ওই কারণে।"

রিস্ ডেভিড্স্-এর পক্ষে লোকায়তকে এজাতীয় অর্থে—বিতণ্ডা অর্থে—গ্রহণ করা স্বভাবতই সম্ভব হয়নি। কেননা তিনি যে-প্রসঙ্গে লোকায়তর সমস্যাটি বুঝতে চেয়েছেন তার উপর আলোচ্য অর্থ বিশেষ কোন

১২০। 'দীঘ' ১।৪।২।১৯ ; ১।৫।২।২২।

১২১। 'মজ্ঝিমনিকায়, ২।৪১।১।২, ২।৪১।২।৮, ২।৪২।২।২, ২।৪৩।১।১, ২।৪৫।১।৩, ২।৪৫।২।৫, ২।৫০।১।১ ; 'খুদ্দকনিকায়', 'সুত্তনিপাত'—'সেলসুত্ত'।

১২২। দাসগুপ্ত বলছেন, এখানে 'বিতণ্ডা' ও 'বাদ' শব্দকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত অর্থে গ্রহণ করলে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়: তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধরা শব্দ দুটির ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অর্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না—বিতণ্ডা অর্থেই উভয় শব্দ ব্যবহার করেছেন; Dasgupta HIP iii. 512। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

১২৩। Rhys Davids DBi. 167.

১২৪। 'দীঘ' ১।১।২।১৭, ১।২।৫।৫২, ১।৯।১।৩।

আলোকপাত করতে পারে না ঃ তাঁর মতে 'ত্রিপিটক'-এ ব্রাহ্মণ-সমর্থিত বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের ছকে-বাঁধা বর্ণনাতেই লোকায়তে পারদর্শিতা উল্লিখিত হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেখানে লোকায়ত বলতে যে-রকম কোন বেদবিরোধী বস্তুবাদী দর্শন বোঝা সম্ভব নয়, তেমনিই বোঝা সম্ভব নয় বিতণ্ডাশাস্ত্র। কারণ রিস্ ডেভিড্স্ নিজে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও আমরা পরে দেখাবো, 'মনুস্মৃতি' প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যে বেদ-মূলক তর্কের কোন একরকম গৌণ উপযোগিতা স্বীকৃত হলেও[১২৫] হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বস্তুত নিন্দিত হয়েছে[১২৬]। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে বিতণ্ডা বা বৃথাতর্ক অত্যন্ত গর্হিত।

তাহলে, আলোচ্য প্রসঙ্গে লোকায়ত শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? রিস্ ডেভিড্স্ বলছেন, কোন দার্শনিক মত বা দার্শনিক সম্প্রদায় অর্থে হতে পারে না। অতএব, লোকায়তর অর্থ হল 'নেচারলোর'—Naturelore। কিন্তু দার্শনিক মত বা দার্শনিক সম্প্রদায় অর্থে কেন হতে পারে না? প্রথমে এবিষয়ে রিস্ ডেভিড্স্-এর যুক্তিগুলি দেখা যাক।

রিস্ ডেভিড্স্ বলছেন, কুমারিল লোকায়ত শব্দ ব্যবহার করেছেন; কিন্তু যে-প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ ছিল নিছক নাস্তিক। রিস্ ডেভিড্স্ তাই মন্তব্য করেছেন, এখানে কুমারিলের পক্ষে লোকায়ত শব্দর পরিবর্তে সাধারণভাবে নাস্তিক শব্দ ব্যবহার করাই আসলে প্রাসঙ্গিক হোতো।[১২৭] কিন্তু, আমাদের মন্তব্য হল, কুমারিল যেহেতু বস্তুতপক্ষে নাস্তিক শব্দর পরিবর্তে লোকায়ত শব্দই ব্যবহার করেছেন সেইহেতু আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে সবিনয়ে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয় যে লোকায়ত শব্দটির ব্যবহারই তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল। অতএব এখানে লোকায়ত শব্দর ব্যবহারকেই অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রত্যাখ্যান না-করে এই নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারটিরই অভীষ্ট তাৎপর্য বিচার করা আধুনিক বিদ্বানের প্রকৃত দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। অবশ্যই কুমারিলের পক্ষে ঠিক কোন্ অর্থে লোকায়ত শব্দটির ব্যবহারই প্রাসঙ্গিক হয়েছিল তার বিচার কিছুটা দীর্ঘবিস্তৃত হবে। অতএব আমরা পরে সে-আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত রিস্ ডেভিড্স্-এর অন্যান্য যুক্তির গুরুত্ব দেখা যাক।

১২৫। যথা, 'মনু' ৭।৪৩—বিশেষত মেধাতিথির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। যথা, 'মনু' ২।১১, ইত্যাদি। পরে এবিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা হবে।

১২৭। Rhys Davids DB i. 166-7.

১৩॥ লোকায়ত ও দেহাত্মবাদ : শঙ্করাচার্য

স্বমত-সমর্থনে—অর্থাৎ, দার্শনিক মত হিসাবে লোকায়ত আসলে অলীক বা অবাস্তব, এই কথা প্রতিপাদনের পক্ষে—রিস্ ডেভিড্স্-এর কাছে প্রধানতম অন্তরায় বলে প্রতীত হয়েছে শঙ্করাচার্যর 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' বা 'শারীরক-ভাষ্য'। কেননা এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য একাধিকবার সুস্পষ্টভাবে দেহাত্মবাদী ও চতুর্ভূতবাদী মত অর্থেই—অর্থাৎ বস্তুবাদ অর্থেই লোকায়ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব রিস্ ডেভিড্স্ মন্তব্য করছেন, শঙ্করাচার্য "সম্ভবত ভুল করেই" উক্ত মতকে লোকায়ত আখ্যা দিয়েছেন[১২৮]।

অবশ্যই মনে হতে পারে, প্রাচীনদের যে-কোন উক্তি সম্বন্ধে এ-জাতীয় সংশয় প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হলে নবীনদের পক্ষে লোকায়ত সংক্রান্ত যে-কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাই নিরঙ্কুশ হয়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে রিস্ ডেভিড্স্ বিনা যুক্তিতে শঙ্করের এই সমালোচনা করেননি। অতএব আমাদের পক্ষেও রিস্ ডেভিড্স্-এর মন্তব্য সমালোচনা করার আগে তাঁর যুক্তিগুলি বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথমত দেখা যাক, লোকায়ত ও লোকায়তিক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য ঠিক কী মন্তব্য করেছেন। 'শারীরক-ভাষ্য'-এ তিনি তিনবার লোকায়তিকদের উল্লেখ করেছেন। যথা :—

১॥ শঙ্করের প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মাই ব্রহ্ম। আপত্তি উঠবে, একথা যদি প্রসিদ্ধই হয় (অর্থাৎ, কথাটা যদি সকলেরই জানা থাকে) তাহলে আত্মা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাই অবান্তর হবে; পক্ষান্তরে আত্মা যদি অপ্রসিদ্ধ হয় (অর্থাৎ, আত্মা যদি জানা না-থাকে) তাহলে আত্মা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা অসম্ভব হবে। উত্তরে শঙ্কর বলছেন, আত্মা অবশ্যই প্রসিদ্ধ; কেননা, "আমি নেই"—এ-জাতীয় কথা কেউই বলে না। তবুও আত্মা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসারও প্রয়োজন আছে। কেননা, আত্মা বলতে ঠিক কী বোঝায় সে বিষয়ে নানা মত বর্তমান। এবং এ-জাতীয় বিবিধ মতের নিদর্শন হিসাবে তিনি প্রথমেই বলছেন :

> দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ[১২৯]।

—অর্থাৎ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকেই প্রাকৃতজন ও লোকায়তিকেরা আত্মা বিবেচনা করে।

১২৮। **Ib. i. 171 : "Samkara, in setting forth his theory of the soul, controverts a curious opinion which he ascribes to Lokayatikas—*possibly wrongly*"...**

১২৯। **'শারীরক-ভাষ্য' ১।১।১**

২॥ লোকায়ত-প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যর দ্বিতীয় উক্তি আরো চিত্তাকর্ষক। সাংখ্য-মত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি সেই উক্তি করেছেন। সাংখ্য-মতে পুরুষ উদাসীন ও অপ্রধান; অতএব জগৎ-উৎপত্তির ব্যাপারে তার কোন ভূমিকাই নেই। প্রকৃতি বা প্রধান হল অচেতন বা জড়পদার্থ; এবং এই অচেতন প্রধানই জগৎ-উৎপত্তির স্বাধীন কারণ। এই মতের খণ্ডনে শঙ্কর বলতে চান, চেতন-অনধিষ্ঠিত নিছক অচেতনের প্রবৃত্তিই সম্ভব নয় এবং প্রবৃত্তি ব্যতীত বিশিষ্ট কার্যাভিমুখ হওয়াও অসম্ভব। যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্যপ্রবৃত্তির অনুমান অসম্ভব, সেইহেতু অচেতন জগৎকারণেরও অনুমান দুর্ঘট। উত্তরে সাংখ্য-মতাবলম্বীরা অবশ্য বলবেন, শুধুমাত্র বা কেবল-চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; চেতন-সংযুক্ত রথাদি অচেতনেরই প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব প্রশ্ন উঠছে, প্রবৃত্তিটি বস্তুতপক্ষে কার? চেতনসংযুক্ত বলেই কি প্রবৃত্তিটি চেতনের, না, চেতন-সংযোগ সত্ত্বেও প্রবৃত্তিটি বস্তুতপক্ষে অচেতনের? শঙ্কর বলছেন, সাংখ্য মতে—

"ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তস্যৈব সেতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়-দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ, কেবলাচেতনরথাদি-বৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যস্য দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহস্যৈব চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাদচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি।"[১৩০]

—অর্থাৎ, প্রবৃত্তি আসলে যেখানে দৃষ্ট হয় তারই প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত, কেননা 'প্রবৃত্তি' এবং 'যাতে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়' উভয়ই প্রত্যক্ষগোচর। কেবল-চেতন (বা নিছক চেতন) কখনোই প্রবৃত্তির আশ্রয় হিসাবে রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না। পক্ষান্তরে, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় বা প্রমাণিত হয়,—জীবদেহের সঙ্গে কেবল-অচেতন (নিছক অচেতন) রথ প্রভৃতির পার্থক্য থেকেই তা প্রমাণ। এবং এই কারণেই,—অর্থাৎ যেখানে দেহের প্রত্যক্ষ হয় শুধু সেখানেই চৈতন্যর দর্শন ঘটে, যেখানে দেহের প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে চৈতন্যরও প্রত্যক্ষ হয় না, এই কারণেই—লোকায়তিকেরা প্রতিপন্ন করে, চৈতন্য প্রকৃত পক্ষে দেহরই (গুণ বা ধর্ম)। অতএব প্রমাণ হয়, শুধুমাত্র অচেতনেরই প্রবৃত্তি বর্তমান।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পূর্বপক্ষ হিসাবে সাংখ্য-মতের বর্ণনায় শঙ্করাচার্য এখানে সাংখ্য-মতাবলম্বীদের মুখে লোকায়তিকদের যুক্তিই প্রামাণিক

১৩০। 'শারীরক-ভাষ্য' ২।২।২।

হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু লোকায়তর সঙ্গে সাংখ্য-মতের সম্পর্ক পরে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করতে হবে। আপাতত শঙ্কর-বর্ণিত লোকায়তিকদের যুক্তিটির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। সে-যুক্তি হল: যেখানে দেহ বর্তমান শুধুমাত্র সেখানেই চৈতন্য বর্তমান, দেহ যেখানে অবর্তমান সেখানে কুত্রাপি চৈতন্য বর্তমান নয়, অতএব চৈতন্য দেহরই ধর্ম বা গুণ। বলাই বাহুল্য, লোকায়ত-মতের এই বর্ণনার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনাটির অসংগতি নেই, কেননা সেখানেও লোকায়ত-মতের বর্ণনা হিসাবে শঙ্কর বলছেন, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা; অর্থাৎ চৈতন্য দেহরই ধর্ম, তাই আত্মা অর্থে দেহাতিরিক্ত চেতনের কল্পনাই অবান্তর।

৩॥ 'শারীরক-ভাষ্য'-এ শঙ্করাচার্য যে-প্রসঙ্গে তৃতীয়বার লোকায়ত-মতের উল্লেখ করেছেন তারও চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য আছে। 'ব্রহ্মসূত্র'-কার বাদরায়ণ পরপর দুটি সূত্রে[১৩১] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। এই দুটির প্রথম সূত্রটি পূর্বপক্ষ, অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকারের পক্ষে যুক্তি: "এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ"—অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেন, যেহেতু শুধুমাত্র শরীর বর্তমান থাকলেই আত্মা থাকে সেইহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার্য নয়। দ্বিতীয় সূত্রটি হল সিদ্ধান্ত সূত্র, —অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মা কেন স্বীকার্য সেবিষয়ে বাদরায়ণের যুক্তি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা মতের আলোচনা প্রসঙ্গে বাদরায়ণ এই দুটি সূত্র রচনা করেছিলেন। অতএব, সূত্র দুটি ব্যাখ্যার পূর্বে শঙ্করাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, বাদরায়ণের পক্ষে এখানে এইভাবে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে সূত্ররচনার তাৎপর্য কী? উত্তরে শঙ্কর বলছেন, জৈমিনিকৃত 'মীমাংসাসূত্র'-তে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদক কোন সূত্র নেই, এই কারণেই বাদরায়ণ 'ব্রহ্মসূত্র'-তে এইভাবে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। শঙ্কর বলছেন, 'মীমাংসাসূত্র'-র ভাষ্যে শবরস্বামী অবশ্যই প্রমাণ লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার করেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্মসূত্র'-রই আলোচ্য সূত্র উৎকর্ষণ করে সে বিচার উত্থাপন করেছিলেন—জৈমিনিকৃত কোন সূত্র অবলম্বন করে সে-বিচার করেননি।[১৩২] 'মীমাংসাসূত্র'-তে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতি-পাদন-মূলক সূত্রর অভাব অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু বর্তমানে সে-আলোচনায় বিক্ষিপ্ত না-হয়ে এই প্রসঙ্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার অভাব প্রতিপাদক

১৩১। 'ব্রহ্মসূত্র' ৩।৩।৫৩-৪॥
১৩২। 'শারীরক-ভাষ্য' ৩।৩।৫৩॥

লোকায়তিক যুক্তিটি শঙ্কর কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই দেখা যাক। শঙ্কর বলছেন,

অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষ্বদৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ। ন স্বর্গগমনায়াপবর্গগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মাস্তি, যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ। দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে, হেতুঞ্চাচক্ষতে—শরীরে ভাবাদিতি। যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি, তৎ তদ্ধর্মত্বেনাধ্যবসীয়তে, যথাগ্নিধর্মাবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ। প্রাণচেষ্টাচৈতন্য-স্মৃত্যাদয়শ্চাত্ম-ধর্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনাম্, তেঽপ্যন্তরেব দেহ উপলভ্যমানা বহিশ্চানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহব্যতিরিক্তে ধর্মিণি দেহধর্মা এব ভবিতুমর্হন্তি। তস্মাদব্যতিরেকো দেহাদাত্মনঃ।[১৩৩]

—অর্থাৎ দেহমাত্রেই আত্মদর্শনকারী লোকায়তিকেরা মনে করে দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছুই নেই। তাদের মতে, পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য বস্তুগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে বা মিলিতভাবে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না-হলেও এই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতই শরীরাকারে পরিণত হলে তাতে চৈতন্যর উদ্ভব হয়; অতএব বিজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য) মদশক্তির মতোই [অর্থাৎ, কিণ্বাদি দ্রব্য মদ্যরূপে পরিণত হলে যে-ভাবে মদশক্তির আবির্ভাব হয় সেইভাবেই পৃথিবী প্রভৃতি ভূত দেহাকারে পরিণত হলে দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হয়]; অতএব তারা [লোকায়তিকেরা] বলে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ। অতএব, স্বর্গ বা অপবর্গ গমনে সমর্থ দেহব্যতিরিক্ত কোন আত্মা নেই—এ-জাতীয় কোন আত্মার অস্তিত্ব-হেতুই দেহে চৈতন্য বর্তমান, এ কথা বলা যায় না। তাদের ধারণায় দেহই হল চেতন বা আত্মা। এই মতের পক্ষে তাদের যুক্তি হিসাবে সূত্রে উক্ত হয়েছে: "শরীরে ভাবাৎ।" অর্থাৎ: যা বর্তমান থাকলে অপর-কিছু বর্তমান হয় এবং যা অবর্তমান থাকলে সেই অপর-কিছু অবর্তমান হয়—সেই অপর-কিছুকে তারই ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। যেমন অগ্নির ধর্ম হল উষ্ণতা ও প্রকাশ (আলোক)। এবং যেহেতু প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি, প্রভৃতি—যেগুলিকে আত্মবাদীরা আত্মার ধর্ম বলে মনে করেন সেগুলি—সবই শরীরের অভ্যন্তরেই উপলব্ধ হয় এবং দেহের বাইরে কখনোই উপলব্ধ হয় না, [সেইহেতু]

১৩৩। 'শারীরক-ভাষ্য' ৩।৩।৫৩।

দেহব্যতিরিক্ত ধর্মী [অর্থাৎ আত্মা] অসিদ্ধ হওয়ায় এগুলিও [স্মৃতি, চৈতন্য প্রভৃতিও] দেহমাত্রেরই ধর্ম হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব দেহই আত্মা।

রিস্ ডেভিড্‌স্ কেন লোকায়ত-সংক্রান্ত শংকরাচার্যের এই উক্তিগুলিকে "সম্ভবত ভ্রান্ত" বলে বিবেচনা করেছেন—সে-যুক্তি বিচার করার আগে এখানে বিশেষত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত 'শারীরক-ভাষ্য'-এ শঙ্করাচার্য মোট তিনবার লোকায়ত-মত উল্লেখ করেছেন, এবং আমরা দেখলাম, তিনবারই লোকায়ত মতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে একই কথা বলছেন। সেই কথাটি হল, লোকায়ত মূলতই দেহাত্মবাদ—আত্মা ও দেহ অভিন্ন, বা, দেহাতিরিক্ত আত্মা কল্পনামাত্র। সহজেই অনুমান হয়, এজাতীয় মতবাদের বিরুদ্ধে—দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে—প্রধানতম আপত্তি হিসাবে চৈতন্য বা চেতনার নজির দেখানো হতো। দেহমাত্র জড়বস্তু, চতুর্ভূতাত্মক; নিছক জড়বস্তুতে চৈতন্যর পরিচয় নেই। অথচ, আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট; অতএব আত্মাকে নিছক দেহের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করা যায় না। লোকায়ত-মতের উল্লেখ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য স্বভাবতই এ-জাতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে লোকায়তিকদের প্রসিদ্ধ উত্তরটিও বিবেচনা করতে চেয়েছেন। যথা: "মদশক্তিবৎ"। অর্থাৎ, কিণ্বাদিতে মদশক্তির অভাব সত্ত্বেও এই কিণ্বাদির সংমিশ্রণেই মদ্য প্রস্তুত হলে সেই মদ্যে মদশক্তির আবির্ভাব ঘটে; তেমনি, পৃথিবী প্রভৃতি জড় পদার্থে চৈতন্যর অভাব পরিদৃষ্ট হলেও এই জড়পদার্থগুলিই দেহাকারে পরিণত হলে সেই দেহে চৈতন্যর আবির্ভাব ঘটে। এজাতীয় কোন যুক্তি যে বাস্তবিকই লোকায়তিকদের প্রসিদ্ধ যুক্তি ছিল, তার প্রমাণ হিসাবে প্রচলিত লোকগাথা উল্লেখ করা যায়। লোকগাথাগুলি লোকগাথা হিসাবে প্রামাণিক হওয়াই স্বাভাবিক; অর্থাৎ, লোকায়ত-মতের খণ্ডন প্রসঙ্গে লোকায়ত-বিরোধীরাই এ-জাতীয় লোকগাথা রচনা করেছিলেন—একথা কষ্টকল্পনার পরিচায়ক হবে। সংক্ষেপে, লোকগাথাগুলি লোকায়ত-বিরোধীদের উদ্ভাবন না-হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ, লোকায়ত-খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচ্য দৃষ্টান্ত-মূলক লোকগাথা বারবার উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। যথা গুণরত্ন একটি লোকগাথার উল্লেখ করেছেন:

> পৃথ্ব্যাদিভূতসংহত্যাং তথা দেহাদিসংভবঃ।
> মদশক্তি সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বত্তদ্বৎস্থিতাত্মতা ॥[১৩৪]

১৩৪। 'তর্করহস্যদীপিকা' পৃ. ৩০৭।

মাধবাচার্যও নিম্নোক্ত লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন :

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।[১৩৫]

এজাতীয় লোকগাথার প্রচলন থেকে আরো অনুমান করা যেতে পারে যে লোকায়তিকদের আলোচ্য যুক্তির বর্ণনায় হরিভদ্রসূরি যে-শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন সেটিও তাঁর স্বরচিত না-হওয়াই সম্ভব; অর্থাৎ সম্ভবত কোন প্রচলিত লোকগাথা অবলম্বন করেই তিনি লোকায়ত-মতের বর্ণনায় বলছেন,

পৃথ্ব্যাদি ভূতসংহত্যা তথা দেহপরীণতেঃ।
মদশক্তিঃ সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বত্তদ্বচ্চিদাত্মনি ॥[১৩৬]

অতএব সিদ্ধান্ত হয়, শুধু শঙ্করাচার্যই নন,—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক (হরিভদ্রর রচনাকাল) থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক (মাধবাচার্য-গুণরত্নর রচনাকাল) পর্যন্ত বেদপন্থী ও বেদবিরোধী উভয় মহলেই প্রসিদ্ধি ছিল, লোকায়তিকেরা মূলতই দেহাত্মবাদী এবং এই দেহাত্মবাদের সমর্থনে লোকায়তিকেরা মদশক্তির উদ্ভব সংক্রান্ত পরিদর্শন বা পরীক্ষা-মূলক দৃষ্টান্তর সাহায্যেই জড়দেহে চৈতন্য উদ্ভবের ব্যাখ্যা প্রস্তাব করতেন।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার মতবাদটি—অর্থাৎ, আলোচ্য দেহাত্মবাদ —অত্যন্ত প্রাচীন। ইতিপূর্বে, লোকায়ত-সংক্রান্ত দাশগুপ্তর সিদ্ধান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এবিষয়ে 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ'-এর একটি নজির উল্লেখ করেছি। আমরা পরে উপনিষদ্ সাহিত্যে সংরক্ষিত এজাতীয় অন্যান্য নজির আলোচনা করবো। আপাতত মন্তব্য এই যে উপনিষদের এজাতীয় নজির থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষটি সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় দেহাত্মবাদ-বনাম-দেহাতিরিক্ত-আত্মার অস্তিত্ব সংক্রান্ত মতসংঘর্ষ হিসাবেই। সেই কারণেই বাদরায়ণের পক্ষে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য মতের দার্শনিক সারাংশ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মসূত্র'-এ দেহাত্মবাদের খণ্ডনে দুটি সুস্পষ্ট সূত্র রচনা করাই স্বাভাবিক। অবশ্যই এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে উপনিষদ্ সাহিত্যে আলোচ্য দেহাত্মবাদটি সুস্পষ্টভাবে লোকায়তিক নামে উল্লিখিত হয়নি।

১৩৫। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পৃ. ৩।
১৩৬। 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ৮৪।

এই কথাগুলি মনে রেখে আমরা এবার রিস্ ডেভিড্স্-এর মূল যুক্তির বিচারে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। তিনি অবশ্য উপনিষদ্ সাহিত্যে সংরক্ষিত দেহাত্মবাদের নজিরগুলির কোন উল্লেখই করেননি এবং হরিভদ্র-গুণরত্ন প্রমুখর লোকায়ত-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল যুক্তি হল: পালি 'ত্রিপিটক'-এ শুধু যে লোকায়ত শব্দটিই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাই নয়, কোন একরকম প্রাচীন দেহাত্মবাদও অবশ্যই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'ত্রিপিটক'-এর কোথাওই লোকায়ত নাম এবং এই দেহাত্মবাদের মধ্যে সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে লোকায়ত নামটি যেহেতু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-জনোচিত কোন একরকম বিদ্যা বলেই বর্ণিত সেইহেতু লোকায়ত বলতে উক্ত দেহাত্মবাদই বোঝা অসঙ্গত হবে। পক্ষান্তরে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে অনুমান হয় যে লোকায়ত নামটি সেখানে Naturelore অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল; অথচ শঙ্করাচার্য লোকায়ত নামে দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ করেছেন। অতএব শঙ্করাচার্য সম্ভবত ভুল করেই দেহাত্মবাদকে লোকায়ত আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৩৭]

রিস্ ডেভিড্স্-এর এই সিদ্ধান্তর বিচার সুদীর্ঘ হতে বাধ্য।

প্রথমত দেখা যাক, শঙ্করাচার্যর বিরুদ্ধে তাঁর মূল যুক্তিটির গুরুত্ব আসলে ঠিক কতটুকু। এই যুক্তি হল: প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, কোন একরকম দেহবাদ বা দেহাত্মবাদও উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যর কোন ইঙ্গিত নেই। অতএব শঙ্করের পক্ষে দেহবাদ বা দেহাত্মবাদকেই লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হয়নি—বিশেষত এই কারণে নয় যে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত লোকায়ত শব্দটির অর্থান্তরেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অবশ্যই প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব তার বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটু পরে সে-বিচার উত্থাপন করবো এবং সেই প্রসঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রর যে-নজিরগুলি রিস্ ডেভিড্স্ পর্যালোচনা করেছেন সেগুলির পুনর্বিচার ছাড়াও যে-নজিরগুলি তিনি উপেক্ষা করেছেন সেগুলির তাৎপর্য অনুসন্ধানেরও প্রয়াস করবো। আমরা দেখবো, বৌদ্ধশাস্ত্রর নজিরগুলি বস্তুতপক্ষে লোকায়ত শব্দর রিস্ ডেভিড্স্ প্রতিপাদ্য অর্থ সমর্থন করে না। কিন্তু আপাতত ধরে নেওয়া যাক, 'ত্রিপিটক'-এ লোকায়ত এবং লোকায়তিক শব্দ ব্যবহৃত হলেও ঠিক কোন্ অর্থে—বিশেষত ঠিক কোন্ মতবাদের পরিচায়ক হিসাবে—তা ব্যবহৃত হয়েছে এবিষয়ে অনিশ্চয়তা আছে; তেমনি এই পালি গ্রন্থাবলীতে

১৩৭। Rhys Davids DB i. 167; 171-2.

কোন একরকম দেহবাদ বা দেহাত্মবাদ উল্লিখিত হলেও তা ঠিক কার বা কাদের মতবাদ· সে-বিষয়েও অন্তত কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রর নজির থেকে একদিকে যেমন নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় না যে লোকায়ত নামটি কোন একরকম দেহাত্মবাদেরই পরিচায়ক ছিল, অপরদিকে তেমনি একথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় না যে লোকায়তিকদের সঙ্গে কোন অর্থে কোনরকম দেহবাদ বা দেহাত্মবাদের সম্পর্ক একান্তই অসম্ভব। কিন্তু এ-বিচার স্থগিত রেখে আপাতত দেখা যাক, শঙ্করাচার্যর পক্ষে দেহাত্মবাদ অর্থেই লোকায়ত মত উল্লেখ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল কিনা।

লোকায়ত-প্রসঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রর নজিরগুলির গুরুত্ব মনে রেখেও স্বীকার করা দরকার যে এগুলিই একমাত্র নজির নয়। অতএব শঙ্করাচার্যর পক্ষে দেহবাদ বা দেহাত্মবাদ অর্থে লোকায়ত-মত উল্লেখ করা সঙ্গত হয়েছে কিনা, শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত সাক্ষ্যগুলি থেকে এই প্রশ্নর পূর্ণাঙ্গ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে শুধুমাত্র বৌদ্ধ ঐতিহ্যই নয়; এবং শঙ্করাচার্যর মতো প্রবল বৌদ্ধ-বিদ্বেষীর পক্ষে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পরিবর্তে বিশেষত বৈদিক ঐতিহ্যের উপরই নির্ভরশীল হওয়া স্বাভাবিক। অতএব শঙ্করের পক্ষে দেহাত্মবাদ অর্থেই লোকায়ত-মতের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার, বৈদিক ঐতিহ্যে দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার কোন সমর্থন আছে কিনা।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে—বুদ্ধ-পূর্ব উপনিষদ্ সাহিত্যে—দেহাত্মবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান। অবশ্যই এই দেহাত্মবাদ উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের বিশেষ বিরোধী ছিল; তাই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য তত্ত্বর ব্যাখ্যায় স্বয়ং বাদরায়ণ দেহাত্মবাদের উল্লেখ-পূর্বক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে দুটি সূত্র রচনায় প্রয়োজন অনুভব করেন। আপত্তি উঠবে এই দেহাত্মবাদকে সুপ্রাচীন ও বেদবিরোধী কোন মত বলে মেনে নিলেও একে লোকায়তিক আখ্যা দেবার যুক্তি কী হতে পারে? কিংবা, উপনিষদ্ সাহিত্যেই কি এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার উপর নির্ভর করে এই দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া সংগত হবে? আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, এজাতীয় ইঙ্গিত অবশ্যই বর্তমান; অতএব শঙ্করাচার্যর পক্ষে দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া অন্তত ঔপনিষদ-ঐতিহ্য-সমর্থিত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই উপনিষদ্-উল্লিখিত দেহাত্মবাদের একটি নজির দেখেছি। অবশ্য সেখানে মতবাদটিকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হয়নি। তার পরিবর্তে

এই দেহাত্মবাদ অসুর-মত বা "অসুরদের উপনিষদ্" বলেই উল্লিখিত হয়েছে। "অসুর-মত" নামটি অবশ্যই নিন্দাসূচক পৌরাণিক উপাখ্যানেরই পরিচায়ক। তবুও প্রশ্ন ওঠে, ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যে কোন্ মত এইভাবে নিন্দিত হয়েছিল? দাসগুপ্ত অনুমান করেছেন, অসুর-মত নামে উল্লিখিত এই দেহাত্মবাদই লোকায়ত-মতের একটি অতি প্রাচীন নিদর্শন। এবং তিনি নিজে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না করলেও আমাদের পক্ষে স্বীকার করা প্রয়োজন যে অসুর-মতকেই লোকায়ত-মত বলে গ্রহণ করার পিছনে বৃদ্ধসম্মতি বর্তমান। যেমন, 'গীতা'-তে দেব-মত এবং অসুর-মতের মধ্যে পার্থক্য-প্রদর্শনের বিশেষ আয়োজন দেখা যায়।[১৩৮] দেব-মত হিসাবে অবশ্যই এখানে বেদ-মূলক মত উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অসুর-মত অর্থে গীতায় কোন মত উল্লিখিত? টীকায় শ্রীধরস্বামী মন্তব্য করছেন,

"এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলিনচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ"...[১৩৯]

এবং 'গীতা'য় অসুর-মত বলতে যে লোকায়ত-মতই উল্লিখিত হয়েছে তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীধরস্বামী[১৪০] অসুর-মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লোকায়তিক হিসাবে প্রসিদ্ধ একটি প্রামাণিক লোকগাথাও উদ্ধৃত করেছেন: "ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ...।" কিন্তু শুধু শ্রীধরস্বামীই নন; শঙ্করাচার্যও 'গীতা' ১৬।৮-এ উল্লিখিত অসুর-মতের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করছেন: "লোকায়তিকদৃষ্টিঃ ইয়ম্"। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এইভাবে বেদ-মূলক দেব-মতের বিশেষ বিরোধী অসুর-মতকে লোকায়ত-মত বলে গ্রহণ করার পিছনে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যরই সমর্থন ছিলো; ব্যাখ্যাটি শঙ্কর ও শ্রীধরস্বামীর উদ্ভাবন বা কল্পনা-প্রসূত না-হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষত মনে রাখা দরকার, আধুনিক বিদ্বানেরা প্রায় সকলেই মুয়ার-এর[১৪১] সঙ্গে একমত হবেন যে 'বিষ্ণু-পুরাণ'-এ[১৪২] দেব-মত-বিরোধী অসুর-মত নামে ব্যাখ্যাত মতটি প্রকৃত-পক্ষে লোকায়ত-মতই।

কিন্তু অসুর-মতের আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো এবং দেখবো বিশেষত 'গীতা-'য় অসুর-মতের যে-বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে লোকায়তর পুনর্গঠনে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে সে-আলোচনায়

১৩৮। 'গীতা' ১৬ অধ্যায়।

১৩৯। শ্রীধর,—'গীতা' ১৬।৯।

১৪০। শ্রীধর,—'গীতা' ১৬।০।

১৪১। Muir in JRAS-1862, 299ff

১৪২। 'বিষ্ণু পুরাণ' ৩।১৮।১৪-২৬।

বিক্ষিপ্ত না-হয়ে আমাদের মূল প্রশ্নটির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক: অসুর-মত নামটির এই পরোক্ষ ইঙ্গিত ছাড়াও উপনিষদ্-উল্লিখিত দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার পক্ষে উপনিষদ্-সাহিত্যেরই আর কোন স্পষ্টতর নজির পাওয়া যায় কি?

লোকায়ত-মত নামান্তরে বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতি-প্রণীত বলেই প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে বৃহস্পতি অবশ্যই দেবগুরু; পক্ষান্তরে লোকায়ত-মত বেদ-বিরোধী। ফলে, স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষে এ-জাতীয় একটি বেদ-বিরোধী মত প্রণয়ন করা অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষ বিস্ময়কর বলেই প্রতীত হতে পারে। কিন্তু উপনিষদ্-সাহিত্যেই বৃহস্পতির পক্ষে চরম বেদবিরোধী মতবাদ উদ্ভাবনের একরকম ব্যাখ্যাও বর্তমান। যেমন, 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর[১৪৩] উপাখ্যান অনুসারে: [দেবগুরু] বৃহস্পতি [অসুরগুরু] শুক্র হয়ে ইন্দ্রের অভয়ের উদ্দেশ্যে এবং অসুরদের ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে "অবিদ্যা" সৃষ্টি করেছিলেন; সেই অবিদ্যার প্রভাবে যা-শিব তা অশিব বলে প্রতীত হয় এবং যা অশিব তা শিব বলে প্রতীত হয় এবং সে-অবিদ্যা "বেদাদিশাস্ত্র-হিংসক"।

অতএব দেখা যাচ্ছে, উপনিষদ্-সাহিত্যেই বৃহস্পতি-প্রণীত বা বার্হস্পত্য—অতএব অবশ্যই লোকায়ত-নামবাচ্য—কোন একরকম বেদাদি-শাস্ত্রহিংসক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মত "অবিদ্যা" বলে নিন্দিত এবং তা পুনরায় অসুর-মত বলেই উল্লিখিত। কেননা 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ বৃহস্পতি সংক্রান্ত উপরোক্ত উপাখ্যানটি উল্লেখের অব্যবহিত পূর্বেই বেদবিরোধী এবং অবিদ্যা-মূলক এই মতবাদটির মূল পরিচয় হিসাবে বলা হয়েছে, মিথ্যা দৃষ্টান্ত ও হেতুর সাহায্যে আত্মার অস্বীকৃতি: "নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈঃ মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ"।[১৪৪] বস্তুত, এই বেদ-বিরুদ্ধ বৃহস্পতি-প্রণীত এবং অসুর-মত হিসাবে উল্লিখিত মতটি বলতে আসলে যে 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে বর্ণিত ভ্রান্ত আত্মতত্ত্বই বা দেহাত্মবাদই উদ্দিষ্ট হয়েছে তারই যেন স্পষ্টতর ইঙ্গিত দেবার উদ্দেশ্যে 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ বৃহস্পতি সংক্রান্ত উপরোক্ত উল্লেখের পরেই 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর উপাখ্যানটির সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছে[১৪৫]—কেবল এখানে প্রজাপতির পরিবর্তে উল্লেখ করা

১৪৩। 'মৈত্রী-উপনিষদ্' ৭।৯॥

১৪৪। 'মৈত্রী' ৭।৮॥

১৪৫। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ম্যাক্স্-মুয়লার যদিও ব্যাকরণের বিচারে 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-কে অত্যন্ত প্রাচীন বলেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তবুও অন্যান্য বিদ্বানদের কাছে সেকথা প্রকৃত পক্ষে স্বীকার যোগ্য হয়নি। 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর রচনাকাল সাধারণত বুদ্ধ-পরবর্তী বলেই স্বীকৃত; রাধাকৃষ্ণ এই

হয়েছে ব্রহ্মার: "দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই আত্মকাম হয়ে (আত্মাকে জানতে ইচ্ছুক হয়ে) ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তাঁরা বললেন, ভগবন আমরা আত্মকাম হয়েছি, আমাদের (আত্মতত্ত্ব) বলুন। ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলেন, এই অসুরগণ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত আত্মতত্ত্বেরই অধিকারী। তিনি তাই এই মূঢ়গণকে ভ্রান্ত আত্মতত্ত্বেরই উপদেশ দিলেন…।"[৪৬] এই ভ্রান্ত আত্মতত্ত্ব বলতে যে প্রকৃতপক্ষে দেহাত্মবাদই ইতিপূর্বে 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এর আলোচনায় আমরা তার নির্দেশ পেয়েছি এবং আমরা দেখেছি, 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এও তা "নৈরাত্ম্যবাদ" বলেই উল্লিখিত।

অতএব উপনিষদে উল্লিখিত দেহাত্মবাদকেই যে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া সঙ্গত সে-বিষয়ে আমাদের যুক্তিগুলির সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা যাক। এক: উপনিষদে এই দেহাত্মবাদকে অসুর-মত আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং 'বিষ্ণু-পুরাণ', 'গীতা' প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে অনুমান হয় লোকায়ত-মতই বৈদিক ঐতিহ্যে অসুর-মত নামে নিন্দিত। দুই: লোকায়ত-মত নামান্তরে বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতি-প্রণীত বলেই প্রসিদ্ধ এবং সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যে শুধুমাত্র এই বেদ-বিরোধী নৈরাত্ম্যবাদ বা দেহাত্মবাদই সুস্পষ্টভাবে বৃহস্পতি-প্রণীত বলে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব, শঙ্করাচার্যর পক্ষেও দেহাত্মবাদকেই লোকায়ত নামে উল্লেখ করার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান। এবং এই কারণেই আমরা শঙ্করাচার্যর বিরুদ্ধে রিস্ ডেভিড্স্-এর সমালোচনাকে যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করতে পারি না, অর্থাৎ স্বীকার করতে পারি না যে শঙ্কর খুব সম্ভব "ভুল করে" দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দিয়েছিলেন। 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ উল্লিখিত বৃহস্পতি-প্রণীত—দেহাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদের সাক্ষ্যই রিস্ ডেভিড্স্-এর যুক্তির বিরুদ্ধে চরম প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পারে। রিস্ ডেভিড্স্ অবশ্যই আপত্তি তুলে বলবেন, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত নামটি ব্রাহ্মণোচিত কোন এক বিদ্যারই পরিচায়ক; এই পরিস্থিতিতে শঙ্করাচার্যর পক্ষে লোকায়ত বলতে বেদ-বিরোধী দেহাত্মবাদ বোঝা সঙ্গত হয়নি। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলেছি, শঙ্করাচার্য অবশ্যই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পরিবর্তে ঔপনিষদ-ঐতিহ্যের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন এবং ঔপনিষদ-ঐতিহ্যে

উপনিষদে বৌদ্ধমতের প্রভাব উল্লেখ করেছেন। আমাদের বর্তমান যুক্তির পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হল, পরবর্তীকালের রচনা বলেই এই উপনিষদ্‌টিতে যেমন 'ঈশা' 'কঠ' প্রভৃতির উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তেমনিই 'ছান্দোগ্য'-র আখ্যানটির সারাংশও উদ্ধৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

৪৬। 'মৈত্রী', ৭।১০।

দেহাত্মবাদকেই লোকায়তিক আখ্যা দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। তাছাড়া আমরা অচিরে বৌদ্ধশাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত সাক্ষ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখবো, বস্তুতপক্ষে সেখানেও লোকায়ত বলতে ব্রাহ্মণোচিত কোন বিদ্যার ইঙ্গিতই অবধারিত নয়। কিন্তু এই আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের পক্ষে এখানে অপর একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাঞ্ছনীয় হবে: উপনিষদ্-সাহিত্যে যে-দেহাত্মবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার বিচারে পরবর্তীকালের দার্শনিকেরা বিবিধ বিচারের উল্লেখ করলেও দেহাত্মবাদটির আদি ও আদিম রূপ কী হতে পারে? প্রশ্নটির উত্তরে 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর সাক্ষ্যই প্রধান হবে, যদিও তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের আশায় আমরা পরবর্তীকালের অন্যান্য নানা গ্রন্থের নজিরও পর্যালোচনা করতে বাধ্য হবো।

১৪॥ লোকায়তিক ও কাপালিক

প্রাচীন লোকায়ত-মতের পুনর্গঠনে 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর আলোচ্য অংশে আরো কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব আমাদের পক্ষে এখানে উপনিষদ্-অংশটি সামগ্রিকভাবে উল্লেখ ও বিচার করা বিশেষ বাঞ্ছনীয় হবে:

অথ ইদানীং জ্ঞানোপসর্গা রাজন্ মোহজালস্য এষ বৈ যোনিঃ যৎ অস্বর্গ্যৈঃসহ স্বর্গ্যৈস্তু এষ বাট্যে পুরস্তাৎ উক্তে অপি অধঃ স্তম্বেন আশ্লিষ্যন্তি

—অথ যে চ অন্যে হ নিত্যপ্রমুদিতাঃ নিত্যপ্রবসিতাঃ নিত্যযাচকাঃ নিত্যং শিল্পোপজীবিনঃ

—অথ যে চ অন্যে হ পুরযাচকাঃ অযাজ্যযাজকাঃ শূদ্রশিষ্যাঃ শূদ্রাঃ চ শাস্ত্রবিদ্বাংসঃ

—অথ যে চ অন্যে হ চাটজটনটভটপ্রব্রজিতরঙ্গাবতারিণঃ রাজকর্মণি পতিতাদয়ঃ

—অথ যে চ অন্যে হ যক্ষ-রাক্ষসভূতগণপিশাচোরগগ্রহাদীনাং অর্থং পুরস্কৃত্য শময়ামঃ ইতি এবং ব্রুবাণাঃ

—অথ যে চ অন্যে হ বৃথা কষায়কুণ্ডলিনঃ কাপালিনঃ

—অথ যে চ অন্যে হ বৃথাতর্কদৃষ্টান্তকুহকেন্দ্রজালৈঃ বৈদিকেষু পরিস্থাতুম্ ইচ্ছন্তি তৈঃ সহ ন সংবসেৎ প্রকাশভূতাঃ বৈ তে তস্করাঃ অস্বর্গ্যাঃ ইতি এবং হি আহ—

নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈঃ মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ।
ভ্রাম্যন্ লোকঃ ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরং তু যৎ ॥ ৮ ॥

বৃহস্পতিঃ বৈ শুক্রঃ ভূত্বা ইন্দ্রস্য অভয়ায় অসুরেভ্যঃ ক্ষয়ায় ইমাম্ অবিদ্যাম্ অসৃজৎ ; তয়া শিবম্ অশিবম্ ইতি উদ্দিশন্তি অশিবং শিবম্ ইতি। বেদাদি-শাস্ত্রহিংসকধর্মাভিধ্যানম্ অস্তু ইতি বদন্তি। অতঃ ন এনাম্ অভিধীয়তে অন্যথা এষা বন্ধ্যা এব এষা রতিমাত্রং ফলম্ অস্যাঃ বৃত্তচ্যুতস্য ইব ন আরম্ভণীয়ঃ ইতি এবং হি আহ।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যা ইতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিতং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামাঃ বহবঃ লোলুপন্তে॥
বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যঃ তৎ উভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে ॥
অবিদ্যায়াম্ অন্তরে চেষ্টমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেন এব নীয়মানাঃ যথা অন্ধাঃ ॥ ৯ ॥

দেবাসুরাঃ হ বৈ যে আত্মকামাঃ ব্রহ্মণঃ অন্তিকং প্রযাতাঃ তস্মৈ নমস্কৃত্বা উচুঃ, ভগবন্ বয়ম্ আত্মকামাঃ সঃ ত্বং নঃ ব্রূহি ইতি। অতঃ চিরং ধ্যাত্বা অমন্যত। অন্যতাত্মানঃ বৈ তে অসুরাঃ অতঃ অন্যতমম্ এতেষাম্ উক্তং তৎ ইমে মূঢ়াঃ উপজীবন্তি অভিবঙ্গিনঃ তর্ধাভিঘাতিনঃ অনৃতাভিশংসিনঃ সত্যম্ ইব অনৃতং পশ্যন্তি। ইন্দ্রজালবৎ ইতি অতঃ তৎ বেদেষু অভিহিতং বৎ সত্যং তৎ বেদেষু উক্তং তৎ বিদ্বাংসঃ উপজীবন্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ন অবৈদিকম্ অধীয়ীত অয়ম্ অর্থঃ স্যাৎ ইতি ॥ ১০ ॥[১৪৭]

অনুবাদ ঃ

অতএব এখন জ্ঞানের ব্যাঘাতের বিষয় [বলা-হচ্ছে]। হে রাজন্, স্বর্গবিহীনদের সঙ্গে স্বর্গযুক্তদের [সম্পর্কই] মোহজালের উৎস। যেমন, সম্মুখে উপবন থাকলেও নিম্নস্থ তৃণকে আলিঙ্গন করে।

—যারা নিত্য-প্রমোদিত, নিত্য-পরিব্রাজক, নিত্য যাজ্ঞাকারী, নিত্য শিল্প-উপজীবী,

—এবং আরো যারা নগরে ভিক্ষাকারী, অযোগ্য-যজ্ঞকারী (অযোগ্য ব্যক্তির জন্য, বা অযোগ্যস্থলে বা অযোগ্যভাবে যজ্ঞ করে), যারা শূদ্র-শিষ্য এবং শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রবিদ্,

—এবং আরো অন্য যারা ভণ্ড-জটী-নট-ভাট ("চাট-জট-নট-ভট") রঙ্গাভিনয়-কুশল ও রাজকর্ম-পতিত,

—এবং আরো যারা যক্ষ-রাক্ষস-ভূতগণ-পিশাচ-সর্প-হাঙর প্রভৃতি [মন্ত্রবলে] শান্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ গ্রহণ করে,

---

১৪৭। 'মৈত্রী' ৭।৮-১০।

—এবং আরো যারা বৃথা কাষায়বস্ত্র-পরিহিত এবং কুণ্ডলধারী কাপালিক,

—এবং আরো যারা বৃথাতর্ক, দৃষ্টান্ত, কুহক, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দ্বারা বেদকে নস্যাৎ করতে ইচ্ছুক,—

তাদের সঙ্গে কখনো বাস করবে না। তারা প্রকাশ্য তস্কর, স্বর্গের অযোগ্য। কথিত হয়েছে :

নৈরাত্ম্যবাদের কুহকের দ্বারা, মিথ্যা দৃষ্টান্ত দ্বারা,
ভ্রান্ত হয়ে লোক বেদবিদ্যার সঙ্গে [তার] পার্থক্য জানতে পারে না ॥ ৮ ॥

বৃহস্পতি শুক্র হয়ে ইন্দ্রের অভয় এবং অসুরদের ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এই অবিদ্যা সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলে শিব অশিবরূপে এবং অশিব শিবরূপে উক্ত হয়। তারা বলে, বেদাদি শাস্ত্রর হিংসক ধর্মই প্রবর্তিত হোক। অতএব এই [উপদেশ] আমরা আলোচনা করবো না। কারণ, তা মিথ্যা, তা বন্ধ্যা, তার ফল নিছক রতিসুখ। বৃত্তচ্যুত (বিপথগামী) ব্যক্তির মতো। কথিত আছে :

"বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে যা প্রসিদ্ধ বা (পরস্পর থেকে) বিশেষ দূর, বিপরীত ও ভিন্নগতি (ভিন্নফলপ্রদা)। [আমি] নচিকেতকে বিদ্যাভিলাষী বলে জানি, কেননা বহু কামও তাকে প্রলুব্ধ করেনি"। ['কঠ-উপনিদ্', ২।৪, উদ্ধৃত]।

"যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের সহিত [সংযুক্ত], তিনি অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যার সাহায্যে অমৃত লাভ করেন"। ['ঈশা-উপনিষদ্' ১১, উদ্ধৃত]।

"যারা অবিদ্যামধ্যে অবস্থিত অথচ নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত মনে করে সেই মূঢ়রা অতি-কুটিল পথ পরিভ্রমণ করে—অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের মতো"। ['কঠ-উপনিষদ্', ২।৫ উদ্ধৃত।] ॥ ৯ ॥

দেব ও অসুরগণ (উভয়েই) আত্মকাম হয়ে (আত্মাকে জানতে ইচ্ছুক হয়ে) ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "হে ভগবন্, আমরা আত্মকাম; আপনি তাঁর কথা আমাদের বলুন।"

তারপর তিনি সুদীর্ঘ ধ্যান করে চিন্তা করলেন : "এই অসুরগণ নিশ্চয়ই আত্মা থেকে অন্য কিছুকে [আত্মা বলে জানবার যোগ্য]"। অতএব সেই মূঢ়গণকে অন্য [তত্ত্ব] উপদেশ দিলেন। অতএব সেই মূঢ়গণ অসঙ্গ-(বাসনা)-যুক্ত হয়ে বাস করে। তারা [পরপারের] তরী বিনাশ করে এবং মিথ্যার প্রশংসা করে। ইন্দ্রজালের মতো তারা মিথ্যাকেই সত্যরূপে দেখে।

অতএব বেদে যা উক্ত হয়েছে তাইই সত্য। বিদ্বানগণ তা জেনেই জীবনধারণ করবেন। অতএব ব্রাহ্মণ অবৈদিক [শাস্ত্র?] অধ্যয়ন করবেন না। এই হল উদ্দেশ্য॥ ১০॥

বলাই বাহুল্য, উপনিষদের এই অংশটিকে ঠিকমতো বুঝতে হলে সামগ্রিকভাবেই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ, স্বীকার করতে হবে, বেদ-বিরোধী "অবিদ্যা" অর্থে এখানে আগাগোড়া একই মত উদ্দিষ্ট হয়েছে। অসুর-মত অর্থে এবং বিশেষত বৃহস্পতি-প্রণীত বা বার্হস্পত্য মত অর্থে এই মতকে লোকায়ত আখ্যা দেবার যুক্তি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব উপনিষদের এই অংশেই আলোচ্য মতের সমর্থকদের—অর্থাৎ, সম্ভবত লোকায়তিকদের—সম্বন্ধে যে-চিত্তাকর্ষক ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার আলোচনা অবান্তর হবে না।

প্রথমত, "নট", "রঙ্গাবতারিণঃ" প্রভৃতি বিশেষণ থেকে নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতিতে তাদের আসক্তি সহজেই অনুমিত হয়। নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতির বিদ্যা সুপ্রাচীনকাল থেকে তথাকথিত "গান্ধর্ববেদ" নামে উল্লিখিত হয়েছে।[১৪৮] এই কারণে, 'মৈত্রী-উপনিষদ্' বর্ণিত স্বর্গ-বিহীনদের তথাকথিত গান্ধর্ববেদের অনুগামী মনে করা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু শুধু গান্ধর্ববেদ'ই নয়। তাদেরই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, "যক্ষরাক্ষসভূতগণপিশাচোরগগ্রহাদীনাম্ অর্থং পুরস্কৃত্য শময়াম ইতি এবং ব্রুবাণাঃ"। এ-বর্ণনা থেকে 'অথর্ববেদ'-অনুগামীদের কথা মনে পড়াও অসম্ভব নয়; কেননা বিশেষত 'অথর্ববেদ'-ই এ-জাতীয় মন্ত্র ও জাদু-অনুষ্ঠানের সঙ্কলন-শাস্ত্র। এমনকি, যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে: 'অথর্ববেদ'-এ তাদের পারদর্শিতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কি 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ কিছুটা নারাজ ভাবে ও অসন্তোষ সহকারে স্বীকার করা হয়েছে যে এরা শূদ্রশিষ্য ও শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রবিদ্ ছিল? "শূদ্রশিষ্যাঃ শূদ্রাঃ চ শাস্ত্রবিদ্বাংসঃ"—এই উক্তির অন্তত কোন সহজ ও সুস্পষ্ট তাৎপর্যান্তর পাওয়া যায় না। এবং শুধু শাস্ত্রবিদ্ই নয়; একই সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে, "অযাজ্যযাজকাঃ"; অর্থাৎ, তারা কোন রকম যজ্ঞানুষ্ঠানও করতো, যদিও অবশ্য উপনিষদের দৃষ্টিতে সে-যজ্ঞ গর্হিত বলেই বিবেচিত।

বৈদিক ঐতিহ্যে 'অথর্ববেদ'-এর স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিতর্কমূলক সমস্যা[১৪৯] নূতন করে উত্থাপন করাই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। তবুও লোকায়তিক প্রসঙ্গে 'অথর্ববেদ' ও তথাকথিত গান্ধর্ববেদের প্রশ্ন উত্থাপন

১৪৮। 'অভিনয়দর্পণ' অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃ. ১৫;১৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

Winternitz HIL i. 125 f. দ্রষ্টব্য।

করার বিশেষ কারণ আছে। কেননা, 'সর্বমতসংগ্রহ' নামে একটি মধ্যযুগীয় গ্রন্থে চার্বাকমত নিরূপণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করা হয়েছে :

"অর্থকামাবেব পুরুষার্থে ৗ, ন ধর্মঃ। তন্নিষ্ঠাথর্বগান্ধর্ববেদাবেব চ বেদৌ।"

—অর্থাৎ, (চার্বাকমতে) অর্থ ও কামই পুরুষার্থ, ধর্ম পুরুষার্থ নয়। এই অর্থ-ও কাম-নিষ্ঠ অথর্ববেদ এবং গান্ধর্ববেদই হল বেদ।[১৫০]

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, এই গ্রন্থেই চার্বাকমতের বর্ণনায় তিন বেদের নিন্দাসূচক লোকগাথাও উদ্ধৃত হয়েছে : "অগ্নিহোত্র, তিন বেদ প্রভৃতিকে বৃহস্পতি বুদ্ধিপৌরুষহীনদের জীবিকা বলেন," "তিন বেদের কর্তা ভণ্ড ও নিশাচর", ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, 'সর্বমতসংগ্রহ'-কারের মতে চার্বাকেরা অবশ্যই ঘোরতর বেদবিরোধী। কিন্তু তবুও তাঁরা 'অথর্ববেদ' এবং তথাকথিত গান্ধর্ববেদকে প্রামাণ্য বলে মনে করতেন। চার্বাক প্রসঙ্গে এই আপাত-অদ্ভুত মন্তব্যর কোথাও কোন ব্যাখ্যা পাইনি; আধুনিক অগ্রণী বিদ্বানকে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি, কথাটি 'সর্বমতসংগ্রহ'-কারের কল্পনা-প্রসূত হওয়াই সম্ভব।[১৫১] বলাই বাহুল্য, চার্বাক-সংক্রান্ত অধুনালভ্য অন্যান্য কোন নজিরের মধ্যে আলোচ্য উক্তির কোনরকম সমর্থন পাওয়া যায় না। কিন্তু 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর ইঙ্গিত থেকে কি অনুমান করা যায় না যে 'সর্বমতসংগ্রহ'-কার এখানে হয়ত কোন সুপ্রাচীন কিন্তু অধুনালুপ্ত ঐতিহ্যর উপরই নির্ভর করেছিলেন?

এখানে এজাতীয় আর একটি প্রশ্ন উত্থাপনের প্রলোভন হয়। উপনিষদের আলোচ্য অংশে স্বর্গবিহীন অবিদ্যানুগামী বা বার্হস্পত্য-মতানুগামীদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তারা নিত্যভ্রমণশীল ("নিত্যপ্রবসিতাঃ"), পরিব্রাজক ("প্রব্রজিতাঃ") এবং বাগ্‌বিশারদ ("মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ", "বৃথাতর্কদৃষ্টান্ত"… ইত্যাদি)। কথাগুলি মনে রেখে চার্বাক সংক্রান্ত 'মহাভারত'-এর একটি সুপ্রাচীন নজির বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্যায় যুদ্ধে আহত হয়ে মুমূর্ষু দুর্যোধন বিলাপ করছেন :

যদি জানাতি চার্বাকঃ পরিব্রাড়্ বাগ্‌বিশারদঃ ॥
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোঽপচিতিং মম।
সমন্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে ॥[১৫২]

১৫০। 'সর্বমতসংগ্রহ', গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃ. ১৫।

১৫১। পণ্ডিত সুখলালজী, ব্যক্তিগত পত্র, তারিখ ১৬. ৫. ৬৪।

১৫২। শল্যপর্ব, ৬৪।৩৮-৩৯। (গীতা প্রেস সংস্করণ)।

পরিব্রাজক, বাগ্‌বিশারদ চার্বাক যদি [এ-সংবাদ] জানতে পারেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক [নামে] পুণ্য [সরোবর তীরে] আমার জন্য অপচিতি (প্রতিশোধব্যবস্থা)[১৫৩] করবেন।

পরিব্রাজক। বাগ্‌বিশারদ। ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক পুণ্য সরোবরতীরে অপচিতি অনুষ্ঠানে নিযুক্ত। —চার্বাক বলতে এখানে আধুনিক অর্থে দার্শনিকের পরিবর্তে কোন-একরকম প্রাচীন সাধক-সম্প্রদাদের প্রতিনিধিরই অস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাকি? এই প্রশ্নের উত্তরে 'মহাভারত'-এর বর্ণনাটিতে যেটুকু বা সন্দেহের অবকাশ থাকে 'মৈত্রী-উপনিষদ্' বর্ণিত বার্হস্পত্য-মতানুসারীদের বর্ণনা থেকে বস্তুত তাও অপসারিত হয়:

"নিত্যপ্রমুদিতাঃ নিত্যপ্রবসিতাঃ নিত্যযাচকাঃ···চাটজটনটভট-প্রব্রজিতরঙ্গাবতারিণঃ···কাষায়কুণ্ডলিনঃ কাপালিনঃ···"

কাদের বর্ণনা? বেদনিন্দিত ও বেদনিন্দক হলেও অবশ্যই কোন-না-কোন সাধকসম্প্রদায়ভুক্তদেরই বর্ণনা। পরবর্তীকালে মূলত এ-জাতীয় সম্প্রদায়কেই আমরা আউল-বাউল, সহজিয়া-বৈষ্ণব, তান্ত্রিক-কাপালিক প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত হতে দেখেছি। কিন্তু তাই বলে মূল সাধক সম্প্রদায়টিকেই শুধু পরবর্তীকালের পরিচায়ক মনে করা ভুল হবে। আমরা পরে দেখবো, সুদূর অতীত থেকে মূলত এই সাধক সম্প্রদায়েরই একটি ধারা এদেশে প্রচলিত হয়েছে, যদিও অবশ্য স্থানকাল ভেদে তার নানা বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনও দেখা গিয়েছে। তাছাড়া, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেকথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তীকালে সহজিয়া কাপালিক প্রভৃতি নামে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলি মূলতই দেহবাদী: তাদের তত্ত্ব হল দেহতত্ত্ব, তাদের সাধনা হল কায়াসাধনা। আমরা আরো দেখবো, আধুনিক নানা বিদ্বান এই দেহতত্ত্বরই বিশেষ সূক্ষ্ম ও জটিল কোন-না-কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের অক্লান্ত প্রয়াস করলেও তত্ত্বটি বস্তুত প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ও প্রাক্-ভাববাদী পর্যায়ের ধ্যানধারণারই—এবং এই অর্থে কোন একরকম আদিম

১৫৩। মনিয়ার-উইলিয়মস্ (Monier-Williams SED 48) "অপচিতি"-র অর্থ করেছেন, retaliation, revenge। 'ঋগ্বেদ'-এ শব্দটি মাত্র একবার উল্লিখিত হয়েছে; "অবিদ্দেয়াম্ অপচিতিম্ বধত্রৈঃ" (৪।২৮।৪)। সায়ণ অর্থ করেছেন, "বধত্রৈঃ তেষাং শত্রূণাং প্রহারৈঃ অপচিতিং পূজাং জনেভ্য অবিদ্দেয়াম্ অলভেয়াম।" 'মহাভারত'-এর আলোচ্য অংশে শব্দটিকে এই অর্থে গ্রহণ করার সুযোগ নেই; কিন্তু এখানে "অভিচার" জাতীয় কোন অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত আছে কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর হবে না। কেননা, এখানে কোন একরকম জাদু-অনুষ্ঠান-মূলক প্রতিশোধ ব্যবস্থাই উল্লিখিত হওয়া স্বাভাবিক—ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক পুণ্য সরোবরতীরে বসে আর কোন্ ভাবে প্রতিশোধ অনুষ্ঠান করা সম্ভব?

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই—পরিচায়ক। এখানে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করাও হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না: 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ বার্হস্পত্য মতানুসারীদের বর্ণনার শেষে কি তাদের অধুনালুপ্ত কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থেরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? কেননা তা নাহলে, "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ন অবৈদিকং অধীয়ীত"—এই উপদেশের কোন সুস্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন হয়। "অধীয়ীত" শব্দটির ব্যবহার অকারণ হতে পারে না।

এখানে যে-অবৈদিক শাস্ত্র বা গ্রন্থের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হয়েছে তা যে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের হওয়া সম্ভব নয় সে-বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ হল বার্হস্পত্য মতানুসারীদের প্রসঙ্গে "কাষায়কুণ্ডলিনঃ কাপালিনঃ" বিশেষণ ব্যবহার। কেননা, কাপালিকাদি মত শুধু বৈদিক ঐতিহ্যেই নয়—বৌদ্ধাদি ঐতিহ্যেও বিশেষভাবে নিন্দিত। কিন্তু আপাতত বিলুপ্ত গ্রন্থাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র "কাপালিনঃ" শব্দটির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ যদি বার্হস্পত্য-মতানুসারীদের সুস্পষ্টভাবেই কাপালিক বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে গুণরত্ন-উক্ত লোকায়ত ও কাপালিকের তাদাত্ম্য নেহাতই তাঁর কল্পনা-প্রসূত নয়—কথাটির পিছনে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমান।

অবশ্যই লোকায়ত ও কাপালিকের এই তাদাত্ম্য আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে প্রতীত হতে পারে। আমরা একটু পরে দেখবো, লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় করার প্রয়াসে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী কী কঠিন সমস্যায় পড়েছেন এবং কতোরকম কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে সে-সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেছেন।[১৫৪] আমরা আরো দেখবো, প্রকৃত পক্ষে নির্ভরযোগ্য বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি বলেই দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী লোকায়ত ও কাপালিকের তাদাত্ম্য বিচারের সমস্যায় এজাতীয় কঠিন সংকটে পড়েছেন এবং 'চার্বাক দর্শন' নামে তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে বস্তুতপক্ষে সমস্যাটিকে পরিহার করেই তিনি যেন সংকটমুক্ত হতে চাইলেন: "মৈত্রায়ণী উপনিষদে কাপালিকগণকে লোকায়তিকগণের সহিত সমপর্যায়ে উল্লেখ করিয়া উভয়কেই অস্বর্গ্য, তস্কর ও সাধু সমাজের বর্জনীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দার্শনিক গুণরত্ন তর্করহস্যদীপিকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কাপালিকগণকে নাস্তিক,

---

১৫৪। বিশেষত D. R. Shastri, "The Lokayatikas and the Kapalikas" in the *Proceedings and Transactions of the Sixth All India Oriental Conference*, Patna 1930 দ্রষ্টব্য। একই বৎসরে প্রকাশিত *A Short History of Indian Materialism* ইত্যাদি গ্রন্থেও তিনি এই সমস্যাটি সমাধানের বিশেষ প্রয়াস করেন। কিন্তু ১৯৫৯-এ প্রকাশিত 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে তিনি হয়ত সমাধান-বিড়ম্বনা পরিহারের আশাতে সমস্যাটিকেই পরিত্যাগ করেন।

চার্বাক এবং লোকায়ত প্রভৃতি নামে অভিহিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাপালিক একটি ধর্মসম্প্রদায়; চার্বাক কোন ধর্মই স্বীকার করে না। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই, আপাতদৃষ্টিতে, অবৈদিক বা বেদবিরোধী এবং উভয় সম্প্রদায়েরই পুরুষার্থ 'কাম'। এই জন্যই বোধহয় কেহ কেহ এই উভয় সম্প্রদায়কে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।"[১৫৫] অর্থাৎ, লেখকের সিদ্ধান্ত, কাপালিক ও লোকায়তিককে সমপর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্বভাবতই অনুমান হয়, ইতিপূর্বে লেখক নিজেই কাপালিক ও লোকায়তিককে সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তিনি তা প্রত্যাহারই করতে চান; এই কারণেই তিনি 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে সমস্যাটির আর কোন উল্লেখও করেননি। বলাই বাহুল্য, পূর্ব-আলোচনা প্রত্যাখ্যানের অধিকার যে-কোন লেখকেরই বর্তমান। কিন্তু লোকায়তিক ও কাপালিকের সম্পর্কসূচক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নজির উপেক্ষা করার অধিকার সহজে স্বীকৃত হতে পারে না। অতএব 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ লোকায়তিক ও কাপালিক যদি সমপর্যায়ভুক্ত বলেই বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে আধুনিক বিদ্বানের পক্ষে একথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত হবে যে উক্ত সমপর্যায়করণের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য থাকাই সম্ভব। সেই সত্যের অনুসন্ধানই আধুনিক বিদ্বানের প্রকৃত দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। অবশ্যই এজাতীয় ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করার পক্ষে দক্ষিণারঞ্জন একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন: কাপালিক হল ধর্মসম্প্রদায়, লোকায়ত ঐকান্তিকভাবেই ধর্মবিরোধী। কিন্তু বেদবিরোধী এবং দেহাত্মবাদী বা দেহবাদী অর্থে বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও লোকায়তর সঙ্গে কোনরকম যজ্ঞ-মন্ত্র আচার-অনুষ্ঠানাদির সম্পর্ক থাকা যে অসম্ভব নয় —এবিষয়ে কিছু প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং পরে আরো কিছু প্রমাণ উল্লেখ করবো। বিশেষত এই কারণে লোকায়ত-মত সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাটি আমাদের কাছে সংশোধন-সাপেক্ষ বলেই প্রতীত হয়েছে। কাপালিক প্রসঙ্গেও প্রায় একই কথা। কেননা, কাপালিক বলতে আমরা যদিও কোন একরকম সাধন-সম্প্রদায়ই বুঝতে বাধ্য তবুও এই সাধন সম্প্রদায়ের আদি বা আদিম রূপটি যে অন্তত পরবর্তীকালের অর্থে "ধর্মসম্প্রদায়" না-হওয়াই স্বাভাবিক তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দক্ষিণারঞ্জনের উপরোক্ত উক্তির মধ্যেই বর্তমান। এ-সম্প্রদায়ের কাছে পুরুষার্থ বলতে "কাম"—অভ্যুদয় নয়, নিঃশ্রেয়স্ নয়[১৫৬]; স্বর্গ নয়, অপবর্গ নয়, নির্বাণ নয়,

---

১৫৫। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'চার্বাক দর্শন', ভূমিকা পৃ. গ।

১৫৬। 'বৈশেষিক-সূত্র' তে (১।২) ধর্মর লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে: "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"। অবশ্যই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে পুরুষার্থ হিসাবে অভ্যুদয়ের স্থান নেই, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই পুরুষার্থ। পক্ষান্তরে মীমাংসকেরা মুক্তি বা মোক্ষর

মোক্ষ নয়। অতএব অবশ্যই পরবর্তীকালের অর্থে ধর্মসম্প্রদায়ও নয়; কেননা স্বর্গ অপবর্গ প্রভৃতিকেই পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। অতএব, যে সম্প্রদায়ে পুরুষার্থ হিসাবে স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতির উল্লেখই নেই,—পক্ষান্তরে যে-সম্প্রদায়ে কামই একমাত্র পুরুষার্থ বলে উল্লিখিত,—সেটিকে অন্তত প্রচলিত অর্থে ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা পরে দেখবো, সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে প্রচলিত অর্থে ধর্মসম্প্রদায় না হয়েও সাধন-সম্প্রদায় হওয়া অবশ্যই সম্ভব; কিন্তু এই বিচারের উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষে মানব-ইতিহাসের আদিম পর্যায়ের কথা পর্যালোচনা করতে হবে। আপাতত মন্তব্য এই যে লোকায়ত সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার মতোই কাপালিক সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাও সংশোধন-সাপেক্ষ হওয়াই সম্ভব। অতএব, প্রথমটি ঐকান্তিক-ভাবেই ধর্মবিরোধী এবং দ্বিতীয়টি মূলতই ধর্মসম্প্রদায়—এজাতীয় যুক্তির উপর নির্ভর করে লোকায়তিক ও কাপালিকদের মধ্যে সম্পর্কসূচক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নজিরকে প্রত্যাখ্যান বা অবজ্ঞা করার অধিকার আমাদের বাস্তবিক নেই। বিশেষত মনে রাখা দরকার যে এজাতীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত শুধুমাত্র বৈদিক ঐতিহ্যেই সংরক্ষিত হয়নি, জৈন ঐতিহ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়—কেননা, গুণরত্নর পক্ষে বিশেষ করে জৈন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক।

১৫॥ লোকায়ত প্রসঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত নজিরগুলি নিয়ে। এজাতীয় নজিরের মধ্যেও কি লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকাদি প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্পর্কসূচক কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়? রিস্ ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হলে স্বীকার করতে হবে যে বস্তুতপক্ষে তা পাওয়া যায় না। কেননা তিনি অনুমান করেছেন, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকায়ত বলতে কোন একরকম ব্রাহ্মণ-জনোচিত বিদ্যাই উল্লিখিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ-জনোচিত এই বিদ্যার অর্থ হল 'নেচারলোর' (*Naturelore*)

প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে যদি বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ-জনোচিত বিদ্যা অর্থেই লোকায়ত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ঘটনাটিকে বিশেষ বিস্ময়কর বলেই স্বীকার করতে হবে। কেননা, তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যে লোকায়ত শব্দটির অন্য অর্থে

পরিবর্তে পুরুষার্থ হিসাবে বিশেষত স্বর্গই উল্লেখ করেন। কিন্তু এজাতীয় পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের মন্তব্য হল, পুরুষার্থ হিসাবে স্বর্গ ও মোক্ষর স্বীকৃতির ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য।

ব্যবহারের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ অন্তত আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকায়ত শব্দ কি প্রকৃতপক্ষে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ-জনোচিত বিদ্যা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে?

বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্নর সন্তোষজনক উত্তর পেতে হলে আমাদের পক্ষে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন।

এক: বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত যে-নজিরগুলির উপর নির্ভর করে রিস্ ডেভিড্স্ উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলির পুনর্বিচার।

দুই: স্বীয় প্রতিপাদ্য সমর্থনে তাঁর পক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্রেরই অন্যান্য যে-সব সাক্ষ্য অবজ্ঞা করার প্রয়োজন হয়েছে সেগুলিরও তাৎপর্য অনুসন্ধান।

লোকায়তকে ব্রাহ্মণোচিত কোন বিদ্যা বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে রিস্ ডেভিড্স্ মূলতই একজাতীয় সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করেছেন: প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের একরকম যেন ছকে-বাঁধা বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই বর্ণনায় নানা বিদ্যায় বা শাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তারই মধ্যে একটি বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসাবে উক্ত হয়েছে লোকায়ত।

সমস্ত 'ত্রিপিটক'-এ এই ছকে-বাঁধা বর্ণনাটি মোট কতোবার পাওয়া যায় আমরা ইতিপূর্বে তার পরিচয় দেখেছি। বর্তমানে বর্ণনাটির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তার পরিবর্তে প্রশ্ন তোলা দরকার, বর্ণনাটি থেকে লোকায়ত সংক্রান্ত ঠিক কী কথা প্রমাণ হয়? কিংবা, যা একই কথা, অম্বটঠ, সোনদণ্ড, প্রমুখ নানা ব্রাহ্মণের বর্ণনায় বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা বারবার এই জাতীয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতার একটি সুদীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করে ঠিক কী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন? তাঁদের অভিপ্রায় আসলে কী ছিল? এই প্রশ্নর মাত্র একটিই উত্তর সম্ভব। ভগবান বুদ্ধর মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, বৌদ্ধ শাস্ত্রে বারবার বিশেষ করে দেখানো হয়েছে যে এ-হেন বিদগ্ধ ব্রাহ্মণেরাও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধর কাছে পরাজয় স্বীকার করছেন, বুদ্ধর আনুগত্য অঙ্গীকার করছেন। যে-ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধর কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হচ্ছেন তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব যতো বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে বস্তুত-পক্ষে ততোই বেশি করে প্রতিপাদিত হবে বুদ্ধেরই গৌরব। এই পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের পক্ষে একটি বিশেষ প্রবণতাই অনুমিত হওয়া উচিত: আলোচ্য ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় সাধ্যমতো স্ফীত করা এবং এই কারণেই তাঁদের পক্ষে এই ব্রাহ্মণদের বর্ণনায় সেকালের সমস্ত রকম প্রসিদ্ধ বিদ্যার উল্লেখই স্বাভাবিক—তিন বেদে পারদর্শিতা থেকে শুরু করে মহাপুরুষলক্ষণ-বিদ্যায় পারদর্শিতা পর্যন্ত। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নানা বিদ্যা অবশ্যই সেকালের ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধর পরিচায়ক; কিন্তু তালিকার অন্তর্ভুক্ত

প্রতিটি বিদ্যাই যে অবধারিত ভাবে সেকালের ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক —আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে এজাতীয় অনুমানে ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে "মহাপুরুষলক্ষণ" নামে বিদ্যাটিরই উল্লেখ করা যায়। রিস্ ডেভিড্‌স্[১৫৭] নিজেই স্বীকার করছেন যে এই বিদ্যা বা শাস্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে সে-বিষয়ে আমাদের বর্তমান জ্ঞান অবশ্যই অসম্পূর্ণ; এ-বিষয়ে গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মন্তব্য হল, এজাতীয় কোনো বিদ্যায় পারদর্শিতা সেকালের ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধ্যের প্রকৃত পরিচায়ক হলে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যেও তার উল্লেখ প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই যে, প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যে উল্লিখিত বিবিধ বিদ্যার তালিকায় এজাতীয় কোন বিদ্যার আভাসও পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উপনিষদ্-সাহিত্যে সংরক্ষিত প্রাচীন বিদ্যার তালিকাটি বিচার করা যাক। "ছান্দোগ্য-উপনিষদ্"-এ উক্ত হয়েছে, নারদ সনৎকুমারের কাছে জ্ঞানপ্রার্থী হলে সনৎকুমার তাঁকে প্রশ্ন করেন, তুমি ইতিপূর্বে কী কী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছো প্রথমে তাইই বলো। উত্তরে নারদ বলেন, "হে ভগবন —ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদসমূহের বেদ (ব্যকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব উৎপাত সংক্রান্ত বিদ্যা, কালতত্ত্ব (বা ধনতত্ত্ব), বাকোবাক্য (বিতর্কবিদ্যা), নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ও দেবজন বিদ্যা,—হে ভগবন, আমি এই সমুদয় অবগত আছি।"[১৫৮] অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এখানে তালিকাটিকে যথাসম্ভব ব্যাপক করার আয়োজন হয়েছে। এবং এই তালিকায় মহাপুরুষলক্ষণ সংক্রান্ত কোন বিদ্যার আভাসমাত্রও নেই বলে আরো অনুমান করা যেতে পারে যে বৈদিক ঐতিহ্যের প্রাচীন প্রবক্তারা এজাতীয় কোন বিদ্যাকে বস্তুত পক্ষে বৈদগ্ধ্য-সূচক বলে বিবেচনা করেন নি, বা, তাঁরা এজাতীয় কোন বিদ্যার উপর কোন গুরুত্ব আরোপণ করেননি।

প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহাপুরুষলক্ষণে পারদর্শিতা ও লোকায়তে পারদর্শিতা প্রায়ই একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব উভয় প্রসঙ্গে একই মন্তব্য যুক্তিযুক্ত হবে। অর্থাৎ, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের স্থান বিশেষে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার সঙ্গে লোকায়তে পারদর্শিতা

১৫৭। Rhys Davids DB. i. 110 n. "Who will write us a monograph (historical of course) on the Maha-purusa theory as held in the early times among the Aryans in India?"

১৫৮। 'ছান্দোগ্য' ৭।১।২। উপনিষদ্-সাহিত্যে অন্যত্রও মোটের উপর একই রকম তালিকা পাওয়া যায়। যথা, 'বৃহদারণ্যক' ২।৪।১০; ৪।১।২: ৪।৫।১১। 'মহাভারত'-এ উল্লিখিত বিবিধ বিদ্যার একটি তালিকা পরে উদ্ধৃত হবে।

উল্লিখিত হলেও একথা প্রমাণ হয় না যে বৌদ্ধ ভারতে লোকায়তে পারদর্শিতা ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধ্যের অনিবার্য পরিচায়ক ছিল।

আমাদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই গুরুতর আপত্তি উঠবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা যে উদ্দেশ্যেই বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনাকে এ-ভাবে ফাঁপিয়ে তোলার আয়োজন করুন না কেন, তাঁদের পক্ষেও এই প্রসঙ্গে এমন কোন বিদ্যার উল্লেখ সম্ভব নয় যা বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মণোচিত বৈদগ্ধ্যের বিরুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণোচিত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে লোকায়তে পারদর্শিতার ঐকান্তিক বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকলে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের পক্ষেও বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় লোকায়তে পারদর্শিতার উল্লেখ স্বাভাবিক হতে পারে না। অতএব বৌদ্ধ শাস্ত্রের নজির থেকে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণের পক্ষে লোকায়তে পারদর্শিতা অসম্ভব ছিল না।

এই আপত্তি স্বীকারযোগ্য। কিন্তু তা স্বীকার করলেও রিস্ ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্ত স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। কেননা, বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণের পক্ষে লোকায়ত চর্চার সম্ভাবনা বা এমনকি লোকায়তে ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা এক কথা; কিন্তু বৌদ্ধ ভারতে লোকায়তে পারদর্শিতাকে ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক বিবেচনা করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। অর্থাৎ সে-যুগে লোকায়তে পারদর্শিতা ব্রাহ্মণ-বিশেষের পক্ষে সম্ভব হলেও তা ব্রাহ্মণ-সাধারণের বৈদগ্ধ্য-পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য নয়। সহজ কথায়, সেকালের কোনকোন ব্রাহ্মণ লোকায়ত চর্চা করতেন বা লোকায়তিক ছিলেন; কিন্তু তার মানে এই নয় যে লোকায়তে পারদর্শিতা সেকালে ব্রাহ্মণোচিত বলে প্রসিদ্ধ ছিল। অথচ এই দ্বিতীয় কথাটিই রিস্ ডেভিড্স্-এর প্রকৃত প্রতিপাদ্য-বিষয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় কথাটির বিরুদ্ধে বৌদ্ধ শাস্ত্রেই সুস্পষ্ট নজির বর্তমান। অর্থাৎ, বৌদ্ধ শাস্ত্রেরই অন্যান্য নজির থেকে অবধারিতভাবে প্রমাণ হয় যে সেকালে শুধুমাত্র কোনকোন ব্রাহ্মণ লোকায়তিক ছিলেন, বা, লোকায়তে পারদর্শিতা ব্রাহ্মণ-বিশেষেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বীয় প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এজাতীয় নজিরের সঙ্গতি হয় না বলেই কি রিস্ ডেভিড্স্-এর পক্ষে সেগুলিকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার প্রয়োজন হয়েছে?

এখানে এজাতীয় দুটি নজির উদ্ধৃত করা যাক।

'অঙ্গুত্তরনিকায়'-র অংশবিশেষকে "লোকায়তিক সুত্ত" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৫৯] এই অংশের শুরুতেই উক্ত হয়েছে—

> অথ খো দ্বে লোকায়তিকা ব্রাহ্মণা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু; উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু। সম্মোদনীয়ং কথং সারণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্না খো তে ব্রাহ্মণা ভগবন্তং এতদবোচুং—

১৫৯। 'অঙ্গুত্তরনিকায়', ৯।৪।৭।

—অর্থাৎ, একদা দুজন লোকায়তিক ব্রাহ্মণ ভগবানের (বুদ্ধর) নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, উপস্থিত হয়ে শিষ্টযোগ্য সম্মানাদি প্রদর্শন করেন এবং শিষ্টযোগ্য সম্মানাদি কথনের পর তাঁরা একদিকে উপবিষ্ট হন এবং একদিকে উপবিষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবানকে এই কথা বললেন…

লক্ষণীয় বিষয় হল, লোকায়তিক হিসাবে সুস্পষ্টভাবেই এখানে শুধুমাত্র দুজন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের কথাই উক্ত হয়েছে। এই সাক্ষ্যটি থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে সেকালে শুধুমাত্র কোনকোন ব্রাহ্মণ লোকায়তিক ছিলেন,—অর্থাৎ, লোকায়তে পারদর্শিতা ব্রাহ্মণ-বিশেষেরই পরিচায়ক ছিল, সাধারণভাবে ব্রাহ্মণোচিত বৈদগ্ধর পরিচায়ক নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু এই দুজন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা কেন লোকায়তিক বলে বর্ণনা করলেন? তাঁদের বিশ্বাস বা আচরণের এমন কী বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য তাঁরা লোকায়তিক বলে উল্লিখিত হয়েছেন? এ-বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অনিবার্য হলেও পালি শাস্ত্রকারেরা বুদ্ধর মহিমা প্রচারেই এমন ঐকান্তিকভাবে ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁরা উপরোক্ত প্রশ্নর উত্তরসূচক কোন ইংগিত দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। অর্থাৎ, 'অঙ্গুত্তরনিকায়'র এই "লোকায়ত সুত্ত" থেকে এমন আর-কোন তথ্য পাওয়া যায় না যা আজ আমাদের পক্ষে লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। অংশটির সংক্ষিপ্তসার থেকে একথা সুস্পষ্ট হবে।

সেই লোকায়তিক ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, "পূরণ কস্সপ নিজেকে চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী বলে ঘোষণা করে থাকেন এবং তিনি দাবি করেন, 'অনন্ত জ্ঞানের ফলে আমি জানি যে এই লোক বা জগৎ অন্তবৎ (বা সসীম)'। অপরপক্ষে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত-ও নিজেকে চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি দাবি করেন, 'অনন্ত জ্ঞানের ফলে আমি জানি এই লোক বা জগৎ অনন্ত (বা অসীম)'। দুজনেই এই ভাবে নিজেদের চরম জ্ঞানের অধিকারী বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু দুজনে এজাতীয় পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলেন। এঁদের মধ্যে কার কথা সত্য, কার কথা মিথ্যা (কো সচ্চং আহ, কো মুসা)?"

উত্তরে বুদ্ধ সেই লোকায়তিক ব্রাহ্মণদ্বয়কে বলেন, "যথেষ্ট হয়েছে। আমি তোমাদের ধর্ম (ধম্ম) উপদেশ দেবো। শ্রবণ কর।" এবং বুদ্ধর সেই উপদেশের সারমর্ম হল, শতায়ু ব্যক্তিও যদি সারা জীবন ধরে অবিরাম ভাবে পথে অতিক্রম করে চলে তাহলেও তার পক্ষে জগতের সীমা পার হওয়া সম্ভব হবে না; কিন্তু জগতের সীমা অতিক্রম না-করলে দুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব। ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) যেভাবে (অর্থাৎ-ধর্ম-সম্মত সাধনার সাহায্যে) জগতের সীমা অতিক্রম করেন শুধুমাত্র সেইভাবেই তা করা সম্ভব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, বুদ্ধর এই উপদেশ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মর স্বরূপ বোঝার পক্ষে সহায়ক হলেও, ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’-র আলোচ্য অংশ থেকে লোকায়তিক ব্রাহ্মণদ্বয় সম্বন্ধে বড় জোর এটুকু তথ্য পাওয়া যায় যে তাঁরা জগৎ সসীম না অসীম এই প্রশ্নর দুটি পরস্পর-বিরোধী উত্তর শুনে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন এবং বুদ্ধর কাছে জানতে চান দ্বিবিধ উত্তরের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা। স্বভাবতই এটুকু তথ্য প্রাচীন লোকায়তিকদের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে খুব বেশি সহায়ক নয়[১৬০]। কিন্তু রিস্‌ ডেভিড্‌স্‌-এর সিদ্ধান্ত বর্জনের পক্ষে আলোচ্য সাক্ষ্য পর্যাপ্ত হবে: এখানে দুজন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই তাঁদের লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অতএব বৌদ্ধ ভারতে লোকায়তে ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণ-বিশেষেরই পরিচায়ক ছিল, সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ-বৈদগ্ধর পরিচায়ক নয়।

প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রেই এবিষয়ে আরো সাক্ষ্য সংরক্ষিত হয়েছে। ‘সংযুক্তনিকায়’-র একটি অংশকেও “লোকায়তিকসুত্ত” আখ্যা দেওয়া হয়[১৬১]। এই অংশেও দেখা যায়, জনৈক নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই তাঁকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে:

> সাবত্থিয়ং বিহরতি। অথ খো লোকায়তিকো ব্রাহ্মণো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি। সম্মোদনীয়ং কথং সারণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো লোকায়তিকো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদবোচ…

—অর্থাৎ, তখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বিহার করছেন। সে-সময় জনৈক লোকায়তিক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে তিনি ভগবানকে সম্মানসূচক সম্বোধনাদি করেন। সম্মানসূচক সম্বোধনাদির পর তিনি একপাশে উপবিষ্ট হন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই লোকায়তিক ব্রাহ্মণ ভগবানকে এই কথা বলেন…

এখানেও সুস্পষ্টভাবেই একজন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের উদ্দেশ্যেই তাঁকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, ‘সংযুত্তনিকায়’-র এই অংশে যেমন জনৈক লোকায়তিক ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হয়েছে তেমনি এরই পূর্ববর্তী অংশে অন্যান্য প্রকার ব্রাহ্মণের

১৬০। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, Pali Text Society-র ইংরেজী তর্জমায় (*The book of Gradual Sayings*, vol. iv, London 1935, p. 287) এখানের “লোকায়তিক” শব্দকে “skilled in metaphysics” করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই অর্থ তর্জমাকারের কল্পনাপ্রসূত। পালি ভাষ্যকারেরা শব্দটির অর্থ করেছেন “লোকায়ত-পাঠকা”।

১৬১। ‘সংযুত্তনিকায়’ ১২।৪৮।৫০॥

কথা উল্লিখিত হতে দেখা যায়। তার থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, নানা প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট একপ্রকার ব্রাহ্মণকেই লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু ঠিক কোন্ মত পোষণের জন্য বা ঠিক কোন্ কারণে এই নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণটি লোকায়তিক হিসাবে বর্ণিত হয়েছেন,—অর্থাৎ, লোকায়তিকের লক্ষণ আসলে কী,—দুঃখের বিষয় বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা এখানে সে-বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট কোন ইংগিত দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি[১৬২]। তার কারণ, বুদ্ধর মাহাত্ম্য প্রচার এবং বুদ্ধর উপদেশ ব্যাখ্যা করাই বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, বুদ্ধ সেই লোকায়তিক ব্রাহ্মণকে কী উপদেশ দিলেন এবং সে-উপদেশ শুনে উক্ত লোকায়তিক ব্রাহ্মণ কীভাবে বুদ্ধর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন—তারই বর্ণনা বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। 'সংযুক্তনিকায়'-র আলোচ্য অংশের সংক্ষিপ্তসার থেকেই একথা বোঝা যাবে:

সেই লোকায়তিক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, "হে গোতম, সর্বং অস্তি'—এই কথাই কি আপনার মতে সত্য?"

বুদ্ধ বললেন, "হে ব্রাহ্মন, 'সর্বং অস্তি'—এই কথা হল জ্যেষ্ঠ (প্রধান) লোকায়ত।"

[লোকায়তিক ব্রাহ্মণ]—"হে গোতম, 'সর্বং নাস্তি'—এই কথাই কি আপনার মতে সত্য?"

[বুদ্ধ]—"হে ব্রাহ্মণ, 'সর্বং নাস্তি'—এই কথা হল দ্বিতীয় লোকায়ত।"

[লোকায়তিক ব্রাহ্মণ]—"হে গোতম, 'সর্বং একত্বং'—এই কথাই কি আপনার মতে সত্য?"

[বুদ্ধ]—"হে ব্রাহ্মণ, 'সর্বং একত্বং'—এই কথা হল তৃতীয় লোকায়ত।"

[লোকায়তিক ব্রাহ্মণ]—"হে গোতম, 'সর্বং পৃথুত্বং'—এই কথাই কি আপনার মতে সত্য?"

[বুদ্ধ]—"হে ব্রাহ্মণ, 'সর্বং পৃথুত্বং'—এই কথা হল চতুর্থ লোকায়ত। তথাগত এজাতীয় কোন একান্তবাদ গ্রহণ করেন না; মধ্য পন্থা অনুসরণ

১৬২। এজাতীয় ইংগিতের অভাবে Pali Text Society-র ইংরেজী অনুবাদে (PTS Translation Series, No. 10, *The Book of Kindred Sayings*, ii. 53) এখানে "লোকায়তিক ব্রাহ্মণ"-এর অর্থ করা হয়েছে, "a world-wise Brahmin"। এজাতীয় তর্জমা থেকে লোকায়িত শব্দর প্রকৃত অর্থ সংক্রান্ত অনুবাদকারীদের অনিশ্চয়তাই প্রতিপন্ন হয়।

করে তিনি ধর্ম উপদেশ দেন: অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন হয় সংস্কার, সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় বিজ্ঞান..."

বুদ্ধর এই উপদেশ শুনে লোকায়তিক ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হয় এবং বুদ্ধর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এখানেও লোকায়তিক ব্রাহ্মণের নিজস্ব উক্তি থেকে শুধুমাত্র এটুকু অনুমানই নিরাপদ হবে যে তিনি বিবিধ ও পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক তত্ত্ব শুনে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন এবং সেগুলির মধ্যে কোন্ মত সত্য সে-বিষয়ে বুদ্ধর উপদেশ জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকায়তিক ব্রাহ্মণের নিজস্ব মত ঠিক কী—সে-বিষয়ে আলোচ্য কথোপকথন থেকে কোন নির্ভরযোগ্য ইংগিত পাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে একথা সুবিদিত যে বুদ্ধ নিজে কোন রকম দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধেই উৎসাহী ছিলেন না। আলোচ্য অংশে তিনি অবশ্য 'সর্বং অস্তি', 'সর্বং নাস্তি' প্রভৃতি কয়েকটি ঐকান্তিক সিদ্ধান্তকে জ্যেষ্ঠ লোকায়ত, দ্বিতীয় লোকায়ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা এখানে বিদ্রূপাত্মক ভাবেই ঐকান্তিক তত্ত্বমাত্রকেই "লোকায়ত" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে-উল্লেখ থেকে প্রকৃত লোকায়ত মত সংক্রান্ত কোন অনুমান নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র এটুকু অনুমানই নিরাপদ হবে যে বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণ-বিশেষই লোকায়তিক বলে উল্লিখিত; অতএব লোকায়তে ব্যুৎপত্তি সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ বৈদগ্ধর পরিচায়ক নয়।

কিন্তু প্রাচীনকালে কোন কোন ব্রাহ্মণ যে বাস্তবিকই লোকায়তিক ছিলেন—একথা অনুমানের জন্য আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের উপরই নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। কেননা, 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণ'-এও এবিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান।

'মহাভারত'-এ উক্ত হয়েছে, রাজা দুষ্মন্ত কণ্বর আশ্রমে প্রবেশ করে বিবিধ বিপ্রকে বিবিধ শাস্ত্র-চর্চায় নিযুক্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয় হল 'মহাভারত'-বর্ণিত এই বিপ্রতালিকায় সুস্পষ্টভাবেই লোকায়তিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা[১৬৩]—

> যজ্ঞবিদ্যাঙ্গবিদ্ভিশ্চ যজুর্বিদ্ভিশ্চ শোভিতম্।
> মধুরৈঃ সামগীতৈশ্চ ঋষিভির্নিয়তব্রতৈঃ ॥ ৩৮ ॥
> ভারুণ্ডসামগীতাভিরথর্বশিরসোদ্গতৈঃ।
> যতাত্মভিঃ সুনিয়তৈঃ শুশুভে স তদাশ্রমঃ ॥ ৩৯ ॥
> অথর্ববেদপ্রবরাঃ পূগযজ্ঞিয়সামগাঃ।
> সংহিতামীরয়ন্তি স্ম পদক্রমযুতাং তু তে ॥ ৪০ ॥

১৬৩। 'মহাভারত', আদিপর্ব, ৭০।৩৮-৪৭।। (গীতা প্রেস সং)

শব্দসংস্কারসংযুক্তৈর্ব্বদ্ভিশ্চাপরৈর্দ্বিজৈঃ।
নাদিতঃ স বভৌ শ্রীমান্ ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥ ৪১ ॥
যজ্ঞসংস্তরবিদ্ভিশ্চ ক্রমশিক্ষাবিশারদৈঃ।
ন্যায়তত্ত্বাত্মবিজ্ঞানসম্পন্নৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ৪২ ॥
নানাবাক্যসমাহারসমবায়বিশারদৈঃ।
বিশেষকার্যবিদ্ভিশ্চ মোক্ষধর্মপরায়ণৈঃ ॥ ৪৩ ॥
স্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্তপরমার্থজ্ঞতাং গতৈঃ।
শব্দচ্ছন্দোনিরুক্তজ্ঞৈঃ কালজ্ঞানবিশারদৈঃ ॥ ৪৪ ॥
দ্রব্যকর্মগুণজ্ঞৈশ্চ কার্যকারণবেদিভিঃ।
পক্ষিবানররুতজ্ঞৈশ্চ ব্যাসগ্রন্থসমাশ্রিতৈঃ ॥ ৪৫ ॥
নানাশাস্ত্রেষু মুখ্যৈশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতম।
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥ ৪৬ ॥
তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রান্ নিয়তান্ সংশিতব্রতান্।
জপহোমপরান্ বিপ্রান্ দদর্শ পরবীরহা ॥ ৪৭ ॥

—অনুবাদঃ যজ্ঞবিদ্যাঙ্গবিদ্ ও যজুর্বিদ্‌গণ দ্বারা, মধুর সামগান দ্বারা ও নিয়তব্রত ঋষিদের দ্বারা শোভিত ॥ ৩৮ ॥ আথর্বণিক কর্তৃক ভারুণ্ড-সামগান গীত হচ্ছিল; সুনিয়ত জিতাত্মগণ কর্তৃক সেই আশ্রম শোভা পাচ্ছিল ॥ ৩৯ ॥ অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠগণ, পূগযজ্ঞের উপযোগী সামগানকারিগণ পদপাঠ-ক্রমপাঠ সংযোগে সংহিতা উচ্চারণ করছিলেন ॥ ৪০ ॥ অপর দ্বিজগণ কর্তৃক শব্দসংস্কারযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা সেই আশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের মতো মনে হচ্ছিল ॥ ৪১ ॥ ন্যায়তত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণ; নানা বাক্যের সমাহার-সমবায়ের বিশারদগণ; বিশেষ কার্যজ্ঞগণ; মোক্ষধর্মপরায়ণগণ; স্থাপন-আক্ষেপ-সিদ্ধান্ত-ও-পরমার্থজ্ঞগণ; শব্দ-ছন্দ-নিরুক্ত-জ্ঞানবিশিষ্টগণ; কালজ্ঞান-বিশারদগণ; দ্রব্য-কর্ম-গুণজ্ঞগণ, কার্যকারণ বেত্তাগণ; পক্ষী ও বানরের ভাষায় অভিজ্ঞগণ; ব্যাসগ্রন্থ আশ্রয়কারিগণ—এই নানাশাস্ত্রের মুখ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ শুনেছিলেন; লোকায়তিক মুখ্যগণ কর্তৃক চারিদিক থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল; [তাও শুনেছিলেন] ॥ ৪২-৪৬ ॥ পরবীরহা (দুষ্মন্ত) সেইখানে সেই সমস্ত নিয়তব্রতধারী বিপ্র-শ্রেষ্ঠগণকে দেখেছিলেন; জপ-হোম-পরায়ণ বিপ্রদের দেখে-ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

এখানে কয়েকটি শব্দর প্রকৃত অর্থ নিয়ে অল্পবিস্তর সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে; বিশেষত কণ্বর আশ্রমে লোকায়ত মুখ্যগণ চারিদিক থেকে ঠিক কী উচ্চারণ করেছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে উক্ত হয়নি। তবুও অন্যান্য বিপ্রদের সঙ্গে লোকায়ত মুখ্যদের এই উল্লেখ অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।

'রামায়ণ'-এর নজিরটি আরো স্পষ্ট।

অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, রামচন্দ্রর চিত্রকূটে অবস্থান কালে জটাচীরধারী বিবর্ণ কৃশকায় ভরত তাঁর কাছে আগমন করেন। রামচন্দ্র ভরতকে ক্রোড়ে বসিয়ে কুশল-সংবাদাদি প্রশ্ন করেন এবং নানা বিষয়ে—বিশেষত রাজ্য পরিচালন বিষয়ে—সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। এই উপদেশ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন,[১৬৪]

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥

—অর্থাৎ, হে বৎস, আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণগণের সেবা করছ না; তারা অনর্থকুশল এবং পণ্ডিতম্মন্য হলেও বালক। এই দুর্বুদ্ধিগণ মুখ্য ধর্মশাস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আন্বীক্ষিকী-বুদ্ধি আশ্রয় ক'রে নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ করে।[১৬৫]

লোকায়তর সঙ্গে আন্বীক্ষিকীর বা প্রাচীন তর্কবিদ্যার সম্পর্ক এবং আন্বীক্ষিকীর প্রতি প্রাচীন বেদপন্থীদের মনোভাব পরে আলোচনা করা যাবে। আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, 'রামায়ণ'-এর আলোচ্য নজিরটিতে ধর্মশাস্ত্র উপেক্ষা করে আন্বীক্ষিকী-বুদ্ধি আশ্রয় করার অভিযোগে লোকায়তিকেরা বিশেষ নিন্দিত হলেও এই নজিরটি থেকে অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয় যে সেকালে এক ধরনের ব্রাহ্মণ লোকায়তিক ছিলেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অবান্তর হবে না। ইতিপূর্বে 'মৈত্রী-উপনিষদ্' এবং গুণরত্নর রচনায় লোকায়ত সংক্রান্ত আমরা যে-ইংগিত পেয়েছি তার সঙ্গে 'রামায়ণ'-এর এই নজিরটির কি কোন অসংগতি হয়? আমাদের বিচারে প্রশ্নটির উত্তর নেতিবাচক হতে বাধ্য, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে অসংগতি-কল্পনার কোন বাস্তব কারণ নেই। 'রামায়ণ'-এ লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হল, তারা ধর্মশাস্ত্র

১৬৪। 'রামায়ণ', অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০।৩৮-৯॥ (রামরত্নম প্রকাশিত সং, মাদ্রাজ ১৯৫৮)।

১৬৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "লোকায়তিক" শব্দর পরিবর্তে "লৌকায়তিক" শব্দর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। "পাণিনি (৪।২।৬০)...লোকায়ত শব্দটিকে উক্‌থাদিগণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে ব্যক্তি লোকায়ত শাস্ত্র জানে বা অধ্যয়ন করে সে 'লৌকায়তিক'। বার্তিককার সূত্র করিলেন—মুখ্যার্থাত্তু ক্‌থ শব্দাট্‌ঠগণৌ নেয্যতে। উদাহরণ—লোকায়তম্, লৌকায়তিকঃ।... ভট্ট উৎপল 'বৃহৎসংহিতা'র টীকায় বলিয়াছেন,—"অপরে, অন্যে লৌকায়তিকাঃ স্বভাবং জগতঃ কারণমাহুঃ। এই স্থলে লৌকায়তিক শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে"।—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'চার্বাকদর্শন', পৃ. ১৬২॥

অবজ্ঞা করে অন্বীক্ষিকী-বুদ্ধি আশ্রয় করে। 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এও বৃহস্পতি-মতানুসারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণাভরে উক্ত হয়েছে, "বৃথাতর্কদৃষ্টান্ত-কুহকেন্দ্রজালৈঃ বৈদিকেষু পরিস্থাতুম্ ইচ্ছন্তি,"—তারা বৃথাতর্ক দৃষ্টান্ত কুহক ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দ্বারা বেদকে নস্যাৎ করতে ইচ্ছা করে। অতএব 'রামায়ণ' এবং 'মৈত্রী-উপনিষদ্' উভয় গ্রন্থেই লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে ধর্মশাস্ত্র-বিরোধী ও বেদ-বিরোধী তর্কব্যবহারের অভিযোগ পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্যই 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এ বৃহস্পতি-মতানুসারীদের শূদ্র ও শূদ্রশিষ্য বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঘৃণাসূচক অতিরঞ্জনের পরিচায়ক হওয়া অসম্ভব নয়—বিশেষত এই কারণে নয় যে তৎসত্ত্বেও 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এই স্বীকৃত হয়েছে যে এরা শাস্ত্রজ্ঞ এবং যজ্ঞসম্পাদনকারী। গুণরত্ন অবশ্য সরাসরি বলছেন, এই লোকায়তিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং নিম্নজাতীয় উভয়ই বর্তমান : "ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্যজাতাশ্চ"[১৬৬]। গুণরত্নব এই উক্তির সঙ্গে 'রামায়ণ'-এর নজিরটির সুস্পষ্ট সংগতি হয়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, 'মৈত্রী-উপনিষদ্' এবং গুণরত্নর সুস্পষ্ট উক্তি অনুসারে লোকায়তিক বলতে কাপালিক ও সুপ্রাচীন তন্ত্রসাধক প্রভৃতিই বোঝা স্বাভাবিক। এঁদের পক্ষে কোন্ অর্থে বেদ-বিরোধী বা ধর্মশাস্ত্র-বিরোধী তর্কব্যবহারী হওয়া সম্ভব—সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে এখানে অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে : একালের ব্রাহ্মণ-বিশেষের মতোই সেকালের ব্রাহ্মণ-বিশেষের পক্ষেও যেহেতু কাপালিকাদি সাধনমার্গ অবলম্বনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না সেইহেতু কি অনুমান করা যেতে পারে যে 'রামায়ণ'-এও এজাতীয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদেরই "লোকায়তিক ব্রাহ্মণ" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ?

অবশ্য, প্রাচীন কালে লোকায়তিক বলতে কাপালিক, তান্ত্রিক প্রভৃতিরাই উল্লিখিত হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নর পূর্ণাঙ্গ উত্তর পাবার জন্য আমাদের পক্ষে লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যগুলির বিচার করা প্রয়োজন। এবং এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য নজিরগুলির আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। ইতিপূর্বে দেখেছি, স্বয়ং রিস্ ডেভিড্‌স লোকায়ত সংক্রান্ত বৌদ্ধশাস্ত্রর যে-নজিরগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলি থেকে শুধুমাত্র এইটুকু প্রমাণ হতে পারে যে সেকালে ব্রাহ্মণ-বিশেষ লোকায়তে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু লোকয়ত বলতে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা ঠিক কী বুঝতেন—তার ইঙ্গিত পাবার জন্য বৌদ্ধ শাস্ত্ররই আর-এক জাতীয় সাক্ষ্যর বিচার বিশেষ প্রয়োজন।

'বিনয়পিটক'-এ "ছব্‌বগ্‌গিয় ভিক্‌খু" নামে ছ'জন বৌদ্ধ ভিক্ষুর একটি

১৬৬। 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ. ৩০০।

দল বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এদের নিয়ে বুদ্ধ নিজে বিশেষ বিব্রত হয়েছিলেন; কেননা এরা ছিল অত্যন্ত চতুর ও প্রভাবশালী এবং এরা নানাভাবে বৌদ্ধ সংঘর নিয়ম লঙ্ঘন করত। বস্তুত, এদের আচরণে উত্যক্ত হয়েই বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে পালনীয় নানা নিয়ম প্রবর্তন করেন[১৬৭]। 'চুল্লবগ্‌গ'-তে [১৬৮] এদের প্রসঙ্গেই উক্ত হয়েছে:

> সে সময় 'ছব্‌বগ্‌গিয় ভিক্‌খু'গণ লোকায়ত অধ্যয়ন করতে থাকে ("লোকায়তং পরিয়াপুনন্তি")। জনসাধারণ তাই নিয়ে কানাকানি শুরু করে: ভিক্ষুরা তাহলে গৃহীর মতোই কামভোগ করছে! [অন্যান্য] ভিক্ষুরা সাধারণের এই কানাকানি শোনেন এবং ভগবান বুদ্ধকে সে-কথা জানান। বুদ্ধ প্রশ্ন করেন, "যারা লোকায়তর আদর করে তাদের পক্ষে কি ধর্ম ও বিনয়-এর ("ধম্মবিনয়ে") সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা ও ধর্ম-বিনয়ে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করা সম্ভব?" [ভিক্ষুরা বলেন], "তা সম্ভব নয়।" [বুদ্ধ প্রশ্ন করেন] "কিংবা যারা ধর্ম-বিনয়কে সাদরে গ্রহণ করে তাদের পক্ষে কি লোকায়ত অধ্যয়ন সম্ভব?" [ভিক্ষুরা বলেন] "তা সম্ভব নয়।" [বুদ্ধ বলেন] "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা লোকায়ত অধ্যয়ন করতে পারবে না। যারা তা করবে তারা 'দুক্কট'[১৬৯] অপরাধে অপরাধী হবে।"
>
> সে সময়ে ছব্‌বগ্‌গিয় ভিক্‌খুরা লোকায়ত শেখাতে শুরু করে ("লোকায়তং বাচেন্তি")। লোকেরা তাই নিয়ে কানাকানি শুরু করে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বুদ্ধ ঘোষণা করেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা লোকায়ত শিক্ষা দিতে পারবে না। যারা তা করবে তারা দুক্কট অপরাধে অপরাধী হবে।"
>
> ঠিক একইভাবে বুদ্ধ "তিরচ্ছানবিজ্জা"-র নিন্দা করেন এবং ভিক্ষুদের পক্ষে তা শিক্ষা করা বা তাতে শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

"তিরচ্ছানবিজ্জা" কথাটির সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধশাস্ত্রকারদের বিচারে অত্যন্ত গর্হিত বিদ্যাই এই নামে উল্লিখিত। "তিরচ্ছান" মানে জানোয়ার[১৭০]; "তিরচ্ছানবিজ্জা" মানে জানোয়ারসুলভ বিদ্যা—অত্যন্ত ঘৃণ্য, অত্যন্ত নীচ বিদ্যা। অল্‌ডেন্‌বার্গ ও রিস্ ডেভিড্‌স্ তর্জমা করছেন, *low arts, literally, 'brutish or beastly wisdom'*। উপরোক্ত

১৬৭। 'পাচিত্তিয়' (নবনালন্দা সং), ভূমিকা পৃ. xv দ্রষ্টব্য।

১৬৮। 'চুল্লবগ্‌গ', ৫।১৭।৪৪-৪৫॥

১৬৯। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে একরকম অপরাধ-বিশেষের নাম 'দুক্কট'। এই অপরাধ অবশ্য তুলনায় কম গুরুতর।

১৭০। PTS Dictionary।

উদ্ধৃতিতে অবশ্য "লোকায়ত" এবং "তিরচ্ছানবিজ্জা" স্বতন্ত্রভাবেই উল্লিখিত; কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্যত্র দেখা যায়, লোকায়ত তিরচ্ছানবিদ্যা হিসাবেই—বা তিরচ্ছানবিদ্যার অন্তর্গত হিসাবেই—বারবার উক্ত হয়েছে। যেমন 'দীঘনিকায়'-তে 'ব্রহ্মজালসুত্ত'র অন্তর্ভুক্ত 'মহাসীল' অংশে [১৭১] উক্ত হয়েছে:

'যথা বা পনেকে ভোন্তো সমণব্রাহ্মণা সদ্ধাদেয্যানি ভোজনানি ভুঞ্জিত্বা তে এবরূপায় তিরচ্ছানবিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিতং কপ্পেন্তি, সেয্যথিদং—সুবুট্ঠিকা ভবিস্সতি, দুব্বুট্ঠিকা ভবিস্সতি, সুভিক্খং ভবিস্সতি, দুব্ভিক্খং ভবিস্সতি, খেমং ভবিস্সতি, ভয়ং ভবিস্সতি, রোগো ভবিস্সতি, আরোগ্যং ভবিস্সতি, মুদ্দা, গণনা, সঙ্খানং, কাবেয্যং, লোকায়তং ইতি বা ইতি, এবরূপায় তিরচ্ছানবিজ্জায় মিচ্ছাজীবা পটিবিরতো সমণো গোতমো'তি—ইতি বা হি, ভিকখবে, পুথুজ্জনো তথাগতস্স বণ্ণং বদমানো বদেয্য। [১৭২]

অর্থাৎ [সারমর্ম] যদিও কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন ভোজন করে মিথ্যা-জীবিকা রূপ "তিরচ্ছানবিজ্জা"র সাহায্যে—[যথা] "সুবৃষ্টি হবে," "অনাবৃষ্টি হবে", "সুভিক্ষ হবে," "দুর্ভিক্ষ হবে," শান্তি হবে," "ভয় হবে," "রোগ হবে," "আরোগ্য হবে," "মুদ্রা (হস্তরেখা পাঠ?")", "গণনা" "সংখ্যা," "কাব্য" ও "লোকায়ত"—জীবনধারণ করে তবুও তথাগত গোতম ভিক্ষুদের "তিরচ্ছানবিজ্জা" থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন।

"তিরচ্ছানবিজ্জার" এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও, [১৭৩] এখানে মোটের উপর নানা রকম ভবিষ্যৎ বাণী, গণনা প্রভৃতির সাহায্যে জীবিকা উপায় অর্জনই উল্লিখিত হয়েছে। হয়তো আজো গ্রামাঞ্চলে অনেকে যেরকম ঝাড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতির সাহায্যে, মাদুলি-তাবিজ বিক্রি কয়ে জীবিকা অর্জন করে অনেকটা সেই রকমই। এ-জাতীয় জীবিকার তালিকায় লোকায়তর উল্লেখ অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা তাহলে কি লোকায়ত বলতে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতির সমগোত্রীয় কিছু বোঝাতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নর উত্তর প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, বৌদ্ধ শাস্ত্রে "তিরচ্ছানবিজ্জা" হিসাবে শুধুমাত্র উপরোক্ত তালিকাটিই উল্লিখিত নয়। বস্তুত, 'দীঘনিকায়'-র

১৭১। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে এই অংশটি অত্যন্ত প্রাচীন বলেই বিবেচিত : Rhys Davids in SBE xi. 188 দ্রষ্টব্য।

১৭২। 'দীঘ', ১।১।২।২৫॥ 'দীঘনিকায়'-র 'সামঞ্ঞফলসুত্ত'-তেও হুবহু এই কথাগুলিরই পুনরুক্তি পাওয়া যায়—'দীঘ' ১।২।৫।৬০॥

১৭৩। Rhys Davids DB i. 21-22n দ্রষ্টব্য।

'ব্রহ্মজালসুত্ত'-র অন্তর্ভুক্ত সমগ্র 'মহাসীল'[১৭৪] অংশটিতেই বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা "তিরচ্ছানবিজ্জা"রই নিন্দা করেছেন এবং এজাতীয় নিন্দিত জীবিকা-উপায় হিসাবে অন্তত শতাধিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—যদিও অবশ্য তার মধ্যে পুনরুক্তির অভাব নেই। 'সামঞ্‌ঞফলসুত্ত'-তেও হুবহু একই 'মহাসীল' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১৭৫] "তিরচ্ছানবিজ্জা" হিসাবে নিন্দিত এই শতাধিক বিষয়ের তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা অবশ্যই ক্লান্তিকর হবে; তার পরিবর্তে শুধু মনে রাখা দরকার যে এই তালিকায় ঝাড়ফুঁক, তুকতাক জাতীয় বিষয় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এবং এই কারণেই অলডেন্‌বার্গ ও রিস্‌ ডেভিড্‌স্‌ "তিরচ্ছানবিজ্জার" সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে বলছেন: *divination, spells, omens, astrology, sacrifices to gods, witchcraft and quackery*[১৭৬]। লোকায়ত বলতে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা যদি এ-জাতীয় "তিরচ্ছানবিজ্জার" অন্তর্ভুক্ত কিছুই বুঝে থাকেন, তাহলে আমাদের পক্ষে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অসংগত হবে না: এ-জাতীয় লোকায়তিকেরাই কি 'মৈত্রী-উপনিষদ্‌'-এ "যক্ষরাক্ষস-ভূতগণপিশাচোর-গগ্রহাদীনাং অর্থং পুরস্কৃত্য শময়ামঃ" বলে এবং বার্হস্পত্য মতানুসারী হিসাবেই নিন্দিত হয়েছিল? অর্থাৎ, বৌদ্ধশাস্ত্রর "তিরচ্ছানবিজ্জার" নজির থেকে সেই পুরোনো ইংগিতটিতেই প্রত্যাবর্তন করার প্রলোভন হয়: লোকায়তিক বলতে প্রাচীনকালে হয়তো এমন ব্যক্তিদেরই উল্লেখ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে যাদের আমরা কাপালিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি নানা নামে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত হয়েছি।

অন্তত এখানে একটি কথা স্বীকারযোগ্য হবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত যদি "তিরচ্ছানবিজ্জা"র অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই উল্লিখিত হয়ে থাকে এবং "তিরচ্ছানবিজ্জা" বলতে যদি মূলতই '*divination, spells, omens, astrology, sacrifices to gods, witchcraft and quackery*' উক্ত হয়ে থাকে, তাহলে অনুমান করা অসংগত হবে না যে বৌদ্ধশাস্ত্র-বর্ণিত লোকায়তিকদেরই নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। আমরা একটু পরেই দেখবো, বৌদ্ধ সাহিত্যে বস্তুতপক্ষে এবিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণও বর্তমান। কিন্তু সেগুলি উল্লেখ করার আগে "তিরচ্ছানবিজ্জা" সংক্রান্ত নজিরগুলির পর্যালোচনা সমাপ্ত করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৭৪। 'দীঘ', ১।১।২।২১-২৭॥

১৭৫। 'দীঘ', ১।২।৫।৪৬-৬২॥ এছাড়াও, 'দীঘ', ১।৮।৫।২১ এবং ১।১০।২।৮এও "তিরচ্ছান-বিজ্জার" অসম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়; বস্তুত এগুলি 'দীঘ' ১।১।২।২১-এরই পুনরুক্তিমাত্র।

১৭৬। Oldenberg and Rhys Davids in SBE xx. 152.

"লোকায়ত" ছাড়াও বৌদ্ধ সাহিত্যে "লোককৃথায়িকা" শব্দ পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ তার অর্থ করেছেন, লোকায়ত-সম্প্রদায়ের মতামত।[১৭৭] অতএব এই শব্দটিকেও লোকায়ত-মতের পরিচায়ক বলেই গ্রহণ করার সুযোগ আছে। এবং লক্ষণীয় বিষয় হল, "তিরচ্ছানকথা"রই একরকম প্রায় ছকে-বাঁধা তালিকায় এই শব্দটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে :

> রাজকথং, চোরকথং, মহাত্তকথং, সেনাকথং, ভয়কথং, যুদ্ধকথং, অন্নকথং, পানকথং, বথকথং, সয়নকথং, মালাকথং, গন্ধকথং, ঞাতিকথং, যানকথং, গামকথং, নিগমকথং, নগরকথং, জনপদকথং, ইত্থিকথং, পুরিসকথং, সুরকথং, বিসিখাকথং, কুম্ভট্ঠানকথং, পুব্বপেতকথং, নানত্তকথং, লোককৃথায়িকং, সমুদ্দকৃথায়িকং ইতি ভবাভবকথং

'মহাবগ্‌গ'[১৭৮] এবং 'পাচিত্তিয়'-তে[১৭৯] উক্ত হয়েছে, 'ছব্বগ্‌গিয়' ভিক্ষুগণ উপরোক্ত "তিরচ্ছানকথা" বলতে শুরু করেন এবং অবশ্যই বুদ্ধ ঘোষণা করেন, এ-জাতীয় "তিরচ্ছানকথা" বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'দীঘনিকায়'-তেও[১৮০] একই তালিকা হিসাবে বর্ণিত "তিরচ্ছানকথা"র বিশেষ নিন্দা করা হয়েছে। 'পারাজিক'-তে[১৮১] "তিরচ্ছানকথিকা" ভিক্ষুর নিন্দা দেখা যায়। কিন্তু শুধু ভিক্ষুই নয়, ভিক্ষুণীরাও যাতে "তিরচ্ছানবিজ্জা" বা "তিরচ্ছানকথা"র সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক না-রাখেন এবিষয়েও বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা বিশেষ নির্দেশ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন[১৮২]।

সহজেই অনুমান হয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা যেহেতু এতোবার এবং এতোভাবে "তিরচ্ছানবিজ্জা" ও "তিরচ্ছানকথা"র—অতএব তদন্তর্গত "লোকায়ত" এবং "লোককৃথায়িকার"ও—নিষেধ ঘোষণা করেছেন সেইহেতু সেকালে নিশ্চয়ই জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা প্রবণতা বর্তমান ছিল; কেননা এই "তিরচ্ছানবিগ্‌গার" প্রতি প্রবণতা যদি খুবই সীমাবদ্ধ হয় তাহলে তা নিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের পক্ষে এতোখানি চিন্তিত হবার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, "রাজকথা" "চোরকথা" প্রভৃতি বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে সেবিষয়ে আধুনিককালে অল্পবিস্তর সংশয়ের অবকাশ থাকলেও এবিষয়ে আধুনিক

১৭৭। Rhys Davids DB i. 14 n. : 'Buddhaghosa refers this specially to such speculations as put forth according to the Lokayata system'.

১৭৮। 'মহাবগ্‌গ' ৫।৭।১৫॥

১৭৯। 'পাচিত্তিয়' ৫।৮৫।২০৮॥

১৮০। 'দীঘ', ১।১।২।১৭॥; ১।২।৫।৫২ ; ১।৯।১।৩ ; ৩।২।১।২॥

১৮১। 'পারাজিক', ২।৮।১৪৯॥

১৮২। 'পাচিত্তিয়' ৪।৪৯-৫০ : "যা পনা ভিক্‌খুনী তিরচ্ছানবিজ্জং বাচেয্য, পাচিত্তিয়ং"।

বিদ্বানেরা হয়তো একমত হবেন যে উপরোদ্ধৃত তালিকায় যে-বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে মোটের উপর *folk-lore* বা *nature-lore* জাতীয় কোন আখ্যা দেওয়া হয়তো অসংগত হবে না! অতএব, লোকায়ত বা লোককথায়িকাকেও তারই সমগোত্রীয় বিবেচনা করার সুযোগ থাকতে পারে।

তাহলে কি আমরা রিস্ ডেভিড্স্-এর নির্দেশ অনুসরণ করে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত লোকায়ত শব্দটিকে *folk-lore* বা *nature-lore* অর্থেই গ্রহণ করবো? আমরা এই প্রশ্নর নেতিবাচক উত্তরে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি। তার প্রধান কারণ হল, রিস্ ডেভিড্স্ প্রস্তাবিত *nature-lore* অর্থের সঙ্গে কোনরকম মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ সাহিত্যেরই সাক্ষ্য অনুসারে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে লোকায়তর সঙ্গে কোনরকম মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক অবশ্যই বর্তমান ছিল। অর্থাৎ, বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত লোকায়ত শব্দকে নিছক *folk-lore* বা *nature-lore* অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে বৌদ্ধ সাহিত্যে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য নজিরগুলি বিশেষ অন্তরায় হবে।

এখানে এ জাতীয় তিনটি সুস্পষ্ট নজির উল্লেখ করা যায়।

এক: মহাযান বৌদ্ধদের একটি অত্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থর নাম 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'। গ্রন্থটির রচনাকাল প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও তা খ্রীষ্টীয় ২০০-র পরবর্তী না-হওয়াই সম্ভব[১৮৩]। খ্রীষ্টীয় ২৫৫-তে এই গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়, অতএব মূল গ্রন্থটির রচনাকাল আরো অনেক পূর্ববর্তী। এবিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে পরিবর্তিত হয়; বুদ্ধ নিজে দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বৃথা-চিন্তার নিন্দা করলেও মহাযান সম্প্রদায়ে দার্শনিক তত্ত্বর প্রতিই বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। কিন্তু সেই কারণে আমাদের পক্ষে একথা মনে করার সুযোগ নেই যে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্তরা বৌদ্ধধর্মর বিরুদ্ধ মতগুলিরও কোনরকম কাল্পনিক পরিচয় উদ্ভাবন করেছেন। পক্ষান্তরে অনুমান করা অসংগত হবে না যে পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধারণভাবে সমস্ত দার্শনিক মতের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী বিভিন্ন মতবাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করার তাগিদ থাকা স্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ে দার্শনিক তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপণের ফলেই সম্প্রদায়ান্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রবণতাই তুলনায় বেশি সম্ভব। অতএব, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থে লোকায়ত সংক্রান্ত যে-তথ্য পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

১৮৩। Valle Poussin in ERE viii. 146 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বা পালি বৌদ্ধশাস্ত্রর মতোই মহাযান-সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থটিতেও লোকায়ত বিশেষভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। তথাগতর প্রকৃত অনুগামীদের প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে কাব্য, নৃত্য, নাট্য, মল্ল প্রভৃতির মতোই লোকায়তেও তাদের অভিরুচি থাকবে না[১৮৪]: "ন চ তেষাং লোকায়তে রুচির্ভবিষ্যতি"। লোকায়ত সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার উপর নির্ভর করে কার্ন মন্তব্য করেছেন, লোকায়তিক বলতে এখানে ভারতীয় ভোগবাদী-বস্তুবাদী দার্শনিকেরাই উক্ত হয়েছেন, প্রাচীন গ্রীক্ দর্শনের এপিকিউরাস্-পন্থীদের মতো।[১৮৫] কিন্তু 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই অনুমান হয় যে লোকায়ত এবং লোকায়তিক সংক্রান্ত এই প্রচলিত ধারণাটি সংশোধনসাপেক্ষ। কেননা, প্রকৃত বোধিসত্ত্বর পক্ষে কী কী বিষয় পরিত্যাজ্য ও নিন্দিত তার বর্ণনায় এই গ্রন্থেই উক্ত হয়েছে:

যদা [চ] মঞ্জুশ্রীর্বোধিসত্ত্বো মহাসত্ত্বো ন রাজানং সংসেবতেন রাজপুত্রান্ন রাজমহামাত্রান্ন রাজপুরুষান্ সংসেবতে ন ভজতে ন পর্যুপাস্তে [নোপসংক্রামতি] নান্যতীর্থ্যাংশ্চরক [তীর্থকান্ সেবতি ন চ চারকান্ন] পরিব্রাজকাজীবকনিগ্রন্থান্ন কাব্যশাস্ত্রপ্রসৃতান্ সত্ত্বান্ সংসেবতে ন ভজতে ন পর্যুপাস্তে। ন চ লোকায়তমন্ত্রধারকান্ন লোকায়তিকান্ সেবতে ন ভজতে ন পর্যুপাস্তে ন চ তৈঃ সার্ধং সংস্তবং করোতি। ন চণ্ডালান্ন মৌষ্টিকান্ন সৌকরিকান্ন কৌক্কুটিকান্ন মৃগলুব্ধকান্ন মাংসিকান্ন নটনৃত্যকান্ন মল্লান্নন্যানি পরেষাং রতিক্রীড়াস্থানানি তানি নোপসংক্রামতি[১৮৬]।

অর্থাৎ,

—হে মঞ্জুশ্রী, বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব যখন রাজার, রাজপুত্রর, রাজমহামাত্যরও ও রাজপুরুষের সেবা করবে না, নিকটে যাবে না; যখন সে অন্য তীর্থিকদের (অর্থাৎ, সম্প্রদায়ান্তরভুক্তদের)—যথা, চরকদের, পরিব্রাজকদের, আজীবিকদের, নিগ্রন্থদের (অর্থাৎ জৈনদের)—সেবা করবে না, ভজনা করবে না, নিকটে যাবে না; যখন সে কাব্যামোদী-দের সেবা করবে না, ভজনা করবে না, নিকটে যাবে না; যখন সে লোকায়তমন্ত্রধারক লোকায়তিকদের সেবা করবে না, ভজনা করবে না, নিকটে যাবে না, বা তাদের সঙ্গে কোনরকম আলাপ-আলোচনা করবে না; যখন সে চণ্ডালদের, মৌষ্টিকদের, শূকর-কুক্কুট-মৃগ-মাংস

১৮৪। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক পৃ. ১৮০।

১৮৫। Kern in SBE xxi. 437n: "The Lokayatikas are the Indian Epicureans."

১৮৬। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' পৃ. ২৭৬।

পসারীদের, নট-নৃত্য-মল্লজীবীদের এবং রতিক্রীড়াস্থানসমূহের সংস্পর্শে আসবে না……

দুঃখের বিষয় এই অংশে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সাক্ষ্যটিই আধুনিক বিদ্বানদের তর্জমায় অস্পষ্ট ও এমনকি অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কেননা, আমাদের কাছে প্রধানতম প্রশ্ন হল, এখানে "লোকায়তমন্ত্রধারকান্ লোকায়তিকান্" কথার অর্থ ঠিক কী? কার্ন তর্জমা করেছেন, '*adepts at worldly spells and votaries of a worldly philosophy*'[১৮৭]। অবশ্য, *worldly philosophy*-র অর্থ অস্পষ্ট নয়; তা কোন এক রকম অধ্যাত্মবাদবিরোধী বা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক হবে। এই প্রসঙ্গেই হয়তো আরো অনুমান করা যায় যে যেহেতু আমাদের দেশে প্রাচীনকালে অধ্যাত্মবাদ বনাম বস্তুবাদের সংঘর্ষ মূলতই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সংক্রান্ত বিতর্কর উপরই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, সেইহেতু এখানে *worldly philosophy* বলতেও মূলতই দেহাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদ উক্ত হওয়া অসম্ভব নয়—হয়তো সেই বা সেই জাতীয় সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদকেই 'ছান্দোগ্য' এবং 'মৈত্রী' উপনিষদেও অসুর-মত নামে নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, *worldly philosophy*-র সমর্থকদের এজাতীয় কোন অর্থে বোঝবার সুযোগ থাকলেও একই সঙ্গে তাদের *adepts at worldly spells* বলার তাৎপর্য কী? ইহলৌকিক বা নৈসর্গিক মন্ত্র মানে কী? স্বভাবতই, প্রশ্নটির কোন সুবিদিত বা প্রসিদ্ধ উত্তর উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, "লোকায়ত-মন্ত্রধারকান্ লোকায়তিকান্" শব্দের অর্থ বোঝার পক্ষে কার্ন-এর এই তর্জমা আমাদের বিশেষ সহায়ক হয় না।

রিস্ ডেভিড্স্ প্রস্তাবিত তর্জমা প্রসঙ্গেও একই কথা। তিনি তর্জমা করেছেন, '*the Lokayatikas who know by heart the Lokayata mantras (mystic verses)*'[১৮৮]। "মন্ত্র" শব্দর অর্থ অবশ্যই সুস্পষ্ট; *mystic verse* হিসাবে ইংরেজীতে শব্দান্তরিত হলে এই সুস্পষ্ট অর্থ অনুধাবনের হয়তো কিছুটা অন্তরায় ঘটে। তাছাড়া, লোকায়তিকদের সঙ্গে *mystic verse*-এরই বা সম্পর্ক কীভাবে পরিকল্পিত হতে পারে—সে-বিষয়ে রিস্ ডেভিড্স-এর রচনায় লেশমাত্র ইংগিতও পাওয়া যায় না। বিশেষত তিনি নিজে লোকায়তর অর্থ করেছেন *folk-lore* বা *nature-lore*; তার সঙ্গে লোকগাথার সম্পর্ক বোঝা গেলেও কোন রকম মন্ত্রতন্ত্রর সম্পর্ক অনুমান করা সহজসাধ্য নয়।

অতএব, সংক্ষেপে, আধুনিক বিদ্বানেরা আলোচ্য "লোকায়তমন্ত্রধারক"

১৮৭। Korn in SBE xxi. 263.

১৮৮। Rhys Davids DB i. 169.

শব্দকে যে-অর্থে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা আমাদের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না। পক্ষান্তরে, ইতিপূর্বে 'মৈত্রী উপনিষদ'-এ আমরা বার্হস্পত্য-মতানুসারীদের যে বর্ণনা পেয়েছি সেই বর্ণনা অনুসারেই যদি প্রাচীন লোকায়তিকদের বোঝবার প্রয়াস করি তাহলে 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-র এই নজিরটি লোকায়ত সংক্রান্ত নূতন কোন সমস্যা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বস্তুতপক্ষে লোকায়ত সংক্রান্ত মূল সমস্যাটির উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। কেননা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লোকায়তিক বলতে যদি কাপালিক-তান্ত্রিকাদিই উক্ত হয়ে থাকে তাহলে তাদের পক্ষে "মন্ত্রধারক" হওয়াই স্বাভাবিক, যদিচ বৈদিক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এজাতীয় মন্ত্রতন্ত্রকে প্রায়ই ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন। সেই কারণেই কি 'মৈত্রী উপনিষদ্'-এ এদের আচরণাদির বর্ণনায় "কুহকেন্দ্রজালৈঃ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল ?

দুই: প্রাচীন লোকায়তিকদের সঙ্গে যে মন্ত্রতন্ত্রর সম্পর্ক বাস্তবিকই ছিল এ-বিষয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-র উপরোদ্ধৃত নজিরটিই একমাত্র নজির নয়। 'দিব্যাবদান'-এও এবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে 'দিব্যাবদান'-এর অধুনা-লভ্য সংস্করণটির কালনির্ণয় করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে এ-গ্রন্থে সংকলিত অবদানগুলি বস্তুত প্রাচীনতর হওয়াই সম্ভব[১৮৯]। এজাতীয় একটি অবদানের নাম 'শার্দূলকর্ণ অবদান'। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে এটি চীনা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল এবং প্রায়াংশেই অবদানটি বিশেষ প্রাচীন[১৯০]। এই অবদানটিতে লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দ[১৯১] নিন্দার্থে উল্লিখিত হয়নি; পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের স্থানবিশেষে যেভাবে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় লোকায়তে পারদর্শিতা উল্লিখিত হয়েছে এই অবদানটিতেও লোকায়তে পারদর্শিতা ঠিক সেইভাবেই উল্লিখিত। এজাতীয় উল্লেখের মধ্যে আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হল :

> ভূতপূর্বং ভিক্ষবোঽতীতেঽধ্বনি গঙ্গাতটেঽতিমুক্তকদলীপাটল-কামলকীবনগহনপ্রদেশে তত্র ত্রিশঙ্কুর্নাম মাতঙ্গরাজঃ প্রতিবসতি স্ম। সংবহুলৈশ্চ মাতঙ্গসহস্রৈঃ সার্ধম্। স পুনর্ভিক্ষবঃ ত্রিশঙ্কুঃ মাতঙ্গরাজঃ পূর্বজন্মাধীতান্ বেদান্ সমনুস্মরতি স্ম সাঙ্গোপাঙ্গন্ সরহস্যান্ সনিঘণ্ট কৈটভান্ সাক্ষরপ্রভেদান্ ইতিহাসপঞ্চমান্ অন্যানি চ শাস্ত্রানি পদকো

১৮৯। Macdonell in FRE viii. 88

১৯০। Cowell & Neil 655.

১৯১। 'দিব্যাবদান', ৬১৯, ৬৩০, ৬৩১।

বৈয়াকরণ্যো লোকায়তিকযজ্ঞমন্ত্রে মহাপুরুষলক্ষণে নিষ্ণাতো নিষ্কাং[illegible] ভাষ্যং চ যথাধর্মং বেদব্রতপদান্যনুশ্রুতং চ ভাষতে স্ম। ১১২

অর্থাৎ,

—হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে পথের পার্শ্বে গঙ্গাতটে অতিমুক্ত-লতা, কদলি, পাটলক ও আমলকি বনের গহন প্রদেশে বহু সহস্র মাতঙ্গগণের সঙ্গে ত্রিশঙ্কু নামে মাতঙ্গরাজ বাস করতেন। হে ভিক্ষুগণ, সেই ত্রিশঙ্কু নামক মাতঙ্গরাজ পূর্বজন্মে অধীত বিভিন্ন শাখার বেদসকল, বেদাঙ্গসমূহ, রহস্যশাস্ত্র, নিঘণ্টু ও কৈটভশাস্ত্র, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ ও ইতিহাস (পঞ্চম বেদ) স্মরণ করতে পারতেন। পদজ্ঞ ও বৈয়াকরণ (ত্রিশঙ্কু) লোকায়তিক যজ্ঞমন্ত্রে ও মহাপুরুষলক্ষণে নিষ্ণাত হয়ে ও আকাঙ্ক্ষা-বিহীন হয়ে ভাষ্য ও যথাধর্ম বেদ ও ব্রতপাদ-সমূহ শ্রুতি অনুসারে বলতে পারতেন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রকাদের পক্ষে তিন বেদে পারদর্শিতার সঙ্গে লোকায়তে পারদর্শিতার উল্লেখ করায় কোন বাধা হয়নি এবং তাঁরা প্রায়ই লোকায়তর সঙ্গে মহাপুরুষলক্ষণ-সংক্রান্ত কোন একরকম প্রাচীন বিদ্যারও উল্লেখ করেছেন—যদিও সে-বিদ্যার স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু 'দিব্যাবদান'-এর আলোচ্য উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আমাদের কাছে বিশেষ প্রশ্ন হল: "লোকায়তিকযজ্ঞমন্ত্রে··· নিষ্ণাতঃ" কথার তাৎপর্য কী হতে পারে? উত্তরে স্বীকার করতে হবে, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-র মতোই 'দিব্যাবদান'-এর এই সাক্ষ্য অনুসারেও লোকায়তিকদের কোন রকম বিশিষ্ট যজ্ঞ-মন্ত্র ছিল। আর একথা স্বীকার্য হলে লোকায়ত সংক্রান্ত 'মৈত্রী উপনিষদ্' ও 'তর্করহস্যদীপিকা'-র উক্তিতেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ, স্বীকার করতে হয়, বৈদিক, জৈন এবং বৌদ্ধ এই ত্রিবিধ ঐতিহ্যেই ইংগিত পাওয়া যায় যে প্রাচীন কালে লোকায়তিক বলতে সম্ভবত কাপালিক-তান্ত্রিক প্রভৃতিই উল্লিখিত হয়েছেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাপালিকাদি গুহ্য সাধন সম্প্রদায়, এবং এ-জাতীর সাধন সম্প্রদায়ের দীক্ষা-ব্যবস্থার কথাও সুবিদিত। অতএব প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লোকায়ত বলতে কাপালিকাদিই যদি উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে লোকায়তে দীক্ষা গ্রহণের ইংগিতও প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক হবে। 'দিব্যাবদান'-এ-ব্যবহৃত "নিষ্ণাতঃ" শব্দ থেকে কি আমরা সেই ইংগিত পাই?

তিন: হয়তো লামা তারনাথ রচিত বৌদ্ধধর্মর ইতিহাস থেকেও

১১২। ঐ ৬১৯।

লোকায়তে দীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্তই আর-একটি ইংগিত পাওয়া যায়। অবশ্যই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-গ্রন্থের যাথার্থ্য নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়েছে; কিন্তু বিশেষত ভারতীয় সাধন-সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থটির গুরুত্ব অস্বীকার করা অধিকাংশ বিদ্বানের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই কথা মনে রেখে নিম্নোক্ত সাক্ষ্যটি বিচার করা যেতে পারে। রাজা অশোকের জীবনী-প্রসঙ্গে তারনাথ মন্তব্য করছেন: (অশোকের পিতা) নেমিত-র প্রথম পুত্র লোকায়তিকদের গুহ্যবিদ্যায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র মহাদেব উপাসকদের, তৃতীয় পুত্র বিষ্ণু-উপাসকদের, চতুর্থ পুত্র বেদান্তে, পঞ্চম পুত্র নিগ্রন্থ পিঙ্গলের এবং ষষ্ঠ-পুত্র ব্রাহ্মণ কৌশিকের গুহ্যবিদ্যায় দীক্ষা লাভ করেন; এঁরা প্রত্যেকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের মতামতকে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান দেন।[১২৩]

তারনাথের উপরোক্ত উক্তি থেকে অন্তত একটি কথা অনুমিত হয়। বৌদ্ধ আচার্যরা লোকায়ত বলতে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতোই কোন একরকম সাধন-সম্প্রদায় বুঝতেন এবং বৌদ্ধ আচার্যদের মুখে মুখে সে-কথা সুদূর তিব্বত পর্যন্ত পরিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, লোকায়ত বলতে তাঁদের পক্ষে ঠিক কোন্ বা কোন্ ধরনের সাধন-সম্প্রদায় বোঝবার সম্ভাবনা ছিল? ইতিপূর্বে আলোচিত লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্য মনে রাখলে আমাদের পক্ষে এ-প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই পাবার সুযোগ থাকে: মূলত যে-সাধন সম্প্রদায় দেশকালভেদে

১২৩। IHQ-1930. 334 (Taranatha, *History of Buddhism in India*, Tr. from the German version of A. Schiefner. by U.N. Ghosal & N. Dutta): "Of the sons of the king (Nemita, Asoka's father) the first revered, the secret teaching of the Lokayatikas, the second Mahadeva, the third Visnu. the fourth the secret teaching of the Vedanta, the fifth the Nirgrantha Pingala. and the sixth the Brahmana Kausika Brahmacarya; each of them gave to the teaching honoured by him a place of abode." প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে সম্ভবত জৈন ঐতিহ্যেও লোকায়তে "দীক্ষা গ্রহণ" সংক্রান্ত কোন প্রসিদ্ধি প্রচলিত ছিল এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের লেখক শীলাঙ্কের কাছে এ-প্রসিদ্ধি কিছুটা অদ্ভুত বলে প্রতীত হওয়াই সম্ভব। হয়তো সেই কারণেই তিনি সরাসরি লোকায়তে দীক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে সম্প্রদায়ান্তরে দীক্ষিতের পক্ষেই লোকায়ত-মত গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, তাঁর এই ব্যাখ্যা অনুসারেও লোকায়তিকেরা দীক্ষাহীন বা অদীক্ষিত নন। 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র'-র ভাষ্যে (নির্ণয়সাগর সং., পৃ. ২৮০) তিনি মন্তব্য করেছেন, যদিও লোকায়তিকদের কোন দীক্ষানুষ্ঠান নেই তবুও অন্যান্য সাধনমার্গে দীক্ষাগ্রহণের পর কেউ কেউ লোকায়ত অধ্যয়ন করেন ও লোকায়তিক হন: "যদ্যপি লোকায়তিকানাং নাস্তি দীক্ষাদিকং তথাঽপি অপরেণ শাক্যাদিনা প্রব্রজ্যাবিধানেন প্রব্রজ্য পশ্চাৎ লোকায়তিকম্ অধীয়ানস্য তথাবিধপরিণতেঃ তৎ এবাঽভিরুচিতম্"।

কাপালিক-তান্ত্রিক, সহজিয়া-বৈষ্ণব, আউল-বাউল প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হয়েছে সেই সাধন-সম্প্রদায়ই। আমরা পরে দেখাবার চেষ্টা করবো: (১) মূলত একই সাধন-সম্প্রদায় নানাভাবে পল্লবিত হয়ে এজাতীয় নানা নামে পরিচিত হয়েছে, (২) ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সাধন-সম্প্রদায়টির পরিচয় অত্যন্ত প্রাচীন, এবং (৩) এই সাধন সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরবর্তী কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম বিশ্বাসেরই নানাবিধ সংমিশ্রণ সত্ত্বেও এবং আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে এই সাধন-সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্বগত ভিত্তির অতীব জটিল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের অক্লান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের পক্ষে সেই তত্ত্বগত ভিত্তিকে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ও প্রাক্-ভাববাদী অর্থে—অতএব, অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ-বিরোধী অর্থে—কোন একরকম আদিম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করার,—অতএব খণ্ডন করারও,—পর্যাপ্ত কারণ ছিল। অবশ্যই সে আলোচনা বিশেষ জটিল ও দীর্ঘবিস্তৃত হবে; এবং তাতে প্রবিষ্ট হবার পূর্বে লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য নজির বিচার করা বাঞ্ছনীয়।

১৬॥ লোকায়ত প্রসঙ্গে কুমারিলভট্টর উক্তি

'ছান্দোগ্য উপনিষদ্', 'মৈত্রী উপনিষদ্', 'মহাভারত', গুণরত্নর 'তর্করহস্যদীপিকা' এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে দেহাত্মবাদী লোকায়তিকেরা বেদবিরোধী (এবং এই অর্থে অসুর-মতাবলম্বী) হলেও তাঁরা কোন একরকম যাগযজ্ঞ সম্পাদন করতেন [যথা: "অযজ্যযাজকাঃ", 'মৈত্রী'] এবং তাঁদের কোন রকম মন্ত্রতন্ত্রও ছিল [যথা: "লোকায়তমন্ত্রধারকাঃ"—'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'; "লোকায়তযজ্ঞমন্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ",—'দিব্যাবদান']। এই কথাগুলি মনে রেখে এবারে আমরা লোকায়ত সংক্রান্ত কুমারিল ভট্টর একটি উক্তির প্রকৃত অর্থনির্ণয়ের প্রয়াস করতে পারি। এই প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। কেননা, লোকায়তর পুনর্গঠনে বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এই উক্তিটির গুরুত্ব যাই হোক-না-কেন, লোকায়ত-প্রসঙ্গেই আধুনিক বিদ্বানেরা এটি নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। এতো আলোচনা উত্থাপনের কারণও সহজেই অনুমান করা যায়: পিটার্সবার্গ অভিধানে[১৯৪] লোকায়ত শব্দটির ব্যবহার সংক্রান্ত মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হল কুমারিলের আলোচ্য উক্তি এবং একথা সুবিদিত যে আধুনিক বিদ্বানেরা এই অভিধানটির উপর বিশেষ নির্ভরশীল।

১৯৪। Roth & Bothlingk v. 235.

'শ্লোকবার্তিক' গ্রন্থের আরম্ভাংশেই স্বীয় মতে মীমাংসা-দর্শন ব্যাখ্যার প্রয়োজন উল্লেখ করে কুমারিল বলছেন :

প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।
তামাস্তিকপথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া ॥[১৯৫]

—অর্থাৎ, লোকে মীমাংসাকে প্রায় লোকায়তে পরিণত করেছে; তাকে আস্তিকপথে আনয়নের জন্য আমি এই যত্ন করেছি।

কুমারিলের পক্ষে এখানে "লোকায়ত" শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য কী হতে পারে? আগেই দেখেছি, রিস্ ডেভিড্স্ মন্তব্য করেছেন, বস্তুত পক্ষে এখানে কুমারিলের পক্ষে "লোকায়ত" শব্দ ব্যবহার না-করে "নাস্তিক" শব্দ ব্যবহারই প্রাসঙ্গিক হোতো। কিন্তু এজাতীয় মন্তব্যর তাৎপর্য আমরা সহজে বুঝতে পারি না। কেননা, কুমারিলের মতো বিদগ্ধ ও ক্ষুরধারবুদ্ধি দার্শনিক যেহেতু "লোকায়ত" শব্দই ব্যবহার করেছেন সেইহেতু আমাদের পক্ষে বরং এই অনুমানই বাঞ্ছনীয় হবে যে এখানে "লোকায়ত" শব্দটি ব্যবহারের পিছনে তাঁর কোন নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ই বর্তমান ছিল। তাছাড়া, আমরা একটু পরেই দেখবো, বস্তুতপক্ষে এখানে "নাস্তিক" শব্দর ব্যবহার অবশ্যই অসঙ্গত হোতো।

কিন্তু কুমারিলের পক্ষে "লোকায়ত" শব্দ-ব্যবহারের প্রকৃত অভিপ্রায় কী হতে পারে? প্রথমে দেখা যাক, আধুনিক বিদ্বানেরা আলোচ্য উক্তিটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে চান। মুয়ার[১৯৬] বলছেন, কুমারিলের পূর্বে প্রভাকর মীমাংসাকে নিরীশ্বর দর্শনে পরিণত করেছিলেন; সেই নিরীশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যান করে কুমারিল মীমাংসাকে সেশ্বর মতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। রিস্ ডেভিড্স্ও[১৯৭] মন্তব্য করেছেন, অন্তত এটুকু কথা সুস্পষ্ট যে কুমারিল এখানে "লোকায়ত" শব্দ নিরীশ্বর অর্থেই প্রয়োগ করেছেন; অতএব রিস্ ডেভিড্স্-এর মতেও আস্তিকপথে আনয়নের অর্থ মীমাংসাকে সেশ্বর-দর্শনে পরিণত করাই।

কিন্তু কুমারিল কি সত্যিই পূর্ববর্তী মীমাংসকদের নিরীশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যান করে মীমাংসাকে সেশ্বর মতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন? কুমারিলের নিজস্ব রচনাকে[১৯৮] অত্যন্ত স্থূলভাবে অবজ্ঞা না করলে এই প্রশ্নর একটি

১৯৫। 'শ্লোকবার্তিক', প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, কারিকা ১০।

১৯৬। Muir OST iii. 95: "...The Mimamsa commentator Prabhakara and his school treat the Purva Mimamsa as an atheistic system, while Kumarila makes it out to be theistic."

১৯৭। Rhys Davids DB i. 166: "But it is clear that he uses the term in the sense of 'atheistic.'"

১৯৮। 'শ্লোকবার্তিক', সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, কারিকা ৪১-১১৬। তর্জমা Jha SV. 355-68। ঈশ্বর-খণ্ডনে কুমারিলের যুক্তির সংক্ষিপ্তসার Jha PMS 47-50 এবং Keith KM 62-4 দ্রষ্টব্য।

মাত্র উত্তর পাওয়া সম্ভব : জৈমিনি, শবর এবং প্রভাকরের মতোই কুমারিল নিজে প্রখর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন।

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বর-খণ্ডনের প্রকৃত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শবর, প্রভাকর ও কুমারিল প্রস্তাবিত যুক্তিগুলির সারাংশ গ্রন্থান্তরে আলোচনা করেছি[১৯৯]। বর্তমানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতএব কুমারিলের পক্ষে নিরীশ্বরবাদ অভিপ্রায়ে "লোকায়ত" শব্দ ব্যবহারের সম্ভাবনা অবশ্যই কাল্পনিক। "আস্তিকপথে আনয়নের" অর্থও সেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। "আস্তিক" মানে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নয়। মনে রাখা দরকার, ভারতীয় দর্শনে বেদপন্থীদের রচনায় "নাস্তিক" ও "আস্তিক" উভয় শব্দই রূঢ় বা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত : নাস্তিক মানে বেদ-বিরোধী, আস্তিক মানে বেদপন্থী[২০০]। তর্কালঙ্কার যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, "কেহ কেহ মনে করেন যে যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক। ইহা ঠিক নহে। কেননা তাহা হইলে মীমাংসকাচার্য এবং সাংখ্যাচার্য নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। কেননা তাঁহারা ঈশ্বর মানেন না। অধিকন্তু, ঈশ্বর নাই ইহা প্রচলিত সাংখ্য দর্শনে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে।…মীমাংসকাচার্য এবং সাংখ্যাচার্য ঈশ্বর মানেন না বটে, কিন্তু উভয়েই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা নিরতিশয় আস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা মীমাংসা ও সাংখ্য উভয় দর্শনেরই যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে জৈমিনি বেদের পারদর্শী, তাঁহার দর্শনের কোন অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে। সাংখ্যজ্ঞানের তুল্যজ্ঞান নাই, এ বিষয়ে সংশয় করা অনুচিত। এতদনুসারে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যাঁহারা বেদ মানেন না তাঁহারা নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিকের এইরূপ লক্ষণ হইলে বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতিও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেননা চার্বাক দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধাদি দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই"।[২০১]

অন্তত একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। উদ্ধৃত কারিকায় কুমারিল "আস্তিকপথে কর্তুম" বলতে প্রকৃত বেদপন্থী বেদানুসারি বা বেদ-প্রতিষ্ঠিত করারই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, কুমারিলের, বিচারে যে-কোন অর্থেই হোক না কেন, মীমাংসা প্রায় "লোকায়তেই" পরিণত হয়েছিল,

১৯৯। চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, 'ভারতীয় দর্শন' ২৪৫-২৬৭।

২০০। অবশ্য পাণিনির (৪।৪।৬০) মতে নাস্তিক শব্দের অর্থ হল পরলোকে অবিশ্বাসী। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুবচন অনুসারেই বৈদিক ঐতিহ্যে নাস্তিক শব্দের অর্থ স্বীকৃত হয়েছে। মনু (২।১১) বলেছেন, "নাস্তিকঃ বেদনিন্দকঃ"।

২০১। তর্কালঙ্কার ১।৭৫।

তিনি পুনরায় তাকে বেদ-প্রতিষ্ঠ করার প্রয়াস করেছেন। স্বভাবতই বোঝা যায়, বেদ-বিরুদ্ধ বা বেদ-বিচ্যুত বা অবৈদিক কিছুকেই বেদ-প্রতিষ্ঠ করবার প্রয়াস হতে পারে। অতএব এখানে "লোকায়ত" শব্দটির একটি অবধারিত তাৎপর্য হল বেদ-বিরুদ্ধ বা অবৈদিক। অর্থাৎ, রূঢ় বা পারিভাষিক অর্থে "নাস্তিক"। তাহলে কি রিস্ ডেভিড্স্-এর সঙ্গে আমরা এবিষয়ে একমত হতে পারি যে আলোচ্য কারিকায় কুমারিলের পক্ষে "লোকায়ত" শব্দর পরিবর্তে "নাস্তিক" শব্দ ব্যবহারই প্রাসঙ্গিক হোতো? আমরা এই প্রশ্নর নেতিবাচক উত্তরে উপনীত হতে বাধ্য। কেননা, আলোচ্য প্রসঙ্গে "নাস্তিক" শব্দ ব্যবহারে সুস্পষ্টভাবেই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা ঘটে। এবং কুমারিলের মতো প্রখর দার্শনিকের কাছে আধুনিক বিদ্বানেরা অন্তত এটুকু চেতনা প্রত্যাশা করতে পারেন।

নাস্তিক মানে অবশ্যই বেদ-বিরোধী। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বেদ-বিরোধী অর্থে অন্তত তিনটি সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ: লোকায়ত, বৌদ্ধ এবং জৈন। চরম বেদ-পন্থী হিসাবে কুমারিল অবশ্যই এই তিনটি সম্প্রদায়েরই বিশেষ বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রের কাছেই সুবিদিত এবং দর্শন হিসাবে তিনি জৈন মতকে খুব বেশি প্রাধান্য না-দিলেও একথা কল্পনা করার কোন কারণ নেই যে জৈনদের প্রতি তাঁর কোন রকম সহিষ্ণুতার ভাব ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে কি "নাস্তিক" শব্দ ব্যবহার প্রাসঙ্গিক হোতো?

অবশ্যই নয়। কেননা, তাঁর আলোচ্য উক্তিটি বিবিধ নাস্তিক মতামতের গ্রহণ-বর্জন প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়নি: মীমাংসা দর্শনের পরিণতি প্রসঙ্গেই ব্যক্ত হয়েছে। এবং একথা কল্পনাতীত যে কুমারিলের বিচারে তাঁর পূর্বে মীমাংসা প্রায় বৌদ্ধ বা জৈন মতেও পরিণত হয়েছিল। এবং সাধারণভাবে "নাস্তিক" শব্দ ব্যবহারে যেহেতু বৌদ্ধাদি মতও বিবক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে সেই হেতুই তিনি এখানে নাস্তিক শব্দ ব্যবহার করেননি। বিবিধ নাস্তিক মতের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাবে শুধুমাত্র "লোকায়ত"-রই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাহলে "লোকায়ত" শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য কী?

এই প্রশ্নর উত্তর পাবার আগে মনে রাখা দরকার, মীমাংসা বা পূর্ব-মীমাংসার একটি প্রাচীন নামই হল যজ্ঞবিদ্যা[২০২]। যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিচার ছাড়া এই যজ্ঞবিদ্যা বা মীমাংসার কোন রকম আলোচনাই কল্পনাতীত। অর্থাৎ, কুমারিল-পূর্ব মীমাংসা বলতেও অবশ্যই যজ্ঞানুষ্ঠানাদির আলোচনাই; কেননা তা না হলে মীমাংসাই

২০২। Jha SV *Intro*. 1.

অসম্ভব হতে বাধ্য। তবে কুমারিলের মতে যজ্ঞানুষ্ঠানাদির সে আলোচনা বেদ-মূলক নয়। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য যে কুমারিল এখানে মীমাংসার যে অধঃপতন উল্লেখ করেছেন—যে-অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে তিনি মীমাংসাকে পুনরায় আস্তিক পথে আনয়নের বা বেদ-প্রতিষ্ঠ করার প্রস্তাব করছেন—সে অধঃপতনের একমাত্র তাৎপর্য হল অবৈদিক যজ্ঞবিদ্যায় পরিণত হওয়া। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তিনি বলতে চান, তাঁর পূর্বে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির আলোচনা বেদ-বিচ্যুত হয়ে কোন একরকম অবৈদিক রূপ পরিগ্রহণ করেছিল; তিনি পুনরায় সে-আলোচনাকে প্রকৃত বৈদিক পথে আনয়নের প্রস্তাব করছেন।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যজ্ঞবিদ্যার বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদির এই বেদ-বিচ্যুত রূপটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবেই "লোকায়ত" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং কুমারিলের রচনায় এই নির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহার অজ্ঞানসূচক বা অসাবধানসূচক হওয়া স্বাভাবিক নয় বলেই আমরা এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য। লোকায়তিক বলতে তিনিও কি উপনিষদ্-বর্ণিত অসুরমতানুসারী কাপালিকাদিরই উল্লেখ করেছেন?

এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। কেননা, ইতিপূর্বে দেখেছি, 'মৈত্রী উপনিষদ্'-এ তাদেরই সম্বন্ধে ঘৃণাভরে "অযাজ্যযাজকাঃ" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদেরও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি প্রচলিত ছিল, যদিও বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান গর্হিত বা নিন্দিতই। এবং প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে যজ্ঞানুষ্ঠানেরই বেদ-বিরুদ্ধ আর-একটি ধারা যে বাস্তবিকই প্রচলিত ছিল সেবিষয়ে অন্যান্য স্পষ্টতর নজিরও বর্তমান। 'গীতা'য় শ্রীভগবান বলছেন,

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥২০৩

—অর্থাৎ [তারা] দম্ভভরে বিধিবিহীন যজ্ঞ করে, কিন্তু সে-যজ্ঞ শুধু নামেই যজ্ঞ।

বিধি-বিহীন যজ্ঞ অর্থে অবশ্যই বৈদিক-বিধি-বিরুদ্ধ যজ্ঞ। কিন্তু কারা এ-জাতীয় অবৈদিক যজ্ঞের সম্পাদক? 'গীতা'য় শ্রীভগবান তাদের "অসুর" আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন এই অসুরদের না-আছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধারণা, না শৌচ, আচার ও সত্যের জ্ঞান:

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচংনাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥২০৪

উপনিষদ্-সাহিত্য এবং 'গীতা'র মধ্যে ঐতিহ্যগত বিরোধের কল্পনা অবান্তর

২০৩। 'গীতা' ১৬।১৭।
২০৪। 'গীতা' ১৬।৭।

বলেই বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব উপনিষদ্-বর্ণিত এবং 'গীতা'-বর্ণিত অসুরদের অভিন্ন মনে করার কারণ আছে। আরো মনে রাখা দরকার শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরস্বামী উভয়েই দাবি করেছেন, 'গীতা'র এই অধ্যায়ে অসুর-মত অর্থে লোকায়ত-মতই উল্লিখিত হয়েছে; উভয়ের দাবিই যে সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূতই আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে সে-কথা প্রমাণ করাও কষ্টকর হবে। শাঙ্করাচার্যর লোকায়ত-মত খণ্ডন অবশ্যই মূলত দেহাত্মবাদের খণ্ডন। কিন্তু উপনিষদে যাঁরা অসুরমতানুসারী বলে নিন্দিত হয়েছেন তাঁরা দেহাত্মবাদী হওয়া ছাড়াও যে "অযাজ্যযাজকাঃ" ছিলেন সেবিষয়ে উপনিষদ-সাহিত্যেই সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতএব শঙ্করাচার্যর পক্ষে 'গীতা'-বর্ণিত বিধি-বিহীন যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদেরই লোকায়তিক বলে উল্লেখ করায় কোন বাধা হয়নি। কুমারিলের পক্ষেও মীমাংসার বেদবিচ্যুতি অর্থে এজাতীয় বিধিবিহীন যজ্ঞবিদ্যায় পরিণত হওয়ার উল্লেখ করাই স্বাভাবিক এবং সেই বিধিবিহীন যজ্ঞবিদ্যাকে লোকায়ত আখ্যা দিয়ে তিনি উপনিষদ্ ও 'গীতা'র সুপ্রাচীন ঐতিহ্যর সঙ্গেই সংগতি রক্ষা করেছেন। অবশ্যই এই বিধিবিহীন যজ্ঞবিদ্যার সঙ্গে দেহাত্মবাদের সম্পর্ক ছিল কিনা—এখানে কুমারিলের পক্ষে সে-প্রশ্নর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হোতো। কুমারিল তা উত্থাপন করেননি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এ বিষয়ে কুমারিলের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারদের মন্তব্য কী? তাঁদের মন্তব্যেও কি এজাতীয় কোন ইংগিত পাওয়া যায় যে মীমাংসার পক্ষে লোকায়তে পরিণত হওয়া অর্থে কুমারিল এখানে যাগযজ্ঞর বেদবিরুদ্ধ বা অবৈদিক কোন সংস্করণের উল্লেখ করতে চেয়েছেন?

কুমারিলের আলোচ্য কারিকাটি তাঁর প্রখ্যাত ভাষ্যকারেরা কী ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই দেখা যাক।

উম্বেকভট্ট[২০৫] বলছেন,

> মীমাংসা হি সর্বাস্তিকশাস্ত্রাণামগ্রণীঃ সর্বপুরুষার্থসাধনপরিজ্ঞান-স্যৈতন্নিবন্ধনত্বাৎ। সৈবমাস্তিকা অলোকায়তমেব সতী বাহুল্যেন লোকায়তীকৃতা সংস্মৃতিসদাচারাণাং বিনা কারণেন ধর্মপ্রমাণত্ব-নিরাকরণাৎ বিধিনিষেধয়োরিষ্টানিষ্টফলানভ্যুপগমাচ্চ। প্রয়েণেতি। চোদনা প্রমাণকো ধর্মইত্যেতাবন্মাত্রেণ নাস্তিক শাস্ত্রাদপসারিতা, অন্যৎ সামান্যমেব কৃতমিত্যর্থঃ। তামিমামসদ্ব্যাখ্যাতৃবশাদসন্মার্গনিম্নগামুদ্ধৃত্যাস্তিকপথে কর্তুং স্থাপয়িতুং বার্তিকারম্ভপ্রযত্নঃ কৃতো ময়েতি।[২০৬]

২০৫। মহাকবি ভবভূতিরই নাম উম্বেকভট্ট কিনা—এবিষয়ে মণ্ডনমিশ্র রচিত 'ভাবনা বিবেক'-এর (Saraswati Bhawan Texts. Benaras 1923) ভূমিকায় গঙ্গানাথ ঝা-র মন্তব্য এবং উম্বেকভট্ট রচিত 'তাৎপর্যটীকা'-র (Madras, 1940) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০৬। 'তাৎপর্যটীকা', Madras 1940.

অনুবাদ—

মীমাংসা সমস্ত আস্তিকশাস্ত্রের অগ্রণী, কেননা সর্বপুরুষার্থ-সাধনের জ্ঞান তারই উপর নির্ভরশীল। সেই মীমাংসা যদিও আসলে অলোকায়ত তবুও সংস্মৃতি সদাচার প্রভৃতি কারণ ব্যতীত ধর্মের নিরাকরণ হেতু এবং বিধি ও নিষেধের ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলের অপ্রাপ্তি হেতু তা [এই মীমাংসা] বহুলাংশে লোকায়তীকৃত হয়েছে। "প্রায়েণ" ইত্যাদি। 'প্রেরণাই ধর্মের একমাত্র লক্ষণ'—এই বলে নাস্তিকশাস্ত্র থেকে ধর্ম অপসারিত হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য কিছুর যা প্রকৃত ধর্ম নয়, এমন কিছুর সামিল হয়েছে। তাকে [মীমাংসাকে] অসৎ ব্যাখ্যাকারী-দের নিম্নমার্গ থেকে উদ্ধার করে আস্তিক পথে আনতে বা স্থাপন করতে আমি এই বার্তিক রচনায় উৎসাহিত হয়েছি।

তাহলে, উম্বেকভট্টের মতে "লোকায়তে পরিণত হওয়া" মানে অসৎ ব্যাখ্যাকারীদের নিম্নমার্গে পরিণত হওয়া, নাস্তিকশাস্ত্রে পরিণত হওয়া, সংস্মৃতি সদাচার প্রভৃতি বিচ্যুত হওয়া, বিধি ও নিষেধের ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলে অবিশ্বাসী হওয়া, প্রেরণাকেই ধর্মের একমাত্র লক্ষণ বলে গণ্য করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সংক্ষেপে, যজ্ঞবিদ্যারই কোন একরকম অবৈদিক রূপে পরিণতি। কিন্তু যজ্ঞবিদ্যার অবৈদিক পরিণতি স্বীকৃত হলে যজ্ঞবিদ্যারই কোন প্রচলিত অবৈদিক রূপও স্বীকার্য। সেই রূপটিই বেদপন্থীদের পরিভাষায় "লোকায়ত" বলে উক্ত হয়েছে।

পার্থসারথি মিশ্র বলছেন,

নন্থ মীমাংসায়াশ্চিরন্তনানি ভর্তৃমিত্রাদিরচিতানি ব্যাখ্যানানি বিদ্যন্তে, কিমনেনেত্যত আহ—"প্রায়েণেতি"। মীমাংসা হি ভর্তৃমিত্রাদিভির-লোকায়তৈব সতী লোকায়তীকৃতা নিত্যনিষিদ্ধয়োরিষ্টাহনিষ্টং ফলং নাস্তীত্যাদিবহ্বপসিদ্ধান্তপরিগ্রহেণেতি। তামাস্তিকপথে কর্তুং বার্তিকারম্ভযত্নঃ কৃতো ময়েতি।

অনুবাদ—

ভর্তৃমিত্র প্রভৃতি রচিত মীমাংসার চিরন্তন ব্যাখ্যা অবশ্যই বিদ্যমান; অতএব তার আর প্রয়োজন কী? এই আশঙ্কার [উত্তরে] বলছেন, "প্রায়েণ," ইত্যাদি। নিত্য ও নিষিদ্ধের ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল নেই—এজাতীয় বহু অপসিদ্ধান্ত পরিগ্রহণ করার জন্যই মীমাংসা বস্তুত অলোকায়ত হওয়া সত্ত্বেও ভর্তৃমিত্র প্রভৃতি কর্তৃক লোকায়তীকৃত হয়েছিল। তাকে আস্তিকপথে আনবার জন্যই আমি এই বার্তিক রচনার যত্ন করেছি।

জনৈক প্রাচীন মীমাংসকাচার্যের নাম ভর্তৃমিত্র। তাঁর রচনা দুঃখের বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে। তাই ভাট্ট সম্প্রদায়ের মতে তাঁর মীমাংসা ব্যাখ্যা ঠিক

কোন্ কারণে লোকায়তর সমতুল্য বলে বিবেচিত—সে বিষয়ে আমাদের পক্ষে খুব বেশি তথ্য লাভের সম্ভাবনা নেই। পার্থসারথি মিশ্রর উপরোক্ত সমালোচনা থেকে শুধুমাত্র এইটুকুই অনুমিত হতে পারে যে ভাট্ট সম্প্রদায়ের বিবেচনায় ভর্তৃমিত্র প্রভৃতির যজ্ঞবিদ্যায় বহু অপসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, বিশেষত এই অপসিদ্ধান্ত যে নিত্য ও নিষিদ্ধ কর্মের ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল নেই। বলাই বাহুল্য, বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে এজাতীয় সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হলেও তা যজ্ঞবিদ্যারই কোন একরকম সংস্করণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তই। এবং যজ্ঞবিদ্যার এজাতীয় অবৈদিক সংস্করণই লোকায়ত নামে উল্লিখিত। অতএব পার্থসারথি মিশ্রর এই ব্যাখ্যা থেকেও লোকায়তর সঙ্গে কোন একধরণের যাগযজ্ঞর সম্পর্কর ইংগিত পাওয়া যায়।

সুচরিত মিশ্র বলছেন,

নন্থ মীমাংসায়ামপি চিরন্তননিবন্ধনানি সন্তীতি কিং মুধা প্রয়স্যতে। অত আহ—"প্রায়েণেতি"। লোকায়তং নাম নাস্তিকানাং তন্ত্রম্। তদ্ভাবমাপাদিতা নানাঽপসিদ্ধান্তসংগ্রহেণ। তামাস্তিকপথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃত ইতি।

অনুবাদ—

অবশ্যই মীমাংসাতেও চিরন্তন প্রবন্ধ সমূহ বর্তমান; অতএব বৃথা প্রয়াসের কী প্রয়োজন? এই কারণেই বলেছেন, "প্রায়েণ" ইত্যাদি। লোকায়ত নাস্তিকদেরই তন্ত্র: নানা অপসিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই [মীমাংসা] সেইভাব প্রাপ্ত হয়েছে। তাকে আস্তিকপথে আনবার জন্য এই যত্ন করা হল।

"লোকায়তং নাম নাস্তিকানাং তন্ত্রম্"। উক্তিটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই উক্তির তাৎপর্য বিচারে মনে রাখা দরকার, মীমাংসা বা যজ্ঞবিদ্যায় অপসিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে যজ্ঞবিদ্যার পক্ষেই এজাতীয় নাস্তিক বা বেদবিরোধীদের তন্ত্রে পরিণত হবার আশঙ্কা। স্বভাবতই, এজাতীয় অপসিদ্ধান্ত বলতে যজ্ঞবিদ্যা সংক্রান্ত অপসিদ্ধান্তই উক্ত হওয়া সম্ভব; কেননা অন্য কোন প্রকার অপসিদ্ধান্তর উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে যজ্ঞবিদ্যারই কোন রকম অবৈদিক সংস্করণ—বা কোন প্রকার অবৈদিক যজ্ঞবিদ্যাই—এখানে লোকায়ত নামে উল্লিখিত।

কিন্তু যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোন্ জাতীয় সংস্করণ লোকায়ত নামে উল্লিখিত হতে পারে? এই প্রশ্নর উত্তরে স্বভাবতই 'মৈত্রী উপনিষদ্'-বর্ণিত অসুরমতাবলম্বী এবং অযাজ্যযাজক কাপালিকদের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে 'গীতা'-বর্ণিত সদাচারবিহীন অসুরদের যজ্ঞকথা—যে অসুরদের মতকে শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরস্বামী লোকায়তিক আখ্যা দিয়েছেন। গুণরত্নর উক্তি অনুসারে এই কাপালিকাদের মতই লোকায়ত

বলে উল্লিখিত। এ-জাতীয় বিবিধ সাক্ষ্যর পুনর্বিচারেই লোকায়ত সংক্রান্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীত হয়েছে। সে-সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়ত আজো এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি; কাপালিকাদি নামান্তরের আড়ালে এখনো তা প্রচলিত আছে।

এইখানে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে প্রলোভন হয়। কাপালিকাদি সম্প্রদায় সাধারণত তান্ত্রিক বলেই উল্লিখিত। এবং সুপ্রাচীন কাল থেকে বেদপন্থীরা স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্ম-জিজ্ঞাসার দুটি স্বতন্ত্র ধারা বর্তমান—একটির নাম বৈদিক, অপরটির নাম তান্ত্রিক। যেমন 'মনু-সংহিতা'র[২০৭] ভাষ্যে মেধাতিথি হারিত নামের জনৈক সুপ্রাচীন ধর্ম-সূত্রকারের মত উদ্ধৃত করেছেন:

> অতএব হারিতঃ—অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ, শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।

অর্থাৎ—

> অতএব হারিত বলেন: 'অতএব অনন্তর ধর্ম ব্যাখ্যা করব। ধর্ম শ্রুতি-প্রমাণ। শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক।

"তন্ত্র" শব্দ এখানে কাপালিকাদির সাধনমার্গ অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব অনুমান হয় যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে বৈদিক ও তান্ত্রিক—এই দ্বিবিধ সাধনমার্গর ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল। কেননা হারীত ছিলেন খুবই প্রাচীন ধর্মসূত্রকার[২০৮]। তাঁর ধর্মসূত্রটি অনেকাংশে বিলুপ্ত হলেও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখর ধর্মসূত্রে তাঁর অনেক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। কানে-র বিচারে বৌধায়নাদির ধর্মসূত্রর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০।[২০৯]

তন্ত্র অবশ্যই যাগযজ্ঞ, মন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিরই পরিচায়ক। অর্থাৎ, অবৈদিক বা বেদবাহ্য হলেও তা একরকমের যজ্ঞবিদ্যাই। এবং সুপ্রাচীন কাল থেকেই যদি এদেশে যজ্ঞবিদ্যার বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে তাহলে বৈদিক ঐতিহ্যর চরম সমর্থক কুমারিলের পক্ষে মীমাংসা বা বৈদিক যজ্ঞবিদ্যার বেদবিচ্যুতি অর্থে "তান্ত্রিক মার্গে পরিণত হওয়া" বা "তান্ত্রিকাদি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণ" বোঝা অসম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলেই বিবেচিত হবার সম্ভাবনা। অতএব প্রশ্ন তোলা যায়: কুমারিলের ভাষ্যকারেরা কি মীমাংসার পক্ষে

২০৭। 'মনু' ২।১—মেধাতিথির ভাষ্য।

২০৮। Kane HD i. 70 ff.

২০৯। *Ib.* ii. p. x.

লোকায়তে পরিণত হওয়া বলতে এজাতীয় "অপসিদ্ধান্ত" গ্রহণেরই উল্লেখ করেছেন?

১৭। লোকায়ত ও সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদ

আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, লোকায়ত নামটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অর্থে কোন রকম বিশুদ্ধ বা সাধনমার্গ-নিরপেক্ষ অর্থে দার্শনিক মতের পরিচায়ক হওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সাধনমার্গ-নিরপেক্ষ অর্থে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বর পরিচয় একান্তই পাওয়া যায় কিনা[২১০] —বর্তমানে এই তর্ক উত্থাপন না-করেও বলা যায় যে লোকায়তের সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির সম্পর্ক সংক্রান্ত নানা ইংগিত থেকে অনুমান হয় যে অন্তত লোকায়ত বলতে এজাতীয় কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব উল্লিখিত হয়নি।

কিন্তু মাধবাচার্য লোকায়ত বলতে সাধন-সম্পর্ক-শূন্য কোন একরকম বিশুদ্ধ দার্শানিক মতই উল্লেখ করেছেন। এমন কি তাঁর বর্ণনা অনুসারে একমাত্র লোকায়তই সর্বপ্রকার সাধনমার্গর অত্যন্ত বিরোধী। অতএব আমরা ইতিপূর্বে লোকায়ত সংক্রান্ত যে-সাক্ষ্যগুলি বিচার করেছি সেগুলির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে স্বীকার করতে হবে যে মাধবাচার্যর এই লোকায়ত-বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠার অভাব আশঙ্কিত হয়। পরে দেখবো, অন্যান্য কারণেও এই আশঙ্কা দৃঢ় হয়।

আগেই বলেছি, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে রিস্ ডেভিড্স্ মাধবাচার্যর এই লোকায়ত-বর্ণনাকে সামগ্রিকভাবে কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। তাঁর মূল যুক্তি হল, প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-সমর্থিত বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের এ করকম ছকে-বাঁধা বর্ণনায় লোকায়তে ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হয়েছে; অতএব অন্তত এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে লোকায়ত বলতে মাধবাচার্য-বর্ণিত চরম ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও বেদবিরোধী দার্শনিক মত উদ্দিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু মূলতঃ এই সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করেই রিস্ ডেভিড্স্ আরো সিদ্ধান্ত করেছেন যে লোকায়ত বলতে কোনরকম দার্শনিক মত বা

২১০। বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন ও যোগ মূলতই সাধনমার্গ, পূর্ব-মীমাংসা যজ্ঞবিদ্যা, সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে সাধনমার্গর সম্পর্ক ছিল কিনা, এপ্রশ্ন পরে আলোচিত হবে। ন্যায়-বৈশেষিক মুখ্যত দর্শন হলেও এ-সম্প্রদায়ের দাবি অনুসারেই দার্শনিক মতটি শৈব-সাধনার অঙ্গীভূত—ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১। ভূমিকা, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য। অতএব ভারতীয় দর্শনের প্রধান সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব দাবী অনুসারেই আমাদের দেশে সাধনমার্গ ও দার্শনিক তত্ত্বর মধ্যে অত্যন্ত বিভেদ স্বীকার্য নয়। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, দেবতাতত্ত্বভেদ অনুসারেই হরিভদ্র ছয়টি প্রধান দার্শনিক মতের উল্লেখ করেছেন ('ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ২) এবং তাঁর ভাষ্যকার গুণরত্ন প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধন-অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা দিয়েছেন।

কোনরকম নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ই উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু কেন নয়? রিস্ ডেভিড্স্-এর এই দ্বিতীয় মন্তব্যটি বিচার করলে বোঝা যায়, আপাত-বিরোধী শোনালেও বস্তুতপক্ষে মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনাকে সম্পূর্ণ ভাবে কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব সত্ত্বেও তিনি পরোক্ষভাবে এই বর্ণনার উপরই একরকম ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন: তাঁর বিচারে যেহেতু মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণন কাল্পনিক সেইহেতু তাঁর মতে লোকায়ত-দর্শনই কাল্পনিক। অর্থাৎ, লোকায়ত দর্শনের বাস্তবতা বা অবাস্তবতা তাঁর কাছে মাধবাচার্যর বর্ণনার বাস্তবতা বা অবাস্তবতার উপরই যেন একান্তভাবে নির্ভরশীল। পরোক্ষভাবে মাধবাচার্যর উপরই এভাবে নির্ভরশীল বলে তিনি এমনকি বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য নানা সাক্ষ্যর মূল্য মোটের উপর অবজ্ঞাই করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে সেই সাক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করেছি।

কিন্তু মাধবাচার্যর লোকায়ত বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠার অভাব যে-অর্থেই প্রতিপন্ন হোক না কেন, লোকায়ত মতকেই কাল্পনিক মনে করার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত নজিরগুলি ছাড়াও অন্যান্য বাধা বর্তমান। কেননা, প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক সুনির্দিষ্ট একটি দার্শনিক মত অর্থেই লোকায়তর খণ্ডন করতে চেয়েছেন। এই মতটির মূল কথা হল, দেহাত্মবাদ বা দেহবাদ: দেহই সত্য, দেহই আত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা কল্পনামাত্র। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এই মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই বাদরায়ণ 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে দুটি সুনির্দিষ্ট সূত্র রচনা করেছেন। অবশ্যই সূত্র দুটিতে লোকায়ত নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু তা থেকেই প্রমাণ হয় না যে আলোচ্য দেহাত্মবাদ লোকায়ত-মতের পরিচায়ক নয়। বৈশেষিকাদি মত প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গেও বাদরায়ণ সম্প্রদায়গুলির নাম উল্লেখ করেননি; বস্তুত সূত্রগ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত-মতের সম্প্রদায়-নাম প্রত্যাশা করা যায় না। পক্ষান্তরে আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, শঙ্করাচার্যর পক্ষে বাদরায়ণ-প্রত্যাখ্যাত এই দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত হিসাবে উল্লেখ করার পর্যাপ্ত কারণ ছিল।

বাদরায়ণের পক্ষে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়োজন ছিল। কেননা, এই দেহাত্মবাদই 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এ "অসুরদের উপনিষদ্" বলে নিন্দিত হয়েছে, এবং আমরা একটু পরেই দেখবো উপনিষদ্ সাহিত্যের অন্যত্রও দেহাত্মবাদ বা দেহবাদ প্রত্যাখ্যানের সুস্পষ্ট উপদেশ বর্তমান। অতএব, উপনিষদ্ বা বেদান্ত প্রতিপাদ্য দর্শনের ব্যাখ্যায় বাদরায়ণের পক্ষে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের আয়োজনই স্বাভাবিক।

কিন্তু রিস্ ডেভিড্স্ প্রধানতই বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত সাক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করেই লোকায়তর আলোচনা করেছেন। এই সাক্ষ্যগুলির বিচারেও তাঁর পক্ষে অন্তত দেহাত্মবাদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা সম্ভব

হয়নি। কেননা, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও বারবার দেহাত্মবাদের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। তবুও' সেই দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মতের পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে রিস্ ডেভিড্স্ বিশেষ আপত্তি তুলেছেন। তাঁর মূল যুক্তি হল, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে "লোকায়ত" নাম এবং দেহাত্মবাদ উভয়েরই উল্লেখ বর্তমান; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণে, তাঁর মতে, শঙ্করাচার্যর পক্ষে দেহাত্মবাদকে লোকায়ত আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি।

লোকায়ত প্রসঙ্গে বৌদ্ধ শাস্ত্রের নজিরগুলিই যদি একমাত্র নজির হতো তাহলে শঙ্করাচার্যর বিরুদ্ধে এই আপত্তি অন্তত বিবেচনা-যোগ্য বলে স্বীকৃত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তা নয় এবং শঙ্করাচার্য অবশ্যই বৌদ্ধ ঐতিহ্যর পরিবর্তে বৈদিক ঐতিহ্যর উপরই নির্ভর করেছেন। আমরা দেখেছি, বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার পর্যাপ্ত কারণ আছে। অতএব, বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকায়ত নাম এবং দেহাত্মবাদের মধ্যে সম্পর্কসূচক সুস্পষ্ট উক্তির অভাব শঙ্করাচার্যর বিরুদ্ধে আপত্তি হিসাবে পর্যাপ্ত হতে পারে না।

তাছাড়া, সম্পর্কসূচক সুস্পষ্ট উক্তির অভাবই সম্পর্কাভাবের চরম প্রমাণ নয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রসঙ্গে যুক্তিটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক, কেননা বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা দার্শনিক মতের আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। আমরা দেখেছি, 'সংযুক্তনিকায়'-র "লোকায়তিক-সুত্ত"তে "সর্বং অস্তি", "সর্বং নাস্তি" প্রভৃতি সেকালে প্রচলিত কয়েকটি সুস্পষ্ট তত্ত্বকে "জ্যেষ্ঠ লোকায়ত", "দ্বিতীয় লোকায়ত" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও তারই উপর নির্ভর করে লোকায়ত সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বস্তুত নিরাপদ নয়। অতএব, বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের পক্ষে কোন দার্শনিক মতকে লোকায়ত আখ্যা দেওয়া-না-দেওয়ার উপরই নির্ভর করে লোকায়ত সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার্য হবে না।

এক্ষেত্রে রিস্ ডেভিড্স্ যদি দেখাতে পারতেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রর সাক্ষ্য অনুসারে প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বাধা বর্তমান, তাহলেও কিন্তু শঙ্করাচার্যের পক্ষে দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার ঐকান্তিক অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হতো না। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র প্রমাণিত হতো যে লোকায়ত-প্রসঙ্গে প্রাচীন বৈদিক এবং বৌদ্ধ নজিরের মধ্যে বিরোধ বর্তমান; কেননা, বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে দেহাত্মবাদকে লোকায়ত আখ্যা দেবার পর্যাপ্ত কারণ আছে। অবশ্য এ-জাতীয় বিরোধ প্রমাণিত হলেও রিস্ ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য আরো প্রমাণ করা প্রয়োজন হতো যে প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্ব সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে বৈদিক ঐতিহ্যর তুলনায় বৌদ্ধ ঐতিহ্য বেশি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সে-কথা প্রমাণ

করার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। কেননা, বৈদিক ঐতিহ্যে—বিশেষত উপনিষদ্-সাহিত্যে—দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে; পক্ষান্তরে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার বিরুদ্ধেই উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের পক্ষে এ-বিতর্কও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাচীন দেহাত্মবাদ সুস্পষ্টভাবে নামান্তরে উল্লিখিত না-হলেও এই দেহাত্মবাদকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ শাস্ত্রর কোন রকম সুস্পষ্ট বাধা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যদি এই দেহাত্মবাদ সুস্পষ্টভাবে নামান্তরে উল্লিখিত হতো শুধুমাত্র তাহলেই আলোচ্য বাধা প্রমাণিত হতে পারতো; কিন্তু বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেহাত্মবাদটির কোন রকম নামান্তরের আভাসও পাওয়া যায় না। অতএব বৌদ্ধ শাস্ত্রর নজির থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদের পক্ষে লোকায়ত-মতের পরিচায়ক হওয়া অসম্ভব।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত দেহাত্মবাদের নজিরগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা বারবার বলেছেন, বুদ্ধ নিজে দশটি দার্শনিক প্রশ্নর মীমাংসা-সম্ভাবনা, অস্বীকার করেছেন; তাঁর মতে এগুলির আলোচনা শুধু অবান্তরই নয়, অবাঞ্ছনীয়ও। 'ত্রিপিটক'-এ এই দশটিকে "অব্যাকত" বা অনির্ণেয় (*Indeterminable*) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'দীঘনিকায়'-র 'পোট্ঠপাদসুত্ত'[২২১] থেকে এবিষয়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করা যাক:

পোট্ঠপাদ নামের জনৈক পরিব্রাজক বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, "এই লোক বা জগৎ কি শাশ্বত (সস্সতো)? সে-কথাই কি একমাত্র সত্য, বাকি সব মত মূর্খতামাত্র?

> উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।"
> পোট্ঠপাদ প্রশ্ন করেন, "জগৎ কি অশাশ্বত (অসস্সতো)?"
> বুদ্ধ বলেন, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।"
> পোট্ঠপাদ, "জগৎ কি সসীম বা অন্তবৎ (অন্তবা)?
> বুদ্ধ, "এবিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।"

পোট্ঠপাদ, "জগৎ কি অসীম বা অন্তহীন [অনন্তবা]?" বুদ্ধ, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না" পোট্ঠপাদ, জীব ও শরীর কি অভিন্ন [তং জীবং তং সরীরং]?" বুদ্ধ, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদ, "জীব ও শরীর কি ভিন্ন [অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং সরীরং]?" "বুদ্ধ 'এ "বিষয়ে

২২১। 'দীঘনিকায়', ১।৯।৩।১৬।

আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদ, "মৃত্যুর পর তথাগতর সত্তা থাকে—এই কথা কি সত্য?" বুদ্ধ, "এবিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদ, "মৃত্যুর পর তথাগতর সত্তা থাকে না—এই কথা কি সত্য?" বুদ্ধ, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদ, "মৃত্যুর পর তথাগতর সত্তা থাকে এবং থাকে না—উভয়ই কি সত্য?" বুদ্ধ, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।" পোট্ঠপাদ, "মৃত্যুর পর তথাগতর সত্তা থাকে এবং থাকে না—উভয়ই কি মিথ্যা?" বুদ্ধ, "এ বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করি না।"

সংক্ষেপে দশটি দার্শনিক প্রশ্নকে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা নির্ণয়াতীত বলে নিন্দা করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এর মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্ন বিশেষ প্রাসঙ্গিক। "তং জীবং তং সরীরং"?—জীবও যা শরীরও কি তাই, বা জীব ও শরীর কি অভিন্ন? না, "অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং সরীরং"—জীব আলাদা ও শরীর আলাদা, বা, জীব ও শরীর কি ভিন্ন? জীব অর্থে এখানে অবশ্যই আত্মা। অতএব, যাঁদের মতে জীবও যা শরীরও তাইই, তাঁদের দেহাত্মবাদী আখ্যা দেওয়াই সংগত; পক্ষান্তরে যাঁদের মতে জীব ও শরীর বিভিন্ন তাঁদের দেহাত্মবাদ-বিরোধী বলা অযৌক্তিক হবে না। বুদ্ধ নিজে অবশ্য দেহাত্মবাদ-বিরোধী—উভয় মতবাদকেই অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধর নিজস্ব মতামত বা মন্তব্য বর্তমানে আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। বর্তমানে আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হল, বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা যেহেতু অন্যান্য দার্শনিক মতামতের মতোই দেহাত্মবাদ এবং দেহাত্মবাদ-বিরোধী উভয় মতবাদকেই নির্ণয়াতীত বলেছেন সেই হেতু অনায়াসেই অনুমান হয় যে বৌদ্ধ ভারতে উভয় মতবাদই প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সেকালে প্রচলিত দেহাত্মবাদটির সমর্থক বলতে ঠিক কে বা কারা? এই প্রশ্নর উত্তরে বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোন ইংগিত পাওয়া যায় কি? উপরোদ্ধৃত অংশে কিছু পাওয়া যায় না: শুধুমাত্র এটুকু বোঝা যায় যে পোট্ঠপাদ নামের জনৈক পরিব্রাজক সেকালে প্রচলিত নানা মতবাদের মতোই "তং জীবং তং সরীরং" হিসাবে উল্লিখিত দেহাত্মবাদ সম্বন্ধেও বুদ্ধর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এই দশটি মতবাদের হুবহু একই তালিকা বৌদ্ধ শাস্ত্রর অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে: সেখানে আলোচ্য দেহাত্মবাদের সমর্থকদের সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় কি?

'মজ্ঝিমনিকায়'-র 'চূলমালুক্যসুত্ত'র শুরুতেও[২১২] "সস্সতো লোকো", "অসস্সতো লোকো" প্রভৃতি দশ "অব্যাকতানি"র হুবহু একই তালিকা উল্লিখিত হয়েছে: কিন্তু এই তালিকা থেকেও "তং জীবং তং সরীরং" মতের

২১২। 'মজ্ঝিমনিকায়' ২।১৩।১।১।

সমর্থকদের সম্বন্ধে কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। 'সংযুত্তনিকায়'-তে[২১৩] উল্লিখিত একই তালিকা প্রসঙ্গে মোটের উপর একই মন্তব্য। 'উদান'-এও[২১৪] এই তালিকা পাওয়া যায় ; কেবল সেখানে অন্যান্য নয়টি মতবাদের সমর্থকদের মতোই আলোচ্য দেহাত্মবাদের সমর্থক হিসাবে কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় :

> সন্তেকে সমণ-ব্রাহ্মণা এবং বাদিনো এবংদিট্‌ঠিনো—"তং জীবং তং সরীরং, ইদমেব সচ্চং মোঘমঞ্ঞং" তি।

কিন্তু একথা সুবিদিত যে 'ত্রিপিটক'-এ বিরোধী মতবাদীদের বর্ণনায় এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শব্দ সম্পূর্ণ নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যে-কোন বিরুদ্ধ মতবাদীকে উল্লেখ করার সময় বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা প্রায় ছকে-বাঁধা ভাবে এই জাতীয় "কোনকোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব, আলোচ্য দৃষ্টান্তে লোকায়তিকদের উদ্দেশ্য করেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—একথা অনুমানের যে-রকম কোন সঙ্গত কারণ নেই তেমনি এমন সিদ্ধান্তও নিরাপদ হবে না যে এখানে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হিসাবে লোকায়তিকদের উল্লেখ একান্তই অসম্ভব। পক্ষান্তরে সর্বপ্রকার বিরোধী মতবাদীদের প্রসঙ্গে নির্বিচারে এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার থেকে অনুমান হতে পারে 'ত্রিপিটক'-এ লোকায়তিকদের প্রসঙ্গেও এই শব্দ-ব্যবহার অসম্ভব নয়।

অতএব, সংক্ষেপে, এই নজিরগুলি থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না—আলোচ্য দেহাত্মবাদ যে লোকায়তিকদেরই একথা প্রমাণ করার সম্ভাবনা যেমন সুদূর-পরাহত তেমনি আলোচ্য দেহাত্মবাদ যে লোকায়তিকদের হওয়া অসম্ভব একথারও কোন অবধারিত প্রমাণ উক্ত নজিরগুলি থেকে পাওয়া যায় না।

অবশ্যই বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই দশটি নির্ণয়াতীত প্রশ্নের প্রসঙ্গ ছাড়াও দেহাত্মবাদের আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন, 'দীঘনিকায়'-র 'জালিয়-সুত্ত'তে স্বতন্ত্রভাবে এবং বিশেষ করে শুধুমাত্র "তং জীবং তং সরীরং" হিসাবে উল্লিখিত মতবাদটিই আলোচিত হয়েছে। [আয়তনে এই 'জালিয়সুত্ত' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তা সমগ্রভাবেই 'মহালিসুত্ত'র অন্তর্ভুক্ত।] সে-আলোচনা থেকে কি দেহাত্মবাদের সমর্থকদের সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য পাওয়া যায় ?

'জালিয়সুত্ত'-র শুরুতে উক্ত হয়েছে,[২১৫]

> একসময় ভগবান (বুদ্ধ) কৌসাম্বীর ঘোষিত (নামের) আবাসে বিহার করছিলেন। সে সময় দুজন পরিব্রাজক তাঁর কাছে উপস্থিত হন।

২১৩। 'সংযুত্তনিকায়' ৪৪।৭।৭।

২১৪। 'উদান' ৬।৪।৯।

২১৫। 'দীঘনিকায়' ১।৭।১।১—'দীঘনিকায়' ১।৬।৪।১৮।

একজন হলেন পরিব্রাজক মুণ্ডিয় [বা মুণ্ডিস্‌স], অপরজন দারুপত্তিক-শিষ্য জালিয়। শিষ্টাচারসম্মত বাক্যাদির পর তাঁরা একপাশে দাঁড়ান এবং একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভগবানকে এই কথা বলেন, "হে শ্রদ্ধেয় গোতম, জীব ও শীরর কি অভিন্ন, না, জীব ও শরীর স্বতন্ত্র ?"

উত্তরে বুদ্ধ তাঁদের যে-উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্বভাবতই উক্ত প্রশ্নর সরাসরি মীমাংসার প্রয়াস দেখা যায় না ; তার পরিবর্তে তিনি প্রশ্নটিকেই অবান্তর বিবেচনা করে স্বমত-সম্মত সাধনার বর্ণনা করেন। অবশ্যই, বুদ্ধর নিজস্ব উপদেশ আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে আমাদের মূল প্রশ্ন হল, বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রাচীন দেহাত্মবাদের সমর্থক বলতে কে বা কারা ? আলোচ্য উপাখ্যানে যদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো যে পরিব্রাজক মুণ্ডিয় [মুণ্ডিস্‌স] বা দারুপত্তিক-শিষ্য জালিয় নিজেরাই "তং জীবং তং সরীরং" হিসাবে উক্ত দেহাত্মবাদটির সমর্থক ছিলেন তাহলে না-হয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত দেহাত্মবাদীদের সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে এঁদের সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক হতো। কিন্তু 'জালিয়সুত্ত'-তে [এবং 'মহালিসুত্ত'-তেও] এজাতীয় কোন ইঙ্গিত নেই। তার পরিবর্তে শুধুমাত্র এইটুকুই উক্ত হয়েছে যে উক্ত পরিব্রাজকদ্বয় দেহাত্মবাদ এবং দেহাত্মবাদ-বিরোধী মতের মধ্যে কোনটি সত্য সে-বিষয়ে বুদ্ধর উপদেশ প্রার্থনা করেন।

অতএব, উপরোক্ত নজিরগুলি পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে "তং জীবং তং সরীরং" হিসাবে উল্লিখিত দেহাত্মবাদের সমর্থক বলতে ঠিক কে বা কারা—এ বিষয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোন সুনিশ্চিত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। অতএব "তাঁরাই লোকায়তিক" এই অনুমান যেমন অসন্তোষজনক তেমনি, "তাঁদের পক্ষে লোকায়তিক হওয়া অসম্ভব", এই অনুমানও সন্তোষজনক নয়।

অবশ্য, "তং জীবং তং সরীরং"—এই বাঁধাধরা বর্ণনা ছাড়াও সম্ভবত একই প্রাচীন দেহাত্মবাদ বৌদ্ধ শাস্ত্রে ভিন্নভাবেও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, 'দীঘনিকায়'-র 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-তে সেকালে প্রচলিত আত্মা সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদের প্রত্যাখ্যান উপদিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম মতবাদ অনুসারে দেহের মতোই আত্মারও রূপ বর্তমান, দেহের মতোই আত্মাও চতুর্ভূত দ্বারা গঠিত, দেহের মতোই পিতামাতা থেকেই আত্মার জন্ম, এবং দেহ বিলীন হলে আত্মাও বিলীন হয়—মৃত্যুর পর আত্মার কোন সত্তা থাকে না।

যতো খো, ভো অয়ং অত্তা রূপী চাতুমহাভূতিকো মাতাপেত্তিকসম্ভবো

কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা, এত্তাবতা খো, ভো, অয়ং অত্তা সম্মা সমুচ্ছিন্নো হোতি[২১৬]।

—অর্থাৎ, হে মহাশয়, এই আত্মা যেহেতু রূপবিশিষ্ট, চতুর্মহাভৌতিক, মাতাপিতা-জাত, শরীর বিনষ্ট হলে তার উচ্ছেদ হয়, বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর তা আর থাকে না,—সেইহেতু, মহাশয়, এই আত্মার সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের ভাষায় নিছক দেহর বাঁধাধরা বর্ণনা হল, দেহ রূপবিশিষ্ট, চতুর্মহাভৌতিক, মাতাপিতা-সম্ভূত। যেমন, 'দীঘনিকায়'-র 'সামঞ্ঞফলসুত্ত'[২১৭] এবং 'মজ্ঝিমনিকায়'-তে[২১৮] হুবহু একই ভাষায় উক্ত হয়েছে, "কায়ো রূপী চতুমহাভূতিকো মাতাপেত্তিকসম্ভবো"……; 'সংযুত্তনিকায়'-তে[২১৯] উক্ত হয়েছে, "চাতুমহাভূতিকস্স কায়স্স…মাতাপেত্তিকসম্ভবস্স……।" বৌদ্ধ শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত নিছক দেহর সঙ্গে 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-এ উল্লিখিত মতবাদটিতে আত্মার সর্বাংশে তাদাত্ম্য উক্ত হয়েছে বলেই মতবাদটিকে দেহাত্মবাদ আখ্যা দেওয়া অসংগত হবে না।

বর্তমানে আমাদের মূল প্রশ্ন হল, প্রাচীন দেহাত্মবাদটি ঠিক কার বা কাদের মতবাদ সে-বিষয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা? কিংবা, বৌদ্ধ শাস্ত্রে কি এমন কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান যার ফলে সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদটিকে লোকায়ত আখ্যা দেবার বিশেষ বাধা ঘটে?

এই প্রশ্নর উত্তর পাবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে আমাদের পক্ষে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন: 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-তে উল্লিখিত দেহাত্মবাদ কার

২১৬। 'দীঘনিকায়' ১।১।৩।৮৫॥ 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-র এই অংশে পরপর সাতরকম উচ্ছেদবাদ আলোচিত হয়েছে—প্রথম উচ্ছেদবাদ, দ্বিতীয় উচ্ছেদবাদ, ইত্যাদি। উচ্ছেদবাদের এই সপ্তবিধ সংস্করণে আত্মা সংক্রান্ত সপ্তবিধ মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ সাহিত্যেও আত্মা সংক্রান্ত বিবিধ প্রাচীন ভারতীয় ধারণার পরিচয় সংরক্ষিত (Rhys Davids in JRAS-1899 দ্রষ্টব্য)। আমাদের আধুনিক ধ্যানধারণার দিক থেকে আত্মা সংক্রান্ত এই প্রাচীন মতগুলি অত্যাশ্চর্য বলে প্রতীত হতে পারে, কেননা প্রাচীন মতবিশেষে আত্মার ধারণা রিস্ ডেভিড্স্-এর ভাষায় "frankly materialistic" (Rhys Davids DB i. 240)। আমাদের আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে প্রতিটি মতের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে না এবং স্বয়ং বুদ্ধ কোন্ অর্থে অনাত্মবাদী ছিলেন (—দেহাত্মবাদী অর্থে অবশ্যই নয়, Rhys Davids AL 39 ff. দ্রষ্টব্য)—আমাদের পক্ষে বর্তমানে সে-আলোচনা উত্থাপনেরও সুযোগ নেই। বর্তমানে আমরা 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-তে উল্লিখিত শুধুমাত্র "প্রথম উচ্ছেদবাদ"টিই উদ্ধৃত করেছি। কেননা এইটি সুস্পষ্টভাবেই প্রাচীন দেহাত্মবাদের পরিচায়ক এবং প্রাচীন দেহাত্মবাদই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

২১৭। 'দীঘনিকায়' ১।২।৫।৮৫॥

২১৮। 'মজ্ঝিমনিকায়' ২।২৪।২।৫, ২।২৭।৩।১৮॥

২১৯। 'সংযুক্তনিকায়' ৩৫।১০৩।১০৫॥

বা কাদের মতবাদ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে? বৌদ্ধ শাস্ত্রর ছকে-বাঁধা বর্ণনা হিসাবেই 'ব্রহ্মজালসুত্ত'-তে২২০ শুধুমাত্র উক্ত হয়েছে,

"ইধ, ভিক্খবে, একচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা এবংবাদী হোতি এবংদিঠ্ঠি"—অতএব, এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের প্রায় ছকে-বাঁধা সেই একই কথা: কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এজাতীয় উক্তি করেন, এজাতীয় মত পোষণ করেন।

ফলে বৌদ্ধ শাস্ত্রর অন্যান্য সাক্ষ্যর মতো এই সাক্ষ্যটি থেকেও প্রাচীন দেহাত্মবাদের সমর্থকদের সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছুই প্রমাণ হয় না—একদিকে যেমন একথাও প্রমাণ হয় না যে সেকালে তাঁদেরই লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হতো, অপরদিকে তেমনি একথাও প্রমাণ হয় না যে সেকালে তাঁদের পক্ষে লোকায়তিক আখ্যা একান্তই অসম্ভব ছিল। তাই প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রর সাক্ষ্য থেকে প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে কোন বিশিষ্ট বাধা প্রমাণিত হয় না।

অতএব, সংক্ষেপে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকায়ত নাম এবং প্রাচীন দেহাত্মবাদ উভয়ই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যর কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। এই নজির থেকেই রিস্ ডেভিড্স্ সিদ্ধান্ত করেছেন যে শঙ্করাচার্যর পক্ষে প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত আখ্যা দেওয়া সংগত হয়নি। আপত্তি তুলে আমরা বলেছি, বৌদ্ধ ঐতিহ্যর পরিবর্তে শঙ্করাচার্য বৈদিক ঐতিহ্যর উপরই নির্ভরশীল ছিলেন এবং বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত আখ্যা দেবার পর্যাপ্ত কারণ বর্তমান। এই পরিস্থিতিতে যদি প্রমাণ করা যেতো যে বৌদ্ধ শাস্ত্রর সাক্ষ্য অনুসারে প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত মত আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বাধা আছে তাহলেও বড়ো জোর স্বীকার করতে হতো যে আলোচ্য প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈদিক ঐতিহ্যর মধ্যে কোনরকম বিরোধ বর্তমান। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংরক্ষিত দেহাত্মবাদের নজিরগুলি পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারেও প্রাচীন দেহাত্মবাদকে লোকায়ত-মত আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে কোন বিশিষ্ট বাধা প্রমাণ করা যায় না। অতএব. এ-বিষয়ে বৌদ্ধ ও বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে কোন বিরোধ কল্পনা করা অসংগত হবে।

এ-জাতীয় বিরোধ কল্পনার পরিবর্তে এখানে অন্য একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বৌদ্ধ ঐতিহ্যে যদি অস্পষ্টতা থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়টিই যদি বৈদিক ঐতিহ্যে তুলনায় স্পষ্টতর বলে প্রতীত হয় তাহলে বৈদিক

২২০। 'দীঘ' ।১।১।৩৮।

ঐতিহ্যের আলোতেই সে-বিষয়ে বৌদ্ধ ঐতিহ্যর অস্পষ্টতা দূর করার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত; পক্ষান্তরে সে-বিষয়ে বৌদ্ধ ঐতিহ্যর অস্পষ্টতার নজির দেখিয়ে বৈদিক ঐতিহ্যর স্পষ্টতাকে অবজ্ঞা করার বৈধতা স্বীকৃত হতে পারে না। অতএব বৈদিক ঐতিহ্যে ব্যক্ত দেহাত্মবাদের সঙ্গে লোকায়ত-মতের সম্পর্ক অনুসারেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কাভাবের অনিশ্চয়তা দূর করার প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

এখানে সংক্ষেপে আর-একটি কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং বৈদিক ঐতিহ্য ছাড়াও জৈন ঐতিহ্যর সাক্ষ্য বর্তমান। জৈন ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারী হরিভদ্র ও তাঁর ভাষ্যকার মণিভদ্র ও গুণরত্ন লোকায়ত মতের যে-পরিচিতি দিয়েছেন, ইতিপূর্বে তা আংশিকভাবে উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে এবং লোকায়তিকদের দেহাত্মবাদ সংক্রান্ত তাঁদের মন্তব্য একটু পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। আপাতত মন্তব্য এই যে জৈন ঐতিহ্যে দেহাত্মবাদের উল্লেখ সুপ্রাচীন—জৈনদের শাস্ত্রগ্রন্থেই[২২১] তা পরিহার করার উপদেশ দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতোই জৈন শাস্ত্রেও এই দেহাত্মবাদকে "কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের" মত বলেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেহেতু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে বিবিধ প্রকারের মত একই ভাবে "কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের" মত হিসাবেই বর্ণিত সেইহেতু উক্ত বর্ণনা থেকেও প্রাচীন দেহাত্মবাদীদের সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না—তাঁরাই যে লোকায়তিক ছিলেন একথা যেমন সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না তেমনিই তাঁদের পক্ষে লোকায়তিক হওয়া অসম্ভব একথাও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না। অতএব জৈন শাস্ত্রর ভাষ্যকার শীলাঙ্ক এবিষয়ে জৈন শাস্ত্রর অনিশ্চয়তা দূর করার প্রয়াস করেছেন এবং তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে এখানে দেহাত্মবাদী বলতে প্রকৃতপক্ষে লোকায়তিকদেরই উল্লেখ করা হয়েছে[২২২]। শীলাঙ্কর ব্যাখ্যাকে প্রকৃত জৈন ঐতিহ্যসম্মত বলে গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে জৈন ঐতিহ্য অনুসারেও সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদ লোকায়ত-মতেরই পরিচায়ক।

১৮॥ প্রাচীন দেহাত্মবাদ ও পরবর্তী দার্শনিক বিতর্ক

বিবিধ সাক্ষ্য পর্যালোচনার ফলে ইতিপূর্বে আমাদের কাছে লোকায়ত-সংক্রান্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের সিদ্ধান্তটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীত হয়েছে। আমরা দেখেছি, সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকায়তিক

২২১। 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র' ২।১।৯-১০—তর্জমা SBE. lxv 339 ff.—জৈনশাস্ত্র উল্লিখিত দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে জ্যাকবি-র আলোচনা দ্রষ্টব্য: Jacobi in SBE lxv. Intro p. xxiii f.

২২২। Dasgupta HIP iii. 526f দ্রষ্টব্য।

বলতে খুব সম্ভব কাপালিক, তান্ত্রিক প্রভৃতিকেই বোঝানো হয়েছে। লোকায়ত সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাচীন সাক্ষ্য বিচার করে আমরা আরো দেখলাম, লোকায়ত-মতের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেহাত্মবাদকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে রিস্ ডেভিড্‌স্‌-এর নিষেধ প্রকৃতপক্ষে মাননীয় নয়। দেহাত্মবাদ লোকায়ত-মতেরই পরিচায়ক।

আমরা পরে দেখবো, এই দুই সিদ্ধান্তর মধ্যে বস্তুত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে আমাদের পক্ষে উক্ত দুটি সিদ্ধান্তর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ, কাপালিক-তান্ত্রিকাদি সাধন-পদ্ধতির উৎস ও আদি-তাৎপর্য সন্ধানে প্রাচীন সমাজের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের বিচার বাঞ্ছনীয়; সেই সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত দেহাত্মবাদ বা দেহবাদের আদিরূপটিকে সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রাচীন বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার পরিচয়ও প্রয়োজন। অর্থাৎ সংক্ষেপে, উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে শুধু যে দার্শনিক তত্ত্বর সূত্র ছেড়ে তুলনামূলক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন তাইই নয়; তাছাড়াও, সে আলোচনাকে শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্যাদি বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না। তা অনিবার্যভাবেই জটিল ও পল্লবিত হতে বাধ্য। এই কারণে, কাপালিকাদি সাধন পদ্ধতির সঙ্গে দেহাত্মবাদের সম্পর্ক এবং সেই দেহাত্মবাদের আদিরূপটির বিচার পরে উত্থাপন করার প্রয়াস করবো।

কিন্তু সেই দেহবাদ বা দেহাত্মবাদের আদিরূপটি যাই হোক না কেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা প্রতিনিধি স্বীয়-সম্প্রদায়-প্রতিপাদ্য তত্ত্বর বিরুদ্ধে লোকায়তিক দেহাত্মবাদকেই বিশেষ বাধা বলে বিবেচনা করেছিলেন। অতএব তাঁরা নানাবিধ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ উৎসাহও প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনচর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুগটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা লোকায়ত-মতের যে সব বৈশিষ্ট্যর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুলেছেন তার মধ্যে এই দেহাত্মবাদই হল প্রধান; অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বলতে পরলোক-বিলোপ, প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ও স্বভাববাদ। সম্প্রদায়ান্তরের প্রতিনিধিদের বিচারে লোকায়তিকদের দেহাত্মবাদের সঙ্গে পরলোক-বিলোপ, প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ও স্বভাববাদের সম্পর্ক অবশ্যই অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু লোকায়ত-মতের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যর বিচারে ক্রমশ অগ্রসর হওয়া যাবে। আপাতত মন্তব্য হল, দেহাত্মবাদই যে লোকায়ত-মতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য একথা অস্বীকার কর অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচায়ক হবে। কেননা, তাহলে আরো স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুউন্নত

যুগটিতেই বিবিধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা লোকায়ত-মতের একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ অজ্ঞ ছিলেন, বা, যে-দেহাত্মবাদ বর্জনে তাঁরা সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন সেই দেহাত্মবাদটি ঠিক কাদের মতবাদ সে-বিষয়ে তাঁরা সকলে একই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন! কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি এই যে তাঁরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে লোকায়ত-মত হিসাবেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে অবজ্ঞা না-করলে স্বীকার করতেই হবে যে দেহাত্মবাদ লোকায়ত-মতের অনিবার্য পরিচায়ক।

লোকায়তিকদের স্বীয় রচনার অভাবে আমরা সম্প্রদায়ান্তরের লোকায়ত-খণ্ডন থেকেই লোকায়ত-মতের বৈশিষ্ট্য অনুমান করতে বাধ্য। অতএব, লোকায়ত-বিরোধীরা কীভাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের আয়োজন করেছিলেন তারই উপর নির্ভর করে এই দেহাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সে-আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে দু-একটি প্রাথমিক মন্তব্যের প্রয়োজন আছে।

ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ প্রথা অনুসারে কোন একটি মত খণ্ডন করার পূর্বে মতটির সমর্থনে যে-যুক্তি প্রস্তাবিত হয়েছে,—বা, এমনকি, বস্তুতপক্ষে প্রস্তাবিত না-হলেও মতটির সমর্থনে যে-যুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ বা সম্ভাবনা বর্তমান,—তার উল্লেখ করা হয়। বিপক্ষমতের এ-জাতীয় পরিচিতিকে পূর্বপক্ষ বলে। স্বভাবতই, লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের পক্ষে বক্তব্যটুকু ব্যাখ্যা করেছেন। দেহাত্মবাদের আলোচনায় আমরা মূলত তারই উপর নির্ভরশীল হলেও পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের সমর্থনে যতো যুক্তি উল্লিখিত হয়েছে তার সবগুলিকেই প্রকৃত লোকায়তিক যুক্তি বলে স্বীকার করতে বাধ্য নই। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই যে ঐতিহাসিক-ভাবে লোকায়তিকেরা দেহাত্মবাদের সমর্থনে বাস্তবিকই এজাতীয় প্রতিটি যুক্তিই প্রদর্শন করেছিলেন। কেননা, আত্মপক্ষ বা স্বীয় সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আমাদের দার্শনিকেরা অনেক সময় প্রথমে পূর্বপক্ষটিকেই সাধ্যমতো সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন[২২৩]

২২৩ শঙ্করাচার্য ('শারীরকভাষ্য', ৩।৩।৫৩) যেমন "স্থূণানিখনন ন্যায়"-এর উল্লেখ করেছেন—"আক্ষেপপূর্বিকা হি পরিহারোক্তির্বিবক্ষিতেঽর্থে স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি"। মাঝিরা নদীপঙ্কে নৌকা বাঁধার জন্য যখন খোঁটা পোঁতে তখন খোঁটাটিকে একবার তোলে আবার পোঁতে, আবার তোলে আবার পোঁতে, এইভাবেই খোঁটা দৃঢ় বা অবিচল হয়—খুব পুঁতে বসে। এই দৃষ্টান্ত (স্থূণানিখনন) অনুসারে দার্শনিকেরাও স্বীয় প্রতিপাদ্য দৃঢ় বা অবিচল করার উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেন ও তার খণ্ডন করেন

এবং এই উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষর সমর্থনে কতো রকম যুক্তি উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব অনেক সময় নিজেরাই তার পরিচয় দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, পূর্বপক্ষর বর্ণনায় অনেক সময় তাঁরা পূর্বপক্ষর সমর্থনে বহুবিধ নূতন নজিরও প্রদর্শন করেছেন। এখানে এ-জাতীয় একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক।

বেদান্ত ও পূর্বমীমাংসা সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও শ্রুতি বা বেদবাক্যের চরম আপ্তত্বে আস্থাবান ছিলেন। অতএব, স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে তাঁরা অনেক সময় যেন-তেন-প্রকারেও শ্রুতির সমর্থন করতে চেয়েছেন। যেমন, "মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদের 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত"— ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রকেই আরম্ভবাদের মূল শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে উক্ত মন্ত্রের তৃতীয় পদে যে-'পতত্র' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে উহার অর্থ পরমাণু। পরমাণুসমূহ গতিশীল, সুতরাং গত্যর্থ 'পৎ' ধাতু নিষ্পন্ন ঐ 'পতত্র' শব্দটি ঐ পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা"২২৪। এ-হেন পরিস্থিতিতে

২২৪। ফণিভূষণ, 'ন্যায়পরিচয়', ৮৬ ৭।' উদয়নাচার্যর পক্ষে এইভাবে পরমাণুবাদের পক্ষে শ্রুতিবচনের সমর্থন-অন্বেষণ যে বাস্তবিকই কতখানি কষ্টকল্পনার পরিচায়ক এখানে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা অবান্তর হবে না। 'ঋগ্বেদ'-এরই একটি মন্ত্র 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্'-এ উদ্ধৃত হয়েছে: "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥" ('ঋগ্বেদ' ১০।৮১।৩—'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্' ৩।৩।)। সায়ণাচার্যর ব্যাখ্যা অনুসারে মন্ত্রটির সরল অর্থ হল, "সেই অদ্বিতীয় দেবতা, যাঁহার চক্ষু চারিদিকে ব্যাপ্ত, যাঁহার বাহু এবং যাঁহার চরণ চারিদিকে ব্যাপ্ত—তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার বাহুদ্বয় এবং গমনশীল চরণ দ্বারা চালিত করেন।" অতএব, ঋগ্বেদের তুলনায় অর্বাচীন অংশে সংকলিত এই মন্ত্রটি থেকে একেশ্বরবাদের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও ন্যায়-বৈশেষিক প্রতিপাদ্য পরমাণুবাদের লেশমাত্র আভাসও পাওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের অবিরোধ প্রতিপন্ন করার বিশেষ প্রয়াস সত্ত্বেও মন্তব্য করেছেন, "সর্বকর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ঈশ্বর প্রতিপাদনের জন্য 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ' এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে।" ('ভারতী দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয়', পৃঃ ১০০)। যে-"পতত্র" শব্দ অবলম্বন করে উদয়ন শ্রুতিতে পরমাণুবাদের সমর্থন প্রদর্শন করতে চেয়েছেন তার সরল অর্থ হল পাখির ডানা—পততঃ ত্রায়তে ইতি পতত্র—যদিও অবশ্য সায়ণ আলোচ্য মন্ত্রে "পতত্রৈ" শব্দর অর্থ করেছেন, "গমনশীলৈঃ পাদৈঃ"। কিন্তু গত্যর্থ "পৎ"-ধাতু-নিষ্পন্ন বলেই "পতত্র" শব্দ গতিশীল পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা—এজাতীয় ব্যাখ্যা বলে সমগ্র 'ঋগ্বেদ'-কেই পরমাণুবাদে ভরপুর বলে প্রমাণ করা যেতে পারে। কেননা, স্বয়ং, 'নিঘণ্টু'কার গতিকর্মবোধক বৈদিক শব্দতালিকায় মোট ১২২টি শব্দ উল্লেখ করেছেন ('নিঘণ্টু', ২।১৪) এবং এই গত্যর্থক ও তৎজাত শব্দগুলি শুধু 'ঋগ্বেদ'-এই এতোবার উল্লিখিত হয়েছে যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা বিশেষ শ্রমসাধ্য। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ নানাভাবে উদয়নাচার্যর এই ব্যাখ্যা সমর্থনের আয়োজন করা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "অবশ্য উদয়নাচার্যের উপরোক্ত ব্যাখ্যা

সহজেই বোঝা যায়, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা যদি নিজেরাই দেহাত্মবাদী হতেন এবং বেদ বা শ্রুতিতে যদি দেহাত্মবাদের সমর্থন-সূচক কোন রকম আভাসমাত্রও পাওয়া যেতো তাহলে তাঁরা অবশ্যই সেই শ্রুতিবচনের নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ সমর্থনের প্রয়াস করতেন। কিন্তু প্রকৃত লোকায়তিকের পক্ষে এ-জাতীয় প্রয়াস অবশ্যই কল্পনাতীত। কেননা একথা সর্ববাদী-সম্মত যে লোকায়তিকেরা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেননি : পক্ষান্তরে লোকায়তিকদের নামে প্রচলিত বিবিধ প্রামাণিক লোকগাথায় শ্রুতি বা বেদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যই পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হয়, 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্'-এর একটি উক্তিতে অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে দেহাত্মবাদের সমর্থন অন্বেষণ অসম্ভব নয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, "বিজ্ঞানঘন (আত্মা) ভূতসমুদয় (জড়পদার্থাবলী) থেকেই উত্থিত হয়, ভূতসমুদয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর পর সংজ্ঞা (চেতনা) থাকে না"[২২৫]। উপনিষদের এই উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য কী—সে আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয় হল, মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট[২২৬] পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্ম-বাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলছেন :

> আগমাস্তু মনোরথাদিরূঢ়প্রামাণ্যাঃ কথমাত্মানমববোধয়িতুং শক্যন্তে, অয়মপি চ আগমোঽস্ত্যেব "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি" ইতি।
>
> অর্থাৎ, আগম বা শাস্ত্রগুলির প্রামাণ্য মনোরথ বা কল্পনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। [এতএব সেগুলি আবার কী করে] আত্মার জ্ঞানদানে সক্ষম হবে? [তাছাড়া] এমন আগম বা শাস্ত্রবাক্যও তো পাওয়া যায়, "এই ভূত বা জড়পদার্থগুলি থেকেই বিজ্ঞানঘন (চৈতন্য, আত্মা) উৎপন্ন হয়ে সেগুলির সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না"।

জয়ন্তভট্ট অবশ্য এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলছেন যে লোকায়ত-মতে আগম বা শাস্ত্রের প্রামাণ্য কল্পনামূলকই। তবুও লোকায়তিকেরা যেন

অন্যান্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই ও করিবেন না। কিন্তু বিভিন্ন মতের সমর্থক অন্যান্য আচার্যগণও যে শ্রুতির ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে কষ্টকল্পনাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেক স্থলে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাও ত অস্বীকার করা যাইবে না"। ('ন্যায় পরিচয়', পৃ. ৮৭)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যরাও শ্রুতিবাক্যের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করেছেন বলেই উদয়নের কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যাটি অবশ্যই সমর্থিত হয় না; পক্ষান্তরে শুধুমাত্র এইটুকুই প্রমাণ হয় যে পরবর্তী নানা দার্শনিকদের পক্ষে শ্রুতিসমর্থন প্রদর্শনের প্রয়াস কৃত্রিম মাত্র।

২২৫। 'বৃহদারণ্যক' ২।৪।১২॥

২২৬। 'ন্যায়মঞ্জরী'—(চৌখাম্বা সং) ২।৩।

নেহাতই তর্কের খাতিরে বলতে পারেন, "আর শাস্ত্রবাক্যের কথাই যদি বলো তাহলে এমন 'শাস্ত্রবাক্যও দেখানো যায় যা থেকে ভূতচৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদই প্রমাণ হয়।" অবশ্য, তর্কের খাতিরেও লোকায়তিকেরা এভাবে আত্মপক্ষ-সমর্থনে শাস্ত্রবাক্যর নজির দেখাতে চাইতেন কিনা সে-কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে অদ্বৈত-মতের প্রতিনিধি মাধবাচার্য এজাতীয় আভাস দেবারও প্রয়োজন বোধ করেননি যে লোকায়তিকেরা যদিই বা আত্মপক্ষ-সমর্থনে শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করেন তাহলেও তা নেহাতই তর্কের খাতিরে। লোকায়তর বর্ণনায় মাধবাচার্য[২২৭] বলেছেন,

তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকার-পরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎস্থ স্বয়ং বিনশ্যতি। তদাহুঃ—'বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যো সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি' ইতি। তচ্চৈতন্য-বিশিষ্টদেহ এবাঽত্মা।

অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতই তত্ত্ব। সেইগুলিই দেহাকারে পরিণত হলে চৈতন্যর উৎপত্তি হয়, যেমন কিণ্ব প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন হয় মদশক্তি। সেগুলি বিনষ্ট হওয়ামাত্রেই [চৈতন্যও] বিনষ্ট হয়। [শাস্ত্রে] উক্ত হয়েছে, "এই ভূতসমুদয় থেকেই বিজ্ঞানঘন উৎপন্ন হয়ে সেগুলির সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়—মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না"। সেই চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা।

বলাই বাহুল্য, লোকায়তিকদের পক্ষে এইভাবে শ্রুতির নজির প্রদর্শন করা ভূতের-মুখে-রাম-নামের মতোই অসম্ভব। অর্থাৎ, লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস করতেন তারই গণ্ডি ছাড়িয়ে

২২৭। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' (আনন্দাশ্রম সং) ১-২॥ কিন্তু শুধু মাধবাচার্যই নন; 'বেদান্তসার'-এর লেখক সদানন্দযোগীন্দ্র চার্বাকদের দিয়ে নানা রকম শ্রুতিবাক্যর নজির প্রদর্শন করিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে চার্বাক মতের নানাবিধ কাল্পনিক সংস্করণেরও উল্লেখ করেছেন। যথা: "চার্বাকস্তু 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' ('তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্' ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ… স্থূলশরীরমাত্মেতি বদতি। অপরশ্চার্বাকস্তু 'তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ' ('ছান্দোগ্য' ৫।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতেঃ……ইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতি। 'অন্যস্তু চার্বাকঃ 'অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ' ('তৈত্তিরীয়', ২।২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ··প্রাণ আত্মেতি বদতি। ইতরস্তু চার্বাকঃ 'অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ' ('তৈত্তিরীয়,' ২।৩।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ মন আত্মেতি বদতি।" ('বেদান্তসার', ৭৭-৮০)। বলাই বাহুল্য, উপনিষদের উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হলেও চার্বাকদের পক্ষে দেহাত্মবাদের সমর্থনে এই ভাবে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শনের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

মাধবাচার্য এখানে দেখাতে চাইছেন যে তিনি নিজে যদি লোকায়তিক হতেন তাহলে কীভাবে দেহাত্মবাদ সমর্থন করতে পারতেন। আমরা পরে দেখবো, বিশেষত এই কারণেই মাধবাচার্যর লোকায়ত-বর্ণনা সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ নয়; কেননা নিজে লোকায়তিক হলে তিনি কীভাবে তর্ক তুলতেন তা দেখাতে গিয়ে তিনি অনেক সময় লোকায়ত-মতের বর্ণনায় স্বীয় সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ, অদ্বৈত-বেদান্ত সম্প্রদায়ের—বক্তব্য লোকায়তিকদের উপর আরোপ করেছেন। কিন্তু আপাতত আমাদের মন্তব্য এই যে, উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মত বর্ণনার সময় সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা লোকায়ত-মতের সমর্থনে যতোগুলি নজির উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিকেই বাস্তবপক্ষে লোকায়ত-সম্প্রদায়-প্রস্তাবিত নজির মনে করা নিরাপদ নয়। কেননা, প্রথমে পূর্ব-পক্ষকেই সাধ্যমতো সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বিপক্ষ দার্শনিকদের পক্ষে নূতন নজির বা নূতন যুক্তি উদ্ভাবনের সম্ভাবনাও বর্তমান।

অথচ, বাস্তব পরিস্থিতি এই যে লোকায়ত-মতের অধুনালভ্য নিদর্শন মাত্রই পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-বর্ণন। এগুলিকে অবলম্বন করেই আমরা লোকায়ত-মতের পুনর্গঠনে অগ্রসর হতে বাধ্য। স্বভাবতই, লোকায়তব পুনর্গঠন-প্রয়াসে বিশেষ সাবধানতারও প্রয়োজন।

এই কথাগুলি মনে রেখে এবারে আমরা বিশেষত জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনাবলীতে সংরক্ষিত লোকায়তিক দেহাত্মবাদের পরিচিতিগুলির বিচারে অগ্রসর হবো। এছাড়াও অবশ্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় বলতে পূর্ব-মীমাংসা ও সাংখ্য-যোগ[২২৮]। কিন্তু লোকায়তিক দেহাত্মবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব-মীমাংসা এবং সাংখ্য-যোগ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করার কারণ আছে।

প্রথমত, সাংখ্যদর্শনের সমস্যা বিশেষ জটিল ও কঠিন। দার্শনিক মতটি অত্যন্ত প্রাচীন হলেও কালক্রমে তা বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়েছিল। 'সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য'-র ভূমিকায় বিজ্ঞানভিক্ষু যেমন বলেছেন,

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥

অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্যের গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং তার কলামাত্রই অবশিষ্ট আছে; আমি অমৃতবাক্যর দ্বারা তা পূরণ করব।

২২৮। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-তে মাধবাচার্য অবশ্য মোট ১৪-টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করায় বাধা নেই যে মাধবাচার্য-আলোচিত পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশপাশুপতদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন প্রভৃতির অন্তত দার্শনিক মত হিসাবে বিশেষ কোন প্রাধান্য নেই, যদিও এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সাধন সম্প্রদায়গুলির গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

কিন্তু একথা সুবিদিত যে স্বয়ং বিজ্ঞানভিক্ষু যেভাবে বিলুপ্ত সাংখ্যর পুনরুদ্ধার প্রস্তাব করেছিলেন তার ফলে এই দর্শন আর-যাই-হোক অকৃত্রিম সাংখ্যদর্শন থাকেনি—অর্ধ-বেদান্তে বা কোন-এক-রকম বেদান্তমতে পরিণত হয়েছিল[২২৯]। বিজ্ঞানভিক্ষুর বেলায় যে-কথা, সাংখ্যদর্শনের অন্যান্য পরবর্তী ব্যাখ্যাকারদের বেলাতেও অল্পবিস্তর সেই কথাই। স্বভাবতই আধুনিক বিদ্বানেরা সাংখ্যদর্শনের আদিরূপ ও পরবর্তী পরিবর্তনের আলোচনায় বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন[২৩০]। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে আমরা শুধুমাত্র একটি মন্তব্য করতে চাই: সাংখ্যমত-সংক্রান্ত বহুবিধ প্রচলিত ধারণা সত্ত্বেও তার আদিরূপটির সঙ্গে লোকায়ত-মতের প্রকৃত সম্পর্ক নূতন করে বিচার করার সুযোগ ও প্রয়োজন বর্তমান। অতএব সাংখ্যমত সংক্রান্ত বহুবিধ মৌলিক সমস্যা উপেক্ষা করে আমাদের পক্ষে এখানে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের প্রতি সাংখ্যমতাবলম্বীদের মনোভাব আলোচনা বাঞ্ছনীয় হবে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব-মীমাংসা সম্প্রদায়ের কথা। এ-সম্প্রদায়ের নানা পরবর্তী প্রতিনিধি আত্মা বিষয়ে আলোচনা করলেও সম্প্রদায়টির প্রবর্তক স্বয়ং জৈমিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেননি, অতএব তিনি লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকি, অনুমান করা যেতে পারে যে পরবর্তী মীমাংসকেরা বেদান্তদর্শনের প্রভাবেই আত্মতত্ত্বর আলোচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। স্বয়ং শঙ্করাচার্যর[২৩১] মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন পূর্ব-মীমাংসকেরা আত্মতত্ত্বে উৎসাহী ছিলেন না; তাঁদের মতে সে-আলোচনা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। 'ব্রহ্ম-সূত্র'-এ বিশেষ করে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডন করে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্কর বলেছেন,

> নন্বু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুক্তম্। সত্যমুক্তং—ভাষ্যকৃতা, ন তু তত্রাত্মাস্তিত্বে সূত্রমস্তি। ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদস্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইতি এবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।

২২৯। Garbe SPB pref. ix দ্রষ্টব্য।

২৩০। এ-বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা উত্থাপিত হবে।

২৩১। 'শারীরক-ভাষ্য' ৩।৩।৫৩।

অর্থাৎ,—

আপত্তি উঠবে, এই মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথম পাদে (অর্থাৎ, 'পূর্বমীমাংসা-সূত্র'-তে) শাস্ত্রফল উপভোগের উপযোগী দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব উক্ত হয়েছে, [অতএব উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-সূত্রে দেহাতিরিক্ত আত্মার পুনঃপ্রমাণের প্রয়োজন কী ?] । [উত্তরে বলব,] একথা সত্য যে ['মীমাংসা-সূত্র'-র] ভাষ্যকার তা করেছেন । কিন্তু সেখানে [অর্থাৎ, 'মীমাংসা-সূত্র'-তে] আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সূত্র নেই । পক্ষান্তরে এখানে [অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম-সূত্র' বা 'উত্তরমীমাংসা-সূত্র'-তে স্বয়ং সূত্রকারই পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে তার [আত্মার] অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন । এবং প্রমাণ লক্ষণের আলোচনায় আচার্য শবরস্বামী এখান থেকেই ['ব্রহ্মসূত্র' থেকেই] বিষয়টি গ্রহণ করেছেন । এবং একই কারণে ভগবান উপবর্ষও প্রথম তন্ত্রে [অর্থাৎ, পূর্ব-মীমাংসার আলোচনায়] যেখানে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে আলোচনার সুযোগ বর্তমান সেখানে শুধুমাত্র এই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, "এই আলোচনা শারীরকে [অর্থাৎ বেদান্তে] করা হবে ।"

'মীমাংসা-সূত্র'-র অধুনালভ্য ভাষ্যের মধ্যে শবরস্বামীর ভাষ্যই সর্বপ্রাচীন ; তিনি "বৃত্তিকার" হিসাবে প্রাচীনতর ভাষ্যকারের রচনা উদ্ধৃত করেছেন এবং "বৃত্তিকার"-এর রচনায় উপবর্ষ নামের জনৈক পূর্বাচার্যর মত সসম্ভ্রমে উদ্ধৃত হয়েছে । তাই উপবর্ষকে বিশেষ প্রাচীন মীমাংসক বলেই গ্রহণ করা হয় । এই কথা মনে রেখে আমরা শঙ্করাচার্যর উপরোদ্ধৃত উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করবো । পূর্ব-মীমাংসার আকর-গ্রন্থে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না এবং উপবর্ষর মতো সুপ্রাচীন মীমাংসকও মনে করেছেন যে আত্মার আলোচনা বেদান্তদর্শনেই প্রাসঙ্গিক ; অতএব স্বীকার করতেই হবে যে যে-কোন কারণেই হোক-না-কেন, পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের আদি অকৃত্রিম পর্যায়টিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উৎসাহ ছিল না । তাই লোকায়তিক দেহাত্মবাদ বর্জন বা খণ্ডন করার উৎসাহও নয় ।

পক্ষান্তরে, জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিপর্যায় থেকেই এ-উৎসাহ প্রবল ও প্রকট । তার কারণও অস্পষ্ট নয় । এই সম্প্রদায়গুলির আদি-পর্যায় থেকেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে ; বস্তুতপক্ষে দেহাতিরিক্ত আত্মাই এই সম্প্রদায়গুলির একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব । অতএব, এই সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের পক্ষে বিশেষ করে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে । স্বভাবতই তাঁদের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে-পরিচিতি সংরক্ষিত হয়েছে লোকায়তর পুনর্গঠনে তা আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ।

কিন্তু এইখানে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত ও মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনে সবিশেষ উৎসাহী হলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁরা সকলেই একমত নন। বস্তুতপক্ষে, আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে তাঁদের মধ্যে গভীর ও মৌলিক মতভেদ বর্তমান। ফলে, তাঁরা শুধুমাত্র লোকায়তিক দেহাত্মবাদই খণ্ডন করেননি; পরস্পরকে খণ্ডন করারও সবিশেষ প্রয়াস করেছেন। বস্তুতপক্ষে অনেক সময় দেখা যায়, পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের চেয়েও পারস্পরিক আত্মতত্ত্ব খণ্ডনের উৎসাহ প্রবলতর। ন্যায়-বৈশেষিক ও মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এই দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য: উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অবশ্যই লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডন করেছেন; কিন্তু বৌদ্ধ আত্মতত্ত্ব খণ্ডনের উৎসাহই ন্যায়-বৈশেষিকদের মধ্যে তুলনায় প্রবলতর, তেমনি বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও ন্যায়-বৈশেষিক প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব-খণ্ডনেই সমধিক উৎসাহী ছিলেন।

এ-জাতীয় ঘটনার ফলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবানেরাই দেহাতিরিক্ত আত্মার বিবিধ পরিকল্পনায় বিবিধ দুর্বলতা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই কারণে, পূর্বপক্ষ হিসাবে তাঁরা লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে-পরিচয় দিয়েছেন এবং যে-ভাবে এই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রস্তাব করেছেন শুধুমাত্র তার আলোচনাই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে না। কেননা পরবর্তীকালে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে দেহাত্মবাদকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে লোকায়ত-সম্প্রদায়েরই কোন প্রতিনিধির পরিচয় পাওয়া না-গেলেও এমন সম্ভাবনা বর্তমান যে দেহাত্মবাদ-বিরোধীরা দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে যে-ভাবে পরস্পরের মত খণ্ডন করেছেন,—বা পরস্পরের পরিকল্পনায় দোষত্রুটি প্রদর্শন করেছেন,—তার ফলে বস্তুতপক্ষে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিই পুনরাগমনের পথ প্রস্তুত হয়েছে।

এই কারণে দেহাত্মবাদের আলোচনা আমাদের পক্ষে চার ভাগে বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয় হবে। যথা—

এক: বিভিন্ন সম্প্রদায়ে—বিশেষত জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের—রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে সংরক্ষিত লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বিচার। অর্থাৎ, পূর্বপক্ষ হিসাবে অধুনালভ্য লোকায়তিক দেহাত্মবাদের পরিচিতির মধ্যে কোন্ অংশ অকৃত্রিম লোকায়তিক বলে অবশ্য স্বীকার্য তাইই নির্ণয়ের প্রয়াস।

দুই: দেহাত্মবাদ-বিরোধীদের পক্ষে দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের প্রয়াস বিচার।

তিন : দেহাত্মবাদ-বিরোধীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বর বিচার।
চার : দেহাত্মবাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত বিচার।

১৯ ॥ পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের পরিচয়

বেদান্ত, জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক ও মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনাবলীতে সংরক্ষিত লোকায়তিক দেহাত্মবাদের পরিচিতিগুলির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। এই সই সব সম্প্রদায়ের নানা দার্শনিক দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে অবশ্যই নানা আলোচনা করেছেন; বর্তমানে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি উক্তি উদ্ধৃত করা সম্ভব হবে না। এবং তার প্রয়োজনও নেই। কেননা দার্শনিক বিচারে উক্তিগুলি অনেক সময় সমজাতীয়। লোকায়তিক দেহাত্মবাদের আলোচনার পক্ষে যেটুকু পর্যাপ্ত আমরা এখানে তারই উল্লেখ করবো।

বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যর রচনা থেকে শুরু করা যাক। অদ্বৈতবেদান্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। অদ্বৈতমতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই পরব্রহ্ম; লোকায়ত-মতে আত্মা নেই, চৈতন্য দেহরই ধর্ম। অতএব অদ্বৈত দৃষ্টিকোণ থেকে লোকায়ত-মতই সর্বপ্রথম পরিত্যাজ্য। দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যর আলোচনা থেকে শুরু করার একটি সুবিধাও আছে। অন্যান্য দার্শনিকেরা লোকায়ত-মতের আলোচনায় যতো জটিল বিচার উত্থাপন করেছেন শঙ্করাচার্য বস্তুত তা করেননি; তাঁর দেহাত্মবাদ-বর্ণন ও দেহাত্মবাদ-খণ্ডন উভয়ই তুলনায় সহজ ও সরল।

দেহাত্মবাদ-প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যর মূল উক্তিগুলি ইতিপূর্বে[১৩২] উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর উক্তিগুলি থেকে বোঝা যায়, লোকায়ত-মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার কথা কল্পনামাত্র। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রথমেই গভীর আপত্তি উঠবে। দেহ বা শরীর পৃথিবী প্রভৃতি জড়বস্তু দ্বারাই গঠিত, অতএব শরীরও জড়পদার্থমাত্র। এবং জড়পদার্থ চৈতন্য-বিহীন। পক্ষান্তরে মানুষ (এবং অন্যান্য জীবও) চৈতন্যবিশিষ্ট। তাই দেহ ছাড়া আর কিছুর সত্তা না-মানলে এই চৈতন্যর ব্যাখ্যা কী হবে? এই কারণেই আত্মবাদীরা দাবি করেন, চৈতন্য আত্মার ধর্ম এবং জড়দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না-হলে চৈতন্যর কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না। উত্তরে লোকায়তিকেরা বলেন, চৈতন্যর ব্যাখ্যার জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা অবান্তর। কেননা, চৈতন্যও দেহেরই ধর্ম। কিন্তু দেহ জড়বস্তু দ্বারা গঠিত এবং জড়বস্তু চৈতন্যহীন; তাহলে চৈতন্য কী করে দেহের ধর্ম হতে পারে? লোকায়তিকেরা উত্তরে বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি

১৩২। পৃ. ৬০-১ দ্রষ্টব্য।

দেহের উপাদানগুলি স্বতন্ত্র বা মিলিত অবস্থায় চৈতন্যবিহীন হলেও সেগুলিই যখন "দেহাকারে পরিণত হয়" তখন সেই দেহে চৈতন্যর উৎপত্তি ঘটে, দেহই চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়। কিন্তু দেহের উপাদানগুলি যদি চৈতন্যবিহীন হয় তাহলে সেই উপাদানগুলিই দেহাকারে পরিণত হলে কী করে সচেতন হবে? এই প্রশ্নর উত্তরে লোকায়তিকেরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুই মদ্য-প্রস্তুতের উপাদান। এই কিণ্ব প্রভৃতিতে মদশক্তি বা মূর্চ্ছা-জনন-সামর্থ্যর কোন পরিচয় নেই। কিন্তু এগুলিই মদ্যাকারে পরিণত হলে মদশক্তি-বিশিষ্ট হয়। তেমনি পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূত চৈতন্য-বিহীন হলেও এগুলিই শরীরাকারে পরিণত হলে শরীর চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য বলছেন, মদশক্তির এই দৃষ্টান্ত ছাড়াও লোকায়তিকেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন। শরীর বর্তমান থাকলে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি উপলব্ধ হয়; শরীরের অবর্তমানতায় এগুলির উপলব্ধি হয় না, অতএব এগুলি শরীরেরই ধর্ম— যেমন, উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিরই ধর্ম।

'শারীরকভাষ্য'-র উপরোদ্ধৃত অংশর ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'ভামতী' টীকায় লোকায়ত-পক্ষর বর্ণনা হিসাবে শঙ্করাচার্য-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত ও যুক্তির উল্লেখ অবশ্যই করেছেন। যেমন, বাচস্পতি মিশ্রও বলছেন, "স্বতন্ত্র বা মিলিতাবস্থায় পৃথিবী, অপ্, তেজ এবং বায়ুতে [অর্থাৎ, চতুর্ভূতে] চৈতন্য পরিদৃষ্ট না-হলেও [সেগুলিই] কায়াকারে পরিণত হলে [চৈতন্য পরিদৃষ্ট] হয়। কিণ্ব প্রভৃতি [মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলি] স্বতন্ত্র বা মিলিতাবস্থায় মদশক্তি-বিশিষ্ট না হলেও মদিরাকারে পরিণত হলে মাদকতা জন্মায়।" এবং "চেষ্টা (বা হিত-প্রাপ্তি এবং অহিত-পরিহার মূলক ব্যাপার) শরীরের অধীন হিসাবেই পরিদৃষ্ট হয়, অতএব তা শরীরেরই ধর্ম। যেমন, শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপ প্রাণও শরীরধর্মই। যদিও অবশ্য ইচ্ছা, প্রযত্ন ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ বিষয় তবুও যেহেতু সেগুলির শরীরাতিরিক্ত কোন আশ্রয় উপলব্ধ হয় না এবং শরীর বর্তমান থাকলেই সেগুলি বর্তমান থাকে সেইহেতু সেগুলিও অন্তঃশরীরে (বা শরীরাভ্যন্তরে) আশ্রিত। অন্যথা (একথা স্বীকৃত না হলে) দৃষ্টহান (বা প্রত্যক্ষলব্ধ বা পরিদৃষ্ট বিষয়ের পরিত্যাগ) এবং অদৃষ্ট কল্পনার (বা প্রত্যক্ষাতীত বা অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনার) প্রসঙ্গ ঘটে। অতএব, শরীরাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণাভাববশত এবং শরীরই আত্মা এই পক্ষে প্রমাণ বর্তমান থাকায়, শরীরই ইচ্ছাদিবিশিষ্ট আত্মা।"

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, শঙ্করাচার্য-উক্ত উপরোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি ছাড়াও লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় বাচস্পতি মিশ্র আরো কিছু যুক্তি ও নজির প্রদর্শন করেছেন। যথা:

"অহং"—এই অনুভবে গৌরাদি-আকারবিশিষ্ট দেহই ভাসমান হয় (জ্ঞানের বিষয় হয়)। [অহং-জ্ঞানের একটি দৃষ্টান্ত "আমি গৌর"। এক্ষেত্রে গৌরত্ব-রূপবিশিষ্ট দেহেরই প্রতীতি হয়]। কিন্তু তদতিরিক্ত [দেহ-অতিরিক্ত] এবং দেহতে আশ্রিত কোন আত্মার জ্ঞান হয় না। [দেহে যদি দেহাতিরিক্ত কোন আত্মা থাকতো, তাহলে দেহ-কে সেই আত্মার আশ্রয় বলা হতো এবং আত্মাকে সেই দেহের আশ্রিত বলা হত] যেমন, "কুণ্ডে দধি"। [এই দৃষ্টান্তে কুণ্ড হল দধির আশ্রয় এবং দধি কুণ্ডে আশ্রিত। বস্তুতপক্ষে এই দৃষ্টান্তে কুণ্ড ও দধির মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ বর্তমান বলেই কুণ্ড-অতিরিক্ত এবং কুণ্ডেই আশ্রিত দধির স্বতন্ত্র জ্ঞান হয়। তেমনি, দেহ ও আত্মার মধ্যে প্রকৃত আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ বর্তমান থাকলে দেহ-অতিরিক্ত এবং দেহেই আশ্রিত আত্মার স্বতন্ত্র জ্ঞান হতো; কিন্তু তা হয় না। অতএব দেহকে আশ্রয় এবং আত্মাকে তার আশ্রিত বলা যায় না। দেহ এবং দেহাতিরিক্ত আত্মার মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত সম্পর্ক যে সত্যিই নেই তার আরো প্রমাণ আছে।] আশ্রিতর সঙ্গে যে-বিশেষণগুলি সমানাধিকরণ হয় সেই বিশেষণগুলিই আশ্রয়ের সঙ্গে সমানাধিকরণ হয় না। যেমন, দধির সঙ্গে শ্বেত-বর্ণ, মধুরতা প্রভৃতি বিশেষণের সামানাধিকরণ্য অনুভূত হয়; কিন্তু কুণ্ডর সঙ্গে শ্বেত-বর্ণ, মধুরতা প্রভৃতি বিশেষণের সামানাধিকরণ্য অনুভূত হয় না। যেমন, "সিত' (শ্বেতবর্ণযুক্ত), মধুরং, কুণ্ডম্" ইত্যাদি বলা যায় না। অপরপক্ষে, "অহং স্থূলঃ গচ্ছামি" ইত্যাদি অনুভব হয়; এই দৃষ্টান্তে "অহং"-এর সঙ্গে স্থূলাদি দৈহিক বিশেষণের সামানাধিকরণ্য বর্তমান। অতএব, দেহ আশ্রয় এবং অহং বা আত্মা তার আশ্রিত—একথা বলা যায় না। [দেহ ও আত্মার মধ্যে কুণ্ড ও দধির মতোই আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ বর্তমান থাকলে "অহং স্থূলঃ গচ্ছামি" ইত্যাদি জ্ঞান "সিতং মধুরং কুণ্ডম্" ইত্যাদি জ্ঞানের মতোই অসম্ভব হতো।]

লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় বাচস্পতি মিশ্র আরো বলেছেন, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সম্ভব নয় বলেই অনুমান, অর্থাপত্তি, উপমান প্রভৃতি অন্য কোন প্রমাণেরও সম্ভাবনা নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের সমর্থনে শঙ্করাচার্য যে-দৃষ্টান্ত ও যুক্তির উল্লেখ করেছেন বাচস্পতি মিশ্র সেগুলি ছাড়াও আরো জটিল বিচার উত্থাপন করে পূর্বপক্ষ হিসাবেই লোকায়তিক দেহাত্মবাদের তুলনায়-উন্নততর দার্শনিক সমর্থন প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন। আরো পরবর্তী জৈন দার্শনিক গুণরত্নর রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের আরো বিস্তৃত আলোচনা

পাওয়া যায়। কিন্তু গুণরত্নর দেহাত্মবাদ-বর্ণনায় আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে প্রথমে দেখা যাক জৈন দার্শনিকেরা কেন লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বিশেষ যত্নবান হয়েছেন।

জৈন ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল আত্মার বা জীবের মুক্তি। সমস্ত কর্ম ক্ষয় করে আত্মার পক্ষে নিজ স্বরূপ লাভ করাই হল জৈন-মতে মুক্তি। অতএব আত্মার স্বরূপ কী, কীভাবে আত্মা বদ্ধ হয়,—ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানও প্রয়োজন। জৈন দর্শনে এ-জাতীয় নয়টি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলিকে জৈনরা "নবতত্ত্ব" বলেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র যেমন জৈনমতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হিসাবে বলেছেন,

> জীবাজীবৌ তথা পুণ্যং পাপমাস্রবসংবরৌ।
> বন্ধো বিনির্জরামোক্ষৌ নবতত্ত্বানি তন্মতে॥ ২৩৩

অর্থাৎ, সেই মতে নয়টি তত্ত্ব হল জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরা ও মোক্ষ।

এই নয়টি তত্ত্বর মধ্যে প্রধানতম অবশ্যই জীব এবং অজীব, বা আত্মা এবং অনাত্মা। বিশ্বের সমস্ত পদার্থই এই দুটির মধ্যে সমাবিষ্ট হয়। জৈনদর্শনের বাকি সাতটি তত্ত্বে দেখানো হয়েছে, জীব কীভাবে অজীবের দ্বারা আবদ্ধ হয়, সেই বন্ধনের স্বরূপ কী এবং কিভাবে জীব সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। অতএব, জৈন-দর্শনের মূল প্রশ্ন হল, জীব ও অজীব বলতে ঠিক কী বোঝায়? উত্তরে হরিভদ্র বলছেন,

> তত্র জ্ঞানাদিধর্মেভ্যো ভিন্নাভিন্নো বিবৃত্তিমান্।
> শুভাশুভকর্মকর্তা ভোক্তা কর্মফলস্য চ॥
> চৈতন্যলক্ষণো জীবো যশ্চৈতদ্বিপরীতবান্।
> অজীবঃ স সমাখ্যাতঃ......... ॥ ২৩৪

অর্থাৎ, জীব হল জ্ঞানাদি ধর্মর সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয় ভাবেই বিদ্যমান, শুভাশুভ কর্মর কর্তা ও কর্মফলের ভোক্তা এবং চৈতন্যস্বরূপ; তারই বিপরীত অজীব নামে খ্যাত।

কিংবা, গুণরত্ন[২৩৫] যেমন আরো সংক্ষেপে বলেছেন, "চেতনালক্ষণো জীবঃ, তদ্বিপরীতলক্ষণস্ত্বজীবঃ"—জীবের স্বরূপ হল চৈতন্য, অজীব তার বিপরীত-স্বরূপ।

এই মতের বিরুদ্ধে স্বভাবতই প্রথম আপত্তি উঠবে লোকায়তিকদের পক্ষ থেকে। কেননা, দেহাত্মবাদী লোকায়তিকেরা চৈতন্যলক্ষণ কোন জীব

২৩৩। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ৪৭॥
২৩৪। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ৪৮-৯॥
২৩৫। 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ. ১৩৩॥

বা আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অতএব জৈনসম্প্রদায়-সম্মত জীবতত্ত্বর ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়ে গুণরত্ন[২৩৬] সুদীর্ঘভাবে লোকায়ত বা চার্বাকমত খণ্ডনে উদ্যত হয়েছেন। স্বভাবতই তিনি এই উদ্দেশ্যে "স্থূণানিখনন ন্যায়" অনুসারে (পাদটীকা ২২৩ দ্রষ্টব্য) প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তমতকেই যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গুণরত্ন বলছেন,

এই প্রসঙ্গে চার্বাকেরা নিম্নোক্তরূপ চর্চা করে থাকেন।

জগতে চেতনার কারণ হিসাবে দেহাকারে পরিণত জড়বস্তুসমূহেরই (ভূতসমূহেরই) উপলব্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলি ব্যতিরিক্ত (ভূত-ব্যতিরিক্ত) পূর্ব-লক্ষণ যুক্ত জন্মান্তরগামী কোন আত্মা নেই। কেননা, তার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই (তৎসম্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ)।

[আপনারা, যাঁরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁরা, কোন্ প্রমাণের সাহায্যে বা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করবেন ?]

ভূত-ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করবেন, না, অনুমান প্রমাণ ?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিশ্চয়ই নয়। কেননা, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ দ্বারা রূপ প্রভৃতির গোচর করে বলেই তার বিলক্ষণ জীবে প্রত্যক-প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটে।

[প্রত্যক্ষর মূল বৈশিষ্ট্য হল, রূপ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ; অতএব প্রত্যক্ষর দ্বারা শুধুমাত্র রূপাদি বিষয়েরই জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু আপনাদের মতেই আত্মার স্বরূপ রূপাদি বিষয় থেকে অত্যন্ত পৃথক, বা, অত্যন্ত বিলক্ষণ : জড়পদার্থর রূপাদি বর্তমান, চৈতন্য-লক্ষণ আত্মা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে আপনাদের পরিকল্পিত আত্মার জ্ঞান অসম্ভব।]

একথাও দাবি করা যায় না যে "আমি ঘটকে জানছি"—এই অহং-প্রত্যয়ে জ্ঞান-কর্তৃত্ব থাকায় ভূত-ব্যতিরিক্ত রূপেই আত্মা প্রতিভাত হয়। কেননা, সেই জ্ঞানে "আমি স্থূল", "আমি কৃশ" ইত্যাদি জ্ঞানের মতোই শরীর-বিষয়ত্বরই উপপত্তি হয়ে থাকে।

[অর্থাৎ, চার্বাকদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, "ঘটমহং বেদ্মি"—আমি ঘটকে জানছি—এই জাতীয় জ্ঞানের দৃষ্টান্তে

২৩৬। 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ. ১৩৯-১৪২।

জ্ঞানের কর্তা হিসাবে ভূত-ব্যতিরিক্ত আত্মাই প্রতিভাত হয়, কেননা এখানে "অহং" বা জ্ঞাতা জড়পদার্থ নয়। উত্তরে চার্বাকেরা বলবেন, "ঘটমহং বেদ্মি"—এই জ্ঞানটি "স্থূলোঽহং", "কৃশোঽহং"—আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি জ্ঞানেরই সমতুল্য। এবং "আমি স্থূল" বা "আমি কৃশ" ইত্যাদি জ্ঞানের দৃষ্টান্তে "অহং" শব্দবোধ্য বিষয়টি স্পষ্টতই জড়স্বভাব শরীর—চৈতন্যলক্ষণ আত্মার পক্ষে স্থূল, কৃশ প্রভৃতি বিশেষণ স্পষ্টতই অসম্ভব। অতএব, "অহং"-প্রত্যয়ের নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ বর্জনের প্রস্তাব বস্তুত নিষ্ফল। কিংবা, "অহং"-প্রত্যয় থেকে বস্তুতপক্ষে দেহাত্মবাদ বা শরীরাত্মবাদই নিষ্পন্ন হয়।]

এমন কথাও বলা যায় না যে সেই প্রত্যয়ে ["স্থূলোঽহং", "কৃশোঽহং" ইত্যাদি প্রত্যয়ে] আত্মার উপরই নির্ভরশীলতা বর্তমান, বা, সেই প্রত্যয়গুলি আত্মাকেই অবলম্বন করে। কেননা, আত্মাতে স্থূলতা প্রভৃতি ধর্ম অসম্ভব। অতএব, "ঘটমহং বেদ্মি" এই জ্ঞানে ভবৎ-পরিকল্পিত কোন আত্মার অবলম্বনত্ব স্বপ্নেও প্রতীত হতে পারে না। এবং অপ্রতীত বিষয়ের কল্পনায় কল্পনা-গৌরব থাকলেও তাতে প্রতিনিয়ত বস্তুব্যবস্থার বিলোপ ঘটে।

[অর্থাৎ, অহং-প্রত্যয়ের বা অহং-জ্ঞানের নজির থেকেও দেখা গেল দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান হয় না, কেননা আত্মাতে স্থূলতা প্রভৃতি ধর্ম একান্তই অসম্ভব। যার জ্ঞান হয় না তা কাল্পনিক মাত্র। দেহাতিরিক্ত আত্মা অপ্রতীত বলেই কাল্পনিক। কাল্পনিক বিষয়কে সৎ বা বাস্তব মনে করা কল্পনা-গৌরবের পরিচায়ক হতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতিনিয়ত বস্তুব্যবস্থার বা বস্তুর অস্তিত্ব সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন হয়।]

এ কথাও বলা যায় না যে, "ঘটাদির ন্যায় জড় শরীরের অহং-প্রত্যয় অনুপপন্ন।" কেননা, চেতনা-যোগের ফলে সেই শরীর সচেতন হয়।

[চার্বাকদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, ঘট প্রভৃতি বস্তু অচেতন বলেই ঘট প্রভৃতির অহং-প্রত্যয় হয় না—ঘট প্রভৃতি বস্তু নিজেদের "অহং" বলে জানতে পারে না। শরীরও জড়স্বরূপ; অতএব শরীরেরও অহং-প্রত্যয় অসম্ভব। অথচ, অহং-জ্ঞান তো বাস্তবিকই ঘটে। তারই নজির থেকে স্বীকার করতে হবে এই অহং-প্রত্যয় জড়স্বরূপ শরীরেরই নয়—শরীরাতিরিক্ত আত্মার। উত্তরে চার্বাকেরা বলছেন, এই আপত্তি আমাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়। কেননা, আমাদের মতে শরীরই ঘট প্রভৃতির মতো অচেনমাত্র নয়। শরীর জড়বস্তু হলেও তার সঙ্গে চেতনা-সংযোগ হয়, অতএব তা সচেতনও। অর্থাৎ, চার্বাকদের মতে

শরীরের উপাদান জড়বস্তু হলেও এই জড়বস্তুগুলিই শরীরাকারে পরিণত হলে শরীরেই চেতনার উদ্ভব হয়। অতএব, শরীর জড়বস্তু হলেও তা সচেতন। তাই শরীর ঘটাদির সঙ্গে সর্বাংশে সমতুল্য নয়। ঘটাদি অচেতন জড়বস্তু, শরীর সচেতন জড়বস্তু। ফলে, ঘটাদির অহং-প্রত্যয় অনুপপন্ন বা অপ্রমাণিত বলেই শরীরেরও অহং-প্রত্যয় অনুপপন্ন নয়।]

এ-কথাও বলা যায় না যে সেই চেতনার জীবকর্তৃকত্ব বর্তমান। কারণ, জীবের প্রতীতি হয় না। ফলে, জীবের কর্তৃত্বও যুক্তিযুক্ত নয়; যেহেতু খপুষ্প প্রভৃতির প্রসঙ্গও তদ্রূপ।

[চার্বাকদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হয়তো বলা হবে, তোমরাই স্বীকার করছো যে ঘটাদির সঙ্গে শরীরের পার্থক্য এই যে ঘটাদি চৈতন্যবিহীন, কিন্তু শরীর সচেতন। কিন্তু এই চেতনার কর্তা কে? নিশ্চয়ই জীব, বা, আত্মা। অতএব চেতনার কর্তা হিসাবে আত্মা স্বীকার্য। উত্তরে চার্বাকেরা বলবেন, জীব বা আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার্য নয়, কেননা তার প্রতীতি বা জ্ঞানই সম্ভব নয়। জীবের অস্তিত্বই স্বীকার্য নয় বলে তার কর্তৃত্বও যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন খপুষ্প বা গগনকুসুম অপ্রতীত বলেই অস্তিত্বহীন, অতএব তার কর্তৃত্বও স্বীকার্য নয়। কিংবা, আত্মা ও গগনকুসুম উভয়ই অপ্রতীত, অতএব অস্তিত্বহীন; ফলে তোমাদের যুক্তি মানতে হলে আত্মার মতোই গগনকুসুমের কর্তৃত্বও মানার প্রসঙ্গ ঘটে।]

অতএব, প্রসিদ্ধিবশত চৈতন্যর প্রতি শরীরেরই কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত। তদুপরি তার [শরীরের] সঙ্গে অন্বয় ও ব্যতিরেক বশতও। এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের প্রয়োগ নিম্নোক্তরূপ। যে-বস্তু যার অন্বয় ও ব্যতিরেকের অনুকারী সেই বস্তু তারই কার্য। যেমন, ঘট মৃতপিণ্ডের। চৈতন্যও শরীরের অন্বয় ও ব্যতিরেকের অনুকারী। অতএব তারই (শরীরেরই) কর্তৃত্ব। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারাই সর্বত্র কার্যকারণভাবের জ্ঞান হয়। এখানেও সেই দুটি (অন্বয় ও ব্যতিরেক) বর্তমান। শরীরের বর্তমানতাতেই চৈতন্য বর্তমান থাকে, শরীরের অবর্তমানতায় চৈতন্য অবর্তমান থাকে।

[অর্থাৎ, ইতিপূর্বে চার্বাকেরা বলেছিলেন খপুষ্পাদি অপ্রসিদ্ধ, তাই খপুষ্পাদির কর্তৃত্ব অনুপপন্ন; তেমনি আত্মাও অপ্রসিদ্ধ বলেই চৈতন্যর প্রতি আত্মার কর্তৃত্বও অনুপপন্ন। বর্তমানে চার্বাকেরা বলছেন, পক্ষান্তরে শরীর প্রসিদ্ধ এবং এই প্রসিদ্ধিবশতই চৈতন্যের প্রতি শরীরের কর্তৃত্ব উপপন্ন হয়। এবং চৈতন্যর প্রতি যে বস্তুতপক্ষে শরীরেরই কর্তৃত্ব এ-বিষয়ে আরো যুক্তি আছে। কী যুক্তি? চৈতন্য ও শরীরের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়—অর্থাৎ, প্রমাণ হয় যে শরীরই কারণ, চৈতন্য তার কার্য।

কীভাবে এই কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়? অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা। যা কোন বস্তুর অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুসরণ করে তাকে সেই বস্তুর কার্য বলা হয়। যেমন, ঘট মৃৎপিণ্ডের। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মৃৎপিণ্ডের উপস্থিতিতেই ঘট উপস্থিত থাকে; এখানে ঘট মৃৎপিণ্ডের অন্বয় অনুসরণ করছে। তেমনি, মৃৎপিণ্ডের অনুপস্থিতিতে ঘটও অনুপস্থিত থাকে; এখানে ঘট মৃৎপিণ্ডের ব্যতিরেক অনুসরণ করছে। এইভাবে ঘট মৃৎপিণ্ডের অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুসরণ করে বলেই ঘট হল মৃৎপিণ্ডের কার্য, মৃৎপিণ্ড ঘটের কারণ। চৈতন্যও শরীরের অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুসরণ করে; অতএব চৈতন্যও শরীরেরই কার্য, শরীরই চৈতন্যর কারণ। চৈতন্য কীভাবে শরীরের অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুসরণ করে? শরীর উপস্থিত বা বর্তমান থাকলে পরই চৈতন্য উপস্থিত থাকে (অন্বয়); শরীর অনুপস্থিত বা অবর্তমান থাকলে চৈতন্যও অনুপস্থিত বা অবর্তমান হয় (ব্যতিরেক)। অতএব, প্রমাণ হয় শরীরই কারণ, চৈতন্য তার কার্য। তাই অপ্রসিদ্ধ দেহাতিরিক্ত আত্মাকে চৈতন্যর প্রবর্তক হিসাবে কল্পনা না-করে প্রসিদ্ধ শরীরকেই চৈতন্যর প্রবর্তক বলা যুক্তিযুক্ত।]

একথাও বলা যায় না যে মৃত-শরীরে চৈতন্যর উপলব্ধি হয় না; অতএব পূর্বোক্ত অন্বয়-ব্যতিরেকের অনুকারিত্ব অসিদ্ধ। কারণ, মৃতাবস্থায় বায়ু ও তেজের অভাববশত শরীরেরই অভাব হয়। কেননা, বিশিষ্ট ভূত-সংযোগেরই শরীরত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। শরীরের আকারমাত্রেই চৈতন্য-উপপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা তাহলে চিত্রলিখিত তুরঙ্গরও চৈতন্য-উপপত্তির প্রসঙ্গ ঘটে।

[চার্বাকদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, মৃত-শরীরে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না। অতএব, চার্বাকেরা ইতিপূর্বে যে-অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করতে চেয়েছেন তা বস্তুতপক্ষে স্বীকার্য নয়। মৃতর দৃষ্টান্তে শরীর বর্তমান থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য বর্তমান নয়, অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের নিয়ম অনুসারে শরীরকেই চৈতন্যর কারণ বলা অসঙ্গত। উত্তরে চার্বাকেরা বলবেন, মৃতাবস্থায় চৈতন্যর অভাব পরিদৃষ্ট হয়; তার প্রকৃত কারণ হল শরীরেরই অভাব। কেননা, পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই চতুর্ভূতের সংযোগেই শরীর; কিন্তু মৃতাবস্থায় বা মৃতদেহে তেজ ও বায়ুর অভাব ঘটে—মৃতদেহে উত্তাপ নেই, শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। অতএব প্রকৃত শরীরের উপাদান হিসাবে চতুর্ভূতের মধ্যে দুটি ভূতের অভাববশত মৃতদেহকে প্রকৃতপক্ষে শরীরই বলা যায় না। এবং প্রকৃতপক্ষে শরীর নয় বলেই মৃতদেহে চৈতন্যও পরিলক্ষিত হয় না। (ফলে, মৃতদেহে চৈতন্যর অভাব বস্তুত পক্ষে পূর্বোক্ত

ব্যতিরেকরই প্রমাণ করে।) আসলে, চার্বাকেরা বলছেন, মৃতাবস্থায় শরীরের আকারমাত্র বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রকৃত শরীর বর্তমান থাকে না। এবং তাঁদের বক্তব্য হল, প্রকৃত শরীর বর্তমান থাকলেই চৈতন্যও বর্তমান থাকে; তাঁদের বক্তব্য এই নয় যে শরীরের আকারমাত্র বর্তমান থাকলেই চৈতন্য বর্তমান থাকবে। শরীরের আকারমাত্র বর্তমান থাকলেই যদি চৈতন্য উপপন্ন হতো তাহলে ছবিতে-আঁকা ঘোড়ারও চৈতন্য উপপন্ন হতে পারতো।]

অতএব সিদ্ধান্ত হয়, শরীরেরই কার্য হল চৈতন্য। এই চৈতন্যযুক্ত শরীরেই "অহং"-প্রত্যয়ের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ। এই ভাবেই বোঝা যায় যে আত্মা প্রত্যক্ষর দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অতএব আত্মা অবিদ্যমান। এই অনুমানটির প্রয়োগ দেখা যাক:

আত্মা নেই (ন আত্মা অস্তি),
অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষত্ব বশত (অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষত্বাৎ),
যা অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ তা নেই (যৎ অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষং তৎ নাস্তি),
যেমন খপুষ্প (যথা খপুষ্পম্)।

আবার,

যা আছে তা প্রত্যক্ষর দ্বারাই গৃহীত হয় (যৎ চ অস্তি তৎ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যত এব),
যেমন ঘট (যথা ঘটঃ)।

[তাহলে চার্বাকেরা সিদ্ধান্ত করলেন; দেহই কারণ; চৈতন্য হল দেহরই কার্য। এই চৈতন্যযুক্ত শরীরই অহং-জ্ঞানের বা অহং-প্রত্যক্ষর বিষয় হয়। অতএব, অহং-প্রত্যয়ের নজির দেখিয়ে চার্বাকদের বিরুদ্ধে যাঁরা দাবি করেছিলেন যে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব তাঁদের পক্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হল,—দেখা গেল যে প্রত্যক্ষ দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ কোন মতেই সম্ভব নয়। অতএব আত্মাকে অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ বলা হবে। এবারে চার্বাকেরা আত্মার এই অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষত্বকে হেতু করে আত্মার অলীকত্ব-প্রতিপাদক একটি অনুমান প্রস্তাব করছেন; "আত্মা অলীক; কেননা তা অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ; যা অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ তা অলীক; যেমন খপুষ্প"।[২৩৭] চার্বাকেরা বলবেন, এই

২৩৭। ভারতীয় তর্কবিদ্যার পরিভাষায় পরার্থ-অনুমানের এই দৃষ্টান্তটিতেই চারটি অবয়ব বর্তমান; প্রতিজ্ঞা, হেতু, ব্যাপ্তি ও দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গত মনে রাখা যায়, জৈন আচার্যরা পরার্থ-অনুমানের অবয়ব-সংখ্যা সংক্রান্ত কোন বাঁধাধরা নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁদের মতে যার প্রতীতি উৎপাদন করা হবে তার যোগ্যতা অনুসারেই অনুমানটির অবয়ব উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়; Sanghri ASILM 85 ff. দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গেই আরো মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষত্বই হল অস্তিত্ব অনুমানের প্রকৃত হেতু। যথা: "ঘট (বা যে-কোন সৎ পদার্থ) আছে; কেননা তা প্রত্যক্ষ-গৃহীত; যার অস্তিত্ব আছে তা প্রত্যক্ষ দ্বারাই গৃহীত হয়; যেমন ঘট"। অতএব, আত্মা যদি প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হতো তাহলে এজাতীয় অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হতো, কিংবা, আত্মাকে অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষত্ব-হেতুর উপর নির্ভরতা প্রয়োজন; কিন্তু আত্মা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষত্ব হেতু অসম্ভব। অবশ্য, আত্মার অনুমান সংক্রান্ত বিস্তৃততর বিচার অচিরেই গুণরত্ন দ্বারা উত্থাপিত হবে।]

অবশ্য পরমাণুসমূহও অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু সেগুলি ঘট-রূপ কার্যে পরিণত হলে প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। পক্ষান্তরে আত্মা কখনই প্রত্যক্ষলব্ধ হয় না। এই কারণে, অপ্রত্যক্ষত্বর সঙ্গে "অত্যন্ত" বিশেষণ যোগ করে পরমাণুগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যভিচার প্রদর্শন সম্ভাবনার নিরসন করা হয়েছে।

[আত্মার অলীকত্ব প্রতিপাদক অনুমানটিতে শুধুমাত্র "অপ্রত্যক্ষত্ব"কে হেতু না-করে চার্বাকেরা তার সঙ্গে "অত্যন্ত" বিশেষণ যোগ দিয়েছেন,—অর্থাৎ, হেতু করেছেন "অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষত্ব"। তার কারণ এইভাবে তাঁরা পরমাণুর অলীকতত্ব প্রসঙ্গ পরিহার করতে চান। কেননা, পরমাণুও অপ্রত্যক্ষ—পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব শুধুমাত্র "অপ্রত্যক্ষত্ব"কে হেতু করলে পরমাণুরও অলীকত্ব প্রতিপাদিত হয়। তাই চার্বাকেরা বলছেন, পরমাণু "অপ্রত্যক্ষ" হলেও "অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ" নয়, কারণ পরমাণুসমূহই ঘটাদি কার্যে পরিণত হলে প্রত্যক্ষগোচর হয়। অর্থাৎ, পরমাণু-সমূহ পরমাণু-রূপে অপ্রত্যক্ষ হলেও ঘটাদি-রূপে প্রত্যক্ষই। পক্ষান্তরে, দেহাতিরিক্ত আত্মা কখনোই বা কোন ভাবেই প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। তাই আত্মা "অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষ"। এইভাবে অত্যন্ত-অপ্রত্যক্ষত্ব-কে হেতু করে পরমাণুসমূহর দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যভিচার-প্রসঙ্গ পরিহার করা হল।]

একথাও বলা যায় না যে ভূতব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে অনুমান প্রবর্তিত হয়। কেননা, তা (অর্থাৎ অনুমান) প্রমাণই নয়। যদিই বা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় তাহলেও অনুমানের প্রয়োগ শুধুমাত্র এমন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ যা প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত হয় না। অন্যথা অনুমান বাধিত[২৩৮] দোষদুষ্ট হয়।

২৩৮। গুণরত্ন এখানে "কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ" শব্দ ব্যবহার করেছেন। "কালাতীত" ও "বাধিত" হেত্বাভাসের মধ্যে কেউ কেউ পার্থক্য নির্ণয়ের আয়োজন করলেও (Chatterjee NTK 317 দ্রষ্টব্য), মতান্তরে উভয় নাম একই হেত্বাভাসের বোধক। গুণরত্ন এখানে অবশ্যই

[চার্বাকেরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছেন, প্রত্যক্ষ দ্বারা কখনোই দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ হয় না। এবারে তাঁরা আত্মার অনুমান-প্রমাণ খণ্ডনে অগ্রসর হচ্ছেন। প্রশ্ন হল, প্রত্যক্ষর দ্বারা আত্মার প্রমাণ না-হলেও অনুমানের দ্বারা কি ভূতব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়? উত্তরে চার্বাকেরা প্রথমেই বলেছেন, আত্মার অনুমান-প্রমাণের প্রসঙ্গটিই অবান্তর, কেননা বস্তুতপক্ষে অনুমান কোন প্রমাণই নয়। (এইখানে মন্তব্য করা প্রয়োজন যে চার্বাক-পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করার সময় গুণরত্ন চার্বাকদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধির উপরই নির্ভর করেছেন: চার্বাক-মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান কোন প্রমাণই নয়—অনুমানের প্রামাণ্য নেই। কিন্তু প্রসিদ্ধিটি ঐতিহাসিকভাবে কতখানি সত্য,—অর্থাৎ, চার্বাকেরা বস্তুতপক্ষে কোন প্রকার অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকার করতেন কিনা,—এ বিষয়ে চার্বাক-মত সংক্রান্ত অধুনালভ্য তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে আমরা পরে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা উত্থাপন করতে বাধ্য হবো। আপাতত গুণরত্ন-বর্ণিত চার্বাক-পক্ষ-পরিচয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।) চার্বাকেরা বলছেন, যদিই বা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তাহলেও অনুমানের সাহায্যে ভূতব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস দোষদুষ্ট হতে বাধ্য। কেননা, অনুমান-প্রমাণের সমর্থকেরাও স্বীকার করবেন যে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমান স্বীকার্য হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায়, কোন অনুমান যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি দ্বারা[২৩৯] বাধিত হয় তাহলে সে-অনুমান দোষদুষ্ট হবে। এই দোষকে "বাধিত" আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, কেউ যদি অনুমান করেন: "অগ্নি শীতল, কেননা তা দ্রব্য, যেমন, জল,—তাহলে এই অনুমান প্রত্যক্ষ-দ্বারা বাধিত হয়। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, অগ্নি উষ্ণ। অতএব, চার্বাকেরা বলবেন, অনুমান-প্রমাণের সমর্থকেরাও প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করতে পারেন না। এবং এই কারণেই, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান প্রমাণের নজির দেখানো অসম্ভব। কেননা, ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে যে প্রত্যক্ষ দ্বারা দেহাত্মবাদই সিদ্ধ হয়। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে যে-কোন অনুমানই

"বাধিত" হেত্বাভাস অর্থেই "কালাতীত" নাম ব্যবহার করেছেন; তার পরবর্তী আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট।

২৩৯। বস্তুতপক্ষে, অন্য যে-কোন প্রমাণ দ্বারা বাধিত হলেই অনুমানের হেতু "বাধিত" দোষদুষ্ট হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষই প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ। এই কারণে "বাধিত" দোষ হিসাবে প্রধানতই প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিত হওয়ার কথাই গুণরত্ন উল্লেখ করেছেন।

প্রস্তাবিত হোক না কেন, তা প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত হবে,—অর্থাৎ "বাধিত" দোষদুষ্ট হবে।]

উপরন্তু, অনুমান লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ স্মরণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, পূর্বে মহানস (উনুন) প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অগ্নি নামক লিঙ্গী এবং ধূম নামক লিঙ্গর অন্বয়-ব্যতিরেকী সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হবার পরে কোন স্থানে বনযুক্ত পর্বতের মধ্যদেশে আকাশে সঞ্চলমান ধূমরেখা দর্শনের ফলে পূর্বে উপলব্ধ সম্বন্ধর স্মরণ হয়। যেমন: "যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি দর্শন করেছিলাম। যথা, মহানস (উনুন) প্রভৃতিতে। এখানেও ধূম দেখা যাচ্ছে। অতএব এখানেও বহ্নি থাকবে"।—এইভাবে লিঙ্গ-গ্রহণ ও সম্বন্ধ-স্মরণের দ্বারা প্রমাতা সেই স্থানে হুতভুজ বা অগ্নির অনুমান করেন। কিন্তু, অনুরূপভাবে লিঙ্গিরূপ আত্মার সঙ্গে কোন লিঙ্গর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নয়—যে-সম্বন্ধ স্মরণ-পূর্বক পুনরায় সেই লিঙ্গ দর্শন করে আত্মা বা জীবের প্রত্যয় (অর্থাৎ লিঙ্গী আত্মার জ্ঞান) হতে পারে। যদি বলা হয়, আত্মা নামের লিঙ্গী এবং আত্মা অনুমানের লিঙ্গ—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্য আরো স্বীকার করতে হবে যে উক্ত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষকালেই লিঙ্গী বা আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু আত্মার যদি প্রত্যক্ষই হয় তাহলে তার অনুমান-প্রসঙ্গ ব্যর্থ বা নিরর্থক—আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হলে পুনরায় অনুমানের সাহায্যে তার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব বাহুল্যমাত্র।

[ইতিপূর্বে চার্বাকেরা বলেছেন, আত্মার অনুমান "বাধিত" দোষদুষ্ট হতে বাধ্য। বর্তমানে তাঁরা অনুমান প্রমাণের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আরো আপত্তি প্রদর্শন করছেন। যথা: ১॥ অনুমান প্রমাণের বৈশিষ্ট্য বিচার করলেই বোঝা যায় যে আত্মার অনুমান বস্তুত অসম্ভব; অর্থাৎ, অনুমান প্রমাণের মূল সর্তই এমন যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অনুমানের উপর নির্ভরতা অসম্ভব। ২॥ যদিই বা দাবি করা হয় যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অনুমান প্রমাণের মূল সর্ত পূরণ করা সম্ভব তাহলেও আবার আপত্তি উঠবে যে আত্মার অনুমানই ব্যর্থ বা বাহুল্যমাত্র।

[চার্বাকদের এই আপত্তি বিচার করার জন্য অনুমান প্রসঙ্গে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য[২৪০] প্রথমে দেখা দরকার।

[লিঙ্গ মানে কি? যে-অনুমানের যেটি প্রকৃত হেতু সেইটিকেই

২৪০। ফণিভূষণ 'ন্যায়দর্শন', ১।১৩০-১৩৯ দ্রষ্টব্য। এখানে মূলত তার আলোচনা অনুসরণেরই প্রয়াস করেছি।

সে-অনুমানের লিঙ্গ বলা হয়। যেমন, ধূম থেকেই অগ্নির অনুমান হয়; তাই এই অনুমানটির প্রকৃত হেতু বা লিঙ্গ হল ধূম।

[লিঙ্গী মানে কী? লিঙ্গটি যে পদার্থের অনুমাপক সেই অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গী বলে। ধূম থেকে কী অনুমান করা হয়? বহ্নি। অতএব এই অনুমানে অনুমেয় পদার্থ বা লিঙ্গী হল ধূম।

[বর্তমানে ধূম-প্রত্যক্ষ থেকে অগ্নি অনুমিত হচ্ছে—অর্থাৎ, লিঙ্গর প্রত্যক্ষ থেকে লিঙ্গীর অনুমান হচ্ছে। কী করে তা সম্ভব হয়? লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ সংক্রান্ত স্মৃতির উপর নির্ভর করে। অতএব প্রথমে দেখা দরকার, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে সম্বন্ধ বলতে কী বোঝায় এবং সেই সম্বন্ধর জ্ঞান প্রথমে কিভাবেই বা উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য ভারতীয় দর্শনে অনেক বিতর্ক আছে। গুণরত্ন এখানে ন্যায়-সম্প্রদায়ের (প্রাচীন) মত অবলম্বন করেই চার্বাক-পক্ষ ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব বর্তমানে আমাদের পক্ষে সেই ন্যায়-মতটির পরিচিতিই প্রাসঙ্গিক।

[অতীতে পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধূম বা লিঙ্গর প্রত্যক্ষ হয়েছিল। সেই ধূম-প্রত্যক্ষ বা লিঙ্গ-প্রত্যক্ষকে বলা হয় প্রথম লিঙ্গদর্শন। সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই ধূম ও বহ্নির মধ্যে—অর্থাৎ, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে—বিশিষ্ট সম্বন্ধরও জ্ঞান (অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ-মূলক জ্ঞান) হয়েছিল। লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে (যথা ধূম ও বহ্নির মধ্যে) এই সম্বন্ধকে বলা হয় ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ, বা, সংক্ষেপে ব্যাপ্তি। লিঙ্গ পদার্থটি ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদার্থ তার ব্যাপক। ধূম ব্যাপ্য, অগ্নি ব্যাপক; কেননা যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি, বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের উৎপত্তি হয় না। "ধূমের উৎপত্তিস্থানমাত্রেই অবশ্য বহ্নির সত্তা স্বীকার্য। সুতরাং ধূমত্বরূপে ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নিত্বরূপে বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই ব্যাপ্য বলে। ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্য।" অতীতে পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির (লিঙ্গ ও লিঙ্গীর, ব্যাপ্য ও ব্যাপকের) প্রত্যক্ষ হয়; তাকেই বলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন। অতএব, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধজ্ঞানও প্রত্যক্ষলব্ধ। কেননা, "ব্যভিচারের অজ্ঞান এবং সহচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায় বা কারণ। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারের অর্থাৎ বহ্নিশূন্য স্থানে বিলক্ষণ-সংযোগসম্বন্ধে ধূমের বর্তমানতার অদর্শন এবং পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমে বহ্নির সহচারের অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যের দর্শন ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নিত্বরূপে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষরূপ নিশ্চয়ের উপায়"। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, যেখানেই ধূমের প্রত্যক্ষ হয়েছে সেখানেই বহ্নিরও প্রত্যক্ষ হয়েছে (অন্বয়), এবং বহ্নিশূন্য স্থানে কখনোই

ধূমের প্রত্যক্ষ হয়নি (ব্যতিরেকের অভাব)—এজাতীয় প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেই ধূম ও বহ্নির (লিঙ্গ ও লিঙ্গীর) মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। তাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয়।

[অতীতে লব্ধ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ সংক্রান্ত এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ফলে সেই সম্বন্ধের সংস্কার জন্মায়। বর্তমানে পর্বতে আবার ধূম বা লিঙ্গর প্রত্যক্ষ হল। এই প্রত্যক্ষকে বলা হয় দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। এই ধূম পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ। ফলে সেই পূর্বোৎপন্ন সম্বন্ধ সংক্রান্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তাই "ধূম বহ্নির ব্যাপ্য"—এইরূপ স্মৃতিও জন্মায়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনের ফলে পূর্বোৎপন্ন লিঙ্গলিঙ্গী-সম্বন্ধের স্মরণ হয়। "কিন্তু উপরোক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে···· শেষোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গদর্শন। উহাকেই বলে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান' এবং উহারই নাম—'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ'। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্বতে ধূমদর্শন হওয়ার পরে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম' এই রূপে বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলে পরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত' এইরূপে পর্বতে আবার যে-ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। তাই উহা 'তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ' নামে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গ-পরামর্শের পরক্ষণেই 'পর্বতো বহ্নিমান' এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে"।

[অর্থাৎ এই মতে অনুমানের জন্য তিনবার লিঙ্গপ্রত্যক্ষ বা লিঙ্গদর্শন বা লিঙ্গপরামর্শের প্রয়োজন হয়। যথা: ক॥ ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্য প্রথমবার লিঙ্গপ্রত্যক্ষ—যেমন, পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধূমদর্শন। খ॥ বর্তমানে দ্বিতীয়বার লিঙ্গপ্রত্যক্ষ—যেমন, পর্বতে ধূমদর্শন। এই দ্বিতীয়বার লিঙ্গপ্রত্যক্ষের ফলে অতীতে প্রত্যক্ষলব্ধ লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ সংক্রান্ত স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব, গ॥ আবার (তৃতীয়বার) আমরা লিঙ্গপ্রত্যক্ষ করি, এবং এবারে নিছক লিঙ্গ হিসাবে নয়,—"লিঙ্গীর সঙ্গে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ হিসাবে।" যথা, পর্বতে ধূম দেখার পর ধূম-বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সংক্রান্ত স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আমরা আবার এই পর্বতে দৃষ্ট ধূমকে "বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্পর্কিত ধূম" হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ, দ্বিতীয়বারের ধূম-প্রত্যক্ষ শুধুমাত্র ধূম-প্রত্যক্ষই; কিন্তু তৃতীয়বারের ধূম-প্রত্যক্ষ অগ্নির-সঙ্গে-ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ধূমের প্রত্যক্ষ। এই তৃতীয় লিঙ্গ-প্রত্যক্ষ থেকেই অনুমিতি জন্মায়।

[অনুমান প্রমাণের উপরোক্ত মূল সর্তগুলির কথা মনে রেখে এবারে দেখা যাক চার্বাকেরা কীভাবে আত্মার অনুমান-সম্ভাবনা অস্বীকার করছেন।

[আত্মা-অনুমানের দৃষ্টান্তে আত্মাই অনুমেয় পদার্থ বা লিঙ্গী বা সাধ্য। যেমন বহ্নি-অনুমানের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটিতে বহ্নিই অনুমেয় পদার্থ বা লিঙ্গী বা সাধ্য। অতএব, আত্মা-অনুমানের জন্য নিম্নোক্ত সর্তগুলি পূরণ হওয়া প্রয়োজন। যথা:

১॥ আত্মার অনুমাপক কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গ,

২॥ সেই লিঙ্গর সঙ্গে আত্মার সহচারের জ্ঞান এবং ব্যভিচারের অজ্ঞান—অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের জন্য প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে জানা দরকার যে উক্ত লিঙ্গ যেখানে বর্তমান সেখানেই আত্মা বর্তমান এবং আত্মার অবর্তমানতায় উক্ত লিঙ্গর বর্তমানতা অসম্ভব,

৩॥ বর্তমানে উক্ত লিঙ্গর প্রত্যক্ষ (দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন),

৪॥ উক্ত লিঙ্গর সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তিসম্বন্ধ-সূচক অতীত প্রত্যক্ষর স্মৃতি,

৫॥ তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ: অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে ব্যাপ্তিসম্বন্ধবিশিষ্ট হিসাবে উক্ত লিঙ্গর পুনঃ-প্রত্যক্ষ।

চার্বাকেরা বলবেন, অনুমানের উপরোক্ত সর্তগুলি মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে, আত্মার—অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার—অনুমান কেন একান্তই অসম্ভব। কেননা, আত্মা-অনুমানের জন্য প্রথমে প্রত্যক্ষমূলক ভাবে অনুমানের লিঙ্গটির সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তি-সম্পর্কর জ্ঞান হওয়া দরকার। অর্থাৎ, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য শুধুমাত্র লিঙ্গটিরই প্রত্যক্ষ নয়, আত্মারও প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। তা না-হলে অনুমানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্পর্কর জ্ঞান ও তার স্মরণ অসম্ভব হবে। কিন্তু কোনকালেই এবং কোন অবস্থাতেই দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। অতএব. আত্মার অনুমান অসম্ভব। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, আত্মা-অনুমানের জন্য আত্মা সংক্রান্তই পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞান অসম্ভব. অতএব, আত্মা অনুমান অসম্ভব।

[আরো কথা হল, যাঁরা দাবি করেন যে আত্মার অনুমান সম্ভব, তাঁরা ভুলে যান যে তাঁদের পক্ষেই একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই অনুমানের পূর্বে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইতিপূর্বেই সিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব পুনরায় প্রতিপন্ন করার প্রস্তাবই অবাস্তব বা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ, আত্মা-অনুমানের

সমর্থকদের নিজস্ব দাবি অনুসারেই আত্মা-অনুমানের প্রস্তাব বাহুল্যমাত্র।]

চার্বাকেরা বলছেন, কেউ দাবি করতে পারেন যে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে আদিত্য-গতি যে-ভাবে সিদ্ধ হয় আত্মা বা জীবের অস্তিত্বও সেইভাবেই সিদ্ধ হয়। যেমন (অর্থাৎ, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের নমুনা): "আদিত্য গতিমান্, দেশান্তরপ্রাপ্তি-দর্শন-হেতু, যেমন দেবদত্ত।" উত্তরে চার্বাকদের মন্তব্য হল, এই দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, দৃষ্টান্তধর্মী দেবদত্তে সাধারণভাবে দেশান্তর-প্রাপ্তি গতিপূর্বক হয়—একথা প্রত্যক্ষ দ্বারাই নিশ্চিত। প্রমাতা সেইভাবেই সূর্যেও সেই গতি প্রমাণ করেন। কিন্তু সেইভাবেই এখানে (অর্থাৎ, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদন প্রসঙ্গে) কোন দৃষ্টান্তই আত্মার সঙ্গে অবিনাভাব-সম্বন্ধ বিশিষ্ট (ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বিশিষ্ট) কোন হেতুই প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না। অতএব, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না।

[ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দাবি করেছেন, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আধার হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়। এবিষয়ে আমরা পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা উত্থাপন করবো এবং দেখবো সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানটির প্রকৃতি এবং সেই অনুমানের সাহায্যে বস্তুতপক্ষে আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদন সম্ভাবনা প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের মধ্যেই অনেক মতভেদ এবং বিতর্ক আছে। আপাতত দেখা যাক, চার্বাকপক্ষর বর্ণনায় গুণরত্ন কীভাবে চার্বাকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাৎস্যায়নের এই দাবিটিকে খণ্ডন করেছেন।

[বাৎস্যায়ন বলেছেন, অনুমান তিন প্রকারের: ১॥ পূর্ববৎ ২॥ শেষবৎ এবং ৩॥ সামান্যতোদৃষ্ট। অবশ্য বাৎস্যায়ন নিজেই এই তিন রকম অনুমানের বিকল্প-ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৪১] তার মধ্যে চার্বাক দৃষ্টিকোণ থেকে গুণরত্ন এখানে যে ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন তারই আলোচনা বর্তমানে প্রাসঙ্গিক হবে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য প্রথমে পূর্ববৎ এবং শেষবৎ অনুমানের কিঞ্চিৎ পরিচয় বাঞ্ছনীয়। "পূর্ব শব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কার্য। কার্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব এবং কার্যটি শেষ, এজন্য 'কারণ' অর্থেও 'পূর্ব' শব্দ এবং 'কার্য' অর্থেও 'শেষ' শব্দর প্রয়োগ হইয়াছে। ...উক্ত 'পূর্ববৎ' এবং 'শেষবৎ' শব্দের দ্বারা কারণহেতুক ও কার্যহেতুক অনুমান

২৪১। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন', ১।১৪৫-১৫৯ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলি এই গ্রন্থ থেকেই গৃহীত।

বুঝা যায়। কারণবিশেষই তাহার ব্যাপক কার্যবিশেষের অনুমাপক হয় এবং কার্যবিশেষ তাহার ব্যাপক কারণবিশেষের অনুমাপক হয়। যেমন মেঘের উন্নতিবিশেষরূপ কারণের দর্শনের দ্বারা তাহার কার্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতি জন্মে এবং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা বিশেষরূপ কার্যের দর্শনের দ্বারা তাহার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জন্মে"।২৪২ অর্থাৎ, কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল একরকম ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধই: একদিকে যেমন কার্য ব্যাপ্য ও কারণ তার ব্যাপক অপরদিকে তেমনি কারণ ব্যাপ্য ও কার্য তার ব্যাপক। কার্যকে ব্যাপ্য এবং কারণকে ব্যাপক হিসাবে গ্রহণ করলে কারণই কার্য-অনুমানের লিঙ্গ হয়; কারণ-দর্শন করে কার্য অনুমান করা যায়। এই অনুমানকে পূর্ববৎ বলা হয়। যেমন: আকাশে কোন এক নির্দিষ্ট ধরণের মেঘ (কারণ) দর্শন করে ভাবী বৃষ্টির (কার্য) অনুমান। আবার, কারণকে ব্যাপ্য ও কার্যকে ব্যাপক হিসাবে গ্রহণ করলে কার্যই কারণ-অনুমানের লিঙ্গ হয়; কার্য-দর্শন করে কারণ অনুমান করা যায়। এই অনুমানকে শেষবৎ বলে। যেমন: নদীর পূর্ণতা ও প্রখরতা বিশেষ (কার্য) দর্শন করে অতীত বৃষ্টির (কারণ) অনুমান।

[অবশ্য এই পূর্ববৎ এবং শেষবৎ উভয়বিধ অনুমানই প্রত্যক্ষ-অনুগামী। অর্থাৎ, কার্য-কারণের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ পূর্বে প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হয় বলেই পরে কার্য-অনুমানের পক্ষে কারণ (পূর্ববৎ) বা কারণ অনুমানের পক্ষে কার্য (শেষবৎ) লিঙ্গ বা হেতু হয়। কিন্তু এছাড়াও আর-একরকম অনুমান আছে যেখানে অনুমেয় পদার্থ (সাধ্য বা লিঙ্গী) প্রত্যক্ষের অযোগ্য। তাই কোন পদার্থে তার ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। যেমন, সূর্যের গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষের অযোগ্য; তাই কোন পদার্থেই তার ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু এক-স্থানে দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়া-প্রযুক্ত—এই বিষয় বহু দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, দেবদত্ত পূর্বে একস্থানে দৃষ্ট হয়েছিল, পরে অন্যস্থানে দৃষ্ট হয়েছে, এবং গতি-ক্রিয়ার ফলেই তার পক্ষে এই ভাবে স্থানান্তরে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব—এজাতীয় বহু ঘটনাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। "সুতরাং উক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষের ফলে 'সূর্যো গতিমান্'—এইরূপে সূর্যে অপ্রত্যক্ষ গতিক্রিয়ার অনুমিতি জন্মে। কারণ, প্রাতঃকালে একস্থানে দৃষ্ট সূর্যেরও মধ্যাহ্নাদিকালে অন্য স্থানে দর্শন হয়। সুতরাং তাদৃশ দর্শনবিষয়ত্ব হেতুর দ্বারা সূর্যে গতিক্রিয়ার অনুমিতি হয়"। অর্থাৎ, সূর্যের গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নয়।

২৪২। পূর্ববৎ এবং শেষবৎ এই দ্বিবিধ অনুমানের উক্ত প্রয়োগ অবশ্য উদ্যোতকর প্রদর্শন করেছেন, বাৎস্যায়ন নন।

তবুও, অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি, একটি বস্তু একস্থানে পরিদৃষ্ট হবার পরে সেই বস্তুই স্থানান্তরে পরিদৃষ্ট হওয়া সেই বস্তুটিরই গতিক্রিয়া-প্রযুক্ত। অর্থাৎ, "একস্থানে পরিদৃষ্ট হবার পর স্থানান্তরে পরিদৃষ্ট হওয়া" এবং "গতিক্রিয়া"—উভয়ের মধ্যে একরকম ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এজাতীয় ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেই সূর্যের গতিক্রিয়া বস্তুত অপ্রত্যক্ষ হলেও "এক স্থানে সূর্যদর্শনের পর অন্য স্থানে সূর্যদর্শন"কে হেতু করে আমরা সূর্যের গতিক্রিয়া অনুমান করতে পারি। এ-জাতীয় অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়েছে।

[বাৎস্যায়ন[২৪৩] আরো বলেছেন, আত্মা অপ্রত্যক্ষ হলেও[২৪৪]। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যেই তার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়। যথা: "ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থ; গুণপদার্থসমূহ কিন্তু 'দ্রব্যসংস্থান' (অর্থাৎ, দ্রব্যপদার্থই গুণপদার্থের স্থান বা আধার); অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থের যাহা স্থান বা আধার (অর্থাৎ, যে দ্রব্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়), তাহা আত্মা"। এই অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ বলা হয়েছে। এখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের যোগ্যই নয়, কেননা দেহাদি ভিন্ন রূপে আত্মা প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়। তাই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণে আত্মার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হতে পারে না: "কারণ, যাহাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তাহা দেহাদিভিন্ন আত্মা,—এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন উদাহরণ নাই। কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, সে সমস্তই দ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপাদি গুণ,—এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থে অথবা গুণত্বে দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি গুণ যে দ্রব্যাশ্রিত, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণ কোন দ্রব্যাশ্রিত, অর্থাৎ কোন দ্রব্যপদার্থ তাহার আশ্রয় বা আধার,

---

২৪৩। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাৎস্যায়ন নিজে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রথম ব্যাখ্যার উদাহরণ হিসাবে "আদিত্যের গতি অনুমান" ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উদাহরণ হিসাবে "ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আধার আত্মা অনুমান" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চার্বাকমতের ব্যাখ্যায় গুণরত্ন এই পার্থক্য উপেক্ষা করেছেন। এবং তিনি উভয় উদাহরণকেই একত্রে উল্লেখ করেছেন বলে বর্তমানে আমরাও গুণরত্নের রচনা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উভয় উদাহরণই একত্রে আলোচনা করলাম। ন্যায়-সম্প্রদায় প্রস্তাবিত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সমস্যা পরে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়াস করা হবে।

২৪৪। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে বাৎস্যায়ন আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার না করলেও পরবর্তী নৈয়ায়িকদের মধ্যে দার্শনিকবিশেষ সে সম্ভাবনা মেনেছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা উত্থাপিত হবে।

ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হয়"।

[উপরোক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের বিরুদ্ধে চার্বাকেরা আপত্তি তুলছেন। তাঁরা বলছেন, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ আদিত্যগতি অনুমানকে বিচার করলেই বোঝা যায় যে এই অনুমানও যে-অর্থে পূর্ব-প্রত্যক্ষর উপর অনিবার্যভাবেই নির্ভরশীল আত্মা-অনুমান সেই অর্থে পূর্ব-প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। কেননা, আদিত্যগতি অনুমানের 'দৃষ্টান্ত' হল দেবদত্তর গতিক্রিয়া। কিন্তু দেবদত্তর দেশান্তর প্রাপ্তি যে সামান্যত গতিপূর্বকই হয় একথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই সামান্যত দেশান্তর প্রাপ্তি এবং গতিক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ জানা যায়। এবং এই ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধর উপর নির্ভর করেই সূর্যের গতিক্রিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু একইভাবে আত্মার অনুমান সম্ভব নয়, কেননা সে-অনুমানের জন্য একইভাবে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নেই—ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নেই, কেননা দেহাতিরিক্ত আত্মার সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন হেতু প্রতক্ষ্য দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তাই আত্মা অনুমানের জন্য সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রস্তাবও প্রকৃতপক্ষে বৃথাই।]

আগম বা শাস্ত্র দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। কেননা, আপ্তজন-প্রণীত অবিসংবাদী বচনের উপরই আগমের প্রামাণ্য নির্ভর করে। কিন্তু অবিসংবাদী বচনযুক্ত এমন কোন আপ্তজনকে আমরা দেখিনি যাঁর আত্মা প্রত্যক্ষভূত। [আমরা যারা] এইরূপ ব্যক্তি পাই না [তারা] কীভাবে আত্মাকে পাবো? উপরন্তু [বিভিন্ন] আগম পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী। অতএব, কোন্‌টি প্রমাণ আর কোন্‌টিই বা অপ্রমাণ—এই সন্দেহের দাবানল জ্বালাতেই আগমের প্রামাণ্য অবসিত হয়। তাই আগম প্রমাণ থেকেও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

[চার্বাকদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে যে আগম বা শাস্ত্রই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে। উত্তরে চার্বাকেরা বলছেন, যাঁরা শাস্ত্র-প্রমাণ মানেন তাঁরাই শাস্ত্র-প্রমাণের যে-মূল সর্ত উল্লেখ করেন সেই মূল সর্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে স্বীকার্য হতে পারে না। কেননা, তাঁদের মতেই শাস্ত্রর প্রামাণ্য নির্ভর করে অবিসংবাদী-বচন যুক্ত আপ্তজনের উক্তির উপর; কিন্তু অবিসংবাদীবচন যুক্ত এমন কোন ব্যক্তির পরিচয়ই পাওয়া যায় না যিনি সত্যিই

আত্মা দর্শন করেছেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া, চার্বাকদের চরম মন্তব্য এই যে তথাকথিত আগম-প্রমাণের প্রসঙ্গই অবান্তর; কেননা আগম বা শাস্ত্র প্রমাণই নয়—শাস্ত্রর প্রামাণ্য অসম্ভব। তার কারণ নানা সম্প্রদায়ের নানা শাস্ত্র, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাস্ত্র পরস্পর-বিরুদ্ধ। অতএব, কোন্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে প্রামাণ্য এবং কোন্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে প্রামাণ্যহীন—এবিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়। এবং সেই সন্দেহ-অনলেই আগমের তথাকথিত প্রামাণ্য ভস্মীভূত হয়।]

তেমনি উপমান প্রমাণের সাহায্যেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কেননা, "যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ—যেমন গোরু সেইরকম গবয়" ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দুটি বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অবলম্বন করেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ত্রিভুবনেও আত্মা সদৃশ এমন কোন বস্তু নেই যা দর্শন করে আত্মাকে জানতে পারি। একথাও বলা যায় না যে কাল, আকাশ, দিক্ প্রভৃতি আত্ম-সদৃশ বা আত্ম-তুল্য রূপে বিরাজমান। কেননা, বিবাদাস্পদ বলেই এগুলিও সমপর্যায়ভুক্তই।

[নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকেরা (এবং "ব্যবহারে ভাট্ট-নয়ঃ" নীতি অনুসরণ করে নবীন অদ্বৈতবাদীরাও—পাদটীকা ৪৭ দ্রষ্টব্য) উপমান নামের একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেছেন[২৪৫]। অবশ্য, উপমানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। উপমান বাক্যের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হল, "যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ" —গোরু যেরকম, সেইরকমই গবয়। গোরুর মতোই একরকম বন্য পশুকে গবয় বলে: গোরুর মতো তার গলদেশে গলকম্বল নেই, সুতরাং তা গোরু নয়; কিন্তু তবুও তা গোরুরই সদৃশ। (দেশবিশেষে এই পশুকে নীলগাই বলে)। ন্যায়-মতে উক্ত উপমানবাক্যর তাৎপর্য

২৪৫। অবশ্য গুণরত্নর নিজ-সম্প্রদায়ে উপমান প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত নয়; জৈন আচার্যদের মতে পরোক্ষ-প্রমাণ পাঁচ রকমের: অনুমান, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মরণ, তর্ক ও আগম এবং সম্প্রদায়ান্তর-প্রস্তাবিত উপমান-প্রমাণ প্রত্যভিজ্ঞারই প্রকার-বিশেষ—Sanghavi ASILM 53 এবং Chatterjee NTK 331 দ্রষ্টব্য। অতএব বোঝা যায় যে গুণরত্ন এখানে ন্যায় ও মীমাংসার পক্ষ থেকেই উপমান-প্রমাণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে উপমান-প্রমাণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এই দুটি সম্প্রদায়ের একটিতেও উপমান-প্রমাণের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস দেখা যায় না। অতএব, গুণরত্নর চার্বাকমত বর্ণনায় এ-জাতীয় আলোচনা উত্থাপনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বাস্তব বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে গুণরত্নর অভিপ্রায় এই যে চার্বাকমতে কোন প্রমাণের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, অতএব সম্প্রদায়ান্তর-প্রস্তাবিত এই তথাকথিত উপমান-প্রমাণটির সাহায্যেও নয়।

হল : "যে-ব্যক্তি কখনও গবয় পশু দেখেন নাই, গবয় শব্দের অর্থ যিনি জানেন না, কিন্তু গো যাঁহার প্রজ্ঞাত, তাঁহাকে দৃষ্টগবয় কোন বনবাসী বলিলেন, 'যেমন গো সেইরূপ গবয়,' অর্থাৎ গবয় পশু গোর সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি কোন সময়ে কোন স্থানে গবয় পশু দেখিয়া, তখন তাহাতে গোর সাদৃশ্য দর্শন করিলে পরক্ষণে তাঁহার সেই পূর্বশ্রুত বনেচর-বাক্যের অর্থ স্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে দৃশ্যমান গবয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পশু 'গবয়' শব্দের বাচ্য এইরূপ যথার্থবোধ জন্মে। উহারই নাম উপমিতি এবং ঐ উপমিতির করণই উক্ত স্থলে উপমান-প্রমাণ"। কিন্তু মীমাংসা-মতে আলোচ্য উপমান বাক্যটির তাৎপর্য অন্য রকম : এক ব্যক্তি পূর্বে নিজের গরু দেখেছে কিন্তু গবয় দেখেনি, বনে গিয়ে সে গবয় দেখলো, গবয় দেখে তার প্রথম জ্ঞান হল, "এই গবয় আমার গোরুর সদৃশ," সেই জ্ঞান থেকে তার দ্বিতীয় জ্ঞান হল "আমার গোরু এই গবয়র সদৃশ"। অর্থাৎ, গবয়তে গোরুর সাদৃশ্য-দর্শন-জন্য জ্ঞান (গবয়-নিষ্ঠ-গো-সাদৃশ্য জ্ঞান) থেকে গোরুতে গবয়র সাদৃশ্য সংক্রান্ত জ্ঞানকে (গো-নিষ্ঠ-গবয়-সাদৃশ্য জ্ঞানকে) উপমান-জন্য জ্ঞান বলা হয়।

[গুণরত্ন এখানে পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকমত বর্ণনা প্রসঙ্গে আপত্তি তুলেছেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন নাহলেও উপমান প্রমাণের দ্বারা তা প্রমাণিত হতে পারে। অবশ্য এখানে কোন্ অর্থে উপমান প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে—ন্যায়-সম্মত অর্থে, না, মীমাংসা-সম্মত অর্থে—সে-বিষয়ে গুণরত্ন কোন সুস্পষ্ট উক্তি করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর কারণ, তিনি চার্বাকপক্ষ থেকে এই আপত্তির যে-উত্তর প্রস্তাব করেছেন তা এমনই যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে উভয়-সম্মত অর্থেই উপমান-প্রমাণের সহায়তা অন্বেষণ নিষ্ফল হয়। কেননা, উভয়-সম্মত অর্থেই উপমান-প্রমাণের জন্য দুটি বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে একটিতে অপরের সাদৃশ্য দর্শন প্রয়োজন। ন্যায়-মতে গবয়তে গো-র সাদৃশ্য দর্শন না হলে দৃশ্যমান গবয়ত্ববিশিষ্ট পশু যে গবয়শব্দের বাচ্য এই জ্ঞান হয় না। মীমাংসা-মতেও, দৃশ্যমান গবয়তে গোর সাদৃশ্য দর্শনের ফলেই পূর্বদৃষ্ট গো-তে গবয়র সাদৃশ্যজ্ঞান হয়। অতএব, উভয়-মতেই উপমান-মূলক ভাবে আত্মার জ্ঞানের জন্য আত্মা-নয়-কিন্তু-আত্মার-সদৃশ এমন কোন বস্তুতে আত্মার সাদৃশ্য দর্শন প্রয়োজন। কিন্তু ত্রিভুবনেও আত্মাসদৃশ কোন বস্তু নেই; তাই সেরকম কোন বস্তুতে আত্মার সাদৃশ্য-দর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে উপমান-প্রমাণের যোগ্যতা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই

ওঠে না। আপত্তি তুলে যদি বলা হয় যে কাল, আকাশ, দিক্ প্রভৃতিই আত্ম-সদৃশ বস্তু; তাহলে উত্তরে চার্বাকেরা বলবেন, কাল, আকাশ, দিক্ প্রভৃতিও আত্মার মতোই অলীক। অতএব কাল, আকাশ প্রভৃতি দর্শনই সম্ভব নয়, তাই সেগুলিতে আত্মার সাদৃশ্য-দর্শন প্রসঙ্গও অবান্তর।]

উপরন্তু আত্মা অর্থাপত্তির দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। এমন কোন বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যার জ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব ব্যতীত উপপন্ন হতে পারে না,—অতএব যার বলে আমরা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করতে পারি।

[মীমাংসক এবং নবীন অদ্বৈতবাদীরা অর্থাপত্তি নামে আরো একটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। একটি জ্ঞাত ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য অপর কোন অজ্ঞাত ঘটনার অনিবার্য-স্বীকৃতিমূলক জ্ঞানকে অর্থাপত্তি বলা হয়েছে। যেমন আমরা দেখেছি, দেবদত্ত দিনে খায় না, তবুও মোটা হচ্ছে। এই ঘটনার ব্যাখ্যায় আমরা মানতে বাধ্য যে দেবদত্ত রাতে খায়। এইভাবে অনিবার্য-স্বীকৃতি-মূলক তার রাতে খাওয়া সংক্রান্ত যে-জ্ঞান পাওয়া যায় তার করণ বা সাধকতম কারণ হল অর্থাপত্তি-প্রমাণ।

[যদিও অবশ্য মীমাংসকেরা অর্থাপত্তির সাহায্যে বাস্তবিকই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চাননি তবুও চার্বাকমত বর্ণনায় গুণরত্ন বলছেন, অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও তার সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন অসম্ভব। কেননা, এমন কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই যার ব্যাখ্যায় আত্মার অস্তিত্ব অনিবার্য-ভাবে মানা প্রয়োজন।]

পরিশেষে চার্বাকেরা বিদ্রূপ করে বলেছেন, অতএব সমুপলম্ভ-প্রমাণের বিষয় না-হওয়ায় প্রতিষেধ (অভাব) সাধক অভাব-প্রমাণেরই বিষয় আত্মা,—এই কথাই সিদ্ধ হয়।

[ভাট্ট মীমাংসকেরা অনুপলব্ধি বা অভাব-প্রমাণ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ মেনেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের বিষয় হল ভাব-পদার্থ—অর্থাৎ, এমন পদার্থ যা বাস্তবিকই আছে বা যা বর্তমান। পক্ষান্তরে অনুপলব্ধি বা অভাব-প্রমাণের বিষয় হল অভাব-পদার্থ—যা নেই বা যা অবর্তমান। যেমন আমার সামনে এখন ঘট নেই; ভাট্ট-মতে অনুপলব্ধি-প্রমাণের সাহায্যেই আমি এই ঘটের অভাব জানতে পারি। চার্বাকেরা পরিহাস করে বলছেন, যেহেতু ইতিপূর্বে দেখা গেল যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ভাব-পদার্থ প্রতিপাদক প্রমাণের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব মানা যায় না সেইহেতু বরং স্বীকার করা ভাল যে আত্ম

আসলে অভাব-প্রমাণেরই বিষয়, অর্থাৎ অভাব-পদার্থই। সংক্ষেপে, এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হল যে আত্মা নেই।]

এ-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে উপরোক্তভাবে চার্বাক-পক্ষ বর্ণনা করে গুণরত্ন স্বীয় বিচারশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। যে-দেহাত্মবাদ তাঁর নিজ অভিপ্রায় অনুসারে বস্তুত অত্যন্ত গর্হিত তার সমর্থনেও, গুণরত্ন দেখিয়েছেন, বহুবিধ জটিল ও অন্তত আপাত-অলঙ্ঘনীয় যুক্তি অবতারণা করা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য অনুসারে এমন বিস্তৃতভাবে পূর্বপক্ষ বর্ণনার সার্থকতা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে : বিরুদ্ধ মতবাদটির পক্ষে যতো প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব তা প্রদর্শন করার পরও মতটির অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপাদন করলে তা সর্বৈবভাবে খণ্ডিত হয়। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে উক্ত নীতি অনুসারে অগ্রসর হয়েছেন বলেই গুণরত্নর এই দেহাত্মবাদ-বর্ণনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়েছে। দেহাত্মবাদের সমর্থনে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকপক্ষে বা ঐতিহাসিকভাবে যে-নজির প্রদর্শন করেছেন দেহাত্মবাদের আলোচনাকে গুণরত্ন শুধুমাত্র তারই ব্যাখ্যা-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি আরো দেখাতে চেয়েছেন লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে এবং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যে-সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে লোকায়তিক পক্ষ থেকেই অন্তত প্রাথমিকভাবে এমনকি সেগুলিরও কোন-না-কোন উত্তর উদ্ভাবন করা অসম্ভব নয়।

এই বিষয়টি এখানে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে মূলত দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, দেহাত্মবাদের সমর্থনে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই যে-নজির প্রদর্শন করেছেন তার খণ্ডন। কিন্তু শুধুমাত্র এই নেতিমূলক দায়িত্বই পর্যাপ্ত হতে পারে না। দেহাত্মবাদ বিরোধীদের পক্ষে আরো দেখানো দরকার যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদক সুস্পষ্ট প্রমাণও বর্তমান। আমরা অচিরেই দেখবো, বিশেষত ন্যায়-সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এই দ্বিতীয় দায়িত্বটি পালনে অগ্রণী হয়েছিলেন; অর্থাৎ বিশেষত তাঁরাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। তার কারণ অবশ্য শুধুমাত্র দেহাত্মবাদী লোকায়তিকদের সঙ্গেই তাঁদের মতবিরোধ নয়, নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে বিশেষ মতসংঘর্ষও,—যদিও অবশ্যই লোকায়তিক

দেহাত্মবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের প্রভূত পার্থক্যও বর্তমান এবং আমরা কিছু পরেই এই পার্থক্যর আলোচনা উত্থাপন করবো। আপাতত মনে রাখা দরকার যে নৈয়ায়িকেরা অনুভব করেছিলেন যে লোকায়তিক ও বৌদ্ধ উভয় মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদক বাস্তব প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন বর্তমান এবং এই কারণেই তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদক প্রমাণ—বিশেষত অনুমান-প্রমাণ—প্রদর্শনের প্রয়াস করেছিলেন। গুণরত্নর উপরোদ্ধৃত দেহাত্মবাদ বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ন্যায় সম্প্রদায় প্রস্তাবিত আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদক নানা বিচার পুনরুল্লেখ করেছেন এবং সাময়িক বা প্রাথমিক ভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে চার্বাক-পক্ষ থেকে এ-জাতীয় বিচারের প্রত্যুত্তর উদ্ভাবনও অসম্ভব নয়।

বলাই বাহুল্য, দেহাত্মবাদের স্বকীয় দার্শনিক মূল্য নির্ণয়ের পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা উত্থাপন করা অবশ্য অবান্তর নয়। কিন্তু লোকায়তিক দেহাত্মবাদের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এখানে আরো একটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। উপরোক্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে গুণরত্ন দেহাত্মবাদের বর্ণনাটিকে মোটের উপর ন্যায়-সম্প্রদায় সম্মত আলোচনার ছাঁচে ঢালতে বাধ্য হয়েছেন। পক্ষান্তরে একথা স্বীকার করার পক্ষে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক নজির নেই যে দেহাত্মবাদের সমর্থনে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই ন্যায়-সম্প্রদায় সম্মত আলোচনার ধারাই অনুসরণ করতেন, বা, প্রমাণতত্ত্বর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদের দার্শনিক মূল্যায়ন এককথা, লোকায়তিক দেহাত্মবাদের ঐতিহাসিক রূপটি সনাক্ত করা স্বতন্ত্র কথা। লোকায়ত-মতের বিচারে প্রথম উদ্দেশ্যটি অবশ্যই অবান্তর নয় এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রমাণ-শাস্ত্র-সম্মত ধারা অনুসরণের প্রস্তাবও অবান্তর নয়। কিন্তু লোকায়তিক দেহাত্মবাদের স্বরূপ সংক্রান্ত প্রশ্নটি মূলতই ঐতিহাসিক প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নর উত্তরে আমাদের প্রধানতম জ্ঞাতব্য-বিষয় হল, লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই কীভাবে দেহাত্মবাদ ব্যাখ্যা ও সমর্থন করতেন—লোকায়তিকদের পক্ষে ভারতীয় প্রমাণ-শাস্ত্রর মানদণ্ডে দেহাত্মবাদকে কীভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত সমর্থন করা সম্ভব তাইই নয়। এই কারণেই লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনাকে ন্যায়-সম্প্রদায় সম্মত আলোচনার ছাঁচে ঢালার আগ্রহ লোকায়ত-মতের ঐতিহাসিক স্বরূপ নির্ণয়ের পরিপন্থী হতে পারে। অন্তত গুণরত্নর উপরোদ্ধৃত লোকায়ত-মতের বর্ণনায় যে এজাতীয় আশঙ্কার কারণ বর্তমান তার পক্ষে তাঁর নিজস্ব রচনারই সাক্ষ্য দেখানো অসম্ভব নয়।

স্বীয় সম্প্রদায় সম্মত জীব বা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনাকে "স্থূণানিখনন ন্যায়" অনুসারে সাধ্যমত পল্লবিত করলেও গুণরত্ন তাঁর 'তর্করহস্যদীপিকা'রই

শেষাংশে পুনরায় চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের ব্যাখা প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, এই গ্রন্থটি হরিভদ্র সূরি রচিত 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'-এর ভাষ্যমাত্র। এবং স্বয়ং হরিভদ্র তাঁর গ্রন্থশেষে সাতটি শ্লোকে স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায় হিসাবেই লোকায়তর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন; স্বভাবতই গুণরত্নর পক্ষেও সে-বর্ণনাকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এবারে স্ব-সম্প্রদায় প্রতিপাদ্য কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা-কল্পে লোকায়তিক প্রতিপাদ্য কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বেরই খণ্ডন তাঁর উদ্দেশ্য নয়; অতএব পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিকদের কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের সমর্থনে সম্ভব অসম্ভব সর্ববিধ যুক্তি অবতারণার উৎসাহও নয়। এবং এই কারণেই লোকায়ত সংক্রান্ত বাস্তব ঐতিহাসিক ইংগিত লাভের পক্ষে হরিভদ্রর সাতটি শ্লোক এবং গুণরত্ন রচিত তারই ভাষ্য তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য। অতএব আমাদের আলোচনার পক্ষে এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, হরিভদ্র রচিত সাতটি শ্লোকে এবং গুণরত্ন রচিত তারই ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে কী তথ্য পাওয়া যায় এবং বিশেষ করে লোকায়তিক দেহাত্মবাদেরই বা কী পরিচয় পাওয়া সম্ভব ?

প্রথমে হরিভদ্রর শ্লোকগুলি দেখা যাক :

লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি জীবো ন নির্বৃতিঃ।
ধর্মাধর্মৌ ন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ॥ ৮০ ॥
এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।
ভদ্রে বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ॥ ৮১ ॥
পিব খাদ চ চারুলোচনে, যদতীতং বরগাত্রি তন্নতে।
ন হি ভীরু গতং নিবর্ততে, সমুদয়মাত্রমিদং কলেবরম্॥ ৮২ ॥
পৃথ্বী জলং তথা তেজো বায়ুর্ভূতচতুষ্টয়ম্।
চৈতন্যভূমিরেতেষাং ত্বক্ষমন জমেবহি॥ ৮৩ ॥[২৪৬]
পৃথিব্যাদিভূতসংহত্যা তথা দেহপরিণতেঃ।
মদশক্তিঃ সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বত্তদ্বচ্চিদাত্মনি॥ ৮৪ ॥
তস্মাদ্দৃষ্টপরিত্যাগাদ্যদদৃষ্টে প্রবর্তনম্।
লোকস্য বুদ্ধিমূঢ়ত্বং চার্বাকাঃ প্রতিপেদিরে॥ ৮৫ ॥
সাধ্যবৃত্তিনিবৃত্তিভ্যাং যা প্রীতির্জায়তে জনে।
নিরর্থা সা মতে তেষাং ধর্মঃ কামাদপরো ন হি॥ ৮৬ ॥
অর্থাৎ

২৪৬। গুণরত্ন বলছেন, "চৈতন্যভূমিরেতেষাং"-এর পরিবর্তে "আধারো ভূমিরেতেষাং" বা "প্রমাণভূমিরেতেষা" পাঠান্তরও পাওয়া যায়। কিন্তু স্পষ্টার্থের প্রয়োজনে আমরা "চৈতন্যভূমিরেতেষাং" পাঠই গ্রহণ করেছি।

লোকায়তিকেরা বলে থাকে: জীব (আত্মা) নেই, মোক্ষ নেই ধর্মাধর্ম নেই; পুণ্যপাপের ফল নেই। ভদ্রে বৃকপাদ দেখ—এমন কি বহুশ্রুত ব্যক্তিরাও [যেমন ব্যাঘ্রপদচিহ্ন দেখে অপ্রত্যক্ষ ব্যাঘ্রাগমন সংক্রান্ত ভ্রান্ত অনুমান করেন তেমনি অপ্রত্যক্ষ পরলোকাদি সংক্রান্ত তাঁদের অনুমানও ভ্রান্ত।] হে ভীরু, যা অতীত তা প্রত্যাবর্তন করেনা; শরীর [চতুর্ভূতের] সমুদায় মাত্র। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু—এই হল চতুর্ভূত। এগুলিই চৈতন্যভূমি বা চৈতন্য উৎপত্তির স্থান। প্রত্যক্ষই প্রমাণ। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতের সংহতিই দেহাকারে পরিণত হয়; যেমন [গুড় প্রভৃতি] সুরাঙ্গ (মদ্য প্রস্তুতের উপাদান) থেকে মদশক্তি [উৎপন্ন হয়] তেমনি [দেহাকারে পরিণত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত থেকেই] চেতন আত্মার [চৈতন্যর] উৎপত্তি হয়। অতএব চার্বাকেরা প্রতিপাদন করে, দৃষ্ট (বা প্রত্যক্ষগোচর বিষয়) পরিত্যাগ করে অদৃষ্ট বিষয়ে (অপ্রত্যক্ষ পরলোকে লভ্য সুখাদি বিষয়ে) প্রবৃত্ত হওয়া লোকের পক্ষে মূঢ়তারই পরিচায়ক। এই মতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জনিত প্রীতি নিরর্থক. কাম ব্যতীত ধর্ম নেই।

অন্য কোন সম্প্রদায়ের পরিচিতি প্রসঙ্গে কোন নারীকে সম্বোধন করার রীতি অনুসরণ না-করলেও হরিভদ্র কেন "ভদ্রে," "ভীরুলোচনে" প্রভৃতিশব্দ ব্যবহার করে শুধুমাত্র লোকায়তমতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই এই রীতি অনুসরণ করেছেন,—হরিভদ্রর ভাষ্যকারেরা অবশ্য সে-প্রশ্ন আলোচনা করেননি। এবং সাধারণভাবে আমাদের শুধু এইটুকুই জানা আছে যে বিবিধ ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র তান্ত্রিক সম্প্রদায়েরই প্রসিদ্ধ রচনা-রীতি এই রকমই। হরিভদ্র লোকায়ত-মত বর্ণনার শেষে "তাদের মতে কাম ছাড়া ধর্ম নেই"—এই উক্তি করেও তান্ত্রিক-কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায় সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাই মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আমরা আগেই দেখেছি যে লোকায়তিক বলতে যে আসলে তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে—একথা গুণরত্ন অত্যন্ত সরাসরি ভাবেই ব্যক্ত করেছেন: "কাপালিকা ভস্মোদ্ধূলনপরা যোগিনো ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্যজাতাশ্চ কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ জীবপুণ্যপাপাদিকং ন মন্যন্তে। চতুর্ভূতাত্মকং জগৎ আচক্ষতে।...তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যাগমনমপি কুর্বতে।...ধর্মং কামাদপরং ন মন্বতে। তন্নামানি চার্বাকা লোকায়তা ইত্যাদীনি"। এ-হেন কাপালিকাদি নাস্তিকদেরই কেন "চার্বাক" বলা হতো তার ব্যাখ্যায় গুণরত্ন বলেছেন, "গলচর্ব অদনে। চর্বন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতো ন মন্যন্তে পুণ্যপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্বাকাঃ"২৪৭।

২৪৭। 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ. ৩০০

অর্থাৎ, "চর্ব" থেকে নাম হয়েছে চার্বাক—এরা পুণ্যপাপ নির্বিচারে মদ্যমাংস পান-ভোজন করে বলেই এদের চার্বাক বলা হয়। এবং সাধারণ লোকের বা ইতর জনের মতোই নির্বিচার এদের আচরণ বলেই গুণরত্নের মতে এদের নাম "লোকায়ত বা লোকায়তিক" : "লোকা নির্বিচারাঃ সামান্যা লোকাস্তদ্বদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা, লোকায়তিকা ইত্যপি"।

বলাই বাহুল্য, চার্বাক, লোকায়ত প্রভৃতি নাম এই অর্থে গ্রহণ করলে এবং বিশেষত লোকায়তিক বলতে কাপালিক-তান্ত্রিকাদিকেই বোঝবার আয়োজন করলে একথা স্বীকার করা অত্যন্ত কষ্টকল্পনারই পরিচায়ক হবে যে তাঁরা ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্র সম্মত সুদীর্ঘ বিচারের ভিত্তিতেই দেহাত্মবাদ প্রতিপাদনের আয়োজন করতেন। অতএব সহজেই বোঝা যায় যে ইতিপূর্বে গুণরত্ন নিজেই যে-ভাবে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ বর্ণনা করেছেন তা মূলত তাঁরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। কিন্তু এবিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রমাণশাস্ত্র সম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুন আর নাই করুন, এই লোকায়তিকেরাই দেহাত্মবাদের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। কেননা, বৈদান্তিক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ান্তরের প্রতিনিধিরা লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের সুস্পষ্ট আয়োজন করেছেন। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্র সম্মত আলোচনার ছাঁচে না-ঢাললেও লোকায়তিকেরা কীভাবে তাঁদের এই দেহাত্মবাদ ব্যাখ্যা করতেন? ইতিপূর্বে এই প্রশ্নের শঙ্করাচার্য ও বাচস্পতি মিশ্র প্রদত্ত উত্তর উল্লিখিত হয়েছে এবং হরিভদ্র প্রদত্ত উত্তরটিও পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়; "পৃথিব্যাদিভূতসংহত্যা তথা দেহপরিণতেঃ। মদশক্তিঃ সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বত্তদ্বচ্চিদাত্মনি॥" 'তর্করহস্যদীপিকা'-র শেষাংশে গুণরত্নও মূলত এই ভাবেই লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনা দিয়েছেন :

তন্মতে ভূতেভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুৎপদ্যতে। জলবুদ্‌বুদবদ্ জীবাঃ। চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি।…জীবশ্চেতনালক্ষণঃ পরলোকযায়ী নাস্তি, পঞ্চমহাভূতসম্ভূতস্য চৈতন্যস্যৈব ভূতনাশে নাশাৎ পরলোকানুস্মরণাসম্ভবাৎ। …পৃথিব্যাদীনি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুলক্ষণানি যানি ভূতানি তেষাং সংহতিঃ সমবায়ঃ সংযোগ ইতি যাবৎ, তয়া হেতুভূতয়া। তথা তেন প্রকারেণ যা দেহস্য পরিণতিঃ পরিণামঃ, তস্যাঃ সকাশাৎ চিদিতি প্রয়োগঃ। যদ্বত্তথা সুরাঙ্গেভ্যো গুড়ধাতকাদিভ্যো মদ্যাঙ্গেভ্যো মদশক্তিরুন্মাদকত্বং ভবতি, তদ্বত্তথা চিচ্চৈতন্যমাত্মনি শরীরে। অত্রাত্মশব্দেনানেকার্থেন শরীরমেব জ্ঞাতব্যং ন পুনর্জীবঃ। অয়ং ভাবঃ। ভূতচতুষ্টয়সংবন্ধাদ্দেহপরিণামঃ, ততশ্চ দেহে চৈতন্যমিতি। …সুরাঙ্গেভ্যো যদ্বন্মদশক্তির্ভবতি, তদ্বদ্ভূতসংবন্ধাচ্ছরীরং আত্মতা

সচেতনতা স্থিতা ব্যবস্থিতেতি। যদুবাচ বাচস্পতিঃ (!), 'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি। তৎসমুদায়ে শরীরবিষয়েন্দ্রিয়সংজ্ঞাঃ। তেভ্যশ্চৈতন্যং' ইতি।

অর্থাৎ—

এই মতে ভূত সকল থেকে মদশক্তির মতো চৈতন্য উৎপন্ন হয়। জীব জলবুদ্বুদের মতোই। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল পুরুষ।… চেতনলক্ষণ, পরলোকগামী জীব (আত্মা) নেই। চেতনা পঞ্চ মহাভূত সম্ভূত, তাই ভূত নাশপ্রাপ্ত হলে চেতনাও বিনষ্ট হয়, অতএব পরলোক-অনুস্মরণ অসম্ভব।…পৃথিবী প্রভৃতির,—অর্থাৎ, পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু লক্ষণ যে সব ভূত সেগুলির-সংযোগেই যে দেহর পরিণতি তারই মধ্যে চেতনা বর্তমান। যেমন, গুড়ধাতকাদি মদ্যপ্রস্তুতের উপকরণেই মদশক্তি উৎপাদিত হয় তেমনিই শরীরে চৈতন্যর উৎপত্তি হয়। এখানে আত্মন্ শব্দর অর্থ শরীরই "জীব" নয়। ভূতচতুষ্টয়ের সম্বন্ধর পরিণামেই দেহ, সেই দেহেই চৈতন্য বর্তমান।…সুরাঙ্গ বা মদ্য প্রস্তুতের উপকরণে যেমন মদশক্তির আবির্ভাব হয় তেমনি ভূত সমূহের সম্বন্ধজাত শরীরে আত্মভাব, সচেতনতা বর্তমান থাকে। বৃহস্পতি যেমন বলেছেন, 'পৃথিবী অপ্, তেজ ও বায়ু—এইগুলিই হল তত্ত্ব। সেগুলির সমুদায়কেই শরীর, বিষয় এবং ইন্দ্রিয় বলা হয়; সেগুলিরই চৈতন্য,' ইত্যাদি।

এখানে হরিভদ্র এবং গুণরত্ন লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে পরিচয় দিয়েছেন তার মূল কথা কী? লোকায়ত-মতে শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতই সত্য, এই চতুর্ভূতই শরীর বা দেহের উপাদান—চতুর্ভূতই দেহাকারে বা শরীরাকারে পরিণত হয়। এবং দেহাকারে পরিণত চতুর্ভূতই চৈতন্যবিশিষ্ট হয়। অবশ্য পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতের কোনটিই চৈতন্যবিশিষ্ট নয়; অতএব প্রশ্ন ওঠে, এই চতুর্ভূতই দেহাকারে বা কায়াকারে পরিণত হলে কীভাবে চৈতন্যবিশিষ্ট হতে পারে? উত্তরে লোকায়তিকেরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত দেন। মদ্য প্রস্তুতের কোন উপাদানই মদশক্তি-বিশিষ্ট নয়; কিন্তু সেগুলিই মদ্যাকারে পরিণত হলে সেই মদ্য মদশক্তিবিশিষ্ট হয়। তেমনি, শরীর বা দেহের উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতের কোনটিই চৈতন্যবিশিষ্ট নাহলেও সেগুলিই যখন শরীরাকারে পরিণত হয় তখন এই শরীর চৈতন্যবিশিষ্ট হয়। অতএব, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যলক্ষণ কোন আত্মার কল্পনা অবান্তর।

লক্ষণীয় বিষয় হল, গুণরত্ন প্রদত্ত লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে সুবিস্তৃত বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণশাস্ত্র সম্মত বিচারের জটিলতা যতই থাকুক না কেন, মদশক্তির এই দৃষ্টান্তটিই উল্লিখিত হয়নি। অথচ

এ-কথা মনে করার পর্যাপ্ত কারণ আছে যে বাস্তবপক্ষে বা ঐতিহাসিক ভাবে লোকায়তিকেরা তাঁদের দেহাত্মবাদের সমর্থনে প্রমাণ-শাস্ত্র সম্মত সুবিস্তৃত বিচারের উপর নির্ভর করুন আর নাই করুন, অন্তত মদশক্তির এই দৃষ্টান্তটির উপর অবশ্যই অত্যন্ত মৌলিক ভাবেই নির্ভর করতেন। একথার সমর্থনে চূড়ান্ত নজির এই যে, লোকায়ত-বিরোধীরা সকলেই এবং প্রায় একবাক্যেই লোকায়তিকদের এই দৃষ্টান্তটিরই উল্লেখ পূর্বক খণ্ডনের বিশেষ প্রয়াস করেছেন।

জৈন-সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা যে এই পথে অগ্রসর হয়েছেন তার প্রমাণ শুধু হরিভদ্র ও গুণরত্নর সম্প্রতি উদ্ধৃত উক্তিই নয়। আমরা পরে দেখবো পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদেব সুবিস্তৃত বর্ণনায় এই মূল দৃষ্টান্তটি উপেক্ষা করে প্রমাণশাস্ত্র সম্মত বিচারের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও, স্বয়ং গুণরত্নই যখন সেই পূর্বপক্ষ খণ্ডনে অগ্রসব হয়েছেন তখন তিনি লোকায়তিকদের এই মূল দৃষ্টান্তটিকে উপেক্ষা করতে পারেননি—বস্তুত-পক্ষে নানাভাবে এই দৃষ্টান্তটিরই দোষ প্রদর্শন করে দেহাত্মবাদ বর্জনের প্রস্তাব করেছেন।

লোকায়তিকেরা যে বাস্তবিকই মদশক্তি-উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেই জড়দেহে চৈতন্য উৎপত্তির—অতএব, ভূতচৈতন্যবাদের বা দেহাত্মবাদের—সমর্থন করতেন সে বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন শঙ্করাচার্য বলছেন, “মদশক্তিবদ্ বিজ্ঞানম্”। ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলছেন, “স্বতন্ত্র বা মিলিতাবস্থায় পৃথিবী, অপ্, তেজ এবং বায়ুতে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না হলেও সেগুলিই কায়াকারে পরিণত হলে চৈতন্যবিশিষ্ট হয়। যেমন কিণ্ব প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুতের বিবিধ উপাদান স্বতন্ত্র বা মিলিতাবস্থায় মদশক্তিবিশিষ্ট না হলেও মদিরাকারে পরিণত হলে মাদকতার জন্ম দেয়।” মাধবাচার্যও লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় মূলত এই দৃষ্টান্তই উল্লেখ করেছেন, “তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুপজায়তে।” এবং এই বর্ণনার সমর্থনেই মাধবাচার্য নিম্নোক্ত লোকগাথাও উদ্ধৃত করেছেন:

> অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ।
> চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ॥
> কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।...২৪৮
> অর্থাৎ—
> এই মতে ভূমি, বায়ু, অনল ও অনিল—এই চতুর্ভূতই তত্ত্ব।

২৪৮। ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’, (আনন্দাশ্রম সং) পৃ. ৩

চতুর্ভূত থেকেই চৈতন্য উপজাত হয়, যেমন কিণ্ব প্রভৃতি দ্রব্যর সংমিশ্রণ থেকেই উৎপন্ন হয় মদশক্তি।

কিন্তু শুধু জৈন এবং বৈদান্তিকেরাই নন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নানা দার্শনিকও লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনায় মূলত বা প্রধানত এই মদশক্তির দৃষ্টান্তই উল্লেখ করেছেন। নজির হিসাবে এখানে বৌদ্ধ এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সাহিত্য থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃতি পর্যাপ্ত হবে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ করে শান্তরক্ষিতই বিস্তৃত ভাবে লোকায়ত মত বর্ণনা-পূর্বক খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। অতএব তাঁর লোকায়ত মত বর্ণনা কিঞ্চিত বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার পূর্বে শান্তরক্ষিতের স্বীয় দার্শনিক প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে। শান্তরক্ষিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের সমর্থক ছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিকদের কোন সম্প্রদায়েই অবশ্য জন্মান্তরগামী উৎপত্তিহীন নিত্য আত্মা নামের পদার্থ স্বীকৃত নয়; বিজ্ঞানবাদীরাও এজাতীয় আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে লোকায়ত পক্ষ খণ্ডন করারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁদের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান বা জ্ঞানই একমাত্র সত্য—পূর্ববর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞান পরবর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানের কারণ হয়, সেটি আবার তারও পরবর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানের কারণ হয়,—এইভাবে প্রবাহিত হয় বিজ্ঞান-সন্তান। এই বিজ্ঞান-সন্তান বা জ্ঞান-প্রবাহ বা চিত্ত-প্রবাহ বা চৈতন্য-প্রবাহই বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মপদবাচ্য। বিজ্ঞানবাদীদের বর্ণনায় মহামহোপাধ্যায় ফনিভূষণ[২৪৯] যেমন বলছেন, "তাঁহাদিগের মতে এক দেহগত এই সমস্ত বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকায় অন্য দেহগত বিজ্ঞান সমূহ হইতে তাহার বিশেষ আছে। এক দেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞান বিশেষের সন্তানরূপ চিত্তপ্রবাহই সেই দেহের পক্ষে আত্মা। সেই আত্মা জন্মান্তরে ও তাহার পূর্বজন্মে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে।" অতএব, যোগাচার মতে পরলোকগামী ও পরিবর্তনাতীত আত্মা নামে কোন পদার্থ স্বীকৃত না হলেও এই পক্ষ থেকে লোকায়তমতও অত্যন্ত গর্হিত বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য। কেননা, যোগাচার মতে বিজ্ঞান বা চেতনাই চরম সত্য; পক্ষান্তরে লোকয়ত মতে বিজ্ঞান বা চেতনা ভূত-সমুদ্ভূত এবং জড়দেহেরই ধর্মমাত্র। তাছাড়া, যোগাচার মতে পরলোকগামী পরিবর্তনাতীতী আত্মা নামে পদার্থ স্বীকৃত, না-হলেও পরলোক ও আত্মা অবশ্য-স্বীকার্য। কী ভাবে? যোগাচার বৌদ্ধরা মনে করেন, বর্তমান জন্মের বিজ্ঞান-সমূহর মধ্যে যেমন কার্যকারণভাব বর্তমান তেমনি অতীত জন্মর বিজ্ঞান-ধারা বা চেতনা-প্রবাহর সঙ্গে বর্তমান জন্মের বিজ্ঞান-ধারা বা চেতনা-প্রবাহর, এবং বর্তমান জন্মের

২৪৯। 'ন্যায়দর্শন', ১।১৮৩।

বিজ্ঞান-ধারা বা চেতনা-প্রবাহর সঙ্গে অনাগত-জন্মর বিজ্ঞান-ধারা বা চেতনা-প্রবাহর মধ্যেও কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান। অতীত জন্মের বিজ্ঞান-প্রবাহই বর্তমান জন্মের বিজ্ঞান-প্রবাহর কারণ, আবার বর্তমান জন্মের বিজ্ঞান-প্রবাহ অনাগত জন্মের বিজ্ঞান-প্রবাহর কারণ। এইভাবে জন্মজন্মান্তরের চিত্তপ্রবাহই বিজ্ঞান-সন্তান নামে উল্লিখিত। অতএব, এই মতে জন্মান্তর ও পরলোক অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু লোকায়তিক দেহাত্মবাদ অনুসারে দেহই আত্মা, দেহ বিনষ্ট হলে আত্মাও বিনষ্ট হয়; অতএব পরলোকগামী আত্মা কল্পনা-মাত্র। ফলে পরলোকও কল্পনামাত্র—পরলোকী বলেই যদি কিছু না-থাকে তাহলে পরলোকই বা কী করে সম্ভব হবে? অর্থাৎ, দেহাত্মবাদের অনিবার্য উপসিদ্ধান্ত হল পরলোক-বিলোপ।

শান্তরক্ষিত লোকায়তিকদের এই পরলোক-বিলোপের দিক থেকেই লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, পূর্বপক্ষ হিসাবে এই দেহাত্মবাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি এবং তার ব্যাখ্যাকার ('পঞ্জিকা'-কার) কমলশীল সর্বপ্রথম ও বিশেষ করে লোকায়তিকদের মদশক্তির প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটিরই উল্লেখ করেছেন। শান্তরক্ষিত বলছেন,

দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং প্রতিক্ষণবিনাশনে।
ন যুক্তং পরলোকিত্বং নান্যশ্চাভ্যুপগম্যতে॥
তস্মাৎভূতবিশেষেভ্যো যথা শুক্তসুরাদিকম্।
তেভ্য এব তথা জ্ঞানং জায়তে ব্যজ্যতেঽথবা॥২৫০

অর্থাৎ,

[বৌদ্ধ দার্শনিকেরা নিজেরাই ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন যে] দেহ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রতিক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়; অতএব এগুলির কোনটিই পরলোকগামী হতে পারেনা। এবং এছাড়া আর কিছুর সত্তাই স্বীকার্য নয়। (অতএব, পরলোকগামী কিছুর সত্তা স্বীকার্য নয় এবং পরলোকীর সত্তা স্বীকার্য নয় বলেই পরলোকের সত্তাও স্বীকার্য নয়)। অতএব, ভূতবিশেষ থেকেই (কয়েকটি নির্দিষ্ট জড় পদার্থ থেকেই) জ্ঞান বা চৈতন্য উৎপন্ন হয়, বা, সেগুলিতেই চৈতন্য প্রতিভাত হয়—শুক্ত (fermented acid) এবং সুরা প্রভৃতির ন্যায়। (অর্থাৎ, শুক্ত, সুরা প্রভৃতির উপাদানে "মূর্চ্ছাদিজননসামর্থ্য" পরিদৃষ্ট না হলেও সেগুলিই শুক্ত, সুরা প্রভৃতিতে পরিণত হলে মূর্চ্ছাদিজননসামর্থ্য বিশিষ্ট হয়; একই ভাবে পরিণতি-বিশেষের ফলে জড়পদার্থগুলিও জ্ঞানবিশিষ্ট বা চৈতন্যবিশিষ্ট হয়; অতএব চৈতন্য ভূতজাতই।)

২৫০। 'তত্ত্বসংগ্রহ', শ্লোক ১৮৫৮-৫৯॥

পঞ্জিকা'য় কমলশীল বলছেন,

উপরোক্ত "আদি" শব্দের দ্বারা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বুঝতে হবে। [অর্থাৎ বৌদ্ধ-মতে এগুলি সবই প্রতিক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।] এছাড়া আর কিছুর সত্তাই স্বীকার্য নয়; অর্থাৎ আত্মা স্বীকার্য নয়। অতএব, লোকায়তিকদের পক্ষই প্রমাণিত হয়। তাই তাদের [লোকায়তিকদের] সূত্র হল, "পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ"—অর্থাৎ পরলোকীর অভাব বশতই পরলোকের অভাব। আরো, (অর্থাৎ, লোকায়তিকদের আরো সূত্র হল), "পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি, তেভ্যশ্চৈতন্যম্"—অর্থাৎ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এই চারটি (জড়পদার্থ ই) তত্ত্ব; তাদেরই চৈতন্য।···অবশ্য এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে, একথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং রূপ প্রভৃতি বিষয়ের জন্যই চৈতন্য উৎপন্ন হয় [অর্থাৎ, রূপ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়র সন্নিকর্ষর ফলেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়]। অতএব এগুলিই চৈতন্যর প্রকৃত কারণ বলে বিবেচিত হবে। তাহলে লোকায়তিকেরা কী করে দাবি করেন যে উক্ত চতুর্ভূতই বিজ্ঞান বা চৈতন্যর কারণ?

কমলশীল বলছেন, লোকায়ত-পক্ষ থেকে এই আপত্তির কী ভাবে নিরসন করা হবে—তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই শান্তরক্ষিত পরবর্তী শ্লোকটি রচনা করেছেন।

লোকায়ত-পক্ষর বর্ণনায় পরবর্তী শ্লোকে শান্তরক্ষিত বলছেন,

> সন্নিবেশবিশেষে চ ক্ষিত্যাদীনাং নিবেশ্যতে।
> দেহেন্দ্রিয়াদিসংজ্ঞেয়ং তত্ত্বং নান্যদ্ধি বিদ্যতে ॥২৫১

অর্থাৎ—

ক্ষিতি প্রভৃতি [চতুর্ভূতের] সন্নিবেশ বিশেষই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নামে উক্ত হয়। এই চতুর্ভূত ব্যতীত আর কোন তত্ত্ব নেই।

ব্যাখ্যায় কমলশীল বলছেন,

তাদের [লোকায়তিকদের] সূত্র হল "তৎসমুদায়ে বিষয়েন্দ্রিয়-সংজ্ঞা" ইতি। অর্থাৎ এগুলির সমুদায়কেই বিষয় ও ইন্দ্রিয় বলা হয়। মহাভূত ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নেই। এই মহাভূতগুলির সংস্থান-বিশেষকেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বলা হয়। এই মহাভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। এগুলি ব্যতিরিক্ত (অর্থাৎ, এই চার প্রকার মহাভূত ব্যতিরিক্ত) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আর কোন তত্ত্ব নেই। এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণও নেই—যে প্রমাণের সাহায্যে পরলোক প্রভৃতি প্রমাণিত হতে পারে।

---

২৫১ 'তত্ত্বসংগ্রহঃ', ১৮৬০।

পরলোকবাদীরা বা পরলোকের অস্তিত্বে আস্থাবানেরা দাবি করতে পারেন যে অতীত দেহের চেতনাই বর্তমান নবজাত দেহের চেতনার কারণ এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরীণ চেতনাই তার পরজন্মলব্ধ দেহের চেতনার কারণ। এইভাবে এক চেতনাকেই দ্বিতীয় চেতনার কারণ বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হলে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং অবশ্যই ভূতচৈতন্যবাদও—অর্থাৎ, চতুর্ভূতই চৈতন্যর কারণ, এই মতবাদও—প্রত্যাখ্যাত হয়। অতএব, শান্তরক্ষিত বলছেন, লোকায়তিকেরা প্রতিপন্ন করতে চান দুটি দেহের অভ্যন্তরস্থ দুই চেতনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়, চেতনাই চেতনার কারণ এই মতবাদ স্বীকার্য নয়। শান্তরক্ষিতের ভাষায় লোকায়তিকদের এই যুক্তি হল—

কার্যকারণতা নাস্তি বিবাদপদচেতসোঃ।
বিভিন্নদেহবৃত্তিত্বাৎগবাশ্বজ্ঞানয়োরিব ॥[২৫২]

অর্থাৎ—

বিতর্কসাপেক্ষ দুটি চেতনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়; কেননা এই দুটি চেতনা দুটি ভিন্ন দেহে অবস্থিত [দুটির দেহবৃত্তি বিভিন্ন]—যেমন গো ও অশ্বর জ্ঞান বা চেতনা। [অর্থাৎ গোরুর চেতনা এবং অশ্বর চেতনা—এই দুই চেতনা দুটি স্বতন্ত্র দেহাভ্যন্তরে বর্তমান বলেই উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়; তেমনি, একথাও দাবি করা যায় না যে তথাকথিত পূর্বজন্মর দেহাভ্যন্তরস্থ চেতনাই তথাকথিত পরজন্মর দেহাভ্যন্তরস্থ চেতনার কারণ হয়; কেননা এই দুই দেহ স্বতন্ত্র বলেই তদভ্যন্তরস্থ দুই চেতনার মধ্যেও কার্যকারণ সম্বন্ধ অসম্ভব।]

ব্যাখ্যায় কমলশীল বলছেন,

যদি অতীত দেহবর্তী চেতনা নবজন্মর চেতনার কারণ হয় এবং মৃতর চেতনা আগামী চেতনার কারণ হয় তাহলে চেতনার ধারাবাহিকতার অবসানের অভাববশতই পরলোক কল্পনা ঘটবে। কিন্তু বিবাদাস্পদীভূত দুটি চেতনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ সম্বন্ধ অসম্ভব; কেননা এই দুই চেতনা ভিন্নদেহবর্তী—গো এবং অশ্বর চেতনার মতো।

লোকায়ত পক্ষ থেকে কমলশীল আরো দেখাচ্ছেন, তথাকথিত অতীত দেহবর্তী চেতনা যেমন নবজন্মলব্ধ দেহবর্তী চেতনার কারণ হতে পারে না তেমনি বর্তমান দেহবর্তী চেতনাও কোন তথাকথিত ভবিষ্যৎ দেহাভ্যন্তরীণ চেতনারও কারণ হতে পারে না। অতএব, সংক্ষেপে, চেতনাই চেতনার কারণ—এজাতীয় কল্পনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

২৫২। 'তত্ত্বসংগ্রহঃ', ১৮৬১।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, চেতনার প্রকৃত কারণ কী? কীভাবে চেতনার উৎপত্তি হয়? লোকায়ত-পক্ষ থেকে এই প্রশ্নর উত্তর হিসাবে শান্তরক্ষিত বলছেন,

কায়াদেব ততো জ্ঞানং প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতাৎ।
যুক্তং জায়ত ইত্যেতৎকম্বলাশ্বতরোদিতম্ ॥[২৫৩]

অর্থাৎ,—

অতএব, কম্বলাশ্বতর যেমন বলেন, প্রাণ, অপান প্রভৃতির [পঞ্চবিধ প্রাণ বায়ুর] আশ্রয়ীভূত দেহ থেকেই জ্ঞান বা চৈতন্য উৎপন্ন হয়—এ কথাই যুক্তিযুক্ত।

'পঞ্জিকা'-য় কমলশীল শুধু বলছেন, লোকায়তিকদের একটি সূত্র হল "কায়াদেব" ইত্যাদি এবং কম্বলাশ্বতর নামের জনৈক লোকায়ত-মতের প্রতিনিধিই এই সূত্র উল্লেখ করে থাকেন।

অবশ্য কম্বলাশ্বতর নামের লোকায়ত-মতের এই প্রতিনিধি আসলে কে ছিলেন সে বিষয়ে আমাদের পক্ষে আজ কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২৫৪] অনুমান করেছেন, পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে,—'সামঞ্ঞফলসুত্ত'-তে, [২৫৫]—অজিত কেশকম্বলী নামে যে নাস্তিক মতাবলম্বী উল্লিখিত হয়েছেন তিনি এবং শান্তরক্ষিত উল্লিখিত এই কম্বলাশ্বতর অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। এই অনুমানের পক্ষে মূলত দুটি নজির প্রদর্শন করা সম্ভব। প্রথমত, অজিত কেশকম্বলী এবং কম্বলাশ্বতর—এই দুটি নামের মধ্যে অন্তত অংশবিশেষে সাদৃশ্য। দ্বিতীয়ত, উভয়ের মতবাদের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য। কেননা, 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' বর্ণিত অজিত কেশকম্বলীর মতানুসারেও পরলোক কল্পনামাত্র, মানুষ চতুর্মহাভূতেরই সমষ্টিমাত্র, মৃত্যুতেই মানুষের চরম পরিসমাপ্তি, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের মধ্যে ফলভেদের কথা একান্তই অবান্তর—ইত্যাদি, ইত্যাদি। অজিত কেশকম্বলীর এই মতটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করার সুযোগ আমরা পরে পাবো। আপাতত দ্রষ্টব্য এই যে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই[২৫৬] তাঁকে লোকায়ত-মতের অত্যন্ত প্রাচীন কোন প্রচারক হিসাবেই গ্রহণ করতে চান। এবং এই যুক্তি অনুসরণ করেই বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও[২৫৭] মন্তব্য করেছেন যে যেহেতু কম্বলাশ্বতর এবং অজিত কেশকম্বলীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত এবং যেহেতু পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে অজিত কেশকম্বলী বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক হিসাবে বিবেচিত সেইহেতু শান্তরক্ষিত উল্লিখিত কম্বলাশ্বতর নামের এই লোকায়তিক দার্শনিকটির জীবনকাল খৃষ্টপূর্ব ৫৫০-৫০০ হওয়াই সম্ভব।

অবশ্যই এই দুটি নামের মধ্যে সাদৃশ্যাংশ বলতে শুধুমাত্র "কম্বল" শব্দ এবং উভয় নামের ক্ষেত্রেই শব্দ যে সমানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবিষয়েও

২৫৩। 'তত্ত্বসংগ্রহঃ', ১৮৬৪।
২৫৪। Sastri L 2.
২৫৫। 'দীঘনিকায়', ১।২।৪।২২॥
২৫৬। Dasgupta HIP iii. 521 f. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী 'চার্বাকদর্শন', ১৩-৪ ; ইত্যাদি
২৫৭ Bhattacharyya, Foreword to 'Tattvasamgraha'. (GOS xxx), pp. liv-lvi

সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়; অন্যান্য কারণেও উভয় নামকে একই ব্যক্তির বোধক হিসাবে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে না[২৫৮]। তবুও এ-বিষয়েও

২৫৮। কম্বলাশ্বতর নামের "কম্বল" শব্দ গলকম্বল অর্থে গৃহীত হলে উভয় নামের মধ্যে অর্থান্তর গভীর হবে। কেননা, পালি ঐতিহ্য অনুসারে কেশ-কম্বল বা চুলের কম্বল পরিধান করতেন বলেই অজিতকে "কেশকম্বলী" বিশেষণ দেওয়া হয়েছিল ('সুমঙ্গলবিলাসিনী', ১।১৪৪ দ্রষ্টব্য)। অজিত কেশকম্বলী এবং কম্বলাশ্বতর একই ব্যক্তির দ্বিবিধ নাম হলে দ্বিতীয় নামটিতে অজিত শব্দের ঐকান্তিক অভাবই বা কেন এবং অশ্বতর শব্দের যোগই বা কেন—এজাতীয় প্রশ্নর সদুত্তর পাওয়াও কঠিন হবে। তাছাড়া, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনার নজির (*Nepal Catalogue* ii. 72) থেকে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য নিজেই (in GOS xxx, p liv) স্বীকার করছেন, ভুবনানন্দ কবিকণ্ঠাভরণ রচিত 'সংগীতালোক' গ্রন্থে 'সংগীতশাস্ত্রেরই জনৈক প্রাচীন ঋষি হিসাবে তুম্বুরু, বায়ু, নারদ প্রভৃতির সঙ্গে কম্বলাশ্বতর নামটিও উল্লিখিত হয়েছে। শান্তরক্ষিত উল্লিখিত কম্বলাশ্বতর অবশ্যই লোকায়তিক; অতএব বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যর কাছে প্রশ্ন উঠেছে, এজাতীয় মতাবলম্বীর পক্ষে কী করে সংগীতশাস্ত্রের ঋষি হওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নর একটি কষ্টকল্পিত উত্তরও তিনি উদ্ভাবন করেছেন: "It is not at all strange that a member of a materialist sect should devote himself to music; disbelieving in transmigration of soul or in a future life the cultivation of pleasure in this life should seem logical and entirely proper" (*Ib*). অর্থাৎ, সংক্ষেপে, বস্তুবাদীরা ভোগবিলাসী ছিলেন, সংগীতানুরাগ ভোগবিলাসেরই পরিচায়ক, তাই লোকায়তিক কম্বলাশ্বতরর পক্ষে সংগীতশাস্ত্রানুরাগী হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্যই ঐতিহাসিক ভাবে লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই ভোগসর্বস্ব-বাদী ছিলেন কিনা, বা, কোন্ অর্থে তাঁরা ভোগের আদর্শ গ্রহণ করেছেন,—এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনার প্রয়াস করবো। আপাতত শুধু মন্তব্য করা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তব ইতিহাসের পটভূমিকায় ভট্টাচার্য্যর আলোচ্য উক্তিটি অতিসারল্য দোষদুষ্ট হবে। তার কারণ শুধু এই নয় যে এই উক্তি অনুসারে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রর সমস্ত প্রাচীন আচার্যকেই ভোগসর্বস্ববাদী বলে বিবেচনা করার আশঙ্কা ঘটে; তার আরো বড়ো কারণ এই যে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয় ধারাতেই গান বা সংগীত অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠান—এমন কি সাধনপদ্ধতির বিশিষ্ট অঙ্গ—হিসাবেও স্বীকৃত। এবিষয়ে, 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্' প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের নজির এবং তান্ত্রিক সাধনায় চর্যা-গান প্রভৃতির গুরুত্ব পরে বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হবে। তাই সংগীতশাস্ত্রে অনুরাগকে নিছক ভোগবিলাস-সর্বস্বতার পরিচায়ক বলে বিবেচনা করায় বাধা ঘটে। পক্ষান্তরে, প্রাচীন লোকায়তিকদের পক্ষে আধুনিক আউল-বাউলদের মতো সংগীতানুরাগী হবার সম্ভাবনাও অবাস্তর নয়। এবিষয়ে আমরা 'মৈত্রী-উপনিষদ্'-এর নজির ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি

সন্দেহের অবকাশ নেই যে শান্তরক্ষিত উল্লিখিত কম্বলাশ্বতরর মতোই পালি সাহিত্যে উল্লিখিত অজিত কেশকম্বলীও কোন-না-কোন প্রাচীন বস্তুবাদের সমর্থক ছিলেন। উভয়ের মত যে-ভাবে আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে অজিত কেশকম্বলী মূলতই সুপ্রাচীন নৈতিক ও ধর্মমূলক আচরণের ক্ষেত্রে বস্তুবাদটির অনুসিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন, পক্ষান্তরে কম্বলাশ্বতর বস্তুবাদের মূল দার্শনিক সমস্যার—অর্থাৎ, চেতনার উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার—সমাধান হিসাবে সূত্রাকারে বলছেন, "কায়াদেব", অর্থাৎ শরীর থেকেই চৈতন্যর উৎপত্তি। স্বাভাবতই পুরুষার্থ সংক্রান্ত লোকায়তিক মতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পরে অজিত কেশকম্বলীর কথায় প্রত্যাবর্তন করবো; আপাতত লোকায়তিকদের ভূতচৈন্যবাদের পরিচয়ই দেখা যাক।

কমলশীল বলছেন, "দেহ থেকেই চৈতন্যর উৎপত্তি"—লোকায়তিকদের এই মতের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উঠতে পারে: "ভ্রূণাবস্থাতেই (কললাদ্য-বস্থায়াং) অস্ফুটভাবে হলেও চৈতন্য বর্তমান এবং এজাতীয় অবস্থায় যেহেতু শরীরের পূর্ণাঙ্গ পরিণতিই অবর্তমান সেইহেতু দাবি করা যায় না যে শরীরই চৈতন্যর কারণ, বা, শরীর থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে সিদ্ধ হয় যে ভ্রূণাদি অবস্থার চৈতন্য অতীত চৈতন্য বা কোন পূর্ববর্তী অবস্থার চৈতন্য থেকেই উৎপন্ন। অর্থাৎ, ভ্রূণাবস্থায় চৈতন্যর বর্তমানতা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে শুধু শরীর থেকে চৈতন্যর উৎপত্তি সম্ভব নয়, চৈতন্য থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়।"

কমলশীল বলছেন, [লোকায়ত-পক্ষর বর্ণনা প্রসঙ্গে] উপরোক্ত আপত্তির নিরসনার্থে শান্তরক্ষিত [প্রাথমিক ভাবে] বলেছেন,

কললাদিষু বিজ্ঞানমস্তীত্যেতচ্চ সাহসম্।
অসঞ্জাতেন্দ্রিয়ত্বাদ্ধি ন তত্রার্থোঽবগম্যতে॥
ন চার্থাবগতেরন্যদ্রূপং জ্ঞানস্য যুজ্যতে।
মূর্চ্ছাদাবপি তেনাস্য সদ্ভাবো নোপপদ্যতে॥
ন চাপি শক্তিরূপেণ তদা ধীরবতিষ্ঠতে।
নিরাশ্রয়ত্বাচ্ছক্তীনাং স্থিতির্নহ্যবকল্পতে॥

'সর্বমতসংগ্রহ'-কারও মন্তব্য করেছেন যে লোকায়তিকদের কাছে শুধুমাত্র অথর্ববেদ এবং গান্ধর্ববেদই বেদ হিসাবে স্বীকৃত। অতএব লোকায়তিক কম্বলাশ্বতর-র পক্ষে সংগীতানুরাগের ব্যাখ্যা হিসাবে ভট্টাচার্য্যের উপরোক্ত ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে আমাদের পক্ষে পালি বৌদ্ধশাস্ত্র উল্লিখিত অজিত কেশকম্বলী এবং শান্তরক্ষিত উল্লিখিত কম্বলাশ্বতরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে বিবেচনা করাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

জ্ঞানাধারাত্মনোঽসত্ত্বে দেহ এব তদাশ্রয়ঃ।
অন্তে দেহনিবৃত্তৌ চ জ্ঞানবৃত্তিঃ কিমাশ্রয়া ॥[২৫৯]

অর্থাৎ—

কললাদি বা ভ্রূণাদি অবস্থাতেও বিজ্ঞান বা চেতনা বর্তমান—এই দাবি দুঃসাহসের পরিচায়ক। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলিই সঞ্জাত হয়নি বলে কোন বিষয় সম্বন্ধে অবগতিই সম্ভব নয় এবং বিষয়ের অবগতি ব্যতিরিক্ত জ্ঞান [বা চেতনার] কোন রূপই সম্ভব নয়—যে-কারণে মূর্চ্ছাবস্থায় চেতনার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। [অর্থাৎ, মূর্চ্ছাবস্থায় চেতনার বা জ্ঞানের অভাব অবশ্য স্বীকার্য। তার প্রকৃত কারণ হল, মূর্চ্ছাবস্থায় কোন বিষয়ের অবগতিই হয় না। অতএব, বিষয়ের অবগতি ছাড়া জ্ঞান বা চেতনার আর কোন রূপই সম্ভব নয়। এবং ভ্রূণাদি অবস্থায় কোন বিষয়ের অবগতির প্রশ্নই ওঠে না; কেননা, ইন্দ্রিয় ছাড়া বিষয়ের অবগতি অসম্ভব এবং ভ্রূণাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলিই গড়ে ওঠেনি। অতএব ভ্রূণাদি অবস্থায় জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা চেতনার অস্তিত্ব একান্তই অসম্ভব।

একথাও বলা যায় না যে সেই অবস্থায় [কললাদি অবস্থায়] চেতনা বা জ্ঞান শক্তিরূপে (*latent potency* হিসাবে) বর্তমান থাকে। কেননা নিরাশ্রয় অবস্থায় শক্তির অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। এবং আত্মার সত্তা নেই বলেই চেতনা বা জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় দেহই। [অর্থাৎ, আপত্তি তুলে হয়তো বলা হবে যে প্রকট রূপে না-হলেও ভ্রূণাদি অবস্থায় জ্ঞান বা চেতনা অস্ফুট শক্তিরূপে বর্তমান থাকে। উত্তরে বলা হবে, তা সম্ভব নয়। কেননা, শক্তিরূপে বর্তমান থাকার পক্ষেও চেতনা বা জ্ঞানের কোন না কোন আশ্রয় অবশ্য প্রয়োজন। এই আশ্রয় কী হতে পারে? দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নেই; অতএব কল্পনা করা অবান্তর হবে যে এ-জাতীয় কোন আত্মাই এই আশ্রয়। ফলে একমাত্র দেহই আলোচ্য আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় এই দেহেরই পূর্ণ পরিণতি হয়নি। তাই ভ্রূণাবস্থায় দেহ সেই আশ্রয় হতে পারে না। ফলে শক্তিরূপে অবস্থান করার পক্ষে ভ্রূণাবস্থায় জ্ঞান বা চেতনার কোন রকম আশ্রয়ই কল্পনা করা যায় না। এবং কোন প্রকার আশ্রয়ই সম্ভব নয় বলেই শক্তিরূপেও এই অবস্থায় জ্ঞান বা চেতনার অস্তিত্বই সম্ভব নয়।]

দেহনিবৃত্তির অন্তেও জ্ঞান বা চেতনা কিসের আশ্রয়ে অবস্থান করবে? [অর্থাৎ, নিরাশ্রয় অবস্থায় জ্ঞান বা চেতনার অস্তিত্ব অসম্ভব

২৫৯। 'তত্ত্বসংগ্রহঃ', ১৮৬৫-৬৮।

বলেই এবং দেহই চেতনার একমাত্র আশ্রয় বলেই দেহনিবৃত্তির পরও চেতনার অস্তিত্ব অসম্ভব।]

উপরোক্ত যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করে কমলশীল বলছেন, দেহনিবৃত্তির পর আশ্রয়াভাববশতই জ্ঞান বা চেতনারও অভাব স্বীকার্য বলেই অনাগত জন্মর, অর্থাৎ মৃত্যুর পর কোন পরজন্মর, সম্ভাবনার বিরুদ্ধে লোকায়ত পক্ষ থেকে আরো কী যুক্তি প্রদর্শন করা যায় তার উল্লেখ করে শাস্তরক্ষিত নিম্নোক্তভাবে লোকায়তপক্ষ বর্ণনার উপসংহার করছেন :

তদনন্তরসম্ভূতদেহান্তরসমাশ্রয়ঃ।
যদি দেহোঽপরো দৃষ্টঃ কথমস্তীতি গম্যতে॥
ভিন্নদেহপ্রবৃত্তং চ গজবাজ্যাদিচিত্তবৎ।
একসন্ততিসম্বদ্ধং তদ্বিজ্ঞানং কথং ভবেৎ॥
একো জ্ঞানাশ্রয়স্তস্মাদনাদিনিধনো নরঃ।
সংসারী কশ্চিদেষ্টব্যো যদ্বা নাস্তিকতা পরা॥[২৬০]

অর্থাৎ—

একথাও দাবি করা সম্ভব নয় যে চেতনা বা জ্ঞান তদনন্তর সম্ভূত দেহান্তরকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে। [অর্থাৎ, মৃত্যুর পর অপর কোন দেহ সম্ভূত হয় এবং সেই দেহকেই আশ্রয় করে মৃত্যুর পরও চেতনা বা জ্ঞান বর্তমান থাকে—এই জাতীয় কথাও কাল্পনিক হবে। কারণ] এ-জাতীয় অপর কোন দেহ দৃষ্ট হয় না এবং যা দৃষ্ট হয়নি তার অস্তিত্বও স্বীকারযোগ্য নয়। [অর্থাৎ, মৃত্যুর পর যদি এ-জাতীয় অপর কোন দেহ উদ্ভূত হতো তাহলে তা পরিদৃষ্টও হতো। কিন্তু যেহেতু তা পরিদৃষ্ট হয় না সেইহেতু তার সত্তা স্বীকার্য নয়। অতএব এ-জাতীয় কিছুকে আশ্রয় করেই মৃত্যুর পরও চৈতন্য বর্তমান থাকে একথাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক।] তাছাড়া, গজ, অশ্ব প্রভৃতির চেতনার মতো বিভিন্ন দেহের আভ্যন্তরীণ চেতনাও বিভিন্ন এবং এজাতীয় বিভিন্ন চেতনা একই চেতনা-সন্ততির বা চেতনা-ধারার অন্তর্ভুক্ত কী করে হবে? [এই আপত্তিটি লোকায়ত-পক্ষ থেকে বিশেষ করে বৌদ্ধ-পক্ষর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হয়েছে। কেননা, জৈন এবং ন্যায়-বৈশেষিকেরা যে অর্থে জন্মান্তরগামী ও নিত্য আত্মা মানেন বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সেই অর্থে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শান্তরক্ষিত প্রমুখর মতে আত্মা বিজ্ঞান-সন্তান মাত্র বা চেতনা-প্রবাহ মাত্র। বিজ্ঞান বা চেতনা ক্ষণিক—একটি ক্ষণিক বিজ্ঞান অপর একটি ক্ষণিক বিজ্ঞানের কারণ হয়, সেটি আবার পরবর্তী বিজ্ঞানের কারণ হয়—এই ভাবেই

২৬০। 'তত্ত্বসংগ্রহঃ' ১৮৬৯-৭১।

প্রবাহিত হয় বিজ্ঞান-সন্তান এবং এই ভাবেই পূর্বজন্মর বিজ্ঞান-প্রবাহ, বর্তমান জন্মর বিজ্ঞান-প্রবাহ এবং অনাগত জন্মর বিজ্ঞান-প্রবাহর মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকে। ফলে পরলোকগামী শাশ্বত আত্মা স্বীকার না করলেও জন্মান্তর ও পরলোকের স্বীকৃতিতে বাধা থাকে না।

এজাতীয় বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে লোকায়তিকেরা বলছেন, আশ্রয়-হীন চেতনা কল্পনামাত্র এবং চেতনার একমাত্র আশ্রয় দেহই। অতএব, পূর্বজন্ম-পরজন্মর কথা বললেও স্বীকার করতেই হবে যে তথাকথিত পূর্বজন্মর চেতনা তথাকথিত পূর্বজন্মর দেহাশ্রিত এবং তথাকথিত পর-জন্মর চেতনাও তথাকথিত পরজন্মের দেহাশ্রিতই। কিন্তু এক দেহাশ্রিত চেতনা এবং অপর দেহাশ্রিত চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। যেমন, গজদেহাশ্রিত চেতনা এবং অশ্বদেহাশ্রিত চেতনা। স্বতন্ত্র দেহাশ্রিত বলেই চেতনাদুটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তেমনি, তথাকথিক পূর্বজন্মর দেহাশ্রিত চেতনা এবং তথাকথিত পরজন্মর দেহাশ্রিত চেতনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য। এবং যদি তাইই হয় তাহলে উভয়কেই এক চেতনা-সন্ততির অন্তর্ভুক্ত বলে কল্পনা করাও অবান্তর।

ফলে, জন্মান্তরগামী শাশ্বত আত্মা অস্বীকার করে শুধুমাত্র চেতনা-সন্ততি স্বীকার করলে পরলোক স্বীকার করার কোন উপায় থাকে না। এই কারণেই লোকায়ত-পক্ষ থেকে বৌদ্ধপক্ষর বিরুদ্ধে উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে···]

অতএব, চেতনার বা জ্ঞানের আশ্রয় হিসাবে হয় [ন্যায় বৈশেষিকাদির মতো] অনাদি ও অনন্ত "নর" [অর্থাৎ শাশ্বত বা উৎপত্তিহীন ও বিনাশহীন আত্মা] স্বীকার করো, আর না-হয় আমাদের নাস্তিকমত [অর্থাৎ লোকায়ত দেহাত্মবাদ] স্বীকার করো। [তাৎপর্য এই যে, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা নিজেরাই প্রমাণ করেছেন যে উৎপত্তিহীন ও বিনাশহীন আত্মার পরিকল্পনা কেন দোষদুষ্ট, অতএব অস্বীকার্য। আমরা—লোকায়তিকেরা—প্রমাণ করলাম যে বিজ্ঞান-সন্ততির পরিকল্পনাও গভীর দোষদুষ্ট। অতএব আমাদের পক্ষই একমাত্র স্বীকার্য পক্ষ : মহাভূত-গঠিত শরীর থেকেই আত্মার উৎপত্তি, নিরাশ্রয় চেতনা অসম্ভব, শরীরই চেতনার একমাত্র আশ্রয় ; অর্থাৎ, দেহাতিরিক্ত আত্মা কল্পনামাত্র এবং পরলোকী বা পরলোকগামী বলেই যেহেতু কিছু নেই সেইহেতু পরলোকও কল্পনামাত্রই।

'পঞ্জিকা'-য় লোকায়ত পক্ষর উপসংহার হিসাবে কমলশীল তাই লোকায়ত-সূত্ররই পুনরুল্লেখ করেছেন : "পরলোকিনোঽভাবাৎ-পরলোকাভাব" ইতি।]

পরিশেষে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের বর্ণনা হিসাবে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের রচনা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি পর্যাপ্ত হবে। লোকায়তিকেরা দেহাত্মবাদের সমর্থনে বাস্তবিকই যে প্রধানত মদশক্তির দৃষ্টান্তর উপরই নির্ভর করতেন তার একটি প্রকৃষ্ট নজির জয়ন্তভট্টর রচনা। জয়ন্ত বলছেন,

তথাচ লোকাযতিকাঃ পবলোকাপবাদিনঃ।
চৈতন্যখচিতাৎকায়ান্নাত্মাহন্যোঽস্তীতি মন্বতে॥

…জ্ঞানাদিযোগস্তু ভূতানামেব পরিণামবিশেষোপপাদিতশক্ত্যতিশয়জুষাং ভবিষ্যতি, যথা গুড়পিষ্টাদয়ঃ প্রাগসতীমপি মদশক্তিমাসাদিতস্বরাকাবপরিণামাঃ প্রপদ্যন্তে তথা মৃদাদ্যবস্থায়ামচেতনান্যপি ভূতানি শরীরাকারপরিণতানি চৈতন্যং প্রপৎস্যন্তি।[২৬১]

অর্থাৎ,

—পরলোক-অপবাদী লোকায়তিকেরা মনে করে চৈতন্য-খচিত দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই।…বিশেষ-পরিণামের ফলে জড়পদার্থাবলী অতিশয় শক্তিসম্পন্ন হলে সেগুলিই জ্ঞানযুক্ত হয়, অর্থাৎ সেগুলিতেই জ্ঞান বা চেতনা উৎপন্ন হয়। যেমন গুড়, পিষ্ট প্রভৃতিতে পূর্বে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিই সুরারূপে পরিণত হলে মদশক্তি প্রাপ্ত হয়; তেমনি, ভূতসমূহও মৃৎ প্রভৃতি অবস্থায় অচেতন হলেও বা চেতনাবিহীন হলেও সেগুলিই দেহাকারে পরিণত হলে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা দার্শনিকের রচনাবলী থেকে পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের যে-বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা হল সেগুলির নজির থেকে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হবে না যে দেহাত্মবাদের সমর্থনে লোকায়তিকেরা বাস্তবিক পক্ষে বা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণশাস্ত্র-মূলক বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা না-করলেও অন্তত মদশক্তির দৃষ্টান্তটি প্রদর্শন করে ভূতচৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করতেন। অবশ্যই সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তর উপর নির্ভরশীল ভূতচৈতন্যবাদই সমালোচনামূলক ভাবে প্রত্যাখ্যানের প্রয়াস করেননি; তাঁরা এই প্রসঙ্গেই আরো বহুবিধ বিচারও উত্থাপন করেছেন। কেননা, বাৎস্যায়ন[২৬২] যেমন বলেছেন, "বহুধা

২৬১। 'ন্যায়মঞ্জরী' ২।৩।

২৬২। 'ন্যায়সূত্র-ভাষ্য' ৩২।৫৫।

পরীক্ষ্যমাণং তত্ত্বং সুনিশ্চিততরং ভবন্তি”—বহুপ্রকারে পরীক্ষ্যমাণ তত্ত্ব সুনিশ্চিততর হয়। স্বভাবতই এই নীতি অনুসরণ করে লোকায়ত বিরোধীরাও লোকায়তিক দেহাত্মবাদকে বহু প্রকারে পরীক্ষা করেই বর্জন করতে চেয়েছেন এবং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ নূতন নজিরও প্রদর্শন করেছেন। লোকায়তিক দেহাত্মবাদের স্বকীয় দার্শনিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য এজাতীয় সমস্ত বিচারেরই পুনরালোচনা অবশ্য অবান্তর হবে না। কিন্তু অন্যান্য বিবিধ বিচারের পুনরালোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের পক্ষে বিশেষ করে দেখা দরকার, মদশক্তির দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ভূতচৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দার্শনিকেরা ঠিক কী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং সে-যুক্তির সার্থকতাই বা কতখানি।

২০। দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস

নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রতিনিধি নানাভাবে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। বর্তমানে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি উক্তি উদ্ধৃত করার সুযোগ হবে না। এবং তার প্রয়োজনও নেই। কেননা এ-জাতীয় বিবিধ উক্তির মধ্যে পুনরুক্তির পরিচয় বর্তমান। অর্থাৎ, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় মূলত একই যুক্তি প্রস্তাবিত হতে দেখা যায়। অতএব, দেহাত্মবাদের দার্শনিক বিচারের পক্ষে যেটুকু পর্যাপ্ত বর্তমান আলোচনা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস করবো।

দেহাত্মবাদ বর্ণনার মতোই শঙ্করাচার্যর দেহাত্মবাদ খণ্ডন[২৬৩] তুলনায় সহজ ও সরল। অথচ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত মূল যুক্তিগুলির অধিকাংশরই পরিচয় তাঁর রচনায় বর্তমান। তাই দেহাত্মবাদ প্রত্যাখ্যানের নিদর্শন হিসাবে আমাদের পক্ষে তাঁর মন্তব্য থেকে শুরু করাই সুবিধাজনক।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যর প্রথম ও প্রধান যুক্তি হল—

> দেহ থেকে আত্মার অব্যতিরেক [অর্থাৎ, দেহ ও আত্মার অভিন্নতা] যুক্তিযুক্ত নয়। দেহ থেকে আত্মার ব্যতিরেকই [অর্থাৎ, আত্মার দেহাতিরিক্ততাই] যুক্তিযুক্ত। [যুক্তি এই যে] তৎ বিদ্যমানেও তৎ-ধর্মর অভাব [অর্থাৎ, দেহ বিদ্যমান সত্ত্বেও তথাকথিত দেহধর্ম বা প্রকৃত আত্মধর্মর অভাব পরিদৃষ্ট হয়]। যদি দেহের বিদ্যমানতায় আত্মধর্মগুলিকে বিদ্যমান দেখে সেগুলিকে দেহধর্ম বলে

২৬৩। 'শারীরক-ভাষ্য' ৩৩৫৩।

বিবেচনা করো, তাহলে দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সেগুলির অবিদ্য-মানতা দেখে কেন সেগুলিকে দেহান্যধর্ম [অর্থাৎ, দেহ ছাড়া অন্য কিছুর ধর্ম বা আত্মার ধর্ম বা আত্মধর্ম] বলে বিবেচনা করবে না? দেহধর্মর সঙ্গে সেগুলির বৈলক্ষণ্যবশত [তাইই করা উচিত]। যতকাল দেহ বর্তমান ততকাল রূপ প্রভৃতি দেহধর্মগুলি বর্তমান থাকুক। কিন্তু মৃতাবস্থায় দেহ বর্তমান সত্ত্বেও প্রাণ, চেষ্টা প্রভৃতি বর্তমান থাকে না। তাছাড়া, রূপ প্রভৃতি দেহধর্মগুলি অপরের দ্বারাও উপলব্ধ হয়। কিন্তু চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্মগুলি তা হয় না।

যুক্তিটির তাৎপর্য দেখা যাক। দেহ থেকে আত্মার অব্যতিরেকই লোকায়ত-মতের মূল কথা। অর্থাৎ দেহই আত্মা, দেহ থেকে আত্মার ব্যতিরেক—বা আত্মার দেহাতিরিক্ততা—স্বীকার্য নয়। অতএব আত্ম-বাদীরা—অর্থাৎ যাঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন, তাঁরা—যে ধর্মগুলিকে আত্মধর্ম বা দেহাতিরিক্ত আত্মার ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান, লোকায়ত-মতে সেগুলি বস্তুতপক্ষে দেহধর্ম। এ-জাতীয় ধর্মর নিদর্শন হিসাবে শঙ্করাচার্য এখানে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতির উল্লেখ করছেন। এবং দেহাত্মবাদ-খণ্ডন বা আত্মবাদ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রমাণ করতে চাইছেন যে এই ধর্মগুলিকে বস্তুতপক্ষে দেহান্যধর্ম বা দেহ ছাড়া অন্য কিছুর ধর্ম—অর্থাৎ, দেহাতিরিক্ত আত্মারই ধর্ম—বলে স্বীকার করতে হবে। আত্মবাদীদের পক্ষে এ-জাতীয় ধর্ম-গুলিকে দেহান্যধর্ম হিসাবে প্রতিপাদন করার প্রয়োজন অবশ্যই সুস্পষ্ট। কেননা, তাঁদের মতে এজাতীয় আত্মধর্ম-গুলিই আত্মার অনুমাপক—এই জাতীয় ধর্ম থেকেই অনুমান-মূলক ভাবে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। 'ন্যায়-সূত্র'কার গোতম[২৬৪] যেমন বলেছেন, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ; অর্থাৎ এই ধর্মগুলি থেকেই দেহাদিভিন্ন আত্মার [অনুমান-মূলক] প্রমাণ হয়।[২৬৫]

কিন্তু এই জাতীয় ধর্মগুলিকেই দেহান্যধর্ম হিসাবে গ্রহণ না করে দেহধর্ম বলে প্রতিপাদন করার পক্ষে লোকায়তিকদের মূল যুক্তি কী? শঙ্করাচার্য বলছেন, সে-যুক্তি এই যে শুধুমাত্র দেহের বিদ্যমানতায়ই আলোচ্য ধর্মগুলি বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, যেখানে দেহ বিদ্যমান শুধুমাত্র সেখানেই

২৬৪। 'ন্যায়-সূত্র', ১।১।১০।

২৬৫। গৌতম-উক্ত ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি আত্মার অনুমানের লিঙ্গর সঙ্গে শঙ্করাচার্য-উক্ত প্রাণ, চেষ্টা প্রভৃতি আত্মধর্মর নিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য বর্তমানে বিচার করতে গেলে আলোচনা অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা ঘটবে, অতএব সে-আলোচনা এখানে উত্থাপন করা বাঞ্ছনীয় হবে না। তাছাড়া, শঙ্করাচার্য এখানে "ধর্ম" শব্দটিকে যে-অর্থে ব্যবহার করেছেন তার বিচারও বর্তমানে উত্থাপন না করাই বাঞ্ছনীয় হবে।

এই ধর্মগুলি বিদ্যমান; অতএব এই ধর্মগুলি বস্তুতপক্ষে দেহরই ধর্ম—দেহধর্ম।

শঙ্করাচার্য দেখাতে চান, এ-যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আলোচ্য ধর্মগুলি যদি বস্তুতপক্ষে দেহধর্মমাত্রই হোতো তাহলে যেখানে ও যতক্ষণ দেহ বর্তমান সেখানে ও ততক্ষণ এই ধর্মগুলিও বর্তমান থাকতে বাধ্য হোতো। অথচ দেখা যায় দেহ বর্তমান সত্ত্বেও এই ধর্মগুলি অবর্তমান হতে পারে। যেমন, মৃতাবস্থায় দেহ বর্তমান সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম অবর্তমান হয়। অতএব, মৃতদেহের নজির থেকেই—অর্থাৎ, মৃতাবস্থায় দেহে চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মর অভাব থেকেই—প্রমাণ হয় যে চৈতন্যাদি দেহমাত্রর ধর্ম নয়। এবং এগুলি যদি দেহমাত্ররই ধর্ম না হয়, তাহলেএগুলিকে দেহ ছাড়া অন্য কিছুর ধর্ম বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু দেহ ছাড়া এগুলি আর কিসের ধর্ম হতে পারে? শঙ্করাচার্যর তাৎপর্য এই যে, এ-প্রশ্নর মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। তা হলো, আলোচ্য ধর্মগুলি দেহাতিরিক্ত আত্মারই ধর্ম বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

আসলে, শঙ্করাচার্য বলছেন, চৈতন্য প্রভৃতিকে দেহমাত্রর ধর্ম বলে প্রতিপন্ন করার উৎসাহে লোকায়তিকেরা ভুলে যান যে প্রকৃত দেহধর্মর সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি আলোচ্য ধর্মগুলির অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য বা মৌলিক পার্থক্য বর্তমান এবং সেই বৈলক্ষণ্যবশতই প্রমাণ হয় যে চৈতন্য প্রভৃতি বস্তুতপক্ষে দেহান্যধর্ম বা আত্মধর্ম। প্রকৃত দেহধর্মর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল রূপ। এবং রূপ প্রভৃতি প্রকৃত দেহধর্মর সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি প্রকৃত আত্মধর্মর অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য এখানে দুটি মূল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। যথা—

এক॥ যতক্ষণ দেহ বর্তমান ততক্ষণ রূপ প্রভৃতি প্রকৃত দেহধর্মও বর্তমান। প্রকৃত দেহধর্ম বলেই মৃতদেহেও—বা দেহের মৃতাবস্থাতেও—রূপ প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান থাকে। কিন্তু মৃতদেহে চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মর অভাব ঘটে। অতএব, মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতির অবিদ্যমানতা থেকেই প্রমাণ হয় যে চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম রূপাদি ধর্মের মতো দেহমাত্ররই ধর্ম নয়, বা, প্রকৃত দেহধর্মর সঙ্গে চৈতন্যাদি ধর্মর অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য বর্তমান।

দুই॥ রূপ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট দেহধর্মগুলি অপরাপর ব্যক্তির দ্বারাও উপলব্ধ হয়—ব্যক্তিবিশেষের রূপ প্রভৃতি ধর্ম অপরাপর ব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। কিন্তু চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম অপরাপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হয় না—ব্যক্তিবিশেষের চৈতন্য অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা উপলব্ধ হয় না। শঙ্করাচার্যর এই যুক্তির ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র[২৬৬] যেমন বলেছেনে

২৬৬। 'ভামতী', ৩।৩।৫৪।

"স্বপরপ্রত্যক্ষা হি দেহধর্মা দৃষ্টাঃ, যথা রূপাদয়ঃ। ইচ্ছাদয়স্তু স্বপ্রত্যক্ষা এবেতি দেহধর্মৈর্বৈধর্ম্যম্ ॥"—অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি দেহধর্মগুলি নিজের এবং পরের উভয়েরই প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি শুধুমাত্র স্বপ্রত্যক্ষ; অতএব দেহধর্মর সঙ্গে এগুলির বৈধর্ম্য বা পার্থক্য স্বীকার্য। [প্রসঙ্গত, শঙ্করাচার্য চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্মর স্বপ্রত্যক্ষত্ব-মাত্র উল্লেখ করলেও তাঁরই উক্তির ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র কেন আত্মধর্মর নিদর্শন হিসাবে ইচ্ছা প্রভৃতিরই স্বপ্রত্যক্ষত্ব-মাত্র উল্লেখ করেছেন—এ প্রশ্ন সুধীগণ বিচার করবেন।]

আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে—অর্থাৎ, শঙ্করাচার্যর উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে দেহাত্মবাদ বাস্তবিকই খণ্ডিত হয় কিনা, এই বিচারে প্রবিষ্ট হবার আগে আমাদের পক্ষে এখানে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অবান্তর হবে না। যথা—

এক ॥ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য এখানে যেভাবে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতিকে প্রকৃত আত্মধর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তা কি প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কাছেই স্বীকারযোগ্য হবে? কিংবা, এই দাবির সঙ্গে শঙ্করাচার্যর স্বীয় দার্শনিক তত্ত্বর সত্যিই কি সঙ্গতি হয়?

দুই ॥ প্রকৃত দেহধর্ম ও প্রকৃত আত্মধর্মর মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদক যে-দুটি নজির শঙ্করাচার্য প্রদর্শন করেছেন তার উভয়ের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা কি আত্মবাদীর পক্ষে—বিশেষত শঙ্করাচার্যর পক্ষে—বাস্তবিকই নিরাপদ? কিংবা, উক্ত দুটি নজিরের মধ্যে দ্বিতীয়টির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপিত হলে প্রথমটির সার্থকতা কি সন্দিগ্ধ হয় না?

তিন ॥ মৃতাবস্থায় চৈতন্যর অভাব (বা বিলোপ?) সংক্রান্ত নজিরটির সাহায্যে দেহাত্মবাদ প্রকৃতপক্ষে খণ্ডিত হোক-আর-নাই হোক, তা শঙ্করাচার্যর স্বীয় প্রতিপাদ্য-বিষয়ের পক্ষে কি বিশেষ আশঙ্কাজনক নয়?

একে একে এই প্রশ্ন তিনটির তাৎপর্য দেখা যাক।

প্রথমতঃ, একথা সুবিদিত যে অদ্বৈতমতে আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ। অতএব, চৈতন্যকে আত্মার গুণ বা ধর্ম বলে বিবেচনা করা শঙ্করাচার্যর স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত যুক্তি প্রয়োগের অল্প পরেই শঙ্করাচার্য বলছেন, "উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মা"—আমরা আত্মাকে উপলব্ধিস্বরূপ বলেই জানি। কিন্তু আত্মা যদি শঙ্করাচার্য-মতে উপলব্ধি-স্বরূপ বা চৈতন্য-স্বরূপই হয় তাহলে শঙ্করাচার্যর পক্ষেই চৈতন্যকে আত্মার ধর্ম বা আত্মার গুণ বলে প্রতিপাদন করা কীভাবে স্বীয় সিদ্ধান্তসঙ্গত হতে পারে? এবং শঙ্করাচার্যর পক্ষে

চৈতন্যকেই যেহেতু আত্মার গুণ বা ধর্ম বলে বিবেচনা করার সুযোগ সত্যিই নেই, সেইহেতু তাঁর পক্ষে প্রাণ, চেষ্টা ও স্মৃতি নামের আরো তিনটি গুণকে আত্মধর্ম বলে উল্লেখ করা আত্মবিরোধেরই পরিচায়ক বলে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ, শঙ্করচার্যর পক্ষে দেহাত্মবাদ খণ্ডনেব উৎসাহ এমনই প্রবল যে সেই উদ্দেশ্যে তিনি অন্তত সাময়িক ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়েব মূল সিদ্ধান্তটিকেও পরিহার—বা অন্তত উপেক্ষা—করতে উদ্যত হয়েছেন।

একথার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। শঙ্করাচার্যর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু দেহাত্মবাদেব খণ্ডনে তাঁব মূল হেতু কী? প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রকৃতপক্ষে দেহধর্ম হতে পাবে না, অতএব এগুলি দেহান্যধর্ম এবং এই কারণেই আত্মধর্ম বা আত্মার ধর্ম। অর্থাৎ, প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতিকে আত্মধর্ম হিসাবে প্রতিপাদন করে সেই হেতুব সাহায্যেই তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চান, বা খণ্ডন করতে চান দেহাত্মবাদ। কিন্তু এই হেতু তাব স্বীকৃত সিদ্ধান্তর বিরোধী। কিন্তু, স্বীকৃত সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধ হেতু গ্রহণ করা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে বিশেষ নিন্দিত বা দোষদুষ্ট হিসাবেই পরিগণিত। অনেকে এই দোষকেই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, 'ন্যায়-সূত্র'-কাব গোতম[২৬৭] বলেছেন, "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ"—অর্থাৎ, "সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকাব করিয়া, তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তর ব্যাঘাতক তাহা বিরুদ্ধ (বিরুদ্ধ-নামক হেত্বাভাস)।" ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলছেন, "তং বিরুদ্ধেতি তদ্বিরোধী। অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি"—অর্থাৎ, "তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী', (বিশদার্থ) স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে। অর্থাৎ যেহেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা 'বিরুদ্ধ'-নামক হেত্বাভাস।"[২৬৮] অবশ্য, পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা 'বিরুদ্ধ'-নামক হেত্বাভাসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন[২৬৯]; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে আলোচ্য দোষকে 'বিরুদ্ধ'-নামক হেত্বাভাস আখ্যা দেওয়া হোক-আর-নাই হোক, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে পরপক্ষ-নিরসনের উদ্দেশ্যেও স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক কোন হেতু প্রদর্শন করা দার্শনিক গৌরবের

২৬৭। 'ন্যায়-সূত্র', ১।২।৬।

২৬৮। উভয় তর্জমাই ফণিভূষণের।

২৬৯। যথা, "প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বা বিরোধঃ"...('ন্যায়বার্তিক', ১।২।৬); "সাধ্যাভাব ব্যাপ্তো হেতুর্বিরুদ্ধ"... ('তর্কসংগ্রহ', কলিকাতা সং, পৃঃ ৫৭) Chatterjee NTK 311 2 দ্রষ্টব্য।

পরিচায়ক নয়। অতএব, চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় বিশ্বাসী শঙ্করাচার্য এখানে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যেভাবে প্রাণ, চেষ্টা চৈতন্য ও স্মৃতিকে আত্মধর্ম বা আত্মার ধর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন—এবং তারই নজির দেখিয়ে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন—তা সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হোক-আর-নাই হোক, অন্তত শঙ্করাচার্যর মুখে শোভা পায় না। আমরা পরে দেখবো, শঙ্করাচার্য এই যুক্তি সম্ভবত নৈয়ায়িকদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু গ্রহণ করার সময় তিনি সম্ভবত এই প্রশ্ন-প্রসঙ্গে উদাসীন ছিলেন যে যুক্তিটির সঙ্গে ন্যায়দর্শন সম্মত আত্মতত্ত্বের সঙ্গতি থাকলেও অদ্বৈতসম্প্রদায় সম্মত আত্মতত্ত্বের সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে কিনা। যেন-তেন-প্রকারে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের আগ্রহই এই ঔদাসীন্যের কারণ বলে অনুমিত হয়।

এবারে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচারে অগ্রসর হওয়া যাক।

না-হয় ধরাই যাক,[২৭০] চৈতন্য স্মৃতি প্রভৃতি শুধুমাত্র স্ব-প্রত্যক্ষগোচরই হয়; রূপাদি দেহধর্মের মতো স্ব-প্রত্যক্ষ ও পর-প্রত্যক্ষ উভয়েরই গোচর হতে পারে না। কিন্তু তাহলে অন্তত প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে শঙ্করাচার্য-উক্ত প্রথম নজিরটি সংক্রান্ত ঠিক কতটুকু কথা প্রমাণ করার সুযোগ থাকে? তা শুধুমাত্র এই যে স্বীয় দেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্য প্রভৃতি বর্তমান। অথচ শুধুমাত্র এটুকু স্বীকার করলেই দেহাত্মবাদ খণ্ডন করা যায় না, বা, চৈতন্য প্রভৃতিকে দেহান্যধর্ম বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। বিষয়টির আলোচনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে।

চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মর শুধুমাত্র স্ব-প্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হলে নিম্নোক্ত দুটি দাবির একটি প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে স্বীকার করার সুযোগ থাকে না। যথা—১। স্বীয় দৃষ্টান্তে মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হয়, এবং ২। পর দৃষ্টান্তে দেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্য বিদ্যমান ও মৃতাবস্থায় চৈতন্য অবিদ্যমান। উভয় দাবিই কেন প্রত্যক্ষমূলক ভাবে সমর্থন করতে সুযোগ নেই তার যুক্তি অস্পষ্ট নয়। প্রথমত, স্বীয় দেহের মৃতাবস্থায় কোন রকম প্রত্যক্ষ-মূলক জ্ঞানের প্রসঙ্গই অবান্তর—স্বীয় দেহের

২৭০। ইচ্ছাদি স্বীয় আত্মধর্মর মানস-প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িক মহলে স্বীকৃত হলেও (ফণিভূষণ. ন্যায় দর্শন', '৩।২৩২-৩ দ্রষ্টব্য) আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অন্তদর্শন বা *Introspection* পদ্ধতির বিরোধীরা চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতির স্ব-প্রত্যক্ষত্ব অবশ্যই অস্বীকার করবেন এবং বর্তমানে অন্তদর্শন পদ্ধতির সমর্থক একান্তই দুর্লভ। কিন্তু আপাতত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন না-করে মূলত ভারতীয় দর্শনের পরিভাষাতেই দেহাত্মবাদের দার্শনিক বিচার পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণ, চেষ্টা চৈতন্য ও স্মৃতি হিসাবে উল্লিখিত "আত্মধর্মগুলির" প্রকৃত তাৎপর্যের বিচারেই বর্তমান আলোচনা বিশেষ বিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা।

মৃতাবস্থায় চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান থাকে-কি-না-থাকে এ-বিষয়ে স্বীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্ভাবনা তো দূরের কথা, এমনকি মৃতাবস্থায় স্বীয় দেহের অস্তিত্ব সংক্রান্তই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ, আমার মৃতাবস্থায় আমার [দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সেই দেহে] চৈতন্যর অবিদ্যমানতা সংক্রান্ত কোন রকম প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রসঙ্গ তো দূরের কথা, এমনকি আমার দেহের বিদ্যমানতা সংক্রান্তই আমার পক্ষে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্ভাবনা নেই। অপর পক্ষে, চৈতন্য যদি একান্তভাবেই স্ব-প্রত্যক্ষ গোচর হয় তাহলে আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে এটুকুও দাবি করার সুযোগ থাকে না যে অপরাপরের দৃষ্টান্তে দেহের এমনকি জীবিতাবস্থায় চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান থাকে। অথচ, দেহাত্মবাদের খণ্ডনে সাধারণ ভাবে প্রমাণ করা প্রয়োজন: 'দেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্য প্রভৃতি বর্তমান থাকলেও মৃতাবস্থায় তা অবিদ্যমান হয়'। স্বভাবতই, এই উক্তি হয় স্ব-প্রসঙ্গে না-হয় পর-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন, অথচ প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে তা উভয় প্রসঙ্গেই অপ্রযোজ্য। স্ব-প্রসঙ্গে মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সংক্রান্তই কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ নেই; পর-প্রসঙ্গে দেহের জীবিতাবস্থায়ও চৈতন্যর বিদ্যমানতা সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ নেই। অতএব চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মকে একান্তভাবেই স্ব-প্রত্যক্ষ গোচর বলে স্বীকার করলে দেহাত্মবাদের খণ্ডনে প্রধানতম যুক্তিটির সার্থকতায় আশঙ্কা ঘটতে পারে।

আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মর শুধুমাত্র স্ব-প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করে প্রত্যক্ষ-মূলক ভাবে না-হলেও অন্তত অনুমান-মূলক ভাবে দাবি করার সুযোগ থাকে যে জীবিতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতায় চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম বিদ্যমান হলেও মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম অবিদ্যমান হয়।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, এই অনুমান কার প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হবে? স্ব-প্রসঙ্গে, না পরপ্রসঙ্গে, না উভয়প্রসঙ্গেই?

স্ব-প্রসঙ্গে এ-জাতীয় অনুমানের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উঠবে। প্রথমত আত্মবাদীর স্বীয় দাবি অনুসারেই মৃতাবস্থায় অনুমাতার অভাব ঘটে এবং অনুমাতার অভাবে অনুমিতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, যে-ভাবে অন্যান্য ভাবী বা ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমান হয় সেই ভাবেই অনুমাতা তাঁর জীবিতাবস্থাতেই অনুমান করতে পারেন যে ভবিষ্যতে তাঁর মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম অবিদ্যমান হবে। অবশ্যই একথা সুবিদিত যে নৈয়ায়িকেরা ভাবী বা ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমানের জন্য "পূর্ববৎ" নামের এক প্রকার অনুমান স্বীকার করেছেন;—যেমন, বর্তমানে মেঘের উন্নতি-বিশেষ দর্শন করে ভাবী বৃষ্টির

অনুমান হয়। কিন্তু এই অনুমানের প্রকৃত স্বরূপ ও সর্ত কী? অনুমানটি আসলে কারণ-কার্য সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনুমানটির সর্ত হল উক্ত কারণ-কার্য সম্বন্ধের মধ্যে বর্তমানে কারণটির পরিদর্শন—এই কারণ পরিদর্শন করেই ভাবী কার্যের অনুমান সম্ভব হয়। অতএব স্বীয় দৃষ্টান্তে দেহের মৃতাবস্থায় চৈতন্যের ভাবী অবিদ্যমানতা সংক্রান্ত অনুমানের প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন উঠবে। এক: স্বীয় দেহের মৃতাবস্থায় চৈতন্যের অভাবের প্রকৃত কারণ কী? দুই: বর্তমানে সেই কারণের প্রত্যক্ষ সম্ভব কি না? আত্মবাদীদের মতে এই কারণ হল, "মৃতাবস্থায় স্বীয় দেহে আত্মার অভাব"। অতএব, "মৃতাবস্থায় স্বীয় দেহে আত্মার অভাব" বর্তমানে পরিদর্শন করার সম্ভাবনা স্বীকার না-করলে "মৃতাবস্থায় স্বীয় দেহে আত্মার অভাব" সংক্রান্ত ভাবী বা আগামী ঘটনাটির অনুমিতি কঠিন হবে। কিন্তু আত্মবাদীর পক্ষে আলোচ্য পরিদর্শন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যে-অর্থে মেঘের উন্নতি-বিশেষ পরিদর্শন করে ভাবী বৃষ্টির অনুমান সম্ভব সেই অর্থে বর্তমানে "স্বীয় দেহে আত্মার অভাব" নামক কারণ পরিদর্শন করে তারই আগামী বা ভবিষ্যৎ কার্য হিসাবে "মৃতাবস্থায় স্বীয় দেহে চৈতন্যের অভাব" নামক ঘটনাটি অনুমানের সুযোগ নেই। অতএব, সংক্ষেপে, স্ব-প্রসঙ্গে মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্যের অবিদ্যমানতা অনুমানে নানা বাধা আছে।

শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পর-প্রসঙ্গেও অনুমান-মূলক ভাবে প্রমাণ করা সহজ নয় যে জীবিতাবস্থায় দেহে চৈতন্য বিদ্যমান হলেও মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হয়। প্রথমতঃ পরদেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্যের বিদ্যমানতা কীভাবে অনুমিত হবে? এই অনুমানের হেতু বা লিঙ্গ কী হবে? এবং এই হেতু বা লিঙ্গ যাই হোক-না-কেন, তার সঙ্গে পরদেহে চৈতন্যের (অর্থাৎ, লিঙ্গীর) ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবই বা কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অন্তত প্রসিদ্ধ অনুমানের ক্ষেত্রে "লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ" যদি কোন কালেই প্রত্যক্ষগোচর না-হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না, এবং এ-জাতীয় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষকালে শুধু লিঙ্গেরই নয় লিঙ্গীরও,—অর্থাৎ আলোচ্য দৃষ্টান্তে পরদেহে চৈতন্যেরও—প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রয়োজন। অথচ, শঙ্করমতে চৈতন্য একান্তভাবেই স্ব-প্রত্যক্ষ গোচর, অর্থাৎ পরদেহে চৈতন্য একান্তভাবেই স্বপ্রত্যক্ষ। এবং একথা স্বীকৃত হলে অনুমান-মূলক ভাবেও পরদেহে চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রমাণে বাধা ঘটে। অবশ্যই ন্যায়-দর্শনে "সামান্যতোদৃষ্ট" নামের একপ্রকার অনুমান স্বীকৃত হয়েছে এবং সে-অনুমান লিঙ্গীর পূর্ব-প্রত্যক্ষ অপেক্ষা করে না। কিন্তু আমরা পরে দেখবো, উক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের প্রকৃতি বা স্বরূপ এমনকি নৈয়ায়িক মহলেই বিশেষ বিতর্কসাপেক্ষ। অতএব, আত্মবাদীরা সকলেই এজাতীয় অনুমান স্বীকার

করবেন কিনা, স্বীকার করলেও কোন্ অর্থে তা স্বীকার করবেন; এবং সেই অর্থে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে পরদেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্যর অস্তিত্ব কীভাবে প্রমাণিত হবে—এজাতীয় বহুবিধ জটিল প্রশ্ন উপেক্ষা করে শঙ্করাচার্যর দৃষ্টিকোণ থেকে পরদেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্যর বিদ্যমানতা অনুমান-মূলক ভাবে প্রমাণ করা সহজ হবে না। এবং পরদেহের জীবিতাবস্থায় চৈতন্যর বিদ্যমানতাই যদি অনুমিত না হয় তাহলে পরদেহের মৃতাবস্থায় সেই চৈতন্যর অভাব সংক্রান্ত উক্তিও নিরর্থক হবার আশঙ্কা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ন্যায়-দর্শনে আত্মার অনুমান প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রস্তাবিত হয়েছে; আমরা পরে সে-আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে শঙ্করাচার্য দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে প্রকৃত দেহধর্ম ও প্রকৃত আত্মধর্মর মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য-সূচক যে-দুটি নজির প্রদর্শন করতে চেয়েছেন তার মধ্যে দ্বিতীয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলে প্রথমটির সার্থকতা সন্দিগ্ধ হতে পারে। অর্থাৎ, রূপাদি দেহধর্ম স্বপ্রত্যক্ষ এবং পরপ্রত্যক্ষ উভয়েরই গোচর কিন্তু চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্ম একান্তভাবেই স্বপ্রত্যক্ষ গোচর—একথা স্বীকার করলে আরো স্বীকার করা কঠিন হয় যে জীবিতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতায় চৈতন্য বিদ্যমান হলেও মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হয়। অথচ, দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্যর অবিদ্যমানতা সংক্রান্ত নজিরটিই তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অচিরেই দেখবো, অন্যান্য দার্শনিকেরাও অল্প-বিস্তর ভিন্ন পরিভাষায় হলেও দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে মূলত এই যুক্তিই প্রদর্শন করেছেন।

দেহাত্মবাদ খণ্ডনের পক্ষে উক্ত যুক্তি বাস্তবিকই পর্যাপ্ত কিনা, এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। আমরা পরে দেখাবার প্রয়াস করবো যে দেহাত্মবাদের মূল দাবিকে "মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্যর অবিদ্যমানতা" সংক্রান্ত নজিরের সাহায্যে সত্যিই পর্যাপ্তভাবে খণ্ডন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক।

শঙ্করাচার্যর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই মৃতাবস্থায় চৈতন্যর অভাব সংক্রান্ত নজিরটি উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আশঙ্কাজনক। কেননা, মৃত্যুতেই চৈতন্যর চরম পরিসমাপ্তি ঘটে—একথা স্বীকৃত হলে বস্তুতপক্ষে চার্বাকপক্ষই সমর্থিত হবার সম্ভাবনা। এই কারণে, আমরা আগেই দেখেছি, পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের বর্ণনায় বৈদান্তিক মাধবাচার্য এবং নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট উভয়েই লোকায়ত-মতের আপাত-সমর্থনে 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্'-এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "বিজ্ঞানঘন এ বৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি; ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি"—এই ভূতসমূহ

থেকেই বিজ্ঞানঘন উৎপন্ন হয়ে সেগুলির সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকে না।

ঐতিহাসিকভাবে লোকায়তিকদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনে বেদবাক্য উদ্ধৃতির সম্ভবনা বাস্তবিকই ছিল কিনা—এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। আমরা ইতিপূর্বে সে-সম্ভাবনাকে সুদূর-পরাহত বলেই বিবেচনা করেছি। তবুও লোকায়তিকদের পক্ষে আলোচ্য উক্তিটি কেন মনঃপুত হবারই কথা—তার দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আত্মবাদীদের মতে যেগুলি প্রকৃত আত্মধর্ম সেগুলির মধ্যে চৈতন্যই প্রধান—এমনকি শঙ্করাচার্যর মতে আত্মা তো চৈতন্যস্বরূপই। তাই মৃত্যুকালেই যদি চৈতন্যর চরম বিলোপ ঘটে তাহলে দেহাবসানকেই আত্মনাশের সমতুল্য বলে বিবেচনা করার সম্ভাবনা হয়, অন্তত মৃত্যু-উত্তীর্ণ আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে বিশেষ বাধা হয়। ফলে, আত্মবাদের পরিবর্তে বস্তুতক্ষে দেহাত্মবাদই সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা। অতএব, বিশেষত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী শঙ্করাচার্যর পক্ষে বিনা-সর্তে দাবি করা সম্ভবই নয় যে মৃতাবস্থায় চৈতন্যর ঐকান্তিক অভাব ঘটে। অথচ, যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শনও প্রয়োজন যে চৈতন্য যদি দেহমাত্ররই ধর্ম হয় তাহলে যতক্ষণ দেহ বর্তমান ততক্ষণ চৈতন্যও বর্তমান হবার কথা, অথচ বস্তুত দেখা যায় যে মৃতাবস্থায় দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হয়। ফলে, মৃতাবস্থায় চৈতন্যর অবিদ্যমানতা-সংক্রান্ত নজিরটি প্রদর্শনের অব্যবহিত পরে স্বীয় পক্ষ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য দাবি করেছেন যে দেহ বিনষ্ট হলেই যে চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় একথাও নিশ্চিত নয়, কেননা আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তির সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্মগুলিরও দেহান্তর প্রাপ্তি হতে পারে:

> অপি চ, সতি তাবদ্দেহে জীবদবস্থায়ামেষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং, নত্বসত্যভাবঃ। পতিতেঽপি কদাচিদস্মিন্ দেহে দেহান্তর-সঞ্চারেণাত্মধর্মা অনুবর্তেরন্। সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে।

অর্থাৎ,—

> আরো কথা এই যে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে যতকাল দেহর জীবিতাবস্থা ততকাল এগুলির (অর্থাৎ চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্ম-গুলির) সত্তা থাকে; কিন্তু দেহর অভাবে বা অবিদ্যমানতায় যে এগুলির অভাব ঘটে তা [নিশ্চয়ভাবে] বলা যায় না। [কেননা,] এই দেহ পতিত বা বিনষ্ট হলেও আত্মধর্মগুলি কখনো-কখনো দেহান্তরে সঞ্চারিত হতেও পারে। সংশয়মাত্রই পরপক্ষ প্রতিষেধের পক্ষে পর্যাপ্ত।

তাৎপর্য এই যে অন্ততঃ দৃষ্টান্ত-বিশেষে দেহাবসান বা মৃত্যুর পরও আত্মার—অতএব চৈতন্যাদি আত্মধর্মরও—দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্ভব। তাই জীবদ্দশায় শরীরে চৈতন্যর বিদ্যমানতা অসন্দিগ্ধ হলেও, মৃত্যুতেই চৈতন্যর অত্যন্ত বিলোপ নিঃসন্দিগ্ধ নয়। অবশ্যই শঙ্করাচার্য বলেছেন, "প্রতিবাদীর মতে মৃত্যুর পর আত্মার ও আত্মধর্মর দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সংশয়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রতিবাদীর পক্ষ নিরসনে সংশয়মাত্রই পর্যাপ্ত।"

কিন্তু এ-জাতীয় উক্তির দুর্বলতা অস্পষ্ট নয়। কেননা, প্রতিবাদীর পক্ষ নিরসনে সংশয়মাত্রকেই পর্যাপ্ত বলে স্বীকার করলেও, এখানে মূল প্রশ্ন হবে, লোকায়াতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কি মৃত্যুর পরও চৈতন্যাদি ধর্মর দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্যই সংশয়-সাপেক্ষ, না, একান্তই অসম্ভব? পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মতের যে-পরিচিতিগুলি আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে তার কুত্রাপি এ-জাতীয় আভাস পাওয়া যায় না যে এই মতে দেহাবসানের পর চৈতন্যাদি ধর্মর দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্ভাবনা বাস্তবিকই সংশয়-সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির রচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে লোকায়ত-মতে পরলোকীর কল্পনামাত্রই—অতএব চৈতন্যাদি ধর্মর দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্ভাবনা-মাত্রও—একান্তই অসম্ভব বা অত্যন্ত গর্হিত। বস্তুতপক্ষে "সংশয়" পদার্থটির প্রকৃত দার্শনিক লক্ষণ বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় লোকায়তিক দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যাদি ধর্মর দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় কেন সংশয়ের প্রসঙ্গই আবান্তর হবে। নৈয়ায়িকেরা[২৭১] দেখিয়েছেন, যে-পদার্থ সামান্যত জ্ঞাত কিন্তু বিশেষত অজ্ঞাত শুধুমাত্র সেই পদার্থেই সংশয়ের প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ, যা সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞাত তাতেও যেমন সংশয়ের প্রসঙ্গ হয় না তেমনি যা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত তাতেও সংশয়ের প্রসঙ্গ হয় না। যেমন, পর্বতকে জানি; কিন্তু তা বহ্নিমান্ কিনা জানি না; এজাতীয় অবস্থাতেই—অর্থাৎ, পর্বতে বহ্নিবিষয়েই—সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু লোকায়ত-মতে চৈতন্যাদি ধর্মর দেহান্তর-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে সামান্যত জ্ঞাত যদিচ শুধু বিশেষরূপে অজ্ঞাত কোন বিষয়েরই উল্লেখ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, লোকায়তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেহাবসানের সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মর সম্পূর্ণ বিলোপ সুস্পষ্টভাবেই জ্ঞাত, কেননা লোকায়ত-মতে এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বর্তমান। তাই লোকায়তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে কোন রকম সংশয়-স্বীকৃতির সুযোগ নেই; ফলে শঙ্করাচার্যর পক্ষেও উপরোক্তভাবে সংশয় প্রদর্শন করে লোকায়তিক পক্ষ নিরসনের প্রয়াসও ব্যর্থ।

কিন্তু শঙ্করাচার্যর আলোচ্য যুক্তিটি দুর্বল হলেও তাঁর পক্ষে—তথা আত্মবাদীদের পক্ষে—দেহাবসান বা মৃত্যুর পরও কোন-না-কোন ভাবে

২৭১। 'ন্যায়-সূত্র', ২।১।১-৭। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন', ২।১-৪২ দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্মগুলির বিদ্যমানতা-সম্ভাবনা প্রদর্শনের প্রয়োজনটুকু অস্পষ্ট নয়। কেননা, দেহাত্মবাদ সম্পূর্ণ উচ্ছেদকল্পে আত্মবাদীদের পক্ষে দ্বিবিধ নজির প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যথা:

এক ॥ দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হতে পারে;

দুই ॥ দেহের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য বিদ্যমান হতে পারে।

দেহাত্মবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদকল্পে কেন এই দ্বিবিধ নজিরই একান্ত প্রয়োজন তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

দেহাত্মবাদের পরিচিতি হিসাবে শঙ্করাচার্য অবশ্য এখানে চৈতন্য ও দেহর মধ্যে ধর্মধর্মি-ভাবের উল্লেখ করেছেন: দেহ ধর্মী, চৈতন্য তারই ধর্ম। কিন্তু ধর্মধর্মি-ভাব না বলে এখানে কার্যকারণ-ভাবের উল্লেখও অসঙ্গত হয় না, কেননা আলোচ্য ধর্মধর্মি-ভাব কার্যকারণ-ভাবেরই প্রকারমাত্র। লোকায়ত-মতে চতুর্ভূত দেহকারে পরিণত হলে সেই দেহ চৈতন্যযুক্ত হয়। অতএব চতুর্ভূতাত্মক দেহই কারণ, চৈতন্য তার কার্য। লোকায়ত-মতকে তাই ভূতচৈতন্যবাদ বলে উল্লেখ করারও প্রথা আছে।

কিন্তু ভারতীয় যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচ্য ধর্মধর্মি-ভাব বা কার্যকারণ-ভাব প্রতিষ্ঠা করার প্রসিদ্ধ প্রথা কী? দেহ ও চৈতন্যর মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন।

অন্বয় অর্থে "তৎ সত্ত্বে তৎ সত্তা",—কারণ থাকলে কার্য থাকে। যেমন, ধূম ও বহ্নির মধ্যে কার্যকারণ-ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য দেখানো দরকার, বহ্নি (কারণ) থাকলে ধূম (কার্য) থাকে। তাহলে, দেহাত্মবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্বয় কী হবে? শরীর বিদ্যমান থাকলে চৈতন্যও বিদ্যমান হয়—যেখানে যেখানে শরীর সেখানে সেখানে চৈতন্য।

ব্যতিরেক অর্থে, "তৎ অসত্ত্বে তৎ অসত্তা",—কারণ না-থাকলে কার্য থাকে না, বা কারণের অভাবে কার্য সম্ভব নয়। যেমন, বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না। তাহলে, দেহাত্মবাদের পক্ষে ব্যতিরেক কী হবে? শরীরের অবিদ্যমানতায় চৈতন্যও অবিদ্যমান; যেখানে শরীর নেই সেখানে চৈতন্যও নেই। শরীরহীন চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয় না।

উপরোক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শিত হলে দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। সংক্ষেপে, দেহাত্মবাদীরা দাবি করবেন, দেহ থাকলে চৈতন্য থাকে; দেহ না থাকলে চৈতন্য থাকে না; অতএব দেহই চৈতন্যের কারণ, বা, দেহই ধর্মী এবং চৈতন্য তারই ধর্ম। স্বভাবতই আত্মবাদীদের পক্ষে দেহাত্মবাদ নিরসনে উপরোক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক খণ্ডন করার—বা দোষদুষ্ট বলে প্রতিপন্ন করার—প্রয়োজন। এবং এই অন্বয়ের খণ্ডনে প্রদর্শন করা প্রয়োজন যে দেহ বিদ্যমান সত্ত্বেও চৈতন্য অবিদ্যমান হতে পারে; অর্থাৎ

দৃষ্টান্তবিশেষে দেহ থাকলেও চৈতন্য থাকে না। তেমনি, উক্ত ব্যতিরেকের খণ্ডনে প্রদর্শন করা প্রয়োজন যে দেহের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য বিদ্যমান হতে পারে; অর্থাৎ, দৃষ্টান্তবিশেষে দেহ না থাকলেও চৈতন্য থাকতে পারে। স্বভাবতই শঙ্করাচার্যর দেহাত্মবাদ খণ্ডনে এই দ্বিবিধ প্রয়াসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

এক॥ দেহাত্মবাদীদের অন্বয়টি দোষদুষ্ট; কেননা মৃতাবস্থায় শরীরের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্যের অবিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হয়।

দুই॥ দেহাত্মবাদীদের ব্যতিরেকটিও দোষদুষ্ট। কেননা, দেহাবসানের পরও চৈতন্যর দেহান্তরপ্রাপ্তি—অর্থাৎ, অবস্থানান্তরে বা স্থানান্তরে চৈতন্যর অস্তিত্ব—অসম্ভব নয়। অতএব, দেহের অবর্তমানতায়ও চৈতন্যর বর্তমানতা সম্ভব হতে পারে।

শঙ্করাচার্যর এই দ্বিতীয় যুক্তির ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র যেমন বলছেন, "তাছাড়া, অন্বয়মাত্রর দ্বারা ধর্মধর্মি-ভাব নির্ণয় করা যায় না। এই জন্যই অন্বয় সত্ত্বেও সকল ধর্মর ধর্মী আকাশ নয়। [অর্থাৎ, আকাশ নিত্য ও সর্বত্রই বর্তমান। অতএব যে কোন ধর্মর সঙ্গেই তার অন্বয় আছে; কিন্তু সেই কারণে আকাশকে যাবতীয় ধর্মের ধর্মী বলা হয় না।] কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারাই [ধর্মধর্মি-ভাব] সিদ্ধ হয়। এ স্থলে ব্যতিরেক সন্দিগ্ধ। সুতরাং অন্বয়মাত্র সাধক হয় না। এই উদ্দেশ্যেই [শঙ্করাচার্য] বলছেন, 'অপি চ সতি হি তাবদিতি'।" ২৭২

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শঙ্করাচার্য এখানে "দেহাবসানের পরও চৈতন্যর দেহান্তর প্রাপ্তি সম্ভাবনা" প্রদর্শন করে যে-ভাবে দেহাত্মবাদের পক্ষে ব্যতিরেককেও দোষদুষ্ট বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন,—সমস্ত আত্মবাদীদের রচনাতেই সেই প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্যেরা বিশেষ করে দেহাত্মবাদীদের অন্বয়টিই খণ্ডন করার—বা এই অন্বয়ের ব্যভিচার প্রদর্শন করার—প্রয়াস করেছেন। অর্থাৎ, অন্যেরা বিশেষ করে দেখাতে চেয়েছেন যে শরীরের বিদ্যমানতায়ও চৈতন্য অবিদ্যমান হতে পারে। কিন্তু তাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্যর মতো আরো দেখাতে চাননি যে শরীরের অবিদ্যমানতায়ও চৈতন্য বিদ্যমান হতে পারে।

প্রসঙ্গত অন্যান্য আত্মবাদীদের মধ্যে বিশেষত নৈয়ায়িকদের পক্ষে দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকটি খণ্ডন করার—বা তার ব্যভিচার প্রদর্শন করার—বাস্তবিকই কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ, তাঁদের স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই এ-দাবি করার কোন সুযোগ নেই যে দেহের অবিদ্যমানতায়ও চৈতন্য বিদ্যমান হতে পারে, বা দেহ না-থাকলেও চৈতন্য থাকতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি বিশেষ গুণ মাত্র এবং

২৭২। 'ভামতী', ৩৩৫৪।

এই বিশেষ গুণটি সর্বকালে বা সর্বাবস্থায় আত্মাতে বর্তমান থাকে না। বস্তুত, আত্মাতে এই বিশেষ গুণটি উৎপন্ন হবার পক্ষে কয়েকটি কারণের সমাবেশ প্রয়োজন। এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল দেহ। দেহাশ্রিত—বা, নৈয়ায়িকদের পরিভাষায় দেহাবচ্ছিন্ন—আত্মাতেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। নিরবচ্ছিন্ন—বা, দেহে অনাশ্রিত—আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হতে পারে না। এই কারণেই ন্যায়মতে পরামুক্তির অবস্থায় দেহ রূপ অবচ্ছেদ বা আশ্রয় বিনষ্ট হওয়ায় মুক্ত আত্মা চৈতন্য প্রভৃতি গুণশূন্য হয়ে পাষাণ-সদৃশ হয়। বস্তুতপক্ষে এই মতের সঙ্গে লোকায়তিক দেহাত্ম-বাদের পার্থক্য ঠিক কতটুকু এবং ন্যায়মতে যেহেতু আত্মার গুণগুলিই আত্মার অনুমাপক সেই হেতু ন্যায়মতেই পরামুক্তির অবস্থায় আত্মার অনুমাপক বা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদক কোন হেতু বা লিঙ্গ থাকে কিনা—এজাতীয় প্রশ্ন আপাতত উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে নৈয়ায়িকদের পক্ষে শঙ্করাচার্যর মতো দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকও খণ্ডন করার প্রশ্ন ওঠে না,—অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে দাবি করার সুযোগই নেই যে দেহের অবিদ্যমানতায়ও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম বিদ্যমান হতে পারে, বা, দেহ না থাকলেও চৈতন্য থাকতে পারে।

অবশ্যই শঙ্করাচার্য নিজে যে-ভাবে দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকটি খণ্ডন করার আয়োজন করেছেন তার দুর্বলতাও অস্পষ্ট নয়। বস্তুতপক্ষে, দেহের অবিদ্যমানতায়ও চৈতন্যর বিদ্যমানতা সংক্রান্ত—বা দেহবিহীন চৈতন্য সংক্রান্ত—অন্তত প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ প্রদর্শন করা সম্ভবই নয়; কেননা এজাতীয় নিছক চৈতন্যর প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অথচ, দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকটির প্রকৃত ব্যভিচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এজাতীয় নজিরই প্রদর্শন করার প্রয়োজন। সে-নজির সম্ভব নয় বলেই শঙ্করাচার্য "দেহাবসানের পর আত্মার সঙ্গে চৈতন্যাদি আত্মধর্মর দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্ভাবনা" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যর—তথা আত্মবাদীদের—পক্ষেই কি সত্যিই নিরাপদে দাবি করার সুযোগ আছে যে দেহাবসানের পর আত্মার সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্মগুলিরও দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে? মনে রাখা দরকার যে আত্মবাদীদের মতেই আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি মানেই সজাতীয় জীবদেহ প্রাপ্তি নয়; কর্মফল অনুসারে তা বিজাতীয় জীবদেহও হতে পারে। "অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্, শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা"[২৭৩]—আর যারা এই পৃথিবীতে কুৎসিৎ কর্ম করেছিল তারা শীঘ্রই কুৎসিৎ জন্ম লাভ করে; যেমন, কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি। আপাতত না-হয় চণ্ডালযোনির কথা নাই তোলা গেল; কিন্তু আত্মবাদীদের মতেই

২৭৩। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্', ৫।১০।৭।

দুষ্কৃত কর্মের ফলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তির আত্মাও মৃত্যুর পর কুকুর, শূকর থেকে শুরু করে এমনকি ক্রিমি, কীট প্রভৃতির রূপেও নবদেহ লাভ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, আত্মবাদীদের পক্ষেই আত্মার সঙ্গে চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্মগুলিরও দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্ভাবনা স্বীকার করা বিশেষ কষ্টকল্পনার পরিচায়ক হবে। কেননা, তাহলে মানব-চৈতন্যের সঙ্গে কুকুর, শূকর, ক্রিমি, কীট প্রভৃতির চৈতন্যের তাদাত্ম্য প্রদর্শনের প্রসঙ্গ ঘটবে। অতএব, সংক্ষেপে, শঙ্করাচার্য যে-ভাবে দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকটি খণ্ডন করতে চান তা আত্মবাদীদের পক্ষেই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

কিন্তু সে যাইই হোক, ভারতীয় দর্শনের বাস্তব পরিস্থিতি এই যে সমস্ত আত্মবাদীই শঙ্করাচার্যের মতো দেহাত্মবাদের ব্যতিরেকটিকে খণ্ডন করার উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে তা হয়ত একান্ত-ভাবে প্রয়োজনও নয়। কেননা, আত্মবাদীরা যদি দেহাত্মবাদ সমর্থক অন্বয়টিকেই সার্থক ভাবে খণ্ডন করতে পারেন—বা, এই অন্বয়ের ব্যভিচার প্রদর্শন করতে পারেন—তাহলেই দেহাত্মবাদ নিরসিত হয়। অতএব, আত্মবাদীরা কীভাবে এই অন্বয়টি খণ্ডন করতে চেয়েছেন বর্তমানে তাইই বিচার করা যাক।

আত্মবাদীদের পক্ষে এই অন্বয়ের ব্যভিচার প্রদর্শনের অন্যতম কৌশল হল, মৃতদেহের বা মৃতশরীরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ। মৃতাবস্থায় শরীর বা দেহ বর্তমান হলেও চৈতন্য অবর্তমান, অতএব চৈতন্য শরীরধর্ম বা দেহধর্ম নয়। এবিষয়ে বর্তমানে নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট এবং জৈন গুণরত্নের উক্তি উদ্ধৃত করাই পর্যাপ্ত হবে।

শরীরের সঙ্গে জ্ঞানাদির সম্বন্ধ হয় না—এবিষয়ে কয়েকটি অনুমান প্রদর্শনের পর জয়ন্তভট্ট[২৭৪] বলছেন,

> শরীরং চৈতন্যশূন্যং, শরীরত্বাৎ, মৃতশরীরবৎ।
> —শরীর চৈতন্যশূন্য, কেননা তা শরীর, যেমন মৃতশরীর।

এই উক্তিকে ন্যায়দর্শন সম্মত প্রকৃত অনুমান হিসাবে গ্রহণ করলে এর ব্যাপ্তি হবে: "যত্র যত্র শরীরত্বং তত্র তত্র চৈতন্যশূন্যত্বং"—যেখানেই শরীর সেখানেই চৈতন্যশূন্যত্ব, বা শরীরমাত্রই চৈতন্যশূন্য। ব্যাপ্তিটির

২৭৪। 'ন্যায় মঞ্জরী', (চৌখাম্বা সং), ১।১২। অবশ্য গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে অনুমানটি নিম্নরূপে উক্ত হয়েছে: "চৈতন্যশূন্যং শরীরং শরীরত্বাৎ মৃতশরীরবৎ"। কিন্তু অনুমানটির প্রকৃত রূপ এই হলে তার সাধ্য এবং হেতু উভয়ই হবে "শরীরত্ব" এবং তা স্পষ্টতই অসম্ভব। অতএব, স্পষ্টার্থের প্রয়োজনে আমরা অনুমানটিকে "শরীরং চৈতন্যশূন্যং, শরীরত্বাৎ, মৃতশরীরবৎ"—এই রূপে উদ্ধৃত করেছি।

ব্যভিচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দেহাত্মবাদী অবশ্যই শরীরের জীবিতাবস্থার নজির দেখাবেন। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা সে-ব্যভিচার স্বীকার করবেন না। কেননা তাঁদের মতে চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মারই ধর্ম, শরীরের নয়। ফলে শরীরের জীবিতাবস্থায় যে-চৈতন্যর পরিচয় পাওয়া যায়, তার ধর্মী শরীর নয়, শরীরবাসী আত্মাই। ফলে, নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপরোক্ত ব্যাপ্তিতে কোন বাধা নেই। নিছক শরীর চৈতন্যহীনই। কিন্তু যেহেতু ন্যায়মতেই আত্মার সঙ্গে শরীরের সংযোগ না ঘটলে আত্মায় জ্ঞান বা চৈতন্য নামের ধর্ম উৎপন্ন হতে পারে না, সেইহেতু নৈয়ায়িকেরাও শরীরকেই চৈতন্য উৎপাদনের অন্যতম কারণ বলেই বিবেচনা করতে বাধ্য। অতএব, দেহাত্মবাদী বলতে পারেন, এমনকি নৈয়ায়িকের পক্ষেও শরীরের সঙ্গে চৈতন্যর সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য কোন ব্যাপ্তি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িকদের মতেই যেহেতু শরীর-সংযোগ ছাড়া কুত্রাপি চৈতন্য সম্ভব নয় এবং যেহেতু কুত্রাপিও শরীরশূন্য চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয় না সেইহেতু আলোচ্য ব্যাপ্তির পরিবর্তে বরং দাবি করা যুক্তিযুক্ত: "যত্রযত্র শরীরত্বং তত্র তত্র চৈতন্যং"। কিন্তু এজাতীয় বিচারের অবতারণা পরে করা যাবে। জয়ন্তভট্টর আলোচ্য উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য হল, দেহাত্মবাদীর অভিপ্রেত অন্বয়টিরই ব্যভিচার প্রদর্শন। এবং এই কারণেই তিনি এখানে মৃতশরীরের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদীর বিরুদ্ধে তিনি দেখাতে চান যে মৃতশরীরে শরীরত্ব বর্তমান হলেও চৈতন্য অবর্তমান। অতএব শরীর ও চৈতন্যর মধ্যে অন্বয়ের সম্ভাবনা নেই। অতএব, চৈতন্য, ও দেহর মধ্যে ধর্মধর্মি-ভাব বা কার্যকারণ-ভাব অসম্ভব —অর্থাৎ, দেহাত্মবাদই অসম্ভব।

দেহাত্মবাদীদের অন্বয়-ব্যতিরেকের বিরুদ্ধে জয়ন্তভট্ট অবশ্য আরো বিচারের অবতারণা করেছেন; কিন্তু সেখানে তিনি পূর্বপক্ষ বা দেহাত্মবাদের মূল পরিচিতি হিসাবে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি মতের উল্লেখ করেছেন—আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে তার আলোচনা উত্থাপন করবো। আপাতত অন্য একটি প্রশ্ন বিচার করা যাক।

মৃত শরীরের নজির থেকে কি বাস্তবিকই দেহাত্মবাদের অভিপ্রেত অন্বয়টির ব্যভিচার প্রমাণ হয়? কিংবা, "চৈতন্য শরীরের ধর্ম নয়, কেননা মৃতাবস্থায় শরীর বর্তমান সত্ত্বেও চৈতন্য অবর্তমান"—দেহাত্মবাদীদের বিরুদ্ধে আত্মবাদীদের এই যুক্তির স্বকীয় দার্শনিক মূল্য ঠিক কী বা কতটুকু?

আত্মবাদীদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে দেহাত্মবাদীরা অবশ্যই একটি আপত্তি উত্থাপন করবেন: শব ও শরীর এক নয়, বা মৃতদেহ শরীর-পদবাচ্যই নয়; তাই শবদেহের নজির থেকেই চৈতন্য ও শরীরের মধ্যে

ধর্মধর্মি-ভাব খণ্ডন করা যায় না। দেহাত্মবাদীরা বলবেন, শরীর বা দেহ বলতে তাঁরা ঠিক কী বুঝে থাকেন—এবং কোন্ অর্থে তাঁদের মতে চৈতন্য এই দেহেরই কার্যমাত্র বা ধর্মমাত্র—তা অত্যন্ত স্থূলভাবে অবজ্ঞা না-করে আত্মবাদীদের পক্ষে মৃতশরীরের বা শব-দেহর নজির থেকে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস অবশ্যই ব্যর্থ। কেননা, দেহাত্মবাদের মূল কথা হল, মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলি কোন এক রকম বিশেষ পরিণামের ফলে যে-ভাবে মদশক্তি-সম্পন্ন বা মূর্ছাজননের বিশেষ সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবেই ক্ষিতি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলির কোন এক রকম বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্য নামের বিশিষ্ট শক্তি বা সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শবদেহে সেই বিশেষ পরিণামটির অভাবই সূচিত হয়, যে কারণে শবদেহ ক্রমশই ক্ষিতি প্রভৃতি উপাদানগত ভূতগুলির রূপেই প্রত্যাবর্তন করে। ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের উক্ত বিশেষ পরিণামই দেহ। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ পরিণাম বর্তমান শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্তই প্রকৃত অর্থে দেহ বর্তমান। মৃত্যুকাল থেকেই এই বিশেষ পরিণামের অভাব সূচিত হয়; তাই শব বা মৃতদেহকে দেহাত্মবাদীর অভিপ্রেত অর্থে দেহ বলাই সঙ্গত নয়—যদিও মৃত্যুকালের অব্যবহিত পরে কিছুকাল পর্যন্ত বা সাময়িক ভাবে মৃতদেহেও প্রকৃত দেহের আকারমাত্র অংশবিশেষে অবশিষ্ট থাকে এবং যদিও বা চলতি কথায় শব বা মৃতদেহকেও দেহ আখ্যা দেওয়া হয়। ফলে, মৃতদেহে চৈতন্যাভাবের নজিরকে বস্তুতপক্ষে দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্যর অবিদ্যমানতা বিষয়ক নজির বলা যায় না। তাই আত্মবাদীর পক্ষে মৃতদেহর নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদের অভিপ্রেত অন্বয় খণ্ডন করা—বা তার ব্যভিচার প্রদর্শন করা—সম্ভব নয়।

দেহাত্মবাদী আরো বলতে পারেন. আত্মবাদীদের আচরণেই প্রকাশ যে এমনকি তাঁরাও শব ও শরীরকে সমতুল্য বিবেচনা করেন না। কেননা, তাঁদের নিজেদের বিবেচনাতেই যে-ব্যক্তির পাদস্পর্শে পুণ্য সঞ্চয়ের সম্ভাবনা তারই শবদেহ স্পর্শে প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া, শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর সর্বত্রই লোকযাত্রা নির্ভর করে; কিন্তু শরীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। শঙ্করাচার্য অবশ্য বলেছেন, প্রকৃত দেহধর্মর একটি নিদর্শন হল রূপ; তাই যতক্ষণ দেহ বর্তমান ততক্ষণ রূপও বর্তমান—মৃতদেহেরও রূপ বর্তমান থাকে। কিন্তু শরীরের রূপ ও শবের রূপ অভিন্ন কিনা—একথাও বিচক্ষণেরা বিবেচনা করতে পারেন। যদি তা

অভিন্ন না হয় তাহলে "যতক্ষণ দেহ বর্তমান ততক্ষণ রূপও বর্তমান", এই উক্তিও স্বীকারযোগ্য হবে না।[২৭৫]

কিন্তু আপাতত আমাদের পক্ষে এ জাতীয় বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে দেহাত্মবাদীদের মূল যুক্তির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের বিশেষ পরিণামই দেহ; কিন্তু শবের দৃষ্টান্তে সেই বিশেষ পরিণামের অভাব বলেই শবের নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস ব্যর্থ।

অন্যান্য আত্মবাদীদের মতোই গুণরত্নও দেহাত্মবাদ খণ্ডনে মৃতদেহর নজিরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি দেহাত্মবাদীর পক্ষ থেকে উপরোক্ত আপত্তি আশঙ্কা করে তার একপ্রকার উত্তর দেবারও প্রয়াস করেছেন। গুণরত্ন[২৭৬] বলছেন,

> যদি বল, কায়াকারে পরিণত ভূতসমূহ থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। কেননা, 'কায়াকার থাকলেই চৈতন্য থাকে, মদ্যাঙ্গ থেকে মদ-শক্তির মতো'—ইত্যাদি অনুমানের দ্বারাই চৈতন্যর ভূতকার্যত্ব সিদ্ধ হয়।
>
> কিন্তু তাও অসঙ্গত। কেননা, 'কায়াকার থাকলেই চৈতন্য থাকে'—এই হেতুটিই অনৈকান্তিক (ব্যভিচার দোষদুষ্ট)। কেননা, মৃতাবস্থায় কায়াকার থাকলেও চৈতন্য থাকে না।
>
> [চার্বাক বলবেন,] 'পৃথিবী, অপ্, তেজ এবং বায়ু—এই ভূত-সমুদয় থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়; মৃতশরীরে বায়ু নেই; অতএব বায়ুর অভাববশত চৈতন্যও নেই। সুতরাং ব্যভিচার হয় না'।
>
> [উত্তর] তবে শোন। কোন বস্তু ছিদ্র বিশিষ্ট হলেই তাতে বায়ু থাকে—এরূপ নিশ্চয় করা হয়। [অর্থাৎ, মৃত শরীরও ছিদ্র বিশিষ্ট, অতএব তাতেও বায়ু বর্তমান।] তাছাড়া, মৃত শরীরে বায়ুর অভাব বশতই যদি চৈতন্যর অভাব হয় তাহলে বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ু সম্পাদন

২৭৫। আত্মবাদীদের স্বীয় স্বীকৃতি অনুসারেই যে শব ও শরীর এক নয় এবং উভয় দৃষ্টান্তেই রূপ নামক প্রকৃত দেহধর্মও যে অভিন্ন ভাবে বর্তমান নয়,—এ বিষয়ে অগ্রণী আত্ম-বাদীরই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা অবান্তর হবে না:

গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে।
ভার্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥

—অর্থাৎ, দেহাবসানের পর বায়ু নির্গত হলে এমন কি ভার্যাও সেই দেহ দেখে ভয় পায়!

২৭৬। 'তর্করহস্য দীপিকা', ১৪৪-১৪৬।

করলে (মৃত শরীরে) চৈতন্য হওয়া উচিত। কিন্তু বস্ত্রাদির দ্বারা বায়ু সম্পাদন করলে (মৃত শরীরে) চৈতন্য দেখা দেয় না।

যদি চার্বাক বলেন, "প্রাণ-অপান রূপ বায়ুর অভাববশত মৃতশরীরে চৈতন্য নেই"—তাও ঠিক হবে না। কেননা, প্রাণ-অপান বায়ুর সঙ্গে চৈতন্যর অন্বয়-ব্যতিরেক না-থাকায় চৈতন্যর প্রতি (প্রাণ-অপান বায়ুর) হেতুতা বা কারণতা নেই। যেহেতু, মরণাদি অবস্থায় প্রচুর দীর্ঘশ্বাস-উচ্ছ্বাস থাকলেও চৈতন্য অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [মরণ কালে শ্বাস-উচ্ছ্বাস থাকলেও চৈতন্য ক্ষীণ হয়; অতএব প্রাণ-অপান বায়ুর সঙ্গে চৈতন্যর অন্বয় অসম্ভব।] তাছাড়া, ধ্যানস্তিমিত লোচন সংবৃত মনোবাক্‌কায়-যোগ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো অবস্থিত যোগীর প্রাণ-অপান বায়ু নিরুদ্ধ হলেও চেতনার পরম উৎকর্ষ হতে দেখা যায়। [যোগীর প্রাণ-অপান বায়ু নিরুদ্ধ হলেও চৈতন্যর উৎকর্ষ হয়; অতএক প্রাণ-অপান বায়ুর সঙ্গে চৈতন্যর ব্যতিরেকও সম্ভব নয়।]

যদি বল, তেজের অভাবে মৃত অবস্থায় চৈতন্য থাকে না তাহলে সেখানে (অর্থাৎ, মৃত শরীরে) যদি তেজ নিয়ে যাওয়া হয় তাহলেও কেন চৈতন্য দেখা যায় না?

উপরন্তু, মৃত অবস্থায় বায়ু ও তেজের অভাবে যদি চৈতন্যর অভাব স্বীকার কর তাহলে মৃতশরীরে কিছুক্ষণ পরে সমুৎপন্ন ক্রিমি প্রভৃতির চৈতন্য কীরূপে দেখা দেয়? অতএব, এ-সব উক্তি যৎসামান্যই।

আরো বলছি, ভূতমাত্রই চৈতন্যর কারণ নয়। যদি তাইই হতো তাহলে চৈতন্যর ভূতমাত্রজন্যত্ব স্বভাব হতো এবং ভূত সকলেরও চৈতন্যজননত্ব স্বভাব হওয়ায় সর্বদা সর্বত্র পুরুষাদির ন্যায় ঘটাদিতেও চৈতন্যর প্রকাশ হতো। কেননা, কারণের বিশেষ নেই। [অর্থাৎ ভূতই যদি চৈতন্যর কারণ হয় তাহলে যেহেতু শরীরের উপাদান হিসাবে ভূত এবং ঘটাদির উপাদান হিসাবে ভূত একই বা সমানই, সেইহেতু উভয়ের পক্ষেই চৈতন্যর সমান কারণ হবার প্রসঙ্গ ঘটে।] ফলে, ঘটাদির ও পুরুষের অবিশেষের (বা পার্থক্যহীনতার বা বৈশিষ্ট্য-হীনতার) আপত্তি হয়।

[চার্বাক বলবেন,] "আমরা পূর্বেই বলেছি যে প্রাণ-অপান বায়ু যুক্ত কায়াকারে পরিণত ভূতসকল থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অতএব, পূর্বোক্ত অতিপ্রসঙ্গ দোষের অবকাশ নেই।" [অর্থাৎ আমাদের মতে ভূত সকল শুধুমাত্র কায়াকারে পরিণত হলেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অতএব এই ভূতসকলই ঘটাকার প্রভৃতিতে পরিণত হলে চৈতন্য উৎপত্তির প্রসঙ্গ হয় না।]

[উত্তরে গুণরত্ন বলছেন,] তোমরা একথাও বলতে পারো না।

কেননা, তোমাদের অভিপ্রেত কায়াকারে পরিণামই উৎপন্ন হয় না। [অর্থাৎ, চার্বাকপক্ষ থেকে "কায়াকারে পরিণাম" নামক ঘটনাটিরই কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।] কেননা, এই কায়াকারে পরিণাম (তোমাদের মতে) কি—

১ ॥ পৃথিব্যাদি ভূতমাত্র নিবন্ধন? [শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূত থেকেই ঘটে?] না,

২ ॥ তা অন্যবস্তু নিমিত্তক? না,

৩ ॥ তা অহেতুক?

এই তিনটি পক্ষই বর্তমান। [অর্থাৎ চার্বাকদের পক্ষে কায়াকারে পরিণামের ব্যাখ্যা হিসাবে শুধুমাত্র এই তিনটির মধ্যে কোন একটি কথা বলা সম্ভব—এছাড়া কোন চতুর্থ ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের সুযোগ নেই। কিন্তু গুণরত্ন দেখাবেন, চার্বাকদের পক্ষে উপরোক্ত তিনটির মধ্যে একটি ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।]

১ ॥ এর মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগুলি সর্বত্র বর্তমান থাকায় সর্বত্রই কায়াকারে পরিণামের প্রসঙ্গ হয়। [অর্থাৎ, চার্বাক বলতে পারেন না যে শুধুমাত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগুলিই উক্ত কায়াকারে পরিণামের কারণ। কেননা এই ভূতগুলি সর্বত্রই বর্তমান এবং শুধুমাত্র এগুলিই যদি কায়াকারে পরিণামের কারণ হয় তাহলে সর্বত্রই কায়াকারে পরিণাম পরিদৃষ্ট হবার কথা।]

[উত্তরে চার্বাক বলতে পারেন,] তথাবিধ সাম্যাদিভাব রূপ সহকারী কারণ না-থাকায় সর্বত্র ওই প্রসঙ্গ হয় না। [অর্থাৎ, চার্বাক বলতে পারেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগুলি সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও সর্বত্রই সেগুলি কায়াকায়ে পরিণত হয় না। কেননা, ভূতগুলিই কায়াকারে পরিণামের কারণ হলেও সেগুলির পক্ষেই কায়াকারে পরিণত হবার জন্য "সাম্যাদিভাব" (*proportion?*) নামের সহকারিকারণও স্বীকার্য। যেমন, বহ্নিই ধূমের কারণ; কিন্তু তপ্ত অয়ঃপিণ্ডে বহ্নি বর্তমান সত্ত্বেও ধূম পরিদৃষ্ট হয় না; তার জন্য "আর্দ্র-ইন্ধন-সংযোগ" নামের সহকারিকারণও প্রয়োজন। তেমনি, "সাম্যাদিভাব" নামের সহকারিকারণ যেখানে বর্তমান সেখানে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগুলি কায়াকারে পরিণত হয়; যেখানে এই সহকারী কারণ অবর্তমান সেখানে ভূতগুলির কায়াকারে পরিণাম পরিদৃষ্ট হয় না।

[উত্তরে গুণরত্ন বলছেন,] একথাও বলতে পারো না। কেননা (তোমার মতেই) সেই "সাম্যাদিভাবের" কারণ হিসাবে কোন অতিরিক্ত বস্তু নেই—তাহলে তত্ত্বান্তর হবার আপত্তি হয়। কিন্তু

পৃথিব্যাদি ভূতের সত্তামাত্রই তার (সাম্যাদিভাবের) কারণ। কাজেই সেই সাম্যাদিভাবও সর্বত্রই সমানভাবে থাকায় সহকারিকারণ নেই—একথাও বলা যায় না। [অর্থাৎ, চার্বাকমতে তো শুধুমাত্র পৃথিব্যাদি ভূতই তত্ত্ব। তাই চার্বাকের পক্ষে উক্ত "সাম্যাদিভাবের" কারণ হিসাবে পৃথিব্যাদি ভূত অতিরিক্ত আর কোন তত্ত্বই স্বীকার করা সম্ভব নয়—স্বীকার করতে গেলে চার্বাকের মূল দার্শনিক মতই প্রত্যাখ্যাত হবে। এই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতই যদি উক্ত "সাম্যাদিভাব" নামের সহকারিকারণটিরও কারণ হয় তাহলে সর্বত্রই পৃথিব্যাদি ভূতের বর্তমানতা বশতই উক্ত সাম্যাদিভাবেরও বর্তমানতা স্বীকার্য হবে। অতএব, কোথাও উক্ত সহকারিকারণের অভাব প্রদর্শিত হবে না। তাই চার্বাক বলতে পারেন না যে দৃষ্টান্ত বিশেষে সহকারিকারণের অভাব বশতই কায়াকারে পরিণামের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, চার্বাকমতে যেহেতু পৃথিব্যাদি ভূতই উক্ত সহকারিকারণেরও কারণ এবং পৃথিব্যাদি ভূত যেহেতু সর্বত্রই বর্তমান সেইহেতু সর্বত্রই কায়াকারে পরিণামও পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত।]

২॥ [উক্ত কায়াকারে পরিণাম] অন্য বস্তুনিমিত্তক—এই পক্ষটিও যুক্তিযুক্ত নয়। তা স্বীকার করলে আত্মসিদ্ধির প্রসঙ্গ হয়। [অর্থাৎ, চার্বাক দাবি করতে পারেন না যে পৃথিব্যাদি ভূত ছাড়াও অন্য কোন বস্তু কায়াকারে পরিণামের প্রকৃত কারণ। কেননা, ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলতে আত্মাই; ফলে এই পক্ষে আত্মাই সিদ্ধ হয়, পরিত্যক্ত হয় দেহাত্মবাদই।]

৩॥ যদি বল, [কায়াকারে পরিণাম] অহেতুক তাহলে সর্বদা [কায়াকারে পরিণামের] উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়। কারণ, "হেতু-অন্য-অনপেক্ষ হওয়ায় নিত্য সত্তা বা অসত্তা হয়"—ইত্যাদি বলা হয়েছে। [অর্থাৎ, কায়াকারে পরিণামের যদি কোন নির্দিষ্ট হেতু বা কারণ না থাকে তাহলে একদিকে যেমন সর্বত্রই কায়াকারে পরিণামের সম্ভাবনা ঘটবে অপরদিকে তেমনি কুত্রাপি কায়াকারে পরিণামের সম্ভাবনা ঘটবে না।]

কাজেই তোমার মতে কায়াকারে পরিণাম সঙ্গত হয় না। কায়াকারে পরিণামের অভাবে প্রাণাপান বায়ু যোগ ইত্যাদি সুদূর-পরাহত। অতএব চৈতন্য ভূতের কার্য নয় এবং তা জীবেরই গুণ—একথা স্বীকার করতে হবে।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে গুণরত্ন অবশ্য আরো নানা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

কিন্তু প্রথমে উপরোক্ত যুক্তিগুলির গুরুত্ব বিচার করা যাক। অন্যান্য আত্মবাদীদের মতোই গুণরত্ন এখানে মূলতই দেখাতে চান যে দেহাত্মবাদের পক্ষে অন্বয়টি দোষদুষ্ট। কেননা, মৃত শরীরের দৃষ্টান্তে দেখা যায় শরীর বর্তমান সত্ত্বেও চৈতন্য অবর্তমান; অতএব চৈতন্য শরীরেরই ধর্ম নয় বা শরীরেরই কার্য নয়। কিন্তু গুণরত্নর উপরোক্ত রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে আত্মবাদীর এই যুক্তির বিরুদ্ধে চার্বাকপক্ষ থেকে কী উত্তর উদ্ভাবন করা সম্ভব তা তিনি নিজেই উল্লেখ করতে চেয়েছেন এবং সে উত্তরের অন্তঃসার-শূন্যতাও প্রদর্শনের প্রয়াস করেছেন।

চার্বাকের মূল কথা হবে, পৃথিবী প্রভৃতি ভূতের কোন একরকম বিশেষ পরিণামের ফলেই দেহ এবং সেই দেহই চৈতন্যবিশিষ্ট—যেমন মদ্যাঙ্গগুলির কোন একরকম বিশেষ পরিণামের ফলেই মদ্য এবং সেই মদ্যই মদশক্তি বিশিষ্ট। কিন্তু মৃতাবস্থায় উক্ত বিশেষ পরিণামের অভাব ঘটে। মৃতদেহ এবং দেহ তাই সমান নয়। যে-কারণে দেহ চৈতন্য বিশিষ্ট হয় সেই কারণটির অভাবেই মৃতদেহ চৈতন্যহীন। অতএব, চার্বাক বলবেন, মৃতদেহর নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের প্রয়াস নিরর্থক।

চার্বাকদের এজাতীয় কথার উত্তরে গুণরত্ন মূলত দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রথমত, চার্বাকেরা দেহ এবং মৃতদেহর মধ্যে বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে দাবি করতে পারেন না যে মৃতদেহে দেহগঠনের পক্ষে অপরিহার্য কোন উপাদানের—যথা, বায়ু বা তেজের—অভাব ঘটে, এবং এই কারণেই দেহ চৈতন্যবিশিষ্ট হলেও মৃতদেহ চৈতন্যহীন।

দ্বিতীয়ত, চার্বাকদের স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতের বিশেষ পরিণাম—বা, কায়াকারে পরিণাম—নামক ঘটনাটিরই কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

গুণরত্নর এই যুক্তিদুটির তাৎপর্য দেখা যাক।

দেহাত্মবাদীর মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুই দেহের মূল উপাদান। অতএব, মৃতদেহে যদি এই চতুর্ভূতের মধ্যে কোন এক বা একাধিক ভূতের অভাব প্রমাণিত হয় তাহলে মৃতদেহকে দেহের সমতুল্য বিবেচনা করা যাবে না; ফলে মৃতদেহে চৈতন্যর অভাবই প্রত্যাশিত হবে। এই কারণে চার্বাক হয়ত দেখাতে চাইবেন যে মৃতদেহে চতুর্ভূতের মধ্যে কোন-না-কোন ভূতের অভাব ঘটে। কোন্ ভূতের? বায়ুর বা তেজের। কেননা, মৃতদেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচয় নেই এবং জীবদেহের মতো উত্তাপেরও পরিচয় নেই। অতএব, স্বীয় পক্ষ সমর্থনে চার্বাক বলতে পারেন,

ক॥ মৃতদেহে বায়ুর অভাববশতই চৈতন্যর অভাব ঘটে। বা,

খ ॥ মৃতদেহে তেজের অভাববশতই চৈতন্যর অভাব ঘটে।

এজাতীয় দাবির বিরুদ্ধে গুণরত্ন নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করছেন—

১ ॥ মৃতদেহে বায়ুর অভাব বাস্তবিকই প্রমাণিত হয় না। কেননা, ছিদ্রবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই বায়ু বর্তমান। মৃতশরীর ছিদ্রবিশিষ্ট—মৃতশরীরে নাক, মুখ প্রভৃতি ছিদ্র আছে। অতএব মৃতশরীরেও বায়ু বর্তমান।

২ ॥ বায়ুর অভাব বশতই যদি মৃতশরীরে চৈতন্যব অভাব হয় তাহলে শবদেহের উপর হাওয়া দিলে সেই অভাব পূর্ণ হবার—অতএব চৈতন্যরও পুনরাবির্ভাব হবার—কথা। কিন্তু কাপড় নেড়ে শবদেহের উপর হাওয়া দিলেও শবদেহে চৈতন্যর পুনরাবির্ভাব হয় না।

৩ ॥ চার্বাকেরা বলতে পারেন, এখানে বায়ু শব্দ রূঢ় বা পারিভাষিক অর্থে গ্রহণীয়। অর্থাৎ, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে-বায়ুর পরিচয় পাওয়া যায়—যাকে বলা হয় প্রাণাদি বায়ু—বায়ু বলতে এখানে তাইই বোঝা দরকার। মৃতদেহে প্রাণাদি বায়ুর অভাব ঘটে, কেননা মৃতদেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণেই মৃতদেহ চৈতন্যহীন। কিন্তু গুণরত্ন বলছেন, চার্বাকদের এই যুক্তিও স্বীকার্য নয়। কেননা, প্রাণাদি বায়ুর সঙ্গে চৈতন্যর অন্বয়-ব্যতিরেক নেই। অর্থাৎ, প্রাণাদি বায়ুর বর্তমানতায়ই চৈতন্য বর্তমান (অন্বয়) এবং প্রাণাদি বায়ুর অবর্তমানতায় চৈতন্য অবর্তমান (ব্যতিরেক)—উভয়ই অস্বীকার্য। অন্বয়টির ব্যভিচার হিসাবে গুণরত্ন দেখাচ্ছেন, মৃত্যুকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণাদি বায়ুর) প্রাচুর্য সত্ত্বেও চৈতন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ব্যতিরেকটিরও ব্যভিচার হিসাবে গুণরত্ন দেখাচ্ছেন, যোগাবস্থায় যোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যর বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে। তাই প্রাণাদি বায়ুই চৈতন্যর কারণ নয়। মৃতদেহে প্রাণাদি বায়ুর অভাবই চৈতন্যাভাবের কারণ নয়।

৪ ॥ চার্বাক দাবি করতে পারেন না যে তেজের অভাববশতই মৃতদেহ চৈতন্যহীন; কেননা তাহলে মৃতদেহে অগ্নি সংযোগের সময় কেন চৈতন্যর বিকাশ হয় না?

৫ ॥ উপরন্তু, মৃতদেহে বায়ু ও তেজের অভাবই যদি চৈতন্যাভাবের কারণ হয় তাহলে এই অভাব সত্ত্বেও কিছু পরে মৃতদেহ থেকেই উৎপন্ন ক্রিমি প্রভৃতির চৈতন্য কী ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

উপরোক্ত যুক্তিগুলির মধ্যে পঞ্চম যুক্তিটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। প্রথমে এটির তাৎপর্যই বিচার করা যাক। মৃতদেহে কালক্রমে ক্রিমি-কীট প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে মৃতদেহই এই ক্রিমি-কীট উৎপত্তির কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—বিশেষত পাস্তুরের গবেষণার ফলে—এই বিশ্বাস পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পক্ষে এ-বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের নজির উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।

কেননা, আগেই বলেছি, দেহাত্মবাদ সংক্রান্ত বিতর্কটি প্রথমে ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসারেই এবং যথাসম্ভব ভারতীয় দর্শনের পরিভাষাতেই আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের কোথাওই অবশ্য এই ইঙ্গিত নেই যে দেহাত্মবাদীরা মৃতদেহকেই ক্রিমি-কীট উৎপত্তির কারণ বিবেচনা করতেন বা এই নজিরটির উপর নির্ভর করেই তাঁরা দেহাত্মবাদ প্রতিপাদনের প্রয়াস করতেন। একথাও সুবিদিত যে আধুনিক বস্তুবাদীরা মৃতদেহে ক্রিমি-কীট প্রভৃতি পরিদর্শনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা স্বীকার করেও দেহাত্মবাদ সমর্থন করতে পারেন।[২৭৭]

২৭৭। এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতি—বিশেষত সেই পরিস্থিতি সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার সম্ভাবনা—সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় (Operin 1-28, Beck 108ff. দ্রষ্টব্য)।

আমাদের দেশের প্রাচীন চিন্তাশীলদের মতোই অ্যারিস্টট্ল্, নিউটন. দেকার্থস্—এমন কি উইলিয়াম্ হার্ভে—মনে করতেন যে গলিত শবদেহ বা মাংসপিণ্ড প্রভৃতি থেকেই ক্রিমি-কীট প্রভৃতি প্রাণী বস্তুত উৎপন্ন হয়। এই মতের মূল কথা হল, নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণী সৃষ্ট হয়; মতটি তাই য়ুরোপে "স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিবাদ" বা Doctrine of Spontaneous Generation নামে পরিচিত। জীবকোষ ও জীবাণু আবিষ্কারের পর এই মত প্রসঙ্গে বিতর্ক তীব্র রূপ গ্রহণ করে। কেননা, অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে মণ্ড বা কাথ (broth) আঢাকা অবস্থায় থাকলে কালক্রমে তা অজস্র জীবাণুর উপনিবেশে পরিণত হয়। এই জীবাণু কি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মণ্ড বা কাথ থেকে উৎপন্ন? ফাদার নীড্হাম প্রমুখর মতে বাস্তবিকই তাই। কিন্তু স্পাল্লান্জানি—এবং বিশেষত পাস্তর—পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করেন, কাথ বা মণ্ডতে যে-জীবাণু কালক্রমে পরিদৃষ্ট হয় তা বস্তুতপক্ষে স্থানান্তর থেকে বাতাসে পরিবাহিত হয়ে আসে এবং আঢাকা কাথ বা মণ্ডের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সেখানেই বংশবৃদ্ধি করে। তাই, জীবাণুশূন্য মণ্ড যদি এমন পাত্রর মধ্যে রাখা যায় যেখানে বাতাস প্রবেশ করলেও সে-বাতাস জীবাণুশূন্য হতে বাধ্য তাহলে সেই মণ্ডতে কালক্রমে জীবাণু পরিদৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে পাস্তরের পরীক্ষা সহজ ও সরল হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তকারী এবং তাঁর পরীক্ষার ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়েছে যে গলিত শবদেহ থেকেই কালক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিমিকীট প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে, গলিত শবদেহে কালক্রমে যে-ক্রিমিকীট প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয় তা মণ্ডতে পরিদৃষ্ট জীবাণুপুঞ্জর মতোই বস্তুত পক্ষে বহিরাগত। এই অর্থে আধুনিক বিজ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্তদের চূড়ান্ত নিরসন ঘটেছে।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে জড়পদার্থ বা ভূত সমূহ থেকে কোনকালে বা কোন অবস্থাতেই প্রাণের—বা সজীব পদার্থর—উদ্ভব একান্তই অসম্ভব। মনে রাখা দরকার. স্বয়ং পাস্তরও সে-দাবি করেননি। পক্ষান্তরে

Pasteur freely acknowledged the possibility that living bacteria very well might be arising anew from inanimate matter (Beck 109).

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, যদি সুদূর অতীতে নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থর জটিল পরিণামের ফলে সজীব পদার্থর বা প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে

কিন্তু আপাতত দ্রষ্টব্য এই যে লোকায়তিকেরা মৃতদেহ থেকেই ক্রিমি-কীট প্রভৃতির উৎপত্তির সম্ভাবনা মানুন-আর-নাই-মানুন, আত্মবাদী গুণরত্নর পক্ষে এই নজিরের উপর কোনপ্রকার গুরুত্ব আরোপ করা মোটেই নিরাপদ হবে না। কেননা, তাঁর মতে—তথা আত্মবাদীমাত্রের মতেই—মৃতদেহ চৈতন্যশূন্য জড়বস্তুমাত্র। একথা স্বীকার না করলে দেহাত্মবাদীর বিরুদ্ধে শবদেহের নজির প্রদর্শন করাই নিরর্থক হবে। কিন্তু এ-হেন চৈতন্যহীন জড়বস্তুমাত্র থেকেই যদি চৈতন্যবিশিষ্ট ক্রিমি প্রভৃতির উৎপত্তি স্বীকৃত হয় তাহলে তো প্রকৃতপক্ষে ভূতচৈতন্যবাদের প্রসঙ্গই ঘটবার কথা, অর্থাৎ স্বীকৃত হবার কথা যে চৈতন্যহীন জড়বস্তুমাত্র থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়,—বা, অচেতন পদার্থই চেতনপদার্থের কারণ। অর্থাৎ, ভূতচৈতন্যবাদী মাত্রেই গুণরত্ন-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি স্বীকার করতে বাধ্য না-হলেও, বা ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষে শবদেহে ক্রিমি দর্শনের স্বতন্ত্র কারণ স্বীকার করবার সুযোগ থাকলেও—এবং তাঁর অভিপ্রেত ভূতচৈতন্যবাদকে অন্যান্য যুক্তি ও দৃষ্টান্তর সাহায্যে প্রমাণ করবার অবকাশ সত্ত্বেও—গুণরত্ন-মতে যদি শবদেহই কালক্রমে চৈতন্যযুক্ত ক্রিমি-কীট প্রভৃতি উৎপত্তির প্রকৃত কারণ হয় তাহলে তাঁর পক্ষে আত্মবাদ পরিহারের এবং ভূতচৈতন্য-বাদ গ্রহণেরই প্রসঙ্গ ঘটে। ফলে উপরোক্ত পাঁচটি যুক্তির মধ্যে পঞ্চম যুক্তিটি দেহাত্মবাদ খণ্ডনে প্রযুক্ত হলেও বস্তুতপক্ষে আত্মবাদের বিরুদ্ধেই গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং এই কারণে গুণরত্নর পক্ষে উক্ত যুক্তি উত্থাপন করা সত্যিই নিরাপদ হয়নি।

অতএব, এই পঞ্চম যুক্তির কথা আপাতত ছেড়ে দেওয়া যাক। কিন্তু দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বাকি চারটি যুক্তির সার্থকতা কতটুকু? এই প্রশ্নর উত্তরও অস্পষ্ট নয়। দেহাত্মবাদের অত্যন্ত বিকৃত ব্যাখ্যা না করলে এই চারটি যুক্তির একটিও দেহাত্মবাদীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না।

তাহলে বর্তমান কালেও সমতুল্য পরিবেশে একই ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় না কেন? ১৮৭১ খৃস্টাব্দেই চার্লস্ ডারউইন এ-প্রশ্নর মূল উত্তর দিয়েছিলেন :

It is often said that all the conditions for the first production of a living organism are now present, which could ever have been present. But if (and oh! what a big if) we could conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light. heat, electricity, etc., present, that a protein compound was chemically formed ready to undergo still more complex changes, at the present day, such matter would be instantly devoured or absorbed, which would not have been the case before living creatures were formed. (Quoted by Morgulis in Intro. to Oparin. p. x).

অতএব আধুনিক আত্মবাদী বা দেহাত্মবাদ-বিরোধীর পক্ষে পাস্তুরের পরীক্ষার নজির দেখানো নিরর্থক হবে। এ বিষয়ে ওপারিন্-এর উক্তি উদ্ধৃত করা যায় :

কেননা, দেহাত্মবাদীর বক্তব্য নিশ্চয়ই এই নয় যে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর যে-কোন প্রকার মিলিতাবস্থা বা সংমিশ্রণ থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে চতুর্ভূতের কোন একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকলে লোকায়তিকেরা অনায়াসেই বলতে পারতেন যে জড়পদার্থগুলির যে-কোন যান্ত্রিক সংযোগই চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহের কারণ নয়, যদিও এগুলিরই কোন একপ্রকার রাসায়নিক পরিণাম থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। অবশ্য আমাদের লোকায়তিকেরা—তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকেরা—আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে রাসায়নিক পরিণামের প্রকৃত রহস্য অনেক পরবর্তী কালেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তুলনায় জড়পদার্থ সংক্রান্ত প্রাচীন বস্তুবাদীর জ্ঞানও ছিল যৎসামান্যই। সংক্ষেপে, সুদীর্ঘ শতাব্দী-পরম্পরার গবেষণা উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ আজ যে-জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে লোকায়তিকদের কাছে তা প্রত্যাশা করার প্রশ্ন ওঠে না। তবুও,—বিশেষত প্রাচীন কালের পরিপ্রেক্ষায়—লোকায়তিকদের মন্তব্যটুকুর প্রকৃত গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁরা বারবার যে-মদশক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন,—এবং যে-মদশক্তির দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেই তাঁরা দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন—তার তাৎপর্য প্রকৃতই গভীর। কেননা, এই দৃষ্টান্তটি বিচার করলেই বোঝা যায় যে সেকালের সামর্থ্য অনুসারে বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনের ফলে তাঁরা অবশ্যই একটি অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মের আভাস পেয়েছিলেন: কিণ্ব প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলির স্বতন্ত্র বা মিলিত অবস্থায় যে-গুণের বা যে-শক্তির বা যে-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না

By his experiments Pasteur demonstrated beyond peradventure of doubt the impossibility of autogeneration of life in the sense as it was imagined by his predecessors. He showed that living organisms cannot be formed suddenly before our eyes from formless solutions and infusions. A careful survey of the experimental evidence reveals, however, that it tells nothing about the impossibility of generation of life at some other or under some other conditions. (Oparin 29).

এবং ডারউন্-এর পূর্বোদ্ধৃত যুক্তি অনুসারেই তিনি বলছেন,

Another condition essential for the origin of life is the possibility of prolonged transformations, of prolonged evolution of the primary organic substances...At the present time such a transformation is entirely out of the question because, if organic substance originated anywhere on the Earth's surface, it will extremely rapidly devoured and destroyed by the countless micro organisms inhabiting the soil, air and water. But before life had yet appeared, the Earth, of

এ গুলিরই কোন একরকম বিশেষ পরিণামের ফলে সেই গুণ বা সেই শক্তির উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়ে থাকে। এবং বিশেষ করে এই পরিদর্শনের উপর নির্ভর করেই তাঁরা জড়দেহে চৈতন্যর ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডে চৈতন্যর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁদের এই ব্যাখ্যাটুকুই পর্যাপ্ত নয়—পর্যাপ্ত হবার কথাও নয়। তবুও তাঁদের সেই ব্যাখ্যা তুচ্ছ নয়; কেননা, সেকালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনিবার্য দৈন্য সত্ত্বেও তাঁদের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক্‌-নির্ণয় সূচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গ পরে আবার উত্থাপিত হবে। আপাতত, দেহাত্মবাদীর বিরুদ্ধে গুণরত্ন-প্রযুক্ত প্রথম চারটি যুক্তির সার্থকতা বিচার করা যাক।

বিশেষত মনে রাখা দরকার যে যাঁরা বারবার মদশক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাছে অবশ্যই একথা সুবিদিত ছিল যে মদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলিকে যে-কোন প্রকারে একত্রিত করলেই মদশক্তিবিশিষ্ট পানীয় উৎপন্ন হয় না; এগুলির কোন একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলেই তা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, পৃথক্ অবস্থায়—বা এমনকি মিলিতাবস্থাতেও—এই উপকরণগুলি মদশক্তিবিহীন হলেও, কোন একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে এগুলিই মদশক্তিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উপকরণ পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি প্রসঙ্গেও দেহাত্মবাদীর এই কথাই। বস্তুতপক্ষে, লোকায়ত-মতের বর্ণনা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য, জয়ন্তভট্ট, প্রভৃতি দার্শনিকেরা লোকায়তিকদের এই মূল দাবিটি সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। শঙ্করাচার্য বলছেন, "পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য বস্তুগুলিতে মিলিতাবস্থায় বা স্বতন্ত্রাবস্থায় (সমস্তব্যস্তেষু) চৈতন্য পরিদৃষ্ট না-হলেও এই পৃথিবী প্রভৃতি ভূতই শরীরাকারে পরিণত হলে তাতে

---

course, was entirely sterile and the organic substances which were formed could evolve in many different directions for a long period of time (Oparin 62-3).

অতএব, সংক্ষেপে, গলিত শবদেহে ক্রিমি-কীট প্রভৃতি পরিদর্শনের—বা জীবাণুশূন্য মণ্ড বা কাথে কালক্রমে জীবাণু পরিদর্শনের—প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিবাদ গ্রহণের সুযোগ না-থাকলেও অচেতন জড়পদার্থ থেকেই পৃথিবীতে জীবের আদি-উৎপত্তি অস্বীকার করারও কারণ নেই। অর্থাৎ, মৃতদেহে কালক্রমে ক্রিমি-কীট প্রভৃতি পরিদর্শনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রহণ করেও আধুনিক বস্তুবাদীর পক্ষে ভূতচৈতন্যবাদের মূল দাবি—অর্থাৎ জড়পদার্থ থেকেই জীবের উৎপত্তি সংক্রান্ত দাবি—বৈজ্ঞানিক নজিরের সাহায্যেই সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগ বর্তমান। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, আধুনিক বস্তুবাদীর পক্ষে জড়পদার্থ হিসাবে প্রাচীন লোকায়তিকদের পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতমাত্রই স্বীকার্য নয়, শতাব্দী পরম্পরার গবেষণা উত্তীর্ণ হয়ে জড়পদার্থ সংক্রান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে এবং আগামীকালের গবেষণা এ বিষয়ে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

চৈতন্যর উদ্ভব হয়। অতএব বিজ্ঞান (চৈতন্য) মদশক্তির মতোই।” জয়ন্তভট্ট বলছেন, “বিশেষ পরিণামের ফলে জড়পদার্থাবলী অতিশয় শক্তিসম্পন্ন হলে সেগুলিই জ্ঞানযুক্ত হয়; যেমন গুড়, পিষ্ট প্রভৃতিতে পূর্বে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিই সুরারূপে পরিণত হলে মদশক্তি-বিশিষ্ট হয়।

এই কথাটি মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে দেহাত্মবাদ খণ্ডনো পক্ষে গুণরত্ন-প্রযুক্ত উপরোক্ত প্রথম চারটি যুক্তির মূল্য বস্তুত তুচ্ছ। মৃতশরীরে হাওয়া দিয়ে বা অগ্নি-সংযোগ করে চৈতন্য ফিরিয়ে আনা যায় না; এবং দেহাত্মবাদীর মতেই তা ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ হয় না। কেননা, চতুর্ভূতের যে-বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ, সেই বিশেষ পরিণামের অভাব-বশতঃই মৃতদেহ চৈতন্যহীন। কৃত্রিমভাবে মৃতদেহে হাওয়া দিয়ে বা অগ্নিসংযোগ করে এই বিশেষ পরিণাম ফিরিয়ে আনার কথাই ওঠে না। মৃতদেহ ছিদ্রবিশিষ্ট বলে মৃতদেহেও বায়ু বর্তমান,—এই যুক্তি যেমন দেহাত্মবাদীর মূল বক্তব্য স্পর্শ করতে পারে না, তেমনিই প্রাণাদি বায়ুর সঙ্গে চৈতন্যর প্রকৃত অন্বয়-ব্যতিরেক বর্তমান কিনা—এই আলোচনাও দেহাত্মবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিচারে স্পষ্টতই অবান্তর।

সংক্ষেপে, দেহাত্মবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে গুণরত্ন প্রথমে যে-পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করেছেন তার মধ্যে পঞ্চম যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য আত্মবাদীর পক্ষেই মারাত্মক এবং প্রথম চারটি যুক্তি দেহাত্মবাদের বিচারে বস্তুত অর্থান্তর। কিন্তু এই যুক্তিগুলির পরেই দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে গুণরত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিচার উপস্থিত করেছেন এবং তার তাৎপর্য কিছুটা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

গুণরত্ন বলছেন, শুধুমাত্র ভূতবস্তুকেই চৈতন্যর কারণ বলা যায় না,—ভূতমাত্রই চৈতন্যর কারণ হতে পারে না। কেননা, তাহলে চৈতন্যর ভূতমাত্রজন্যত্ব স্বভাব হোতো এবং ভূতগুলিরও চৈতন্যজনকত্ব স্বভাব হোতো। ফলে সর্বদা ও সর্বত্রই পুরুষাদির ন্যায় ঘটাদিতেও চৈতন্যর প্রকাশ হতো। অর্থাৎ, শুধুমাত্র চতুর্ভূতই যদি চৈতন্যর কারণ হয় তাহলে চতুর্ভূতমাত্রের বর্তমানতায়ই চৈতন্যর প্রকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। ঘটাদির দৃষ্টান্তেও চতুর্ভূত বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘটাদি চৈতন্যশূন্য। পক্ষান্তরে, শুধুমাত্র পুরুষাদির দৃষ্টান্তেই—অর্থাৎ শুধুমাত্র জীবদেহের দৃষ্টান্তেই—চৈতন্যর পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পুরুষাদি ও ঘটাদি উভয় দৃষ্টান্তেই চতুর্ভূত বর্তমান; শুধুমাত্র চতুর্ভূতই যদি চৈতন্যর কারণ হয় তাহলে উভয় দৃষ্টান্তেই চৈতন্য পরিদৃষ্ট হবার কথা; কিন্তু শুধু পুরুষাদির দৃষ্টান্তেই চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয়, ঘটাদির দৃষ্টান্তে চৈতন্য

পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব, নিছক চতুর্ভূতই চৈতন্যর কারণ নয়; পুরুষাদির দৃষ্টান্তে চৈতন্যর প্রকৃত কারণ হিসাবে নিছক চতুর্ভূত ছাড়াও অন্য কিছু অবশ্য স্বীকার্য।

উত্তরে দেহাত্মবাদী অবশ্য বলবেন, ঘটাদিতে চৈতন্যর প্রকাশ হয় না; কেননা ভূতসমূহের যে-বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, ঘটাদিতে তার অভাব ঘটে। পক্ষান্তরে পুরুষাদির দৃষ্টান্তে ভূতসমূহের সেই বিশেষ পরিণাম বর্তমান এবং এই কারণে পুরুষাদির দৃষ্টান্তেই চৈতন্যর বিকাশ হয়।

তাহলে, চতুর্ভূতমাত্রই চৈতন্যর কারণ নয়; চতুর্ভূতের কোন এক-প্রকার বিশেষ পরিণামই চৈতন্যর কারণ। কিন্তু, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে গুণরত্নর চরম মন্তব্য এই যে দেহাত্মবাদীরা স্বমতসম্মতভাবে চৈতন্যর কারণ হিসাবে চতুর্ভূতের এই বিশেষ পরিণাম নামক ঘটনাটির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। অর্থাৎ, যে-বিশেষ পরিণামের ফলে লোকায়তমতে চতুর্ভূতই চৈতন্যবিশিষ্ট হয় লোকায়তিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সেই বিশেষ পরিণামের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গুণরত্ন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি উত্থাপন করেছেন; প্রথমে তার তাৎপর্য দেখা যাক।

চতুর্ভূতের ওই বিশেষ পরিণাম বলতে কী বোঝায়? সেকালে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাবে লোকায়তিকেরা সম্ভবত একে "কায়াকারে পরিণাম" আখ্যাই দিতেন। অর্থাৎ, যে পরিণামের ফলে চতুর্ভূত ঘটাদির পরিবর্তে জীবশরীররূপে পরিণত হয়, সেই পরিণামই এখানে লোকায়তিকদের অভিপ্রেত অর্থ। কিন্তু, গুণরত্ন বলছেন, লোকায়তিকদের পক্ষে স্বমত-সম্মত ভাবে "কায়াকারে পরিণাম" নামক এই ঘটনাটির কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কেননা, লোকায়তিকেরা হয় বলবেন, এই কায়াকারে পরিণামের কোন নির্দিষ্ট কারণ বা হেতু আছে; নাহয় তো তাঁরা বলবেন, এর কোন নির্দিষ্ট হেতু বা কারণ নেই। যদি তাঁরা বলেন এই কায়াকারে পরিণামের কোন নির্দিষ্ট হেতু বা কারণ নেই—তাহলে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই নিরর্থক হবে। কেননা, নির্দিষ্ট হেতুর অভাবে একদিকে যেমন সর্বত্রই ভূতসমূহের পক্ষে কায়াকারে পরিণাম ঘটবার কথা, অপরদিকে তেমনি কুত্রাপি সেই পরিণামের সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, কোন ঘটনাকে অহেতুক বললে ঘটনাটির ব্যাখ্যাই দেওয়া হয় না। অতএব, যুক্তিসঙ্গত ভাবে লোকায়তিকেরা বলতে বাধ্য যে চতুর্ভূতের পক্ষে কায়াকারে পরিণত হবার কোন-না-কোন নির্দিষ্ট কারণ বা হেতু বর্তমান। কিন্তু সেই কারণ কী হতে পারে? এই প্রশ্নর দুরকম মাত্র উত্তর সম্ভব।

এক: উক্ত কারণ চতুর্ভূত-অতিরিক্ত কিছু।

দুই: উক্ত কারণ বলতে চতুর্ভূতমাত্রই, বা, নিছক চতুর্ভূতই। প্রথম উত্তরটি অবশ্যই লোকায়তিকদের মুখে শোভা পাবে না। কেননা

তাঁদের মতে শুধুমাত্র চতুর্ভূতই সত্য (তত্ত্ব); চতুর্ভূত ছাড়া আর কিছুর সত্তা তাঁরা মানতেই পারেন না। চতুর্ভূত ছাড়া অন্য কিছু মানেই হল চেতন আত্মা[২৭৮]; অতএব চতুর্ভূতের পক্ষে কায়াকারে পরিণামের বিশিষ্ট কারণ হিসাবে চতুর্ভূত ছাড়া অন্য কিছু মানতে গেলে দেহাত্মবাদ পরিত্যাগ করে আত্মবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়।

অপরপক্ষে, দেহাত্মবাদীরা চতুর্ভূতমাত্রকেই বা নিছক চতুর্ভূতকেই উক্ত কায়াকারে পরিণামের কারণ বলতে পারেন না। কেননা, তাহলে স্বীকার করতে হবে যেখানেই চতুর্ভূত বর্তমান সেখানেই চতুর্ভূতের পক্ষে কায়াকারে পরিণত হবার কারণও বর্তমান; ফলে সর্বত্রই চতুর্ভূতের পক্ষে কায়াকারে পরিণামের প্রসঙ্গ হবে। কিন্তু ঘটাদির দৃষ্টান্তে স্পষ্টই দেখা যায় চতুর্ভূতের বর্তমানতা সত্ত্বেও কায়াকারে পরিণাম অবর্তমান থাকে। অতএব, নিছক চতুর্ভূতকেই কায়াকারে পরিণামের কারণ বলা যায় না।

উত্তরে দেহাত্মবাদী অবশ্যই বলতে পারেন যে চতুর্ভূত ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার না করেও চতুর্ভূতের পক্ষেই দেহাকারে পরিণামের সহকারি-কারণ হিসাবে "সাম্যাদিভাব" প্রভৃতি স্বীকার করার সুযোগ আছে। যেমন, অগ্নিই ধূমের কারণ; কিন্তু তাই বলে যেখানেই অগ্নি সেখানেই ধূম পরিদৃষ্ট হয় না—যেমন, তপ্ত অয়ঃপিণ্ড (গনগনে লোহার ভাঁটা)। ধূম উৎপাদনের জন্য অগ্নির পক্ষে সহকারি কারণও প্রয়োজন—যেমন, আর্দ্র ইন্ধন (ভিজে কাঠ) সংযোগ। এইভাবে, চতুর্ভূতই দেহাকারে পরিণামের কারণ হলেও এই দেহাকারে পরিণামের জন্য চতুর্ভূতের পক্ষেই সহকারিকারণও প্রয়োজন—যেমন, "সাম্যাদিভাব" (*proportion*), ইত্যাদি। কিন্তু, গুণরত্ন বলছেন, দেহাত্মবাদীর পক্ষে এই দাবিও সম্ভব নয়। কেননা, তাঁদের মতে উক্ত সহকারিকারণের কারণ কী হবে? চতুর্ভূতই, না, চতুর্ভূত-অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু? চার্বাকেরা চতুর্ভূত ছাড়া অন্য কোন বস্তু মানতে পারেন না। অতএব তাঁরা এই চতুর্ভূতকেই উক্ত সহকারিকারণেরও কারণ বলে স্বীকার করতে বাধ্য। ফলে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে যেখানেই চতুর্ভূত বর্তমান সেখানেই চতুর্ভূতের পক্ষে দেহাকারে পরিণত হবার জন্য সহকারিকারণও বর্তমান; ফলে সেখানেই দেহাকারে পরিণামও প্রত্যাশিত হবে। কিন্তু দেখা যায় যে তা হয় না: ঘটাদির দৃষ্টান্তে চতুর্ভূতের বর্তমানতা সত্ত্বেও দেহাকারে পরিণাম—অতএব চৈতন্যও—পরিদৃষ্ট হয় না।

বলাই বাহুল্য, যুক্তি-বিন্যাসের দিক থেকে গুণরত্নর এই আপত্তি বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ। দেহাত্মবাদীরা এই আপত্তির কী উত্তর দেবেন? বা, তাঁদের

২৭৮। বিশেষত গুণরত্ন সহজেই এ কথা দাবি করতে পারেন; কেননা তাঁর মতে "চেতনালক্ষণো জীবঃ, তদ্বিপরীতলক্ষণস্তজীবঃ"—পাদটীকা ২৩৫ দ্রষ্টব্য। অবশ্যই সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরাও একথা স্বীকার করবেন কিনা, এ-প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

পক্ষে এই আপত্তির কি কোনপ্রকার প্রত্যুত্তর সম্ভব? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দেহাত্মবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এই আপত্তির কোন উত্তর না থাকে তাহলে দেহাত্মবাদ পরিত্যাগের প্রসঙ্গ ঘটবে। কিন্তু প্রশ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা দরকার।

প্রশ্নটিকে দু'ভাগে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা—

এক: ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন বস্তুবাদীরা—অর্থাৎ লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই কি এই প্রশ্নর কোন সদুত্তর দিতে পেরেছেন? না, যেহেতু লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা আমাদের হস্তগত হয়নি সেইহেতু প্রশ্নটিকে বরং এই বলেই ব্যাখ্যা করা ভাল: প্রাচীন লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জ্ঞান আছে তার উপর নির্ভর করে আমরা কি আজ দাবি করতে পারি যে তাঁদের পক্ষে আলোচ্য প্রশ্নর কোন সদুত্তর দেবার সুযোগ সত্যিই ছিল?

দুই: আধুনিককালে দেহাত্মবাদীর পক্ষ অবলম্বন করে আলোচ্য প্রশ্নর কোন উত্তর দেওয়া একান্তই অসম্ভব?

প্রশ্নটির উপরোক্ত প্রথম ব্যাখ্যার উত্তর নেতিবাচক হলেও, দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উত্তরও নেতিবাচক হতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ, যদি বা দেখা যায় যে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাচীন বস্তুবাদীদের পক্ষে ভূতসমূহ থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহের উদ্ভব সংক্রান্ত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ সত্যিই অবর্তমান ছিল, তাহলেও প্রমাণ হবে না যে দার্শনিক মত হিসাবে ভূতচৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ প্রকৃতপক্ষে পরিত্যজ্যই। কেননা, আধুনিক কালের পর্যাপ্ততর জ্ঞান ও তথ্যর সাহায্যে—অতএব উন্নততর রূপে—দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়েরই পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকতে পারে। এবং যদি তা থাকে, তাহলে প্রাচীন-দেহাত্মবাদের সমস্ত দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বিশেষত প্রাচীন কালের পরিপ্রেক্ষায় তাকে নিষ্ফল বলা যাবে না। কেননা, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে সমসাময়িক অন্যান্য মতবাদের তুলনায় প্রাচীন দেহাত্মবাদের মধ্যেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা না-থাকলেও সে-ব্যাখ্যার পূর্বাভাস বা প্রতিশ্রুতি বর্তমান ছিল।

লোকায়ত-বিরোধীরা প্রায় একবাক্যেই বলেছেন যে লোকায়ত-মতে শুধুমাত্র চতুর্ভূতই তত্ত্ব এবং যেহেতু এই লোকায়ত-বিরোধীদের মন্তব্যর উপর নির্ভর করেই আমরা আজ লোকায়ত-মত পুনর্গঠন করতে বাধ্য সেই-হেতু আমাদের পক্ষে স্বীকার করা প্রয়োজন যে প্রাচীন লোকায়তিকেরা তত্ত্ব বা মৌলিক সত্য হিসাবে ভূতবস্তু বা জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুর সত্তাই স্বীকার করতেন না এবং জড়পদার্থ বলতে তাঁদের ধারণায় শুধুমাত্র

পৃথিবী, জল, আগুন আর বাতাস। আধুনিক জ্ঞানের পটভূমিতে বস্তুবাদ হিসাবে এই মতের দুর্বলতা অবশ্যই অস্পষ্ট নয়।

পৃথিবী প্রভৃতি উক্ত চতুর্ভূতের কোন-একটিও আজ মৌলিক পদার্থ বলে স্বীকৃত নয়। বস্তুতপক্ষে, *matter* বা জড়পদার্থের স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান সেকালের তুলনায় একালে প্রায় অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করেছে এবং আগামী কাল এই জ্ঞান আরো কতো বিস্তৃত ও গভীর হবে সে-বিষয়ে আজ কোন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-বাণীর প্রয়াসও নিষ্ফল। সংক্ষেপে, সুদীর্ঘ শতাব্দী পরম্পরার বৈজ্ঞানিক গবেষণা উত্তীর্ণ হয়ে জড়পদার্থ প্রসঙ্গে আজ যে-জ্ঞান সংগৃহীত হয়েছে এবং আগামীকাল আরো যে-জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আমাদের প্রাচীন লোকায়তিকদের জ্ঞান তুচ্ছ, স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর। ফলে, আধুনিক বিজ্ঞানী যে-ভাবে জড়পদার্থ থেকেই পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব—বা আমাদের প্রাচীন পরিভাষায়, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উদ্ভব—ব্যাখ্যা করতে চান[২১৯], তার সঙ্গে প্রাচীন লোকায়তিকদের দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদ হিসাবে তুলনীয়ই হতে পারে না। অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞান দাবী করবেন না যে পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূতই জীবদেহ উৎপত্তির একমাত্র কারণ, বা, শুধু এই চতুর্ভূতেরই কোন একপ্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে জীবদেহ উৎপন্ন হয়। তবুও মনে রাখা দরকার, আমাদের প্রাচীন দর্শনে ভূতচৈতন্যবাদ প্রসঙ্গে মূল বিতর্কটি ভূতবস্তু বা জড়বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি সংক্রান্ত নয়। সে-বিতর্কের মূল বিষয় এই যে শুধুমাত্র ভূতবস্তু থেকেই কি চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের ব্যাখ্যা হয়, না, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহর ব্যাখ্যাকল্পে আমরা কোন ভূতাতিরিক্ত আত্মা মানতে বাধ্য—যে-আত্মা শঙ্কর-মতে চৈতন্য-স্বরূপ, গুণরত্ন-মতে চেতন-স্বভাব, যদিচ ন্যায়-মতে শুধুমাত্র দেহের সঙ্গে সংযোগ ঘটলেই যা চৈতন্য গুণ-যুক্ত হয়? বলাই বাহুল্য, ভূতপদার্থ বা *matter* বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান যতোই উন্নত ও পর্যাপ্ত হোক-না-কেন, তারই নজির থেকে এ জাতীয় কোন আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন নিরর্থক। অতএব, প্রাচীন লোকায়তিকদের পৃথিব্যাদি ভূত-মাত্রর তত্ত্ব থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহ-উৎপত্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব না-হলেও, একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে লোকায়তর পরিবর্তে লোকায়ত-বিরোধী আত্মবাদের মধ্যেই পরবর্তীকালে লব্ধ পূর্ণতর সত্যর ইঙ্গিত বর্তমান। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ঐতিহাসিকভাবে লোকায়ত-মত অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতার কারণ সেকালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৈন্য। কিন্তু তারই ফলে দার্শনিক মত হিসাবে ভূতচৈতন্যবাদই অবজ্ঞার বিষয় হতে পারে না।

লোকায়ত-মতের বিরুদ্ধে গুণরত্নর মূল যুক্তিটি বিচার করা যাক

২১৯। Oparin 163-252 দ্রষ্টব্য।

গুণরত্ন বলছেন, পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের কায়াকারে পরিণামই উপপন্ন হয় না,—অর্থাৎ, এই কায়াকারে পরিণামের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কেননা, এই কায়াকারে পরিণাম অহেতুক হতে পারে না অন্যবস্তু-নিমিত্তক হতে পারে না, ভূতমাত্র নিবন্ধনও হতে পারে না। অবশ্যই ভূত-চৈতন্যবাদীর পক্ষে কায়াকারে পরিণামকে অহেতুক বা অন্যবস্তুনিমিত্তক বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নেই। ভূত পদার্থই মূল তত্ত্ব হলে উক্ত কায়াকারে পরিণাম ভূত পদার্থ নিমিত্তকই হবার কথা। কিন্তু ভূতপদার্থ তো ঘটাদির দৃষ্টান্তেও বর্তমান, তাহলে শুধুমাত্র পুরুষাদির দৃষ্টান্তেই কায়া-কারে পরিণাম কেন? গুণরত্ন বলছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ভূতচৈতন্যবাদী সহকারিকারণের প্রসঙ্গ অবতারণা করতে পারেন: ভূতবস্তুই কায়াকারে পরিণামের কারণ হলেও তার জন্য সহকারিকারণও প্রয়োজন--ঘটাদির দৃষ্টান্তে সেই সহকারিকারণের অভাববশতই কায়াকারে পরিণাম পরিদৃষ্ট হয় না, পুরুষাদির দৃষ্টান্তে সেই সহকারিকারণের বর্তমানতাবশতই তা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, এই সহকারিকারণ বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং সেই সহকারিকারণেরই বা কারণ কী হবে? গুণরত্ন বলছেন, লোকায়তিকেরা পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ভূত ছাড়া আর কিছুর সত্তাই স্বীকার করতে পারেন না—তাহলে তত্ত্বান্তরের প্রসঙ্গ হয়। অতএব, লোকায়তিকের পক্ষে স্বমতসম্মত ভাবে পৃথিব্যাদিভূতকেই উক্ত সহকারিকারণেরও কারণ হিসাবে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাহলে, পৃথিব্যাদিভূত সর্বত্র বর্তমান থাকায় সর্বত্রই—ঘটাদির দৃষ্টান্তেও—কায়াকারে পরিণামের সহকারি-কারণটিরও কারণের উপস্থিতি স্বীকৃত হবে; অতএব সর্বত্রই কায়াকারে পরিণামের প্রসঙ্গ ঘটবে।

লোকায়তিকদের পক্ষে ঐতিহাসিকভাবে এই সমালোচনার প্রত্যুত্তর-সামর্থ্য কি বাস্তবিকই ছিল? লোকায়তিক "স্বভাববাদ"-এর তাৎপর্য পরে বিচার করা যাবে। আপাতত ধরে নেওয়া যায় যে তাঁদের পক্ষে কায়াকারে পরিণামের স্বতন্ত্র কোন সহকারিকারণ—বা সেই সহকারিকারণের কোন স্বতন্ত্র কারণ—প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে দার্শনিক ভূতচৈতন্যবাদমাত্রের পক্ষেই এই আশঙ্কা বর্তমান। কেননা, আধুনিককালে ভূতচৈতন্যবাদেরই মূল প্রতিপাদ্য সমর্থনে বস্তুবাদীর পক্ষে প্রাচীন লোকায়তিকদের তুলনায় অন্তত দ্বিবিধ সুবিধা বর্তমান। প্রথমত, ভূত পদার্থ বিষয়েই বিশেষ উন্নত জ্ঞান। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক নিয়ম—যথা, গতির নিয়ম, রাসায়নিক সংগঠনের নিয়ম, ইত্যাদি-সংক্রান্ত আধুনিক জ্ঞান। এই দ্বিবিধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আধুনিক বস্তুবাদী অনায়াসেই দাবি করতে পারেন, ভূতপদার্থ থেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহের উৎপত্তি

হলেও—বা, ভূতপদার্থ ই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহের কারণ হলেও—পুরুষাদির দৃষ্টান্তেই ভূতপদার্থসমূহর এ-জাতীয় কায়াকারে পরিণাম ঘটার কথা, ঘটাদির দৃষ্টান্তে তা প্রত্যাশা করাই অসঙ্গত। জড়পদার্থ বলতে তাঁর কাছে আজ আর শুধুমাত্র ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে[২৮০] এখানে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত মৌলিক পদার্থগুলির কথা এবং সেগুলির পারমাণবিক সংগঠনের কথা উল্লেখ করাই পর্যাপ্ত হবে। বস্তুতপক্ষে, যে-ভূতপদার্থগুলিই কায়াকারে পরিণত হয় আধুনিক জৈব-রসায়নে বিশেষ করে সেগুলিরই আলোচনা। ঘটাদি সমস্ত দৃষ্টান্তেই একই ভূতপদার্থ একইভাবে বর্তমান নয়। ফলে ঘটাদি সমস্ত দৃষ্টান্তেই কায়াকারে পরিণামের প্রসঙ্গ বস্তুতপক্ষে অবান্তর। আধুনিক বস্তুবাদী আরো বলবেন, এই ভূতপদার্থগুলির পক্ষেই কায়াকারে পরিণত হবার জন্য সহকারিকারণ হিসাবে গতির নিয়ম, রাসায়নিক পরিবর্তনের নিয়ম প্রভৃতি উল্লেখ করলেও বস্তুবাদীর পক্ষে তত্ত্বান্তর-স্বীকৃতির আশঙ্কা বাস্তবিকই ঘটে না। বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র স্বভাব-সচেতন বা স্বয়ং-সচেতন বা বিশুদ্ধ চৈতন্য জাতীয় কোন পদার্থ স্বীকৃতির সুযোগ নেই। অতএব, উক্ত গতির নিয়ম বা রাসায়নিক পরিবর্তনের নিয়ম প্রভৃতি যদি স্বয়ং-সচেতন কোন পদার্থের গুণ বা ক্রিয়া বা পরিণাম বা বিকাশ বলে প্রমাণিত হয় শুধুমাত্র তাহলেই এ জাতীয় নিয়ম স্বীকার করায় বস্তুবাদীর পক্ষে তত্ত্বান্তরের আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু, আধুনিক বস্তুবাদী বলবেন, উক্ত নিয়মের মূলে পূর্বোক্ত কোন অর্থেই স্বয়ং-সচেতন কোন পদার্থের বা ভূতাতিরিক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যর পরিচয় নেই। অতএব, ভূতপদার্থের পক্ষেই দেহাকারে পরিণামের ব্যাখ্যায় সহকারিকারণ হিসাবে এ জাতীয় নিয়ম স্বীকার করায় বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বান্তর-স্বীকৃতির আশঙ্কা বাস্তবিকই ঘটে না।

অতএব, ভূতচৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে গুণরত্নর চতুর যুক্তিবিন্যাস সত্ত্বেও ভূতচৈতন্যবাদের মূল দার্শনিক দাবিটি বাস্তবিকই প্রত্যাখ্যাত হয় না—অর্থাৎ, ভূতপদার্থের পক্ষেই কায়াকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয় এবং ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষে এই পরিণতির ব্যাখ্যায় কোন সহকারিকারণ স্বীকার করলেই আত্মবাদ স্বীকারের আশঙ্কা হয় না।

ভূতপদার্থেরই কায়াকারে পরিণতির দোষান্তর প্রদর্শনার্থে নৈয়ায়িকেরা আর-একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যুক্তিটি সংক্ষেপে এই যে তাহলে একই শরীরে জ্ঞাতৃবহুত্বর—বা বহু জ্ঞাতার—প্রসঙ্গ হয়। কিন্তু, বাৎস্যায়ন[২৮১] বলছেন, "একশরীরে জ্ঞাতৃবহুত্বং নিরনুমানম্"—একশরীরে

২৮০। পূর্ব পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৮১। 'ন্যায়সূত্র-ভাষ্য', ৩।২।৩৭॥

জ্ঞাতার বহুত্ব নিরনুমান অর্থাৎ নিষ্প্রমাণ। কিংবা, বাচস্পতি মিশ্র[২৮২] যেমন বলছেন, "তথা চৈকস্মিন্ দেহে বহবশ্চেতয়েরন্",—তাহলে একই দেহে বহু চেতনের সমাবেশ হবে; ইত্যাদি। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণের[২৮৩] ব্যাখ্যা অনুসারে এই যুক্তির তাৎপর্য: "ভূতচৈতন্যবাদী বলিয়াছেন যে, ...শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষেই জ্ঞানাদির উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানাদি ঐ ভূতবিশেষেরই ধর্ম, ভূতমাত্রের ধর্ম নহে। ভাষ্যকার (বাৎস্যায়ন) ভূতচৈতন্যবাদীর এই সমাধানের চিন্তা করিয়া ঐ মতে দোষান্তর বলিয়াছেন যে, এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব নিষ্প্রমাণ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্য স্বীকার করিলে ঐ ভূতবিশেষের অর্থাৎ শরীরের আরম্ভক হস্তাদি অবয়ব অথবা সমস্ত পরমাণুতেই চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। ...শরীরের আরম্ভক প্রত্যেক অবয়ব বা প্রত্যেক পরমাণুতেই চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে প্রতি শরীরে বহু অবয়ব বা অসংখ্য পরমাণুকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এক শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্বের আপত্তি অনিবার্য। এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় ভূতচৈতন্যবাদী তাহা স্বীকারও করিতে পারেন না। ভাষ্যকার এখানে এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব মাত্রই বলিয়াছেন। কিন্তু এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের বাধকও আছে। তাৎপর্য টীকাকার (বাচস্পতি মিশ্র) তাহা বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বহু জ্ঞাতা থাকিলে সমস্ত জ্ঞাতাই বিরুদ্ধ অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় সকলেরই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ কোন কার্যই জন্মিতে পারে না।" কিংবা, 'ভামতী'-তে বাচস্পতি মিশ্র এই যুক্তিটিই যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "মদশক্তি মদিরার প্রতিটি অবয়বের একদেশে থাকে; সেরূপ চৈতন্যও দেহের অবয়বগুলির একদেশে থাকবে। ফলে একই দেহে বহু চেতনের সমাবেশ হবে। বহু চেতনের অন্যোন্যাভিপ্রায়ানুবিধান [ঐকমত্য, সকলেরই একমত হওয়া] সম্ভব নয় এবং সেজন্য একই জালে আবদ্ধ পক্ষী সকল যেমন [প্রত্যেকে] বিরুদ্ধ দিকে গমন করতে সমর্থ হলেও [পরস্পর একমত না হওয়ায়] একহাত পরিমাণ ভূমিও অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না, তেমনি শরীরও কোনকিছু করতে সমর্থ হবে না"।[২৮৪]

ভূতচৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তিটির গুরুত্ব কী? মদশক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেই লোকায়তিকেরা ভূতচৈতন্যবাদ সমর্থন করেছেন: যেমন মদ্যাঙ্গগুলিতে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও সেগুলিই বিশেষ পরিণামের ফলে মদশক্তিবিশিষ্ট হয়, তেমনি শরীরের উপাদান ভূতপদার্থগুলি

২৮২। 'ভামতী', ৩।৩।৫৪॥
২৮৩। 'ন্যায়দর্শন', ৩।২।১১-২॥
২৮৪। 'ভামতী'; ৩।৩।৫৪॥

চৈতন্যবিহীন হলেও কায়াকারে পরিণামের ফলে চৈতন্যবিশিষ্ট হয়। কিন্তু, সমালোচনায় উক্ত হয়েছে যে, এইভাবে মদশক্তির নজির দেখিয়ে ভূত-চৈতন্যবাদ সমর্থন নিরর্থক। কেননা, মদিরার প্রতিটি অবয়বেই—প্রতি মদ্যকণিকাতেই—মদশক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তাই মদশক্তির সঙ্গে চৈতন্য সমতুল্য হলে "শরীরের প্রতিটি অবয়ব বা প্রত্যেক পরমাণুতেই" চৈতন্যর—অতএব জ্ঞাতার—প্রসঙ্গ হবে। অর্থাৎ, একই শরীরে বহু জ্ঞাতার প্রসঙ্গ ঘটবে। কিন্তু, বাৎস্যায়ন-মতে, তার প্রমাণ নেই। বাচস্পতি মিশ্রর মতে তা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবই, কেননা তাহলে বহু জ্ঞাতার বিবিধ এবং বিরুদ্ধ অভিপ্রায়বশত শরীরের পক্ষে কোন কার্যসম্পাদনই সম্ভব হবে না।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রাচীন লোকায়তিকদের পক্ষে ভূতপদার্থরই কায়াকারে পরিণামের বিরুদ্ধে গুণরত্ন-উত্থাপিত আপত্তির প্রত্যুত্তর উদ্ভাবনে প্রধান অন্তরায় ছিল ভূতপদার্থ বিষয়েই সেকালের জ্ঞানের অপ্রাচুর্য বা দৈন্য। ভূতপদার্থর পক্ষেই কায়াকারে পরিণামের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য আপত্তি প্রসঙ্গেও আমাদের প্রায় একই বক্তব্য—পার্থক্য শুধু এই যে প্রাচীন বস্তুবাদীর পক্ষে এই আপত্তির পর্যাপ্ত উত্তর উদ্ভাবন করার প্রধান অন্তরায় ছিল "কায়াকারে পরিণাম" সংক্রান্ত সেকালের জ্ঞানের দৈন্য বা অপ্রাচুর্য।

প্রথমে নৈয়ায়িকদের আপত্তির প্রকৃত তাৎপর্য দেখা যাক। "শরীরের প্রত্যেক অবয়ব বা প্রত্যেক পরমাণু" বলতে ঠিক কী বোঝা হয়েছে আপাতত সে-বিষয়ে বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন নেই; আধুনিক শরীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ,—বিশেষত চৈতন্য, জ্ঞান, জ্ঞাতা—প্রভৃতি শব্দ ঠিক কী অর্থে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব, সে প্রশ্নও আপাতত নিষ্প্রয়োজন। দার্শনিক বিচারের দিক থেকে এখানে মূল প্রশ্ন হল, চৈতন্যহীন ভূতপদার্থর পক্ষেই কি চৈতন্যবিশিষ্ট কায়াকারে পরিণত হওয়া সম্ভব? এই সম্ভাবনার সমর্থনেই লোকায়তিকেরা মদশক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। উত্তরে নৈয়ায়িকেরা দাবি করছেন, মদশক্তির নজির দেখিয়ে অচেতন ভূতপদার্থরই কায়াকারে পরিণাম প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা, মদিরা ও শরীরের মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য বর্তমান। মদিরার প্রতিটি কণিকাই মদশক্তি-বিশিষ্ট, অর্থাৎ প্রতিটি মদ্য-কণিকাই মদ্য-পদবাচ্য। শরীর বা কায়াকারে পরিণামের বেলাতেও কি লোকায়তিকেরা সমতুল্য দাবি করতে পারেন? যদি সেই দাবি করতে চান তাহলে মদিরার প্রতিটি কণিকাতেই যে-ভাবে মদ্যর প্রসঙ্গ ঘটে সেইভাবে লোকায়ত-মতে শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশেই শরীরত্বের বা কায়াকারের প্রসঙ্গ ঘটবে। অর্থাৎ, স্বীকার করতে হবে যে একই জীবদেহের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও

স্বতন্ত্রভাবে জীবশরীরই, বা একই কায়াকারের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও স্বতন্ত্রভাবে কায়াকারই। নৈয়ায়িকদের আপত্তির মূল তাৎপর্য এই হলেও যেহেতু প্রাচীনদের পরিভাষায় পৃথিব্যাদি ভূতমাত্রর তুলনায় শুধুমাত্র জীবশরীরই চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যই যেহেতু পৃথিব্যাদি সমস্ত স্বয়ং-অচেতন বা বিজাতীয় পদার্থর ব্যবচ্ছেদক—সেইহেতু আপত্তিটি "একই শরীরে বহু চৈতন্যর অতএব বহু জ্ঞাতার প্রসঙ্গ" রূপেই উল্লিখিত[২৮৫]। কিংবা লোকায়ত-মতে জ্ঞাতা বলতে শরীরমাত্রই বা কায়াকারে পরিণত ভূতপদার্থমাত্রই; এই শরীরই চৈতন্যবিশিষ্ট। অতএব, লোকায়তিকেরা যদি মদশক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে স্বীয় মত সমর্থন করতে চান তাহলে

২৮৫। মনে রাখা দরকার, এই বিতর্ক প্রসঙ্গে স্বয়ং নৈয়ায়িকেরাই "ত্রস ও স্থাবর শরীর" ('ন্যায়সূত্র ভাষ্য', ৩।২।৩৬) উল্লেখ করেছেন—"ত্রস অর্থাৎ অস্থির বা অল্পকালস্থায়ী কৃমি কীট প্রভৃতির শরীর এবং স্থাবর অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী দেবতা ও মনুষ্যাদির শরীর" (ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন', ৩।২৬৭)। অর্থাৎ, ন্যায়মতে উভয়ই শরীর পদবাচ্য। অতএব নৈয়ায়িকেরা বলবেন, যদিচ লোকায়ত মতে উভয়বিধ শরীরই চৈতন্যবিশিষ্ট তবুও তাঁদের স্বীয় মতে—অর্থাৎ ন্যায়-মতে—আত্মার সঙ্গে উভয়বিধ শরীরের সংযোগ ঘটলে আত্মায় চৈতন্য নামের গুণ বা ধর্ম উৎপন্ন হয়। অবশ্য চৈতন্য আত্মার ধর্ম হলেও ন্যায়-মতে শেষ পর্যন্ত তা শারীরিক ক্রিয়া থেকেই অনুমেয়: "আরম্ভ" বা হিতপ্রাপ্তির চেষ্টা এবং "নিবৃত্তি" বা অহিতপরিহারের চেষ্টা যথাক্রমে 'ইচ্ছা' ও 'দ্বেষ'-এর লিঙ্গ বা অনুমাপক এবং ইচ্ছা ও দ্বেষ জ্ঞান বা চৈতন্যর—অতএব জ্ঞাতার—অনুমাপক। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত এক-কোষ জীব প্রভৃতিও ন্যায় মতে উক্ত 'ত্রস' শরীরেরই অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ন্যায়মতে যেহেতু "ত্রস"-শরীরেরও ক্রিয়া থেকেই "চৈতন্য" অনুমেয় সেই হেতু "চৈতন্য" শব্দকে এখানে আধুনিক অর্থে উন্নততর স্নায়ুতন্ত্রর—বিশেষত মস্তিষ্কের—ক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। অর্থাৎ আলোচ্য বিতর্কে যেহেতু তুচ্ছতম কৃমি-কীটের শরীরেও চৈতন্য বা জ্ঞাতৃত্ব-গুণ অনুমেয় সেইহেতু এখানে চৈতন্য বা জ্ঞাতৃত্ব-গুণ বলতে আধুনিক অর্থে শুধুমাত্র উদ্দীপন-প্রতিবেদন (Stimulus-Response) সামর্থ্যই বোঝা সঙ্গত হবে। অবশ্যই অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি প্রাথমিক কৃমি-কীটের "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" থেকে কোন অর্থে "ইচ্ছা" ও "দ্বেষ" অনুমেয়—এ জাতীয় প্রশ্ন আপাতত নিষ্প্রয়োজন। ভূতচৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা যে আপত্তি তুলেছেন শুধু তার দার্শনিক সারমর্মই বর্তমানে বিবেচ্য। নৈয়ায়িকদের সমালোচনার সারমর্ম হল, মদশক্তির নজির দেখিয়ে ভূতচৈতন্যবাদ সমর্থন সম্ভব নয়, কেননা মদিরার প্রতি কণা মদশক্তিযুক্ত, অর্থাৎ মদ্য; পক্ষান্তরে, লোকায়তিকেরা শরীরকে যে-অর্থে চৈতন্যযুক্ত বা জ্ঞাতা বলেন সেই অর্থে শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশকেও চৈতন্যযুক্ত বা জ্ঞাতা বলা যায় না, অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশই শরীর-লক্ষণ যুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারে না। প্রাচীন লোকায়তিকদের পক্ষে এ আপত্তির উত্তর উদ্ভাবনের সুযোগ না থাকলেও জীবকোষ আবিষ্কারের পর আধুনিক বস্তুবাদী অনায়াসেই বলতে পারেন, শরীরের সূক্ষ্মতম প্রতিটি অংশে শরীরের সমস্ত মৌলিক লক্ষণই বর্তমান এবং যে অর্থে মদিরার প্রতি কণিকা মদশক্তি বিশিষ্ট সেই অর্থে শরীরের সূক্ষ্মতম অংশ প্রতিটি জীবকোষও প্রাচীন লোকায়তিকদের পরিভাষায় চৈতন্যবিশিষ্টই।

তাঁদের পক্ষে মানা দরকার যে মদিরার প্রতিটি কণিকাই যেভাবে মদশক্তি-বিশিষ্ট বা মদ্য, সেই-ভাবেই শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও শরীর লক্ষণ-যুক্ত এবং এই অর্থে চৈতন্যবিশিষ্টও।

অতএব, ভূতচৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তি প্রসঙ্গে মূল প্রশ্ন হল, মদিরার প্রতিটি কণা যে-অর্থে মদ্য-পদবাচ্য সেই অর্থে শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও কি শরীর-পদবাচ্য হতে পারে? ন্যায়মতে তা একান্তই অসম্ভব এবং নৈয়ায়িকেরা দাবি করেন যে ভূতচৈতন্যবাদ স্বীকারের তাৎপর্য হল, এ জাতীয় অসম্ভবের কাছেই আত্মসমর্পণ। ফলে, ভূতচৈতন্যবাদ অবশ্য পরিত্যজ্য।

বলাই বাহুল্য, প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন দার্শনিকের পক্ষেই জীব-শরীরের সূক্ষ্মতম অংশ সংক্রান্ত বাস্তব ধারণায় উপনীত হবার সুযোগ ছিল না। তাই আধুনিক জ্ঞানের মানদণ্ডে এ-বিষয়ে নৈয়ায়িকদের বদ্ধমূল ধারণাটি ভ্রান্ত হলেও সেকালের লোকায়তিক-দের পক্ষেও ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবার মতো পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ছিল। জীবদেহর সূক্ষ্মতম অংশ সংক্রান্ত বাস্তব জ্ঞান বস্তুতপক্ষে সম্প্রতি-লব্ধ। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ[২৮৬] থেকে শুরু করে শরীরের এই সূক্ষ্মতম অংশ সংক্রান্ত জ্ঞান স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে এবং জীববিজ্ঞানীরা এ-জাতীয় সূক্ষ্মতম অংশরই নাম দিয়েছেন জীবকোষ বা *cell*। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একথা আজ সুবিদিত যে একই শরীর বা জীবদেহর বহু জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলেও প্রতিটি জীবকোষই যেহেতু জীবদেহর বা শরীরের মূল লক্ষণাবলীর পরিচায়ক সেইহেতু প্রতিটি জীবকোষও স্বতন্ত্রভাবে শরীর-পদবাচ্য বা দেহ-পদবাচ্য। অতএব, সেকালের লোকায়তিকদের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের নজির দেখিয়ে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য আপত্তির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-থাকলেও একালে অবশ্যই দাবি করার সুযোগ আছে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য আপত্তিটি ভিত্তিহীন। কেননা, মদিরার প্রতিটি কণা যে-অর্থে মদ্য-পদবাচ্য বস্তুতপক্ষে শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও সেই-অর্থে শরীর-পদবাচ্যই।

বাচস্পতি মিশ্র[২৮৭] অবশ্য এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আরো একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশও যদি শরীর-পদবাচ্য—অতএব সচেতন—হয় তাহলে একই শরীরে বহু চেতনের সমাবেশ স্বীকৃত হবে এবং বহু চেতনের পক্ষে ঐকমত্য অসম্ভব বলেই সামগ্রিকভাবে শরীরটির পক্ষে কোন প্রকার কার্য-সম্পাদনই সম্ভব হবে না।

২৮৬। Beck 102 ff.

২৮৭। 'ভামতী' ৩।৩।৫৪।

এই আপত্তির মূল কথা কী? একই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহে যদি বহু জীবদেহের সমাবেশ পরিকল্পিত হয়—বা, যদি স্বীকৃত হয় যে একই পূর্ণাঙ্গ দেহ বস্তুতপক্ষে বহু সূক্ষ্ম জীবদেহ দ্বারাই গঠিত—তাহলে পূর্ণাঙ্গ জীবদেহটির অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্ম জীবদেহগুলির মধ্যে অনিবার্য অনৈক্যের ফলে সামগ্রিকভাবে জীবদেহটির পক্ষে কোন প্রকার কার্য-সম্পাদনই অসম্ভব হবে। বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকায়তিকদের পক্ষে সদুত্তর উদ্ভাবনের সুযোগ অল্পই ছিল এবং পূর্ণাঙ্গ জীবের দেহগঠন সংক্রান্ত বাস্তব জ্ঞানের অভাব তার কারণ। কিন্তু জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার পটভূমিতে বাচস্পতি-উক্ত আপত্তিটিই অবান্তর বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। কেননা, একই জীবদেহ বহু জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলেও এই জীবকোষগুলির মধ্যে চরম অনৈক্যের পরিবর্তে বস্তুতপক্ষে এক অত্যাশ্চর্য সংযোগিতাই পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের ভাষায়, "আমাদের দেহের জীবকোষগুলি বরং এক গ্রহের অধিবাসীদের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু সংখ্যায় বহু কোটি হলেও তারা সাধারণত সুশৃঙ্খলভাবেই কর্ম সম্পাদন করে—তাদের জটিল সমাজের প্রতিটি সভ্য অপরাপরের কল্যাণ সাধনে অংশ গ্রহণ করে।"[২৮৮]

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিস্থিতি অবশ্যই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগে দার্শনিকেরা যে-ঘটনাবলীকে "প্রাণ", "চৈতন্য" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন আধুনিককালে সেগুলি সংক্রান্ত কী বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে এবং আগামীকাল এই জ্ঞান আরো কতো সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা—বর্তমানে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবুও, আধুনিককালে আমাদের প্রাচীন লোকায়ত-মতটির প্রতি ফিরে দেখার সময় একটি প্রশ্ন অবান্তর হবে না। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে-সব দার্শনিক মত প্রস্তাব করেছিলেন তার মধ্যে কোন্ মতটিতে আমরা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস পেতে পারি—এই ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস যতোই অস্পষ্ট হোক-না-কেন? এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। কেননা, ভারতীয় দর্শনে আলোচ্য সমস্যার সমাধানে মূলত দ্বিবিধ মত প্রস্তাবিত হয়েছে—আত্মবাদ ও দেহাত্মবাদ। আত্মবাদীরা ভারতীয় দর্শনে বিশেষ সম্মানিত ও হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এবং দীর্ঘ দিন ধরে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদকে প্রায় পরিহাসের

২৮৮। J.D. Ratcliff & R. Platt in BHB 30.: "The cells of our bodies are more like the population of a planet. But though they are many billions in number, they normally work in harmony, each member of the complex society contributing to the welfare of the others."

বিষয় হিসাবে উল্লেখ করার ব্যাপক প্রয়াস সত্ত্বেও, এই দ্বিতীয় মতটির মধ্যেই ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবদেহের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অমীমাংসিত সমস্যার অস্তিত্ব—অতএব আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন—স্বীকার করেও অনায়াসেই বলা যায় যে ভূতচৈতন্যবাদের মূল যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে আত্মবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সম্পূর্ণভাবেই আজ অন্তর্হিত হয়েছে।

আগেই বলেছি ভূতপদার্থ বা *matter* সংক্রান্ত সেকালের লোকায়তিকদের জ্ঞান অনিবার্য ভাবেই অকিঞ্চিৎ ছিল। অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে তাঁরা মাটি-জল-আগুন-বাতাস হিসাবে চতুর্বিধ ভূতপদার্থ উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁদের মতে যেহেতু এগুলিরই বিবিধ ও বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি সেইহেতু তাঁদের বিচারে মৌলিক পদার্থ বলতে এই চতুর্বিধই। ফলে তাঁদের মতে এই চতুর্বিধ মৌলিক পদার্থ থেকেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তি। "পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানি, তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়সংজ্ঞা।" এই হলো লোকায়তমতের প্রসিদ্ধ পরিচিতি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে পৃথিবী প্রভৃতি এই তথাকথিত মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে একটিও বস্তুতপক্ষে মৌলিক নয়। পক্ষান্তরে শতাব্দী পরম্পরার গবেষণা উত্তীর্ণ হয়ে ভূতবস্তু বা *matter* প্রসঙ্গে জ্ঞান আজ অত্যন্ত গভীর হয়েছে এবং আগামীকাল তা গভীরতর হবে। এবং ভূতপদার্থ বিষয়ে সেকালের ওই অকিঞ্চিৎ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের প্রাচীন লোকায়তিকদের পক্ষে ভূতপদার্থ থেকেই ঠিক কীভাবে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তি হয়, এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ সমাধান নির্ণয়ের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল না। অর্থাৎ, সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ সমাধান সেকালের লোকায়তিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই ঐতিহাসিক ভাবে অবাস্তর।

তবুও, এই প্রসঙ্গে লোকায়ত-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় হতে পারে না। বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদাহরণটি সেকালের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবেই বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পর্যবেক্ষণটির মূল কথা কী? কিণ্ব প্রভৃতি মদ্যাঙ্গ বা মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অবস্থায় বা একত্রিত অবস্থায় মদশক্তি বা মূর্চ্ছাজননসামর্থ্য অবর্তমান হলেও, কোন এক প্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে এই মদ্যাঙ্গগুলি মদ্যে পরিণত হয়—অর্থাৎ পরিণত বস্তুটিতে মূর্চ্ছাজননসামর্থ্য নামের একটি অভূতপূর্ব গুণের আবির্ভাব ঘটে। এবং এই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই লোকায়তিকেরা দাবি করেছিলেন যে, একইভাবে জীবদেহের উপাদানগুলিতে চৈতন্য—বা, আধুনিক

পরিভাষায়, উদ্দীপন-প্রতিবেদনের সামর্থ্য—অবর্তমান হলেও কোন এক প্রকার বিশেষ পরিণামের ফলে এগুলিই জীবদেহে রূপান্তরিত হয় এবং সেই জীবদেহ চৈতন্যবিশিষ্ট (বা উদ্দীপন-প্রতিবেদন সামর্থ্যযুক্ত) হয়। জীবদেহের মূল উপাদানগুলির স্বরূপ কী এবং ঠিক কী পরিণামের ফলে এগুলিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহে পরিণত হয়—এই জাতীয় প্রশ্নর মীমাংসার জন্য বহু শতাব্দীর গবেষণা প্রয়োজন হয়েছে এবং আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই সেকালের লোকায়তিকেরা—এবং ভারতীয় দর্শনে একমাত্র লোকায়তিকেরাই—অনুভব করেছিলেন যে, ভূতবস্তু উদ্ভূত জীবদেহে চৈতন্যর আবির্ভাব কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়,-তার ব্যাখ্যায় আত্মা নামের কোন স্বয়ং চেতন আধ্যাত্মপদার্থর স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। মত্তাঙ্গগুলির বিশেষ পরিণামে মদশক্তির আবির্ভাবের মতোই তা একান্তই লৌকিক একটি ঘটনামাত্র।

লোকায়ত-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে এখানে আরো দু'একটি কথা অবান্তর হবে না। মত্তাঙ্গগুলির বিশেষ পরিণামের ফলেই কীভাবে মদশক্তির উৎপত্তি হয়—এ বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক।[২৮৯] এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় বিজ্ঞানেও এই মদশক্তি মূলতই ভূতাতিরিক্ত বা অধ্যাত্ম বা আত্মা জাতীয় কোন পদার্থ হিসাবেই পরিকল্পিত; সুরা অর্থে *spirit* শব্দ ব্যবহারের মধ্যে এই প্রাচীন বিশ্বাসের রেশ এখনো টিকে আছে।[২৯০] তুলনায় লোকায়তিকদের বৈশিষ্ট এই যে তাঁরা সুপ্রাচীন কালেই অধ্যাত্মবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মদশক্তির উৎপত্তি নামক ঘটনাটিকে একান্ত লৌকিক বা স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বিচার করেছেন। এবং এই দৃষ্টান্তর নজির দেখিয়ে তাঁরা চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহ উৎপত্তিরও একান্ত লৌকিক বা স্বাভাবিক একটি ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য স্বতন্ত্র। লোকায়তিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এই যে সেকালে একমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অনুভূত হয়েছিল যে একদিকে যেমন মত্তাঙ্গগুলির কোন প্রকার বিশেষ পরিণামের মধ্যে মদ-শক্তির উৎপত্তির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, অপরদিকে তেমনি ভূতপদার্থগুলিরই

২৮৯। Bornal SH 471-2.

২৯০। Paraculsus (1493-1541) প্রসঙ্গে J. D. Bornal-এর মন্তব্য: "The crucial process of chemistry, distillation, was essentially a means of capturing the invisible spirits that rose from a boiling liquid. That such spirits were indeed powerful was only too evident from the effect of drinking them", (SH 272-3).

বিশেষ পরিণামের মধ্যেই চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহ উৎপত্তিরও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—উভয় ঘটনাই সমান লৌকিক বা সমান স্বাভাবিক, উভয়ের ব্যাখ্যাতেই অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় অনর্থক ও অবান্তর। কিংবা, যা একই কথা, মদশক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবকে লোকায়তিকেরা অধ্যাত্মবাদী কল্পনা দিয়ে পূরণ করার প্রয়াস করেননি এবং ঠিক একইভাবে জীবদেহে চৈতন্য উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবকেও তাঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা দিয়ে পূরণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মানদণ্ডে তাঁদের মন্তব্য অসম্পূর্ণ হলেও তাঁরা যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে অবশ্যই অনুকূল ছিল।

সুধীগণের বিবেচনার্থে এখানে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অবান্তর হবে না। ভারতীয় দর্শনে আত্মবাদের প্রকৃত ও প্রবল সমর্থকদের পক্ষে চৈতন্য-উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লোকায়ত-প্রদর্শিত মদশক্তির দৃষ্টান্তটি উপেক্ষা করা বা বর্জন করা স্বমত স্থাপনের পক্ষে পরিপন্থী না-হলেও, নৈয়ায়িকদের পক্ষেও কি বাস্তবিকই তাই? অর্থাৎ, নৈয়ায়িকেরাও কি আলোচ্য দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে চৈতন্য-উৎপত্তি সংক্রান্ত স্ব-যূথ স্বীকৃত সিদ্ধান্তর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন? প্রশ্নটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে চৈতন্য স্বরূপ ও উৎপত্তির ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত ও প্রবল সমর্থকদের সঙ্গে নৈয়ায়িকদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। এমন কি একথাও প্রতীত হয় যে অন্যান্য আত্মবাদীদের মতো নৈয়ায়িকেরাও ভূতচৈতন্যবাদের প্রবল বিরোধিতা করে থাকলেও প্রকৃত দার্শনিক বিচারে তাঁদের সিদ্ধান্তর সঙ্গে ভূতচৈতন্যবাদের পার্থক্য তুলনায় কম; অন্তত এই সিদ্ধান্তর সমর্থনে তাঁদের পক্ষে লোকায়ত-প্রদর্শিত মদশক্তির দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করা নিরাপদ নয়।

ভারতীয় দর্শনে অগ্রণী আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদী বলতে অবশ্যই বৈদান্তিক এবং বেদান্তমতের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যার নাম অদ্বৈতবাদ। অতএব এখানে বিশেষত অদ্বৈতমতের সঙ্গে ন্যায়মতের পার্থক্যই বিবেচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এই পার্থক্যর মূল কথা কী? মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ[২৯১] সংক্ষেপে বলছেন, "অদ্বৈতবাদের আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য বা জ্ঞান তাঁহার গুণ নহে; কিন্তু আরম্ভবাদে (অর্থাৎ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে) আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ নহেন, কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞান তাঁহার গুণ। পার্থক্যটির তাৎপর্য বিচার করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হল, ন্যায়মতে চৈতন্য বা জ্ঞান কি আত্মার নিত্য গুণ না জন্য গুণ? কিংবা, ন্যায়মতে আত্মায় চৈতন্য নামের গুণ কি সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় বিদ্যমান, না তা শুধুমাত্র অবস্থা-

২৯১। ফণিভূষণ, 'ন্যায়-পরিচয়' ১।৮১।

বিশেষেই আত্মায় উৎপন্ন হয় আবার অবস্থাবিশেষে আত্মার এই গুণটির অভাব ঘটে? মনে রাখা দরকার, ন্যায়মতে চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মার জন্য গুণ—অর্থাৎ, অবস্থাবিশেষে তা আত্মায় উৎপন্ন হয় এবং অবস্থাবিশেষে আত্মায় তার অভাব ঘটে। নৈয়ায়িকদের আত্মার সঙ্গে চেতনা বা জ্ঞান নামের গুণটির সম্পর্ক নিত্য নয় বলেই এই আত্মা অবস্থাবিশেষে চৈতন্যহীন বা জ্ঞান-হীন। চৈতন্যহীন পদার্থকে অচেতন আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত না-হলে বলা যায় যে ন্যায়মতে আত্মা অবস্থাবিশেষে অচেতন। যা অবস্থাবিশেষে অচেতন তাকে এমনকি মূলত অচেতন পদার্থ বলে বিবেচনা করারও সুযোগ আছে, যদিও সাময়িক ও বাহ্য কারণে এই অচেতন পদার্থে চেতনার পরিচয় পরিলক্ষিত হতে পারে। অতএব, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[২৯২] মন্তব্য করেছেন, Soul with Nyaya is an inert unconscious entity in which knowledge, etc. inhere—ন্যায়মতে আত্মা জড় ও অচেতন পদার্থ, তাতে জ্ঞান প্রভৃতি সমবেত হয়। বস্তুতপক্ষে, নৈয়ায়িকদের স্বীয় স্বকৃতি অনুসারে আত্মার বিশুদ্ধ রূপটি ভূতবস্তু-সদৃশই; কেননা তাঁদের মতে মুক্ত অবস্থায় আত্মা চৈতন্যশূন্য এবং চৈতন্যশূন্য এই আত্মাকে তাঁরা আকাশ-সদৃশ বলেই বর্ণনা করেন[২৯৩] এবং ন্যায়মতে আকাশ ভূত পদার্থই। অতএব, ন্যায়মতে আত্মার বিশুদ্ধ বা মুক্ত রূপটি ভূতপদার্থ-সদৃশই।

আরো প্রশ্ন হল, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ না-হলেও এবং চৈতন্য আত্মার নিত্যগুণ না-হলেও অবস্থাবিশেষে এই ভূতপদার্থ-সদৃশ আত্মাতেই কীভাবে চৈতন্য উৎপন্ন হয়? চৈতন্য-উৎপত্তির প্রকৃত কারণ বা সর্ত কী? প্রথমত অবশ্যই আত্মার সঙ্গে শরীরের সংযোগ। মুক্ত অবস্থায় শরীরের সঙ্গে সংযোগের অভাবেই আত্মায় চৈতন্যর অভাব ঘটে। শরীরই ইন্দ্রিয়র আশ্রয়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—অন্তঃ-ইন্দ্রিয় (বা মন) এবং বহিঃ-ইন্দ্রিয় (বা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়)। ন্যায়মতে, শরীরের সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়র এবং বহিরিন্দ্রিয়র সঙ্গে বিষয়ের (বা বহির্বস্তুর) সংযোগ হয়। তারই ফলে উৎপন্ন হয় জ্ঞান বা চৈতন্য। তাহলে, ন্যায়মতে চৈতন্য-উৎপত্তির কারণ হল: আত্মা+(শরীর)+মন+বহিরিন্দ্রিয়+বিষয়। মনে রাখা দরকার, এগুলির মধ্যে কোনটিই চেতন-স্বভাব নয় বা স্বতঃ-চেতন নয়। সহজ কথায়, স্বতন্ত্রভাবে এগুলির

২৯২। S.N. Dasgupta HIP 1.367.

২৯৩। অবশ্য মোক্ষাবস্থায় আত্মার স্বরূপ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মধ্যেই মতভেদ ছিল—বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ১।১।২২, ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।২০২-২১৬ এবং 'ন্যায় পরিচয় ১৫-১৬ দ্রষ্টব্য।

কোনটির মধ্যেই চৈতন্য বর্তমান নয়। আত্মায় নয়; কেননা শরীরের সঙ্গে সংযোগ ব্যতিরেকে আত্মা চৈতন্যহীন। এ-ছাড়া, ন্যায়মতে শরীর, মন, ইন্দ্রিয় (বহিরিন্দ্রিয়) ও বিষয়—সবই অচেতন পদার্থমাত্র[২৯৪]।

তাহলে, ন্যায়মতে চৈতন্য-উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী? আত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় এবং বহির্বস্তু—এগুলির প্রতিটিই স্বতন্ত্রভাবে চৈতন্য-বিহীন হলেও এগুলিরই সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অতএব, নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করবেন যে কয়েকটি পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে চৈতন্যশূন্য হলেও সেগুলির মধ্যেই কোন-এক-প্রকার বিশেষ সংযোগের ফলে চৈতন্যর উৎপত্তি ঘটে। এবং এই মতের সমর্থক বলেই নৈয়ায়িকদের পক্ষে লোকায়ত-প্রদর্শিত মদশক্তির দৃষ্টান্তটি উপেক্ষা করা বস্তুতপক্ষে নিরাপদ নয়। কেননা, কয়েকটি পদার্থর পৃথক অবস্থায় একটি গুণের অভাব সত্ত্বেও সেগুলিরই মিলিতাবস্থায় ওই গুণের উৎপত্তি যে বাস্তবিকই সম্ভব—এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রদর্শিত প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলতে ওই মদশক্তির দৃষ্টান্তই। অবশ্য, লোকায়তিকেরা ঠিক যে-অর্থে মদশক্তির দৃষ্টান্তর উপর নির্ভর করেন নৈয়ায়িকদের পক্ষেও ঠিক সেই অর্থে দৃষ্টান্তটির উপর নির্ভর করার সুযোগ ছিল না। লোকায়ত-মতে কিণ্ব প্রভৃতি মদ্যাঙ্গগুলির কোনটিতেই মদশক্তির পরিচয় না থাকলেও এগুলিরই কোন-এক-প্রকার **বিশেষ পরিণামের ফলে** মদশক্তির উৎপত্তি হয়। তেমনি ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত-পদার্থগুলির কোনটিতেই চৈতন্যর পরিচয় না-থাকলেও এগুলিরই বিশেষ পরিণামের ফলে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, একই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নৈয়ায়িকদের পক্ষে দাবি করার সুযোগ ছিল যে কিণ্ব প্রভৃতি মদ্যাঙ্গগুলির কোনটিতে মদশক্তির পরিচয় না-থাকলেও এগুলিরই কোন-এক-প্রকার **বিশেষ সংযোগের ফলে** মদশক্তি উৎপন্ন হয়। তেমনি আত্মা, দেহ, প্রভৃতির কোনটিই স্বতঃ-চেতন না-হলেও এগুলিরই কোন-এক-প্রকার বিশেষ সংযোগের ফলে চৈতন্যর উৎপত্তি ঘটে। অবশ্যই মদশক্তির প্রকৃত উৎপত্তি-রহস্য সেকালে অজ্ঞাত ছিল বলেই তার মূলে কোন-এক-প্রকারের বিশেষ পরিণাম বা বিশেষ সংযোগ বর্তমান—এই তর্ক সেকালের পটভূমিতে অনেকাংশে অবাস্তব হোতো। কিন্তু মদশক্তির দৃষ্টান্তটিকে উপরোক্ত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে নৈয়ায়িকদের পক্ষে চৈতন্য-উৎপত্তি সংক্রান্ত স্বীয় মত সমর্থন তুলনায় হয়ত সহজসাধ্যই হতে পারতো। কেননা, চৈতন্যবিহীন বিবিধ পদার্থর সংযোগ থেকে কী ভাবে চৈতন্য উৎপন্ন হতে পারে এ বিষয়ে সেকালে তাঁদের পক্ষে অন্য কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সুযোগ অল্পই ছিল।

এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। নৈয়ায়িকেরা

২৯৪। 'ন্যায়সূত্র', ১।১।১১-১৭। বিষয় বা বহির্বস্তু পরমাণু-গঠিত, অতএব চৈতন্যহীন।

অসৎকার্যবাদী[২৯৫]; অসৎকার্যবাদের মূল কথা হল, "উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ। কারণের ব্যাপারের দ্বারা পূর্বে অবিদ্যমান কার্যেরই উৎপত্তি হয়।" এই মতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সৎকার্যবাদী সাংখ্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা দাবি করেন, উৎপত্তির পূর্বেই—অর্থাৎ কারণের মধ্যেই—কার্য বর্তমান থাকে: "যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, গাভীর স্তনমধ্যে দুগ্ধ থাকে, তদ্রূপই মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে, সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে।" অতএব, কার্য প্রকৃতপক্ষে কারণ ছাড়া কিছু নয়; কার্য হল কারণেরই রূপান্তর মাত্র। সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা অবশ্য নানা বিচারের অবতারণা করেছেন। যেমন: "কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, যেমন তিল প্রভৃতির মধ্যে তৈলাদি থাকে, তদ্রূপই কি মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে? এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে? সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি কি প্রকৃত স্থলে ঠিকই হইয়াছে? ঘট ও বস্ত্রাদি পদার্থ সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঠিক যেরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং তৎদ্বারা জলাহরণাদি কার্য করিতেছেন, ঐ ঘটাদি পদার্থ কি বস্তুত পূর্ব হইতেই ঠিক সেইরূপেই মৃত্তিকাদির মধ্যে ছিল? তাহা হইলে আর ঐ ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্বে, 'ঘট হয় নাই', 'ঘট হইবে' 'বস্ত্র হয় নাই', 'বস্ত্র হইবে', ইত্যাদি কথা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ও ত তখন ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্বে পূর্বোক্তরূপ বাক্যের দ্বারা ঘটত্বাদিরূপে ঘটাদি পদার্থের অসত্তা প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদিগেরও স্বীকার্য। ফলকথা, ধান্যের মধ্যে যেমন পূর্ব হইতেই তণ্ডুলত্বরূপে তণ্ডুলের সত্তা আছে, তদ্রূপ পূর্ব হইতেই মৃত্তিকার মধ্যে ঘটত্বরূপে ঘটের সত্তা আছে এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্রত্বরূপে বস্ত্রের সত্তা আছে, ইহা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না।"[২৯৬]

সৎকার্যবাদ-বনাম-অসৎকার্যবাদের বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এখানে নৈয়ায়িকদের প্রতি একটি মন্তব্য অবান্তর হবে না। অসৎকার্যবাদের চরম সমর্থক হিসাবে তাঁদের পক্ষে লোকায়ত-প্রদর্শিত মদশক্তির দৃষ্টান্তটিকে অবজ্ঞা ও বর্জন করা কি সত্যিই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? কেননা এই দৃষ্টান্তটিকেই অসৎকার্যবাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসাবে গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ বর্তমান। গুড়-তণ্ডুলাদি মদ্যাঙ্গগুলির মধ্যে মদশক্তি নামক গুণ বা ধর্মটির ঐকান্তিক অভাব সর্বজন-স্বীকৃত, অথচ এগুলিই মদ্যরূপ কার্যে পরিণত হলে তা অত্যন্ত

২৯৫। 'ন্যায়সূত্র', ৪।১।৪৯। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৪।২৩০-২৪১।

২৯৬। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৪।২৩৩।

প্রকটভাবেই মূর্ছাজননসমর্থ হয়। কিংবা, যা একই কথা, গুড়তণ্ডুলাদি-রূপ কারণ এবং মত্তরূপ কার্যের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য সর্বস্বীকৃত এবং তা লোকব্যবহারসিদ্ধও। অর্থাৎ, সেকালের বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অসৎকার্যবাদ সমর্থক উদাহরণের মধ্যে এই মদশক্তির উদাহরণটিই উৎকৃষ্ট হিসাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু লোকায়তবিরোধী প্রবল মনোভাবের ফলে, এবং বিশেষত এই দৃষ্টান্তটির সাহায্যে দেহাত্মবাদ প্রমাণিত হবার আশঙ্কায়, নৈয়ায়িকেরা স্বযূথপ্রতিপাদ্য অসৎকার্যবাদের এই উৎকৃষ্ট উদাহরণটির সুযোগ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন। শুধু তাই নয়। লোকায়তমত খণ্ডনের উৎসাহে তাঁরা এমন কি অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদকেই উপেক্ষা করে বস্তুতপক্ষে সৎকার্যবাদের কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করবারও উপক্রম করেছেন। যেমন একালের মহানৈয়ায়িক ফণিভূষণ দেহাত্মবাদ খণ্ডনের যুক্তি হিসাবে বলছেন, "শরীরের মূল কারণে চৈতন্য না থাকিলে শরীরেও চৈতন্য থাকিতে পারে না। গুড়তণ্ডুলাদি যে সকল দ্রব্যের দ্বারা মদ্য জন্মে, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যেই মদশক্তি বা মাদকতা আছে, ইহা স্বীকার্য।"[২৯৭] বিশেষত নৈয়ায়িক-দের রচনায় এ জাতীয় যুক্তি অত্যাশ্চর্য বলেই প্রতীত হয়। কেননা, ন্যায়মতে প্রবৃত্তিসামর্থ্য বা সফল-প্রবৃত্তি-জননত্বই প্রামাণ্য-পরিচায়ক[২৯৮]। পুষ্করিণীতে জলজ্ঞান প্রামাণ্য বা নির্ভুল, কেননা সেই জল পান করে বাস্তবিকই তৃষ্ণানিবারণ হয়; পক্ষান্তরে মরীচিকায় জলজ্ঞান অপ্রামাণ্য বা ভুল, কেননা সেই জলপানে তৃষ্ণানিবারণ হয় না। সহজ কথায়, যে-জ্ঞান বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সার্থক সেই জ্ঞানই নির্ভুল এবং যে-জ্ঞান বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অসার্থক তা ভুল। অতএব, গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যেই মদশক্তি বা মাদকতা বর্তমান কিনা—এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের কাছে চরম প্রশ্ন হবে: গুড়, তণ্ডুল, প্রভৃতি সেবনে বাস্তবিকই নেশা হয় কিনা, বা, নেশার প্রবৃত্তি গুড়তণ্ডুলাদি সেবনেই সফল হয় কিনা? বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। কেননা, নেশার প্রবৃত্তি সফল করার উদ্দেশ্যে কেউই গুড়তণ্ডুলাদি সেবন করে না এবং গুড়তণ্ডুলাদি সেবনেই নেশা হয় না। অতএব, গুড়তণ্ডুলাদি প্রতিটি দ্রব্যেই মাদকতা বা মদশক্তি বর্তমান—এ জাতীয় উক্তি এমন কি তর্কের খাতিরেও নৈয়ায়িকদের রচনায় সমীচীন নয়। দ্বিতীয়ত, মূল কারণে যে-গুণ অবর্তমান কার্যেও তা অবর্তমান হতে বাধ্য, বা, কার্যে যে-গুণ বর্তমান কারণেও তা বর্তমান হতে বাধ্য—এই দাবি আরম্ভবাদী বা অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িকদের পক্ষে "বিরুদ্ধ"

২৯৭। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।২৭২।

২৯৮। বাৎস্যায়ন, ন্যায়ভাষ্য—ভূমিকা।

হয় না কি? স্বীকৃত সিদ্ধান্তর ব্যাঘাতকেই "বিরুদ্ধ" আখ্যা দেওয়া হয়।[২৯৯] অতএব সিদ্ধান্ত হয়, দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রবল উৎসাহে নৈয়ায়িকদের পক্ষে মদশক্তির দৃষ্টান্তটিকে উপেক্ষা করাই সমীচীন নয় এবং এই দৃষ্টান্তকে বর্জন করতে গিয়ে তাঁরা এমনকি অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ পরিহারেরও উপক্রম করেছেন।

অবশ্য, নৈয়ায়িকেরা[৩০০] —এবং অন্যান্য আত্মবাদীরাও[৩০১] দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আরো বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এগুলির প্রতিটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এ জাতীয় যুক্তির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে বর্তমান আলোচনাকে অত্যন্ত দীর্ঘবিস্তৃত করাও নিষ্প্রয়োজন। অতএব, আত্মবাদীদের পক্ষ থেকে প্রযুক্ত চরম যুক্তিটির বিচার করেই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস সংক্রান্ত বর্তমান আলোচনা শেষ করা যাক।

প্রথমে যুক্তিটির সরলার্থ ব্যাখ্যার চেষ্টা করবো। এবং সরলার্থ বলতে এককথায় হল: স্মৃতির সাক্ষ্য। বাল্যে উপলব্ধ বিষয়ের যৌবনে স্মরণ হয়, যৌবনে উপলব্ধ বিষয়ের বার্ধক্যে স্মরণ হয়। কিন্তু কার স্মরণ হয়? স্মরণ-কর্তা বলতে কি বা কে? লোকায়তিকেরা বলেন, দেহই আত্মা; অতএব দেহাতিরিক্ত কোন স্মরণকর্তা তাঁরা স্বীকার করতে পারেন না। অতএব স্মৃতির ব্যাখ্যায় তাঁরা দাবি করতে বাধ্য যে দেহরই স্মরণ হয়; স্মরণকর্তা দেহমাত্রই। কিন্তু এই দাবি স্পষ্টই অসম্ভব। কেননা, দেহ নিত্যপরিবর্তন-শীল। বাল্যদেহ ও যুবদেহ এক নয়; তেমনি যুবদেহ ও বৃদ্ধদেহের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য বর্তমান—রামের দেহ ও শ্যামের দেহর মধ্যে যে-রকম পার্থক্য বর্তমান সেই রকমই। কোন একটি দেহের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ের অন্যদেহর পক্ষে স্মরণ অসম্ভব। অতীতে রামের দেহ যা অনুভব করেছিলো পরবর্তী-কালে শ্যামের দেহ সেই বিষয় স্মরণ করছে—একথা বলা অবশ্যই হাস্যকর হবে। তেমনি বাল্যদেহে অনুভূত বিষয়ে যুবদেহর স্মরণ অসম্ভব, যুবদেহে অনুভূত বিষয়ে বৃদ্ধদেহর স্মরণ অসম্ভব। অতএব, দেহমাত্রই বা নিছক দেহই স্মরণকর্তা হতে পারে না। স্মরণকর্তা হিসাবে দেহাতিরিক্ত কোন নিত্য পদার্থ স্বীকার্য, সেই নিত্যপদার্থকেই আত্মবাদীরা আত্মা আখ্যা দেন। সংক্ষেপে, স্মৃতির সাক্ষ্য থেকেই আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রমাণ হয়।

আত্মবাদীদের পক্ষ থেকে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে—এবং, আমরা অচিরে

২৯৯। 'ন্যায়সূত্র', ১।২।৬॥

৩০০। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।২৬৪-২৭৭; ৩।৩০৫-৩১০; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩০১। 'শারীরক ভাষ্য' ২।২।২; ৩।৩।৫৪; 'তর্করহস্যদীপিকা', পৃ ১৪৩-১৫১; ইত্যাদি।

দেখবো, বস্তুতপক্ষে ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদের[৩০২] বিরুদ্ধেও—মূলত এই যুক্তিই বারবার প্রদর্শিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য[৩০৩] যেমন অত্যন্ত সংক্ষেপে বলছেন, "উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মা, ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বঞ্চোপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ। 'অহমিদমদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তরযোগেঽপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ।" অর্থাৎ "আমরা আত্মাকে উপলব্ধিস্বরূপ বলিয়া জানি এবং উপলব্ধির বা আত্মার একরূপতা বা অভেদ থাকায় নিত্যতা ও দেহাতিরিক্ততা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করি। 'অহমিদমদ্রাক্ষং—আমি ইহা দেখিয়াছি', এইরূপ জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞান অন্য অবস্থাতেও অব্যভিচরিত দৃষ্ট হয়। তৎকালে ও এতৎকালে একই উপলব্ধা আমি, অথবা একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তদবস্থর উপলব্ধা। যেহেতু একই উপলব্ধা ত্রিকালব্যাপী, সেইহেতু স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন হয়। বিভিন্ন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্মৃত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপ প্রাপ্ত হইত।"[৩০৪]

দেহাত্মবাদখণ্ডন প্রসঙ্গেই শঙ্করাচার্য এই যুক্তিপ্রয়োগ করেছেন। তাঁর মূল দাবি হল, প্রত্যভিজ্ঞান ও স্মৃতি থেকেই প্রমাণ হয়, আত্মা দেহাতিরিক্ত ও নিত্য। কিন্তু শঙ্করাচার্য যে-ভাবে যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন তার কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতাও লক্ষণীয়। কেননা, প্রত্যভিজ্ঞা [অর্থাৎ, "আমি এই বস্তু পূর্বে দেখেছি"—এই জাতীয় জ্ঞান] এবং স্মৃতি প্রভৃতির নজির থেকে অনুভবকর্তার নিত্যত্ব বা ত্রিকালব্যাপকত্ব দাবি করার সুযোগ থাকলেও শুধুমাত্র এই নজির থেকেই অনুভবকর্তার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের যুক্তি সুস্পষ্ট নয়; এই দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আরো প্রমাণ করা প্রয়োজন যে দেহ নিত্যপরিবর্তনশীল বলেই তা ওই ত্রিকালব্যাপী বা নিত্য অনুভবকর্তা হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে নৈয়ায়িকেরা বিস্তৃতভাবেই সেই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

নৈয়ায়িকদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত এই যুক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে প্রথমে জয়ন্তভট্টর রচনা উদ্ধৃত করা যাক। কিন্তু এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য

৩০২। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা লোকায়তিকদের মতো দেহকেই আত্মা বলে বিবেচনা করেন না; কিন্তু তাঁরা আত্মা নামের কোন নিত্য পদার্থও মানেন না। তাঁদের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্তান বা চেতনা-প্রবাহই আত্মাপদবাচ্য। বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িকেরা স্মৃতির সাক্ষ্য থেকে নিত্য আত্মা প্রমাণ ক'রে একঢিলে দুই পাখি মারার মতোই দেহাত্মবাদ ও ক্ষণভঙ্গবাদ উভয়ই নিরসন করতে চান, যদিও—বিশেষত পরবর্তীকালে—স্মৃতির সাক্ষ্য সংক্রান্ত এই যুক্তিটি মূলতই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

৩০৩। 'শারীরকভাষ্য', ৩।৩।৫৪।

৩০৪। ব্যাখ্যামূলক তর্জমা—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

বোঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে ন্যায়মতে[৩০৫] ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি গুণের আশ্রয় হিসাবেই দেহাতিরিক্ত ও নিত্য আত্মার প্রমাণ হয়। এই যুক্তিটি দুভাগে ভেঙে নেওয়া যায়। এক: ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি স্মৃতির পরিচায়ক। দুই: স্মৃতি দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার পরিচায়ক। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি স্মৃতির পরিচায়ক কেন? ন্যায়মতে ইচ্ছা হল হিত-প্রাপ্তির চেষ্টা; দ্বেষ হল অহিত-পরিহারের চেষ্টা। যে-জাতীয় বস্তুকে লাভ করে পূর্বে সুখ অনুভব করেছিলাম পরবর্তীকালে সেই জাতীয় বস্তু উপলব্ধি করলে তার সুখসাধনতা স্মরণ হয়, ফলে তা গ্রহণ করবার ইচ্ছা জন্মায়। তেমনি, যে-জাতীয় বস্তুকে লাভ করে পূর্বে দুঃখ অনুভব করেছিলাম পরবর্তীকালে সেই জাতীয় বস্তু উপলব্ধি করলে তার দুঃখসাধনতা স্মরণ হয়, ফলে তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অতএব, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি স্মরণ-নির্ভর। কিন্তু দেহ নিত্যপরিবর্তনশীল। তাই বলা যায় না যে দেহরই স্মরণ হয়। ফলে স্মরণকর্তা—অতএব ইচ্ছাদি গুণের আশ্রয়—হিসাবে দেহাতিরিক্ত আত্মাই অনুমিত হয়।

চার্বাকরা বলবেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই; অতএব ইচ্ছাদি গুণের আশ্রয়ও দেহই। এই পূর্বপক্ষ খণ্ডনে জয়ন্তভট্ট[৩০৬] বলছেন:

কিন্তু যদি বলা যায়, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি দেহতেই আশ্রিত হবে, বৃহস্পতি যেমন বলেছেন, "ভূতসমূহেরই চৈতন্য"। ইতিপূর্বে উক্ত হয়েছে, মদশক্তির মতো জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি।

উত্তরে বলি, ইচ্ছাদির আশ্রয় শরীর হতে পারে না। যেহেতু, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, প্রভৃতি অবস্থাভেদে শরীরও ভিন্ন। [তাৎপর্য এই যে,] একজনের উপলব্ধ বস্তু অপরজন স্মরণ করতে পারে না; একজনের স্মৃত বস্তুতে অন্যের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না [কেননা, আগেই দেখানো হয়েছে যে ইচ্ছা পূর্বানুভূত বিষয়ের সুখসাধনতার স্মরণ-নির্ভর]। অতএব অর্থের (বা বিষয়ের) প্রথম জ্ঞান থেকে শুরু করে ইচ্ছার উৎপত্তি পর্যন্ত যে-একই কার্যচক্র তার কোন একটি আশ্রয় স্বীকার করতে হবে। শরীর যেহেতু বাল্যাদি অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সেইহেতু শরীর তার (অর্থাৎ, উক্ত কার্যচক্রের) আশ্রয় হতে পারে না—সন্তানান্তরের মতোই। যে-রকম দেবদত্তের উপলব্ধ বিষয়ে যজ্ঞদত্তের স্মরণ হয় না সেইরকমই বাল্যশরীরে অনুভূত বিষয়ে যুবশরীরের স্মরণ হবে না।

আপত্তি উঠবে: কেবল অবস্থাই ভিন্ন, অবস্থাত শরীর-স্বরূপ

৩০৫। 'ন্যায়সূত্র' ১।১।১০।

৩০৬। জয়ন্তভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী' (চৌখম্বা সং), ২।১০-১১।

অভিন্নই—প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যয়ের দ্বারাই তা প্রমাণ হয়। [অর্থাৎ, চার্বাকেরা আপত্তি তুলে' বলবেন, বাল্য, যৌবন, প্রভৃতি বস্তুতপক্ষে শরীরভেদের পরিচায়ক নয়; পক্ষান্তরে এগুলি একই শরীরের শুধুমাত্র অবস্থাভেদেরই পরিচায়ক; সেই একই শরীর এই বিভিন্ন অবস্থাগুলির অধিষ্ঠাতৃ। প্রমাণ প্রত্যভিজ্ঞা। অর্থাৎ, পূর্বে দেবদত্তকে দেখেছিলাম; বর্তমানে দেবদত্তকে দেখে প্রত্যভিজ্ঞা নামের এই জ্ঞান হয় যে: "এই সেই দেবদত্ত।" পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তর শরীর যদি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে থাকে—বা, তা যদি শরীরান্তরে পরিণত হয়ে থাকে—তাহলে বর্তমানে শরীরান্তর দর্শন করে "এই সেই দেবদত্ত" বলে তাকে চেনাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তাকে দেবদত্ত হিসাবেই চিনতে পারি। তা থেকেই প্রমাণ হয় যে পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তর শরীর বস্তুতপক্ষে শরীরান্তরে পরিণত হয়নি। তার একই শরীর নিশ্চয়ই বর্তমান, পরিবর্তন হয় শুধু শরীরের অবস্থা বিশেষেরই। অর্থাৎ, বালক দেবদত্ত যুবক দেবদত্তে পরিণত হওয়া মানে দেবদত্তর শরীর বদলে শরীরান্তরে—যথা যজ্ঞদত্তর শরীরে—পরিণত হওয়া নয়, দেবদত্তর শরীরেই বাল্যাবস্থা বদলে যুবাবস্থায় পরিণত হওয়া ॥]

[চার্বাকরা আরো বলবেন, তাদের কথার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে কেউ হয়ত বলবেন,] "এই প্রত্যভিজ্ঞা অন্যথাসিদ্ধ, ছিন্ন পুনর্জাত নখাদির প্রত্যভিজ্ঞার মতো।" কিন্তু সেকথাও বলা যায় না। কারণ বিনাশ অসম্ভব। স্তম্ভ প্রভৃতিতে ক্ষণিকত্বের প্রতিষেধ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারাই করা হবে; এখানেও [অর্থাৎ, শরীরের ক্ষেত্রেও] সেইরূপ করা হোক।

[চার্বাকপক্ষ বর্ণনায় জয়ন্তভট্ট আরো দেখাচ্ছেন যে চার্বাকরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, "এই সেই দেবদত্ত"—এ জাতীয় প্রত্যভিজ্ঞা নামের জ্ঞান থেকেই প্রমাণ হয় যে দেবদত্তর শরীর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে শরীরান্তরে পরিণত হয়নি, কেননা তা হলে তাকে পুরাণো দেবদত্ত বলে চেনাই যেতো না।

[এই যুক্তির বিরুদ্ধে চার্বাক-বিরোধীরা দাবি করতে পারেন যে প্রত্যভিজ্ঞা নামের আলোচ্য জ্ঞান থেকে একই দেহের শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তনই প্রমাণ হয় না। পূর্বদেহ বদলে প্রকৃতপক্ষে দেহান্তরে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য প্রত্যভিজ্ঞার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব। অর্থাৎ, পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তর শরীর সম্পূর্ণ বদলে গেলেও তাকে "এই সেই দেবদত্ত" বলে চেনবার—বা, আসলে ভুল করবার—অন্য ব্যাখ্যাও আছে। কী ব্যাখ্যা? যেমন, নখ কেটে ফেলার পর নূতন নখ পুনর্জাত হলেও তাকে "এই সেই নখ" বলে মনে হতে পারে।

তেমনি, দেবদত্তর শরীর বদলে সম্পূর্ণ অন্য শরীরে পরিণত হলেও তাকে সেই একই দেবদত্ত বলে মনে হতে পারে।

[কিন্তু চার্বাকেরা বলবেন, তাঁদের বক্তব্যর বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা এই যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন না। কেননা, প্রত্যভিজ্ঞার নজির দেখিয়েই তো নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন। বৌদ্ধরা বলেন, সবই ক্ষণিক; অতএব স্তম্ব—বা নীবার ধান কেটে নেবার পর অবশিষ্ট গুঁড়ি—ক্ষণিক। প্রতিক্ষণে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং অন্য স্তম্বে পরিণত হয়। ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরাই যুক্তি দেখান, স্তম্ব প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিক হলে পূর্বদৃষ্ট স্তম্বকে পরবর্তীকালে "এই সেই স্তম্ব" বলে চেনার সম্ভাবনা থাকতো না। কিন্তু স্তম্বর প্রত্যভিজ্ঞা হয় এবং এই প্রত্যভিজ্ঞা থেকেই স্তম্বর ক্ষণিকত্ব নিরসিত হয়। অতএব, চার্বাকরা বলবেন, যে-প্রত্যভিজ্ঞার নজির দেখিয়ে নৈয়ায়িকেরা স্তম্বর ক্ষণিকত্ব নিরসন করেন তারই নজির দেখিয়ে আমরাও দাবি করতে পারি যে পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তর শরীর পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন শরীরে পরিণত হয় না। কেননা, পরবর্তীকালেও আমরা তাকে "এই সেই দেবদত্ত" বলেই চিনে থাকি।]

[চার্বাকদের বিরুদ্ধে জয়ন্তভট্ট মন্তব্য করেছেন,] একথা যুক্তিযুক্ত নয়। স্তম্ব প্রভৃতিতে নানাত্বরূপ কারণের জ্ঞান না-হওয়ায়। কিন্তু এখানে [অর্থাৎ, দেহর দৃষ্টান্তে] রূপ, পরিমাণ, পরিবেশ প্রভৃতির অন্যত্ব (বা পার্থক্য) থাকায় এই প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তিই। শিশু-শরীর, তরুণ-শরীর ও বৃদ্ধ-শরীরে একই পরিমাণাদি দেখা যায় না।

[অর্থাৎ, জয়ন্তভট্ট দাবি করছেন, স্তম্ব প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রত্যভিজ্ঞা থেকে ক্ষণিকত্ব বাস্তবিকই নিরসিত হয়, কিন্তু শরীরের দৃষ্টান্তে তথা-কথিত প্রত্যভিজ্ঞা আসলে সাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তিই; অতএব তার নজির দেখিয়ে শরীরান্তরপ্রাপ্তির নিরসন হয় না। কিন্তু, স্তম্বর প্রত্যভিজ্ঞা কেন প্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞা এবং শরীরের তথাকথিত প্রত্যভিজ্ঞা আসলে কেন সাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তিমাত্র? কেননা, পূর্বদৃষ্ট স্তম্বকে পরে যখন "এই সেই স্তম্ব" বলে চিনি তখন স্তম্বতে নানাত্বরূপ জ্ঞান হয় না; পূর্বদৃষ্ট স্তম্ব এবং পরবর্তীকালে দৃষ্ট স্তম্ব উভয়ই হুবহু একই স্তম্ব হিসাবে প্রতীত হয়। কিন্তু শরীরের দৃষ্টান্তে তা হয় না। পূর্বদৃষ্ট বালক দেবদত্তকে পরবর্তীকালে বৃদ্ধ দেবদত্ত হিসাবে চেনবার সময় উভয়ের মধ্যে বিবিধ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, রূপের পার্থক্য: বালক দেবদত্ত ও বৃদ্ধ দেবদত্তর রূপ এক নয়। তেমনি, পরিমাণের পার্থক্য: দৈর্ঘ্য, ওজন প্রভৃতির দিক থেকেও বালক ও বৃদ্ধ দেবদত্ত অত্যন্ত পৃথক। তাছাড়া,

পরিবেশের পার্থক্যও : পিতামাতা পরিবৃত বালক দেবদত্তর সঙ্গে পৌত্র-পৌত্রী পরিবৃত বৃদ্ধ দেবদত্তর পরিবেশের অনেক তফাত। এই মৌলিক পার্থক্যগুলি মনে রাখলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে উভয় দেবদত্ত এক নয়। তাহলে "এই সেই দেবদত্ত" রূপে প্রত্যভিজ্ঞা বস্তুত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞাই নয়। জয়ন্তভট্ট তাই এজাতীয় জ্ঞানকে সাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তি আখ্যা দিয়েছেন : বালক ও বৃদ্ধ শরীরের মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য বর্তমান এবং এই সাদৃশ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আমরা মনে করি উভয় শরীরই বুঝি এক বা অভিন্ন !]

[পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীর যে প্রকৃতপক্ষে ভিন্নই, এ বিষয়ে জয়ন্তভট্ট চূড়ান্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—] আহারের পরিণাম থেকে দেহর ভেদ অবগত হওয়া যায়। নতুবা, পাকজ-উৎপত্তির দ্বারা অন্ন জীর্ণ হোতো না ; দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষণ সত্ত্বেও পুষ্টি হোতো না। কাঞ্চনাদি উপযোগের ফলে তার (শরীরের) রক্ততা (রক্তবৃদ্ধি) দেখা যায়। কতকগুলি ক্ষীণ অবয়ব-বিশিষ্ট অথবা কতকগুলি অভিনব অবয়ব-বিশিষ্ট অবয়বী কেমন করে অভিন্ন হয় ?

[অর্থাৎ খাদ্যাদি হজম হলে তা দেহর পুষ্টি সাধন করে, অতএব দেহই বদলে যায়। দুধ দই খাবার আগে শরীরের অবয়বগুলি ক্ষীণ ছিল, খাবার পরে অবয়বগুলি পুষ্ট হল। অতএব, কেমন করে বলা যায় যে শরীরী বা অবয়বী একই রইল ? তেমনি, ধাতুবিশেষ দেহে রক্তবৃদ্ধি করে, অর্থাৎ অভিনব বা নূতন অবয়ব সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও কী করে বলা যায় যে শরীরী বা অবয়বী অভিন্ন থাকে ? খাদ্যাদি পরিপাকের ফলে অবয়বের পরিবর্তন বা অভিনব অবয়বের যোগ থেকেই প্রমাণ হয় যে পূর্বশরীর বস্তুতপক্ষে শরীরান্তরেই পরিণত হয়।]

অতএব, সংক্ষেপে, স্বীকার করতেই হবে যে পূর্বশরীর ও পরবর্তী শরীর এক নয়। এবং বর্তমানে পূর্ব শরীরই অবর্তমান বলে আরো স্বীকার করতে হবে যে পূর্বশরীর অনুভূত বিষয়ের স্মরণকর্তা পরবর্তী শরীর হতে পারে না —অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তা ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। তাই শরীরকেই স্মরণ-কর্তা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, শরীর-অতিরিক্ত আত্মা নিত্য : সেই আত্মাই পূর্বে অনুভবকর্তা ও পরে স্মরণকর্তা হতে পারে। তাই স্মরণের সাক্ষ্য থেকেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য নৈয়ায়িকেরাও মূলত এই চরম যুক্তিই প্রদর্শন করেছেন। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ[৩০৭] যেমন মন্তব্য করছেন,

৩০৭। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।২৭২-৩।

"পূর্বোক্ত ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিতে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে, শরীরই চেতন হইলে পূর্বানুভূত বস্তুর কালান্তরে স্মরণ হইতে পারে না। বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধকালেও স্মরণ হইয়া থাকে। কিন্তু বাল্যকালের সেই শরীর বৃদ্ধকালে না থাকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও বিনষ্ট হওয়ায় তখন কোনরূপেই সেই বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। অর্থাৎ শরীরের হ্রাস ও বৃদ্ধিবশতঃ পূর্বশরীরের বিনাশ ও শরীরান্তরের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বালক শরীর হইতে যুবক শরীরের এবং যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের পরিমাণের ভেদ হওয়ায় সেই সমস্ত শরীরকেই একশরীর বলা যাইবে না। কারণ পরিমাণের ভেদে দ্রব্যের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। পরন্তু প্রতিদিনেই শরীরের হ্রাস ও বৃদ্ধিবশত শরীরের ভেদ সিদ্ধ হইলে পূর্বদিনে অনুভূত বস্তুর পরদিনেও স্মরণ হইতে পারে না। শরীরের প্রত্যেক অবয়বে চৈতন্য স্বীকার করিলেও হস্তাদি কোন অবয়বের বিনাশ হইলে সেই হস্তাদি অবয়বের অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। অনুভবিতার বিনাশ হইলে তৎগত সংস্কারেরও বিনাশ হওয়ায় সেই সংস্কারজন্য স্মরণ অসম্ভব। ঐ সংস্কারের বিনাশ হয় না, কিন্তু পরজাত অন্য শরীরে উহার সংক্রম হওয়ায় তৎদ্বারা সেই পরজাত অন্য শরীরও পূর্বশরীরের অনুভূত বস্তু স্মরণ করিতে পারে, ইহাও বলা যায় না। কারণ সংস্কারের ঐরূপ সংক্রম হইতেই পারে না। সংস্কারের ঐরূপ সংক্রম হইলে মাতার সংস্কারও গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে। তাহা হইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভস্থ সন্তান স্মরণ করিতে পারে। উপাদান কারণস্থ সংস্কারই তাহার কার্যে সংক্রান্ত হয়, মাতা সন্তানের উপাদান কারণ না হওয়ায় তাহার সংস্কার সন্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে না,—ইহা বলিলেও পূর্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ শরীরের কোন অবয়ব ধ্বংস হইলে অবশিষ্ট অবয়বগুলির দ্বারা সেখানে শরীরান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে অবয়ব বিনষ্ট হইয়াছে তাহা ঐ শরীরান্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সেই বিনষ্ট অবয়বস্থ সংস্কার শরীরান্তরে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পূর্বে যে বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, তখন তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না। পূর্বে যে হস্ত কোন বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, তখন সেই হস্তেই সেই অনুভবজন্য সংস্কার জন্মিয়াছিল। ঐ হস্ত বিনষ্ট হইলেও তাহার পূর্বানুভূত সেই বস্তুর স্মরণ হয়, ইহা ভূতচৈতন্যবাদীরও স্বীকার্য। কিন্তু তাহার মতে এখন সেই পূর্বানুভবের কর্তা সেই হস্ত ও তদ্‌গত সংস্কার না থাকায় তজ্জন্য সেই পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ কোনরূপেই সম্ভব নহে।"

দেহাত্মবাদের নিরসনে এবং আত্মবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে এজাতীয় যুক্তির

সার্থকতা প্রসঙ্গে আমরা অনিবার্যভাবেই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বিতর্কের গণ্ডি ছেড়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হবো। আমরা অচিরেই তার যুক্তি দেখতে পাবো। কিন্তু সে-আলোচনা উত্থাপনের পূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনের বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রথমত মনে রাখা প্রয়োজন, নৈয়ায়িকদের উপরোদ্ধৃত রচনায় যে-বিচারের পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত নয়। বস্তুতপক্ষে, এই বিচারের উপর নির্ভর করে নৈয়ায়িকেরা একাধারে দুটি মত খণ্ডন করতে চান। এই দুটি মতের মধ্যে একটি হল বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ, অপরটি লোকায়তিক দেহাত্মবাদ।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। এই কারণে তাঁদের মত নৈরাত্ম্যবাদ নামেই প্রসিদ্ধ।[৩০৮] বৌদ্ধ দার্শনিকরা নেহাতই ঔপচারিক অর্থে আত্মা শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করতেন।[৩০৯] অবশ্যই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন, অতএব তাঁদের মধ্যে নানা মতভেদও পরিদৃষ্ট হয়। ফলে, নিত্য আত্মার পরিবর্তে তাঁরা ঠিক কিসের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন—এই প্রশ্নের কোন সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্ভব নয়। 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়নভাষ্য থেকে প্রতীত হয় যে প্রাচীন কালের বৌদ্ধরা নিত্য আত্মার পরিবর্তে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-ও-বেদনার সংঘাতমাত্রই স্বীকার করতেন।[৩১০] অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ মন্তব্য করেছেন, "বৈভাষিকমতে পঞ্চস্কন্ধাত্মক সন্তানই আত্মার স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই কারণেই ইহা 'নৈরাত্ম্যবাদ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"[৩১১] অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরা অবশ্য নিত্য আত্মার পরিবর্তে শুধু বিজ্ঞান-সন্তান বা চেতনা-প্রবাহ স্বীকার করতেন। কিন্তু এজাতীয় সাম্প্রদায়িক পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত বৌদ্ধই ক্ষণিকবাদী। অতএব কোন বৌদ্ধ দার্শনিকই নিত্য আত্মায় বিশ্বাসী নন। এবং এই অর্থে বৌদ্ধরা সকলেই নৈরাত্ম্যবাদী।

৩০৮। অবশ্য ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।৮, মন্তব্য করেছেন, "পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বৌদ্ধ মত বলিয়া নানাগ্রন্থে নানামতের উল্লেখ ও সমর্থন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে বেদ-সিদ্ধ নিত্য আত্মার অস্তিত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।" কিন্তু এই মন্তব্যর প্রকৃত ভিত্তি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়; পক্ষান্তরে আমাদের কাছে এ কথাই সুস্পষ্ট যে প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ মত নৈরাত্ম্যবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

৩০৯। অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ, 'বৈভাষিক দর্শন' ১৮৮।

৩১০। 'ন্যায়সূত্র', তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

৩১১। অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ 'বৈভাষিক দর্শন' ২৫০

বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ এবং লোকায়তিক দেহাত্মবাদ অবশ্যই এক নয়। বস্তুতপক্ষে, নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধদের রচনাতেও[৩১২] লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ আয়োজন দৃষ্ট হয়। তবু 'আত্মবাদ-বিরোধী' অর্থে নৈরাত্ম্যবাদ এবং দেহাত্মবাদের মধ্যে সাদৃশ্যও উপেক্ষণীয় নয়। এবং এই কারণেই নিত্য আত্মায় বিশ্বাসী নৈয়ায়িকদের পক্ষে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনের দার্শনিক প্রয়োজন লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের চেয়ে আসলে কম নয়। বস্তুতপক্ষে গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' থেকে শুরু করে উদয়নের 'আত্মতত্ত্ববিবেক' পর্যন্ত নৈয়ায়িকদের বহু রচনায় বিশেষ প্রয়াস হল বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদেরই নিরসন।

আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে এখানে একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। জয়ন্তভট্ট ও ফণিভূষণের উপরোদ্ধৃত রচনা বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হলেও নৈয়ায়িকদের আলোচ্য বিচারের সফলতা আসলে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ নিরসনের সার্থকতার উপরই নির্ভরশীল। কেননা, স্মরণের সাক্ষ্য প্রদর্শন করে নৈয়ায়িকেরা এজাতীয় বিচারে প্রথমে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদনেরই প্রয়াস করেছেন, অর্থাৎ নিরসন করতে চেয়েছেন বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদই। এবং আত্মার সেই নিত্যত্বর নজির থেকেই তাঁরা আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস করেছেন।

অর্থাৎ, নৈয়ায়িকদের আলোচ্য বিচারের মূল কথা হল: স্মরণের সাক্ষ্য। কিন্তু স্মরণের এই সাক্ষ্য থেকে তাঁরা সরাসরিভাবে আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস করেননি; তার কোন সুস্পষ্ট সুযোগও দেখা যায় না। কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হলে সেই নিত্যত্বর সাক্ষ্য থেকেই আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের সুযোগ হয়। নৈয়ায়িকদের মূল যুক্তি এখানে দুই ভাগে বিভক্ত। বা, সোপান-আরোহণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে বলা যায় যে এ যুক্তির আসলে দুটি ধাপ আছে। যথা—

এক: পূর্বানুভূত বস্তুর কালান্তরে স্মরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে আত্মা নিত্য। কেননা, পূর্বকালের অনুভবকর্তা এবং পরবর্তীকালের স্মরণকর্তাকে এক বা অভিন্ন বলে স্বীকার না করলে স্মরণ নামক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

দুই: কিন্তু দেহ নিয়ত-পরিবর্তনশীল। 'অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তার

৩১২। যথা: শান্তরক্ষিত, 'তত্ত্বসংগ্রহঃ' কারিকা ১৮৭২-১৯৬৪ এবং কমলশীলের পঞ্জিকা। কিন্তু আমরা অচিরে দেখবো, নিত্য আত্মার অস্তিত্ব নিরসনে শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল স্পষ্টতই অংশবিশেষে লোকায়তিক মতেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

দেহ অভিন্ন নয়। অতএব এই দেহ ও স্মরণ-প্রতিপাদিত নিত্য আত্মার মধ্যে তাদাত্ম্য সম্ভব নয়। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য।

নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তি এই দুই ধাপে বিভক্ত হিসাবে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে দ্বিতীয় ধাপটির সার্থকতা মূলতই প্রথম ধাপটির সার্থকতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, স্মৃতির সাক্ষ্য থেকে প্রথমে যদি আত্মার নিত্যত্ব বাস্তবিকই প্রতিপাদিত হয় শুধুমাত্র তাহলেই—অর্থাৎ সেই নিত্যত্বর নজির থেকেই—আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদিত হতে পারে।

এখানে স্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে গৌতম, বাৎস্যায়ন প্রমুখ বৃদ্ধ নৈয়ায়িকেরাই স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদর্শন করে বিশেষত বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনেরই প্রয়াস করেছেন, অর্থাৎ স্মরণের নজির দেখিয়েই ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদের মত পরিহার করে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'ন্যায়সূত্র ৩।১।১৭'-র টিপ্পনীতে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ যেমন মন্তব্য করেছেন, "বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যখন বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, আত্মাও ক্ষণিক, তখন ক্ষণমাত্র স্থায়ী কোন আত্মাই পরে না থাকায়, পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে না পারায়, স্মরণের অনুপপত্তি দোষ অপরিহার্য। ভাষ্যকার (বাৎস্যায়ন) বৌদ্ধ মতে ঐ দোষই পুন পুনঃ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া, বৌদ্ধমতের সর্বথা অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন।"[৩১৩]

স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদর্শন করে নৈয়ায়িকেরা যে বিশেষত বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনেরই প্রয়াস করেছিলেন—ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির বিচারে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে তার আরো কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা অবান্তর হবে না। গৌতম বলেছেন, "জ্ঞ-স্বভাবতা প্রযুক্ত—অর্থাৎ, ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তিপ্রযুক্ত—আত্মারই স্মরণ (উপপন্ন হয়)।"[৩১৪] ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলছেন, "আত্মারই স্মরণ, বুদ্ধিসন্তানমাত্রের [অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের ক্ষণিক চেতনা প্রবাহেরই] স্মরণ নহে।...(প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন? (উত্তর) জ্ঞ-স্বভাবতা প্রযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, 'জ্ঞ' ইহা এই আত্মার স্বভাব কিনা স্বকীয় ধর্ম; এই জ্ঞাতাই জানিবে, জানিতেছে, জানিয়াছিল,—এইজন্য ত্রিকাল বিষয়ক অনেক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই জ্ঞাতার সেই 'জানিবে', 'জানিতেছে', 'জানিয়াছিল', এই-রূপ ত্রিকাল বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের আত্মাতে অনুভব সিদ্ধ আছে। সুতরাং যাহার এই (পূর্বোক্ত) স্বকীয় ধর্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাত্মক বুদ্ধিসন্তানমাত্রেরই নহে।"[৩১৫] একালের মহা-

---

৩১৩। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।৫৭।

৩১৪। 'ন্যায়সূত্র' ৩।২।৪০।

৩১৫। 'বাৎস্যায়ন ভাষ্য' ৩।২।৪০ : অনুবাদ ফণিভূষণ।

নৈয়ায়িক ফণিভূষণ টিপ্পনী করছেন, "স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ সম্মত যুদ্ধিসন্তানমাত্রের স্মরণ উপপন্ন হয় না…। স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন? এতদুত্তরে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন, 'জ্ঞ-স্বভাব্যাৎ'। ভাষ্যকার ঐ হেতুর ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে 'জ্ঞ' ইহাই আত্মার স্বভাব কিনা স্বকীয় ধর্ম। অর্থাৎ, জানিবে, জানিতেছে ও জানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই 'জ্ঞ' এই পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং 'জ্ঞ' শব্দের দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন জ্ঞানের আধার এই অর্থ বুঝা যায়। আত্মাই জানিয়াছিল, আত্মাই জানিবে এবং আত্মাই জানিতেছে, ইহা সমস্ত আত্মাই বুঝিয়া থাকে। আত্মার ঐ কালত্রয় বিষয়ক জ্ঞানসমূহ সমস্ত জীবই নিজের আত্মাতে অনুভব করে। সুতরাং ঐ ত্রিকালীন জ্ঞানের সহিত আত্মারই সম্বন্ধ, ইহা স্বীকার্য। উহাই আত্মার স্বভাব, উহাকেই বলে ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তি।…সুতরাং স্মরণরূপ জ্ঞানও আত্মারই গুণ, ইহা স্বীকার্য। বৌদ্ধ-সম্মত ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী বিজ্ঞানসন্তান পূর্বাপরকালস্থায়ী না-হওয়ায় পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণ তাহার গুণ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে আত্মা বলা যায় না,—ইহাই এখানে ভাষ্যকার মহর্ষি সূত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।…বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান-সন্তান যে আত্মা হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার আরো অনেক স্থলে অনেক বার মহর্ষির সূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই সমর্থন করিয়াছেন।"[৩১৬]

নৈয়ায়িকদের এ জাতীয় নানা উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদর্শন করে তাঁরা মূলতই বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন।

এই কথাটি মনে রেখে আমরা দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নৈয়ায়িকদের চরম যুক্তিটির আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, নৈয়ায়িকদের এই চরম যুক্তি বস্তুত দুই ভাগে বিভক্ত। এক: পূর্বানুভূত বস্তুর কালান্তরে স্মরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে আত্মা নিত্য। দুই: অতএব অনিত্য বা নিয়ত-পরিবর্তনশীল দেহই আত্মা হতে পারে না।

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এই যুক্তির দ্বিতীয়াংশের সার্থকতা বস্তুতপক্ষে প্রথমাংশের সার্থকতার উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কেননা, আত্মা অনিত্য হলে অনিত্য দেহর সঙ্গে তার তাদাত্ম্য কল্পনায় কোনই বাধা থাকে না। আত্মা নিত্য বলে প্রতিপাদিত হলে পরই অনিত্য দেহর সঙ্গে তার তাদাত্ম্য কল্পনায় সুস্পষ্ট বাধা হয়। কিংবা, যা একই কথা, নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তি অনুসারে আত্মার নিত্যত্ব থেকেই তার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদিত হয় এবং স্মৃতির সাক্ষ্য থেকে প্রতিপাদিত হয় আত্মার নিত্যত্ব।

৩১৬। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩।২৮৬।

অতএব, লোকায়তিক দেহাত্মবাদ নিরসনে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তির গুরুত্ব বিচারের জন্য অপর একটি প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন ঃ স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদর্শন করে নৈয়ায়িকেরা কি বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ নিরসনে বাস্তবিকই সফল হয়েছেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই সহজ নয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে প্রশ্নটির গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। কেননা, লোকায়তিক দেহাত্মবাদের সমর্থনে নৈয়ায়িকদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ কোন দিক্‌পাল দার্শনিকের কথা আমরা না জানলেও অন্তত বৌদ্ধ নৈরাত্ম্য-বাদের সমর্থনে নৈয়ায়িকদের সঙ্গে বিতর্করত নানা দিক্‌পাল দার্শনিকের কথা আমাদের জানা আছে। এবং তাঁরা ক্ষণভঙ্গবাদের সমর্থনে[৩১৭] —অতএব তথাকথিত আত্মারও অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে—নৈয়ায়িকদের বিশিষ্ট যুক্তিগুলি বিচারমূলকভাবেই খণ্ডন করার দাবি করেছেন[৩১৮]; আত্মার ক্ষণিকত্ব সমর্থন করেও স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য তাঁদের মতে অবশ্যই সম্ভব।

নৈয়ায়িক আত্মবাদ বনাম বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের বিতর্ক অবশ্য বিশাল ও জটিল। ভারতীয় দর্শনের পদ্ধতি ও পরিভাষা অনুসারে আমাদের পক্ষে বর্তমানে তা পর্যালোচনা করার সুযোগ হবে না। হয়ত শুধু এই বিতর্করই পর্যাপ্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। এবং আধুনিক কালের চিন্তাশীলদের পক্ষে উভয়পক্ষ সমর্থনেই নূতন যুক্তিতর্ক উদ্ভাবনের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা যায় না[৩১৯]। অর্থাৎ সংক্ষেপে, এই বিতর্কে বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে জয়-পরাজয় নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। অতএব—বিশেষত বৌদ্ধ পক্ষে দিক্‌পাল দার্শনিকের নাম মনে রাখলে—মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না যে পর্যাপ্ত বিচার ব্যাতিরেকে নৈয়ায়িকদের জয়ী বলে ঘোষণা করা আসলে সংস্কারমূলক চিন্তারই পরিচায়ক হবে।

দেহাত্মবাদের খণ্ডনে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তির মূল্য নির্ণয়ে এই মন্তব্যর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কেননা, আমরা দেখেছি, স্মরণের সাক্ষ্য প্রদর্শন করে নৈয়ায়িকেরা শেষ পর্যন্ত যেভাবে দেহাত্মবাদ নিরসনের দাবি করছেন তা মূলতই বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনের সার্থকতা-সাপেক্ষই।

৩১৭। বৈভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষণভঙ্গবাদ সমর্থনের পরিচয়ের জন্য অনন্তকুমার ন্যায়তর্ক-তীর্থ, 'বৈভাষিক দর্শন' ১০২-১৪৯ দ্রষ্টব্য।

৩১৮। যথা ঃ শান্তরক্ষিত, 'তত্ত্বসংগ্রহঃ' কারিকা ১৭১ ২২১ এবং কমলশীলের পঞ্জিকা।

৩১৯। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে আধুনিককালে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 'ন্যায়দর্শন'-এ যেমন ন্যায়মত সমর্থনের প্রয়াস করেছেন তেমনি অনন্তকুমার ন্যায়-তর্কতীর্থ 'বৈভাষিক-দর্শন'-এ ক্ষণভঙ্গবাদই বিচারমূলকভাবে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দর্শনের সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদের সমর্থনে আধুনিক চিন্তাশীল অনায়াসেই মন্তব্য করতে পারেন যে নৈয়ায়িকদের পক্ষে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের খণ্ডনই যেহেতু এখনো অন্তত বহুলাংশে বিচারাধীন সেইহেতু এই নৈরাত্ম্যবাদ খণ্ডনেরই উপসিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লিখিত দেহাত্মবাদ খণ্ডনের সার্থকতা অবশ্যই সংশয়সাপেক্ষ। কিংবা, সহজ ভাষায়, লোকায়ত পক্ষ থেকে অনায়াসেই বলা যায়, ভারতীয় দর্শনের পদ্ধতি ও পরিভাষা অনুসরণ করে নৈয়ায়িকেরা প্রথমে স্মরণের সাক্ষ্য থেকে আত্মার অনিত্যত্ব সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করুন, বা, আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদনে আরো যত্নবান হোন ; কেননা তা না হলে স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদর্শন করে শেষ পর্যন্ত আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব অবশ্যই নিষ্ফল হবে।

অবশ্যই ভারতীয় দর্শনের বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে এ জাতীয় মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক না হলেও আধুনিক কালের বস্তুবাদী বা দেহাত্মবাদীর পক্ষে শুধুমাত্র তার উপরই নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, স্মরণের সাক্ষ্য থেকে শেষ পর্যন্ত দেহাত্মবাদ নিরসন-প্রয়াসের নিদর্শন স্বরূপ ইতি-পূর্বে জয়ন্তভট্ট ও ফণিভূষণের যে রচনাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে—অর্থাৎ দেহাত্মবাদ-বিরোধী যে বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল আলোচ্য বিষয়—তা বিশ্লেষণ করলে আধুনিক বস্তুবাদীর কাছে বা দেহাত্মবাদের আধুনিক সমর্থকের কাছে কয়েকটি কথা সুস্পষ্ট হবে। এখানে সংক্ষেপে সেই কথাগুলি উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত, সেকালের লোকায়তিকের পক্ষে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত এ জাতীয় আপত্তির প্রকৃত উত্তর উদ্ভাবনের সম্ভাবনা ঐতিহাসিকভাবে অবর্তমান ছিল। দ্বিতীয়ত, একালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই আপত্তিগুলি সামগ্রিক ভাবেই সার্থকতাহীন বা নিষ্ফল, বিশেষত এই জাতীয় আপত্তির নজির প্রদর্শন করে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস অবশ্যই ব্যর্থ। তৃতীয়ত, একালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের দেহাত্মবাদসমর্থক যুক্তিতর্ক অনিবার্যভাবেই অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও এই দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারের পক্ষে অনুকূল ছিল ; পক্ষান্তরে দেহাত্মবাদ বিরোধীর বা আত্মবাদীর সুদৃঢ় সংস্কারই দীর্ঘকাল ধরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারের বিরুদ্ধে গভীর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, একালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের দেহাত্মবাদ-বনাম-আত্মবাদের আলোচ্য বিতর্ক অনেকাংশে ঐতিহাসিক কৌতূহলমাত্রে পরিণত হলেও, ঐতিহাসিক বিচারেই একথাও স্বীকার্য যে প্রাচীন লোকায়তিকদের মূলত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই পরবর্তীকালের উন্নততর সত্যান্বেষণের সহায়-সম্ভাবনা বর্তমান ছিলো এবং আত্মবাদীদের

দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুতপক্ষে. এই সত্যান্বেষণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধাই সৃষ্টি করেছিল।

আমরা ইতিপূর্বে আধুনিক বিজ্ঞানের নজিরের উপর মূল গুরুত্ব আরোপ না করেই সাধ্যমত ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসারে এবং ভারতীয় দর্শনের পরিভাষাতেই প্রাচীন দেহাত্মবাদ পর্যালোচনার প্রয়াস করেছি। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যর নজির বাদ দিলে আলোচনাটিই অবাস্তব হবার আশঙ্কা ঘটে। কেননা, জয়ন্তভট্ট ও ফণিভূষণের আলোচ্য রচনাংশ বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে নৈয়ায়িকেরাই এখানে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' দার্শনিক বিচারের গণ্ডি ছেড়ে অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব তথ্যর সাক্ষ্য অনুসারেই দেহাত্মবাদ-নিরসনের ও আত্মবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ফণিভূষণ-উক্ত শেষ যুক্তিটি বিশ্লেষণ করা যাক :

ফণিভূষণ দাবি করেছেন যে শরীরের অবয়ব-বিশেষ বিনষ্ট হলেও সেই অবয়বই অতীতে যে বস্তু অনুভব করেছিল তার স্মরণ অক্ষুণ্ণ থাকে। বলাই বাহুল্য, এই ঘটনাটি কোন দার্শনিক যুক্তি নয়; অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যমাত্র। এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই তথ্যর নজির থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে: অতএব শরীরের অবয়বগুলিই বা শরীরই অতীত অনুভবের স্মরণকর্তা হতে পারে না।

তাহলে, নৈয়ায়িকদের এই বা এই জাতীয় যুক্তির প্রকৃত ভিত্তি বলতে অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যমাত্রই। কিন্তু অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব তথ্যরই নামান্তর হল বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এবং এই জাতীয় উপাত্ত-নির্ভর অনুমিতিই বৈজ্ঞানিক উপপত্তি বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ।

কিংবা জয়ন্তভট্টর উপরোদ্ধৃত রচনার কয়েকটি মূল বিষয় বিশ্লেষণ করা যাক। তিনি বলছেন, "আহারের পরিণাম থেকে শরীরের ভেদ অবগত হওয়া যায়। নতুবা, পাকজ-উৎপত্তির দ্বারা অন্ন জীর্ণ হোতো না; দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষণ সত্ত্বেও শরীর পুষ্ট হোতো না। কাঞ্চনাদি উপযোগের ফলে শরীরের রক্তবৃদ্ধি দেখা যায়।" বলাই বাহুল্য, প্রদর্শিত ঘটনাবলীকে জয়ন্তভট্ট নিজে অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব তথ্য বলেই দাবি করবেন। অর্থাৎ, আধুনিক পরিভাষায় এগুলি বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এবং এই জাতীয় উপাত্ত-নির্ভর অনুমিতি বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই জয়ন্তভট্ট দাবি করছেন যে শরীর নিয়ত পরিবর্তনশীল।

অতএব দেখা যায় যে আলোচ্য পদ্ধতিতে লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনে অগ্রসর হয়ে নৈয়ায়িকেরাই প্রধানত বৈজ্ঞানিক তথ্যর উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। অতএব, বৈজ্ঞানিক তথ্যর প্রসঙ্গ পরিহার করে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে তাঁহাদের এই দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের প্রয়াসকে বিচার করার চেষ্টা অবাস্তব হবে। মূলত বৈজ্ঞানিক তথ্যর মানদণ্ডেই নৈয়ায়িকদের এই যুক্তিগুলি বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে কোন সনাতন বা অপরিণামী সত্য বোঝায় না। কেননা, বৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে যদিও অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব ঘটনামাত্রই, তবুও বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল অভিজ্ঞতারই সীমা-সম্প্রসারণ। যেমন, অণুবীক্ষণাদি আবিষ্কারের ফলে যে-সব বাস্তব তথ্য আজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বলে বিবেচিত অতীতে সেগুলি অভিজ্ঞতা-সীমার বহির্ভূত ছিল। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান বলতে শুধু অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যর সংকলনই নয়, এ জাতীয় তথ্যর প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ও। যেমন গ্রহণাদি ঘটনা আদিম মানুষের কাছেও অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ ছিল; কিন্তু এজাতীয় ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য আদিম মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল।

অতএব, নিত্যনূতন গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য বস্তুতপক্ষে নিয়ত-সম্প্রসারণশীল। শুধু তাই নয়; প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক—বিশেষত অত্যাধুনিক—কালে এই সম্প্রসারণশীলতার হার প্রায় অবিশ্বাস্যভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিককালের জনৈক অগ্রণী বিজ্ঞানী যেরকম মন্তব্য করেছেন, পূর্ববর্তী পুরো ঐতিহাসিক যুগের তুলনায় গত মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে অনেক বেশি [৩২০]। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লব্ধ হয়েছে তা পূর্ববর্তী কয়েক সহস্র বছরে লব্ধ সামগ্রিক জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

স্বভাবতই প্রাচীন লোকায়তিকদের কাছে বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্পদ ছিল যৎসামান্যই। অতএব 'অনুভব', 'স্মরণ', 'দৈহিক পরিবর্তনের স্বরূপ' প্রভৃতি ঘটনার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ঐতিহাসিক বোধের পরিচায়ক হবে না। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে জয়ন্তভট্ট, উদয়ন প্রমুখ মধ্যযুগের নৈয়ায়িকেরা যে-ভাবে এ-জাতীয় ঘটনারই নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ বর্জনের এবং আত্মবাদ সমর্থনের প্রস্তাব করেছেন তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পটভূমিতে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা, আলোচ্য ঘটনাগুলি সংক্রান্ত মধ্যযুগের নৈয়ায়িকদেরও বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে আসলে অকিঞ্চিৎকর।

ফণিভূষণের রচনা থেকে উপরোদ্ধৃত অংশের সর্বশেষ যুক্তিটি বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়াই আমাদের আলোচনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। এই যুক্তির মূল কথা হল, দেহাত্মবাদীও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে শরীরের কোন অবয়ব বিনষ্ট হলে সামগ্রিকভাবে শরীরটিই পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ উক্ত অবয়ব-বিশিষ্ট পূর্বশরীর এবং উক্ত অবয়বহীন পরবর্তী শরীর অবশ্যই বিভিন্ন শরীর হিসাবে বিবেচিতব্য। দেহাত্মবাদী শরীরকেই আত্মা—অতএব অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তা—হিসাবে স্বীকার করলেও মানতে বাধ্য হবেন যে এক শরীর দ্বারা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ অন্য শরীর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব

৩২০। Barnal SH 491.

ঘটনা এই যে শরীরের অবয়ব-বিশেষ বিনষ্ট হলেও সেই অবয়বেই পূর্বে যে-বস্তু অনুভূত হয়েছিল তার স্মরণ পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ন থাকে। এক্ষেত্রে শরীরকেই অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তা—অর্থাৎ আত্মা—বলে স্বীকার করা অসম্ভব। আলোচ্য অবয়ব-বিশিষ্ট পূর্বশরীর এবং অবয়ব-হীন পরবর্তী শরীর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শরীর সেইহেতু অবয়ব-বিশিষ্ট পূর্বশরীর অনুভূত বিষয়ের স্মরণ পরবর্তীকালের অবয়ব-হীন শরীর দ্বারাই সম্ভব হলে দেবদত্ত দ্বারা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ যজ্ঞদত্ত দ্বারাও সম্ভব হবে।

অবশ্য জয়ন্তভট্টর উপরোদ্ধৃত রচনাংশে শরীরের অবয়ব-বিশেষ বিনষ্ট হওয়ার নিদর্শন নেই। তবুও, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিটি মূলত একই। কেননা, জয়ন্তভট্ট দেখাচ্ছেন, আহারের পরিণাম প্রভৃতি ঘটনা থেকে অবশ্য প্রমাণ হয় যে দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল। অতএব পূর্বকালের দেহ এবং পরবর্তীকালের দেহ বস্তুত বিভিন্ন দেহই; ফলে পরবর্তীকালের দেহর পক্ষে পূর্বকালের দেহ দ্বারা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, অবয়ব-বিশেষ বিনাশের ফলে শরীরান্তরে পরিণতির কথা অত্যন্ত স্থূল দৃষ্টিতেও স্বীকৃত হবে। কিন্তু অবয়ব-বিশেষ বিনষ্ট হোক-আর-নাই-হোক, খাদ্যাদির পরিণাম এবং পরিমাণ-পরিবেশাদির পার্থক্য থেকেও শরীরান্তরে পরিণতি অবশ্য-স্বীকার্য। অতএব যে দৃষ্টান্তে অবয়ব বিনাশের ফলে অত্যন্ত স্থূলভাবেই শরীরান্তরে পরিণাম বর্তমান তার কথা ছেড়ে দিলেও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিচারে অবশ্য স্বীকার্য যে প্রতি শরীর প্রতিনিয়ত শরীরান্তরে পরিণত হয়। অতএব, পরবর্তী শরীরকেই পূর্ব-শরীর অনুভূত বিষয়ের স্মরণকর্তা বলা নিরর্থক।

অতএব, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত যুক্তিটি মূলত একই। তবুও ফণিভূষণ যে-ভাবে অবয়ব-বিনাশের নিদর্শন উল্লেখ করেছেন তারই প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কেননা তাহলেই আমরা ক্রমশ 'অনুভব', 'স্মরণ', 'দৈহিক পরিবর্তনের স্বরূপ' প্রভৃতি ঘটনা সংক্রান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য উত্থাপনের তুলনায় সহজ সুযোগ পাবো।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, শরীরের অবয়ব-বিশেষে কোন বস্তুর অনুভব ঘটলে দেহাত্মবাদী কী সেই নির্দিষ্ট অবয়বকেই বস্তুটির অনুভব-কর্তা বলে স্বীকার করতে বাধ্য? যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য ফণিভূষণ প্রদর্শিত নজির থেকেই দেহাত্মবাদ নিরসিত হয়। কেননা, উক্ত অবয়ব বিনষ্ট হলে দেহাত্ম-বাদ-সম্মত অনুভবকর্তাই বিনষ্ট হয় এবং অনুভব-কর্তা বিনষ্ট হলে পরও বস্তুটির স্মরণ অবশ্যই অসম্ভব।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নর উত্তর নেতিবাচক হবে। অর্থাৎ, শরীরের হস্তাদি অবয়ব দ্বারা কোন বস্তু অনুভূত হলেও সেই অবয়ব-

বিশেষকেই বস্তুটির অনুভব কর্তা বলে বিবেচনা করার কোন কারণ নেই—আধুনিক বস্তুবাদী বা দেহাত্মবাদীর দৃষ্টি থেকেও নয়। কেননা, একালের বস্তুবাদী বা দেহাত্মবাদী অনায়াসেই বলবেন, অনুভব-প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর—বিশেষত মস্তিষ্কর—ভূমিকা আবিষ্কৃত হবার ফলে শরীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ একথা সুবিদিত যে হস্তাদি শরীরের অবয়বগুলি—বা, আরো সুস্পষ্ট ভাষায়, ত্বক্ প্রভৃতি শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি—বিবিধ অনুভবের গ্রাহকমাত্র (*receptors*)। বহির্বস্তুর কাছ থেকে উদ্দীপক পেলে এজাতীয় গ্রাহকস্থ স্নায়ুকোষে উদ্বুদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি (*nervous impulse*)। কিন্তু স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া মানেই অনুভব নয়। অন্তর্মুখী বা সংবেদনবাহী (*sensory*) স্নায়ুর মাধ্যমে এই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কর স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হলে পরই তা অনুভবে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়। এই কারণে, শরীরস্থ কোন গ্রাহক অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও এবং তা বহির্বস্তু দ্বারা উদ্দীপিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তৎসংলগ্ন স্নায়ু কিংবা স্নায়বিক শক্তির চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল—অর্থাৎ মস্তিষ্কর স্নায়ুকোষ—বিনষ্ট হয় (বা সাময়িকভাবে কর্মক্ষমহীন হয়) তাহলে অনুভবের অভাব ঘটে। অতএব অনুভব প্রসঙ্গে গ্রাহকের ভূমিকা মনে রেখেও গ্রাহকমাত্রকেই অনুভব-কর্তা বিবেচনা করার কারণ নেই। আধুনিক শরীর বিজ্ঞানে আজ একথা সুবিদিত যে অনুভবের চরম দায়িত্ব মস্তিষ্করই।

আমাদের পক্ষে এখানে অনুভব সংক্রান্ত শরীর বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘবিস্তৃতভাবে আলোচনা করার সুযোগ হবে না। তার প্রয়োজনও নেই। দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের আলোচ্য যুক্তির বিচারে এই মন্তব্যই পর্যাপ্ত যে আধুনিক শরীরবিজ্ঞানী দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করেও—অর্থাৎ মূলত দেহাত্মবাদী দৃষ্টি গ্রহণ করেও—শরীরের কোন অবয়বকেই অনুভবকর্তা মনে করেন না। অতএব, দেহাত্মবাদীর পক্ষে কোন অবয়বের বিনাশই অনুভবকর্তার বিনাশের সমতুল্য নয়।

আত্মবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি তুলে হয়ত বলা হবে, স্নায়ুতন্ত্রর—বিশেষত মস্তিষ্কের—ভূমিকা স্বীকার করেও অনুভবের ব্যাখ্যায় দেহাতিরিক্ত আত্মা বা অনুভবকর্তা স্বীকারের প্রয়োজন নিরসিত হয় না। সেকালের নৈয়ায়িকদের কাছে অবশ্য অনুভব প্রসঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রর ভূমিকা জানা ছিল না। কিন্তু তাঁদেরই মূল যুক্তি অনুসরণ করে আধুনিক আত্মবাদী দাবি করতে পারেন: অনুভব বস্তুত এক প্রকার "ক্রিয়া" এবং মস্তিষ্ক এই ক্রিয়ার "কারণ" মাত্র; কিন্তু ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় করণ ছাড়াও কর্তা স্বীকার্য এবং অনুভবের সেই কর্তা বলতে দেহাতিরিক্ত আত্মাই। নৈয়ায়িকেরা বলেন, "কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না, ক্রিয়ামাত্রেরই কর্তা আছে। সুতরাং 'চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে,' 'মনের দ্বারা বুঝিতেছে,' 'বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে,' 'শরীরের দ্বারা সুখদুঃখ অনুভব করিতেছে,'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দর্শনাদি

ক্রিয়া এবং চক্ষুরাদি করণের কোন কর্তার সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়। অর্থাৎ, কোন কর্তা চক্ষুরাদি করণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছে—ইহা বুঝা যায়। ন্যায়মতে আত্মাই কর্তা"[৩২১]। মূলত এই যুক্তি অনুসরণ করে আধুনিক অধ্যাত্মবাদী শরীরবিজ্ঞানের সাক্ষ্য নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন: অনুভব হল এক প্রকারের ক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্র তার করণ, আত্মাই তার কর্তা; অর্থাৎ, আত্মাই মস্তিষ্ক দ্বারা অনুভব করে[৩২১ক]।

এজাতীয় যুক্তির উত্তরে আধুনিক বস্তুবাদীর উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে। সাম্প্রতিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও কোন স্বতন্ত্র অনুভবকর্তার স্বীকৃতি বস্তুত গৌরবদোষদুষ্ট বা অবান্তর। বৈদ্যুতিক শক্তি বিজলী বাতিতে পৌঁছুলে যেমন তা স্বভাবতই আলোকে রূপান্তরিত হয় তেমনই স্নায়বিক শক্তিও শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষে পৌঁছুলে স্বভাবতই অনুভবে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যায় যেমন আলোকদাতা বা রূপান্তরকারী অর্থে কোন স্বতন্ত্র কর্তার স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন, তেমনি স্নায়বিক শক্তির রূপান্তরের ব্যাখ্যাতেও অনুভবকারী অর্থে কোন স্বতন্ত্র কর্তার কল্পনা আসলে অবান্তর। অবশ্যই, স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ ও তার রূপান্তরের ব্যাখ্যায় আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন আছে; কিন্তু আত্মার কল্পনা দিয়ে সেই প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ সত্যিই নেই।

আত্মবাদীরা অবশ্যই অহং-প্রত্যয়ের নজির দেখিয়ে দেহাতিরিক্ত আত্মার বা অনুভবকর্তার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চাইবেন। তাঁদের এই যুক্তিটি বস্তুতপক্ষে আত্মার প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণ। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মবাদীরা যে সব প্রত্যক্ষমূলক ও অনুমানমূলক প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন আমরা পরে সংক্ষেপে সেগুলি বিচার করবো। বর্তমানে, দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত যুক্তিগুলির বিশ্লেষণ শেষ করা যাক।

অনুভব প্রসঙ্গে আলোচনা উঠেছিল, কেননা স্মৃতির সাক্ষ্য বিচারে আত্মবাদীরাই অনুভবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। দেহাত্মবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁদের চরম যুক্তি বলতে এই স্মৃতির সাক্ষ্যই। যুক্তিটি সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। দেহকেই আত্মা বলা যায় না, কেননা দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল, তাই দেহের পক্ষেই পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব। বাল্যে অনুভূত বিষয়েরও বার্ধক্যে স্মরণ হয়, অথচ বাল্যদেহ ও বৃদ্ধদেহ অত্যন্ত পৃথক। দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকার করলে—বা দেহকেই আত্মা বললে—স্বীকার করতে হবে যে বৃদ্ধদেহই বাল্যদেহ-অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করে। কিন্তু বাল্যদেহ ও বৃদ্ধদেহ অত্যন্ত পৃথক বলেই, যেমন যজ্ঞদত্ত-অনুভূত বিষয়ের স্মরণ

৩২১। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ৩৷১৩॥

৩২১ক। cf. Bykov 505—আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীদের মধ্যেও ভাববাদীরা কল্পনা করেছেন: "the activity of the brain was 'governed' by a non-material soul."

দেবদত্তর পক্ষে অসম্ভব তেমনিই বাল্যদেহ-অনুভূত বিষয়ের স্মরণ বৃদ্ধদেহর পক্ষেও অসম্ভব।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত এই চরম যুক্তিটির প্রকৃত গুরুত্ব কী?

উত্তরে প্রথমেই অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে সেকালের বৈজ্ঞানিক তথ্যর অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও দেহকে নিত্য পরিবর্তনশীল বিবেচনা করে নৈয়ায়িকেরা বস্তুতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্যের ইংগিত দিয়েছিলেন। দেহ কেন নিয়ত-পরিবর্তনশীল বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এবিষয়ের আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছি। জীববিজ্ঞানীর পরিভাষায় শরীরের সূক্ষ্মতম অংশর নাম জীবকোষ বা cell এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে একথা আজ সুবিদিত যে শরীরের অধিকাংশ জীবকোষই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নূতন নূতন জীবকোষের জন্ম দেয়[৩২২]।

এই অর্থে শরীর অবশ্যই নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই পরিবর্তনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণের সাক্ষ্য কি বাস্তবিকই দেহাত্মবাদ নিরসন করে? প্রথমে প্রশ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা প্রয়োজন।

দেহাত্মবাদীর মূল বক্তব্য হল, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই অর্থেই তাঁরা বলেন, দেহই আত্মা। আত্মবাদীরা "ইচ্ছা," "দ্বেষ," প্রভৃতি যে-সব "গুণ" বা "ধর্ম"-কে দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোন পদার্থর পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেন সেগুলির ব্যাখ্যাকল্পে দেহাত্মবাদীর মতে দেহ ছাড়া আর কোন পদার্থের স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ, এগুলির পূর্ণাঙ্গ কিন্তু নিছক শরীর-তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা বর্তমান। দেহাত্মবাদীর বক্তব্য অনুসারে কতকগুলি দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যকেই আত্মবাদীরা কোন এক দেহাতিরিক্ত পদার্থর পরিচায়ক বলে কল্পনা করেন এবং সে-কল্পনা অবশ্যই ভিত্তিহীন। দেহকেই আত্মা বলার আর কোন তাৎপর্য অবান্তর।

অতএব স্মরণের ব্যাখ্যায় দেহাত্মবাদী একথা দাবি করতে বাধ্য নন যে সামগ্রিকভাবে শরীরেরই—বা সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট অবয়বীরই—স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণের ব্যাখ্যায় শরীর-অতিরিক্ত আত্মা নামের কোন পদার্থর কল্পনা নিষ্প্রয়োজন; অর্থাৎ স্মরণের নিছক শরীরতত্ত্বমূলক কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সম্ভব।

কিন্তু, আত্মবাদীরা আপত্তি তুলেছেন, শরীর নিত্য-পরিবর্তনশীল

৩২২। Ratcliff & Platt in THB 30........."cells usually reproduce by simple division: they narrow in the middle and finally split into two, the 'daughter cells' being exact duplicates of the original. The speed with which cell reproduction occurs varies from place to place in the body according to local need. It is estimated that half of the body's protein--mainly muscle tissue—is replaced every eight days. The life-span of the skin-cells is four to five days."

এবং আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এই দাবির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য বর্তমান। তাহলে এই শরীরের অভ্যন্তরেই কীভাবে স্মরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে? বাল্যশরীর তো বার্ধক্যে সত্যিই অবর্তমান; তাহলে বৃদ্ধশরীরে বাল্য-অনুভূত বিষয়ের স্মরণ কী করে সম্ভব?

বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সেকালের লোকায়তিকদের জানা ছিল না। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে শারীরিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষায় স্মরণের কোন শরীরতত্ত্ব-মূলক ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়। পক্ষান্তরে, আধুনিক শরীরবিজ্ঞানী বলবেন, স্মরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম শারীরিক পরিবর্তনের স্বরূপকেই আরো সুস্পষ্টভাবে বোঝা প্রয়োজন। এবং এই দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, শরীরের অধিকাংশ জীবকোষ ক্রমাগত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নূতন নূতন জীবকোষে পরিণত হলেও—এবং এই অর্থে শরীর নিয়ত-পরিবর্তনশীল হলেও—অনুভব ও স্মরণের ক্ষেত্রে যে-জাতীয় জীবকোষের ভূমিকাই সর্বপ্রধান সেগুলি বস্তুতপক্ষে অপরিবর্তিত থাকে। বিষয়টি কিঞ্চিত বিস্তৃতভাবে বোঝা দরকার।

আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেও শরীর নিত্য পরিবর্তনশীল। এবং এই পরিবর্তনের প্রকৃত তাৎপর্য শরীরস্থ জীবকোষের পুনরুৎপাদন—নবজাত জীবকোষের দ্বারা পুরাতন জীবকোষের স্থান পরিপূরণ। কিন্তু শরীরস্থ সমস্ত জীবকোষই এক জাতীয় নয়। তার মধ্যে যে নির্দিষ্ট জাতের জীবকোষ দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র গঠিত সেগুলিকে স্নায়ুকোষ আখ্যা দেওয়া হয়। এবং এই স্নায়ুকোষগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান। শরীরের অন্যান্য সর্বজাতীয় জীবকোষই কম বেশী দ্রুত ভাবে পরিবর্তিত হলেও—অর্থাৎ পুরোনো জীবকোষেরা নব উৎপন্ন জীবকোষ দ্বারা বদল হয়ে গেলেও—শরীরস্থ স্নায়ু-কোষগুলি এই নিয়মের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। স্নায়ুকোষগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ক্রমাগতই নূতন জীবকোষ উৎপন্ন করে না। আঘাত বা রোগ জাতীয় কোন নির্দিষ্ট কারণে বিনষ্ট না হলে আমাদের শরীরের জন্মগত জীবকোষের ভাণ্ডার বস্তুতপক্ষে অপরিবর্তিত থাকে। পূর্বানুভবের স্মরণ প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই স্নায়ুকোষগুলির এই বৈশিষ্ট্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, কেননা অনুভব ও স্মরণ উভয় ঘটনার মূলেই স্নায়ুতন্ত্রের—অতএব শেষ পর্যন্ত স্নায়ুকোষগুলিরই—ভূমিকা অবিসংবাদিত।[৩২৩]

৩২৩। Hydon I: I would like to stress a unique feature of the nerve cells in the body. Somatic cells in general divide, some rapidly over short intervals, others over longer intervals, but they all divide. The unique feature of the nerve cells is that they do not divide. We are born and we die with the same nerve cells. What is the reason for this property in which respect the nerve cells differ from other cells? One main reason, I think, is the necessity of keeping the accumulating experiences of the memory store of each neuron ready for immediate use during the whole of their life cycle.

অতএব আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও স্মরণের ব্যাখ্যায় পরিবর্তনশীল দেহ অতিরিক্ত কোন নিত্য আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষা অবলম্বন করেও আধুনিক বিজ্ঞানী অনায়াসেই মন্তব্য করতে পারেন যে অতীত অনুভবের সংস্কার কোন-না-কোন ভাবে মস্তিষ্কর স্নায়ুকোষের মধ্যেই সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে সেই স্নায়ুকোষ উপযুক্ত ভাবে উদ্দীপিত হলে উক্ত পূর্বানুভবের স্মরণ ঘটে।

অবশ্য অতীত অনুভবের সংস্কার ঠিক কীভাবে এবং মস্তিষ্কর ঠিক কোন অংশে সংরক্ষিত হয়—এই প্রশ্নর চরম উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, বিষয়টি এখনো বহুলাংশে গবেষণা সাপেক্ষ। কিন্তু চরম উত্তর পাওয়া যায়নি বলেই এবিষয়ে যতোখানি সুস্পষ্ট জ্ঞান পাওয়া গিয়েছে তার গুরুত্ব উপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত হবে না। শুধুমাত্র এক প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উল্লেখই বর্তমান যুক্তির পক্ষে পর্যাপ্ত হবে, কেননা সেই পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে মস্তিষ্কর স্নায়ুকোষেই পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি সংরক্ষিত হয়।

কানাডার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পেন্‌ফিল্ড্‌ স্মরণ প্রসঙ্গে বহু চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করেছেন।[৩২৪] পরীক্ষার মূল কথা হল, ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্কর রগভাগে অত্যন্ত দুর্বল বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখা, তার কী রকম অভিজ্ঞতা হয়। পেন্‌ফিল্ড্‌ দেখেন, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে এই ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করার ফলে মানুষটির মধ্যে পূর্বানুভূত শ্রৌত ও চাক্ষুষ সংবেদনের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়—গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে যেমন অতীত শব্দ বেরিয়ে আসে অনেকটা সেইভাবেই। পূর্বদৃষ্ট দৃশ্য, পূর্বশ্রুত শব্দ এমন কি অতীতের চিন্তা ও ভাব আবেগ একেবারে হুবহু বা নিখুঁত রূপে এই পদ্ধতিতে পুনরুদ্বুদ্ধ করা যায়—এমনই হুবহুভাবে যে পরীক্ষাপাত্রর স্থির বিশ্বাস হয় যে গবেষণাগারের মধ্যে সেগুলি যেন বাস্তবিকই পুনরায় ঘটে চলেছে! পেন্‌ফিল্ড্‌ দেখেন, মস্তিষ্কের সেই নির্দিষ্ট অংশে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাপাত্রর স্মরণও বন্ধ হয়। পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে পেন্‌ফিল্ড্‌ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। যেমন, বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনের সুইচ্‌ না দিয়েও তিনি পরীক্ষাপাত্রকে বলেন—এই তো সুইচ্‌ দিলাম; কী অভিজ্ঞতা হচ্ছে? উত্তরে পরীক্ষাপাত্র বলেন—কোন অভিজ্ঞতাই হচ্ছে না। কিন্তু পেন্‌ফিল্ড্‌ পুনরায় বাস্তবিকই সুইচ্‌ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাপাত্রর অভিজ্ঞতায় পূর্বানুভবের হুবহু স্মরণ ঘটে।

৩২৪। W. Penfield and T. Rasmussen, *The Cerebral Cortex of Man*, New York 1950; W. Penfield and T. Erickson, *Epilepsy and Cerebral Localisation*. Baltimore 1941; এই পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত ও সহজ বিবরণের জন্য Y. Saparine 113 ff দ্রষ্টব্য।

অধ্যাপক পেন্‌ফিল্‌ড্‌-এর এই চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার পরও শরীর বিজ্ঞানীরা স্মরণ প্রসঙ্গে অনেক গবেষণা করেছেন ও করছেন। ভবিষ্যতে আরো বহু গবেষণার প্রয়োজন বর্তমান। তার প্রধান কারণ বিষয়ের জটিলতা। একটি সহজ হিসাব থেকে এবিষয়ে কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যাবে। আমাদের মস্তিষ্কে মোট স্নায়ুকোষের সংখ্যা প্রায় ১৪০,০০০০০০০০। এগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও সরল নয়। তাছাড়া, জীবিত মানবের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগও সীমাবদ্ধ। অতএব এই ১৪০০ কোটি স্নায়ুকোষের জটিল সংগঠনটির মধ্যে কোথায় এবং কিভাবে পূর্বানুভবের সংস্কার সংরক্ষিত হয়—তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোন সহজ পন্থা প্রত্যাশা করা যায় না।

অতএব, সংক্ষেপে স্মৃতির রহস্য এখানো বহুলাংশেই গবেষণাধীন, এবং এই অর্থে অজ্ঞাতও। তাই আমাদের প্রাচীন লোকায়তমতের সমর্থনে আজ একথা দাবি করার সুযোগ অবশ্যই নেই যে স্মরণ নামের ঘটনাটির শরীরতত্ত্ব-মূলক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, লোকায়তমতের সমর্থনে এজাতীয় দাবীর প্রয়োজনও নেই। পক্ষান্তরে, ভারতীয় দেহাত্মবাদের গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে আজকের দিনে এটুকু কথা মনে রাখাই পর্যাপ্ত যে স্মরণ নামের ঘটনার ব্যাখ্যায় এখন পর্যন্ত যতোটা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য বাস্তবিকই পাওয়া গিয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে শরীরতত্ত্বমূলকই এবং এই শরীরতত্ত্বমূলক গবেষণারই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির মধ্যে স্মরণেব পূর্ণতর ব্যাখ্যা প্রত্যাশিতব্য।

কিংবা, যা একই কথা, মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অধুনা অজ্ঞাত বিষয়ের নজির দেখিয়ে দেহাত্মবাদ বর্জন করে আত্মবাদে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব অবশ্যই নিষ্ফল হবে। কেননা অনাবিষ্কৃত তথ্যর সাক্ষ্য কখনোই আবিষ্কৃত তথ্যর সাক্ষ্যকে নিরসিত করতে পারে না এবং জ্ঞানের অভাবকেই কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তর পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ বিবেচনা করা হাস্যকর :

Ignorance is ignorance ; no right to believe anything is derived from it. [৩২৫]

২১। দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রয়াস : উপসংহার

দার্শনিক মত হিসাবে দেহাত্মবাদ যে বাস্তবিকই কত নিকৃষ্ট তা বোঝাবার জন্য চার্বাকবিরোধিরা দার্শনিক বিচার ছাড়াও বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বাচস্পতি মিশ্র বলছেন, ইষ্ট-অনিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞ নাস্তিক আসলে পশুর চেয়েও পশুতর—"নাস্তিকস্তু পশোরপি পশুরিষ্টানিষ্ট সাধনমবিদ্বান্।"[৩২৬] গুণরত্ন ও জয়ন্তভট্ট দেখাতে চেয়েছেন, দার্শনিক হিসাবে

৩২৫। Freud FI 56.

৩২৬। বাচস্পতি, 'ভামতী' ৩।৩।৫৪॥

এই চার্বাকেরা বড়ো জোর কৃপার পাত্র। গুণরত্ন বলছেন, "চার্বাকস্তু বরাক"... ইত্যাদি[৩২৭]। "বরাক" মানে বেচারা—অবশ্যই চরম তাচ্ছিল্যভরে বলা, চলতি কথায় আমরা যেমন বলি হাবাতে বা হতভাগা। জয়ন্তভট্ট গ্রন্থারম্ভে ঘোষণা করেছেন, কোন্ কোন্ দার্শনিক মত তিনি খণ্ডন করবেন। তার মধ্যে চার্বাকমত কি থাকবে? নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু এই হাবাতে চার্বাকেরা তো নেহাতই ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাই তাদের কথা আবার আলাদা করে গণনা করার প্রয়োজন কী?—"চার্বাকাস্তু বরাকাঃ প্রতিক্ষেপ্তব্যা এবেতি কঃ ক্ষুদ্রতর্কস্য তদীয়স্যেহ গণনাবসরঃ।"[৩২৮]

অবশ্য লোকায়তিকেরা বাস্তবিকই কোন্ ধরনের দার্শনিক বিচারের উপর নির্ভর করে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস করতেন সে বিষয়ে অধুনালভ্য ঐতিহাসিক তথ্য বলতে যৎসামান্যই। পক্ষান্তরে লোকায়তবিরোধীরাই এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার উত্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, প্রধানত তাঁরাই ভেবে দেখেছেন কতো ভাবে দেহাত্মবাদ সমর্থনের সম্ভাবনা আছে এবং তাঁরা অবশ্যই এজাতীয় প্রতিটি সম্ভাবনা খণ্ডনের সাধ্যমতো প্রয়াসও করেছেন। আধুনিক কাল পর্যন্ত লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে প্রচার এমনই প্রবল যে লোকায়তমত খণ্ডনের সার্থকতা অনেকের কাছেই প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এমনকি লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে যে-সব গালিগালাজের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি তাঁদের পক্ষে অনেকাংশেই যেন স্বোপার্জিত—এমন অপকৃষ্ট মতের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অন্যেরা অল্পবিস্তর কটুবাক্য প্রয়োগ করবেন নাই বা কেন? রাধাকৃষ্ণন যেমন মন্তব্য করেছেন,

In later Indian thought materialism *naturally* has come in for a good deal of severe and contemptuous treatment.[৩২৯]

কিন্তু বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি! আমরা দেখেছি, লোকায়তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডনের প্রবল ও বহুবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও তার সার্থকতা বড়ো জোর সংশয়সাপেক্ষ। অনেক কূটতর্ক উদ্ভাবন করেও দেহাত্মবাদ বিরোধীরা বাস্তবিকই দেহাত্মবাদ নিরসনে সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে এই দেহাত্মবাদ এমনই মৌলিক এক দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে তারই মধ্যে পরবর্তীকালে লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় এবং আজকের দিনে নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে এই প্রতিশ্রুতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবজ্ঞার বিষয় হতে পারে না।

এখানে আরো একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে "বরাক" প্রভৃতি তাচ্ছিল্যমূলক নানা শব্দ প্রয়োগ

৩২৭। গুণরত্ন, 'তর্করহস্যদীপিকা' ২৬৪f।

৩২৮। জয়ন্ত, 'ন্যায়মঞ্জরী' ১।৪।

৩২৯। Radhakrishnan IP i. 284. Itallics added.

করলেও, লোকায়তবিরোধীদেরই একটি উপাখ্যান থেকে মনে হয় যে তাঁরা দেহাত্মবাদ খণ্ডনকে আসলে খুব সহজসাধ্য মনে করতেন না। উপাখ্যানটি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের রচনায় সংরক্ষিত হয়েছে। চন্দ্রগোমিন্ নামের মধ্য যুগের জনৈক দিক্‌পাল বৌদ্ধ বিদ্বান[৩৩০] প্রসঙ্গে তারনাথ বলছেন,

> পূর্ব-বরেন্দ্র দেশে আচার্য চন্দ্রগোমিন্ আর্য অবলোকিতেশ্বরের দর্শন পান এবং তিনি জনৈক তীর্থিক লোকায়ত গুরুর সঙ্গে দার্শনিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। আসলে তিনি তাকে (অর্থাৎ, উক্ত লোকায়তকে) পরাজিত করেন। দার্শনিক বিচার কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচিত হয়; ফলে যাঁর বুদ্ধি তুলনায় তীক্ষ্ণতর তাঁরই জয় হয়। [লোকায়তিক বলেন,], "অতএব দেখা যাচ্ছে, যে-পূর্বজন্ম-পরজন্ম আমরা মানি না তার পক্ষে আপনি কোন প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারলেন!" একথা শুনে, তিনি [চন্দ্রগোমিন্] রাজা ও অন্যান্যদের সাক্ষী রেখে বললেন, "আমি যখন পরে জন্মগ্রহণ করবো তখন আমার কপালে এই চিহ্ন থাকবে"—এই কথা বলে তিনি নিজের কপালে কালির চিহ্ন আঁকলেন এবং নিজের মুখের মধ্যে একটি মুক্তা রেখে দেহরক্ষা করলেন। তারপর রাজা তাঁর দেহকে একটি তামার পাত্রে বন্ধ করে রাখলেন। তারপর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো তিনি [চন্দ্রগোমিন্] জনৈক ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেন। শিশুটির দেহে অস্বাভাবিক চিহ্ন দেখা গেল। জন্মের সময়ই দেখা গেল তার কপালে সেই কালির চিহ্ন এবং মুখের মধ্যে সেই মুক্তা! রাজা এবং অন্যান্যরা তা প্রত্যক্ষ করলেন এবং তামার পাত্র খুলে দেখা গেল, মৃতদেহটির কপালে কালির চিহ্ন নেই, মুখের মধ্যে মুক্তাও নেই। ফলে তীর্থিক স্বয়ং [? লোকায়তিকের নাম] পূর্বজন্মের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।[৩৩১]

বলাই বাহুল্য, এই কাহিনীর অলৌকিকাংশ সেকালের বিশেষত তিব্বতী বৌদ্ধদের মনে ভয়ভক্তি সম্বলিত একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদ্রেক করলেও একালের বুদ্ধিজীবীদের মনে মোটের উপর হাসিরই উদ্রেক করবে। কাহিনীটি তারনাথ কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে, বৌদ্ধ আচার্যদের মুখেমুখেই কাহিনীটি ভারত থেকে তিব্বত পর্যন্ত পৌঁছেছিল—কেননা আধুনিক বিদ্বানেরা তারনাথের ইতিহাসকে নেহাতই আষাঢ়ে গল্প বলে সাধারণত উড়িয়ে দেন না। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে যাঁরা এই কাহিনী বিশ্বাস করতেন—অর্থাৎ, সম্ভবত

৩৩০। চন্দ্রগোমিন্ প্রসঙ্গে S. K. De in HB i. 296 ff. দ্রষ্টব্য।

৩৩১। তারনাথ (বারাণসী সং), পৃঃ ১৪০-১।। স্বাধীন তর্জমা অধ্যাপক লামা চিম্পার সৌজন্যে।

মধ্যযুগের বৌদ্ধ আচার্যরাই—তাঁরা অন্তত এটুকু কথা মনে প্রাণে মানতেন যে লোকায়তমত খণ্ডন করা মুখের কথা নয়। শুধুমাত্র দার্শনিক বিচারের সাহায্যে চন্দ্রগোমিন্ তা পারেননি। পরলোক প্রমাণ করতে গিয়ে অতবড় দিকপাল দার্শনিককেও ইহলোক ত্যাগ করতে হল!

২২॥ প্রাচীন দেহাত্মবাদের একটি চিত্তাকর্ষক নজির

দেহাত্মবাদ বিরোধী বলতে আত্মবাদী এবং এই আত্মবাদীদের মধ্যে সর্বাগ্রণী হলেন বৈদান্তিক, বিশেষত অদ্বৈতবাদী। দেহাত্মবাদী যেমন দেহ অতিরিক্ত আত্মা মানেন না, অদ্বৈতবাদী তেমনি আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহ মানেন না—কিছুই মানেন না। তাঁর মতে, এক বা অদ্বিতীয় আত্মাই চরম সত্য বা পরমব্রহ্ম। সংক্ষেপে, দেহাত্মবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত বলতে অদ্বৈতবাদ।

অতএব এখানে বিশেষ করে অদ্বৈতবাদীর বিবেচনার্থে সুপ্রাচীন দেহাত্মবাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি নজির উদ্ধৃত করবো। কেননা, অদ্বৈতবাদীর স্বীয় দাবি অনুসারে তাঁর আত্মবাদের চরম প্রমাণ হল উপনিষদ্ বাক্য, অদ্বৈতবাদ একান্তভাবেই উপনিষদ্ নির্ভর; অথচ দেহাত্মবাদের যে-নজিরটি আলোচনা করতে চাই তা ওই উপনিষদ্ সাহিত্যেই সংরক্ষিত হয়েছে এবং ঋষিবাক্য হিসাবেই সংরক্ষিত হয়েছে—পূর্বপক্ষ বা পরিত্যজ্য মত হিসাবে নয়।

কিন্তু সেই নজিরটির তাৎপর্য বোঝার জন্য আমাদের পক্ষে জয়ন্তভট্টর রচনা থেকে আলোচনা শুরু করা বাঞ্ছনীয় হবে।

দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ হিসাবে—অর্থাৎ দেহাত্মবাদীর বক্তব্য হিসাবেই—জয়ন্তভট্ট নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন—

> "[চার্বাক দাবি করবেন,] জ্ঞানও শরীরের অন্বয় ব্যতিরেকানুবিধায়ী। প্রায়ই দেখা যায়, অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট শরীরে পট্বী (উৎকৃষ্ট) চেতনা হয়। [অর্থাৎ, অন্নপানাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট হলে চেতনাও উৎকর্ষ লাভ করে। অতএব, শরীর ও চেতনা জ্ঞানের মধ্যে অন্বয় বর্তমান।] এবং বিপরীত হইলে বিপরীত হয়। [অর্থাৎ শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটলে চেতনারও অপকর্ষ ঘটে। অতএব, শরীর ও চেতনার মধ্যে ব্যতিরেকও বর্তমান—শরীরপুষ্টির অভাবে চেতনা-উৎকর্ষরও অভাব হয়।] ব্রাহ্মীঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত কুমার শরীরে পটু প্রজ্ঞতা (উৎকৃষ্ট চেতনা) জন্মায়। চৈতন্যর গুরুলাঘব ব্যবহারও (উৎকর্ষ-অপকর্ষ) ভূতাতিশয়ের সত্তা ও অসত্তা দ্বারা করা যাইবে [অর্থাৎ, ভূতাতিশয়ের বর্তমানতায় চৈতন্যর উৎকর্ষ এবং ভূতাতিশয়ের অবর্তমানতায় চৈতন্যর অপকর্ষ হয়।] অতএব, ভূতচৈতন্যবাদ স্পষ্টই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।"[৩৩২]

৩৩২। জয়ন্ত. 'ন্যায়মঞ্জরী,' ২।১৩॥

গুণরত্নর রচনাতেও ভূতচৈতন্যবাদের পক্ষে এই জাতীয় একটি যুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কেন না, এজাতীয় কোন যুক্তির উত্তরেই তিনি বলেছেন, "কৃশ-শরীর বিশিষ্টরও চেতনা-প্রকর্ষ এবং স্থূল দেহীরও চেতনা-অপকর্ষ দেখা যায়।"৩৩৩

বর্তমানে আমাদের কাছে বিশেষ প্রশ্ন হল, দেহাত্মবাদ বা ভূত চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত এজাতীয় যুক্তি গুণরত্ন—এবং বিশেষত জয়ন্তভট্ট—কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? লোকায়তিকদের কোন রচনা থেকে নিশ্চয়ই নয়; অন্তত তা কল্পনা করার পক্ষে ক্ষীণতম তথ্যও পাওয়া যায় না। তাহলে কি যুক্তিটি জয়ন্তরই মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত? ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের কোথাও এযুক্তির পরিচয় পাওয়া না-গেলে আমরা হয়ত তাইই অনুমান করতে চাইতাম। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই যে 'ছন্দোগ্য' উপনিষদ-এ উদ্দালক আরুণিকে সুস্পষ্ট-ভাবেই এই যুক্তি অবতারণা করতে দেখা যায়, যদিও অবশ্যই উপনিষদের বর্ণনায় পরবর্তীকালের নৈয়ায়িক পরিভাষা প্রত্যাশা করা অবান্তর হবে।

পুত্র শ্বেতকেতুকে উদ্দালক উপদেশ দিলেন, "অন্ন ভুক্ত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়। সেই অন্নের যাহা স্থূলতম অংশ তাহা পুরীষ হয়, যাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মন হয়। জল পীত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়। সেই জলের যাহা স্থূলতম অংশ তাহা মূত্র হয়, যাহা মধ্যম অংশ তাহা রক্ত এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ হয়। তেজ (অর্থাৎ ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) ভুক্ত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয়। তাহার যাহা স্থূলতম অংশ তাহা অস্থি হয়, যাহা মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাক্ হয়। হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী।"৩৩৪

আরো চিত্তাকর্ষক কথা হল, মন যে আসলে অন্নময় তা প্রমাণ করবার জন্য উদ্দালক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজন করলেন। পুত্র শ্বেতকেতুকে তিনি বলিলেন, "হে সৌম্য, পুরুষ ষোড়শকলাযুক্ত। পঞ্চদশ দিন ভোজন করিও না, কিন্তু যথেচ্ছ জল পান করিও। প্রাণ জলময়; জল পান করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে না।" শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করলেন না। অনন্তর পিতার নিকট গমন করলেন। তাঁকে বললেন, "পিতঃ, কী বলিব?" পিতা বললেন, "হে সৌম্য, ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্র বলো।" শ্বেতকেতু বললেন, "এ সমুদয় আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না।" পিতা তাঁকে বললেন,…"ভোজন করো। অনন্তর আমার কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিবে।" শ্বেতকেতু ভোজন করলেন এবং তারপর পিতার নিকট গমন করলেন। পিতা যা-কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তৎ সমুদয়েই প্রতিপত্তি দেখালেন। পিতা বলিলেন, "যদি প্রভূত পরিমাণ প্রজ্বলিত অগ্নির খদ্যোত

৩৩৩। গুণরত্ন, 'তর্করহস্যদীপিকা' ১৪৩।
৩৩৪। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্' ৬।৫ ॥

পরিমিত একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে এবং সেই অঙ্গারকে যদি তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণ বস্তু দহন করা যায়। তেমনি হে সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল ; তাহা অন্ন দ্বারা বর্ধিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহার দ্বারাই তুমি বেদ বুঝিতে পারিতেছ। হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী।" তখন শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ বুঝতে পারলেন।[৩৩৫]

এই প্রসঙ্গে উদ্দালক-ব্যাখ্যাত সমস্ত তত্ত্বর বিশ্লেষণ বর্তমানে সম্ভব নয়। এবং তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু জয়ন্তভট্টর আলোচ্য যুক্তি এখানে একটি প্রশ্ন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হত; বেদ বুঝতে পারা কি চেতনা-উৎকর্ষর পরিচায়ক এবং বেদ বুঝতে না পারা কি চেতনা-অপকর্ষর পরিচায়ক? বলাই বাহুল্য, স্বয়ং জয়ন্তভট্টর পক্ষেও এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব : বেদমন্ত্রর স্মরণ ও অর্থবোধ অবশ্যই পটুী চেতনার বা পটুপ্রজ্ঞতার পরিচায়ক এবং তার অভাব অপকৃষ্ট চেতনার পরিচায়ক। অতএব, উদ্দালক আরুণি যখন উপদেশ দিচ্ছেন, "ভোজন কর, অনন্তর আমার কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিবে"---এবং আরো বড়ো কথা হল, তিনি যখন পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করছেন, ষোড়শ-কলার অবশিষ্ট মাত্র একটি কলা অন্ন দ্বারাই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং তারই ফলে শ্বেতকেতু বেদার্থবোধের সামর্থ্য পুনপ্রাপ্ত হয়েছেন—তখন এই উপদেশের মূল কথাটি পরবর্তী কালের নৈয়ায়িকদের পরিভাষায় নিশ্চয়ই নিম্নোক্ত যুক্তি হিসাবে ব্যক্ত করা সম্ভব : অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট শরীরে পটুী চেতনা পরিদৃষ্ট হয় এবং বিপরীত হলে বিপরীত হয়—অর্থাৎ কিনা, দেহাত্মবাদীর মুখে জয়ন্তভট্ট যে যুক্তি বসিয়েছেন হুবহু তাইই।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি আমরা উপনিষদের ঋষি উদ্দালক আরুণিকে দেহাত্মবাদী আখ্যা দেবো? বলাই বাহুল্য, এজাতীয় প্রস্তাবে আমাদের আধুনিক অধ্যাত্মবাদীরা—বিশেষত বৈদান্তিকেরা—বিলক্ষণ বিরক্ত হবেন। কিন্তু তার প্রকৃত কারণ দার্শনিক বিচারও নয়, ঐতিহাসিক বোধও নয়—দীর্ঘকালসঞ্চিত গভীর সংস্কার মাত্র। অর্থাৎ আমাদের দেশে একদিকে যেমন দীর্ঘকাল ধরে প্রচার করা হয়েছে যে বেদ-বেদান্তর বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞানের আকর-মাত্র, অপরদিকে তেমনি দেহাত্মবাদকে অত্যন্ত অপকৃষ্ট মত বলে বিবেচনা করাই আমাদের চিন্তাশীলদের যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উপনিষদের ঋষিবাক্যেই দেহাত্মবাদের নজির দেখতে পাওয়া যেন অতি বড় দুঃসাহস।

তবুও ঐতিহাসিক বোধ ও ধর্মসংস্কার এক নয়। তাই যদি দেখা যায় যে পরবর্তী কালে দার্শনিক পরিভাষায় ব্যক্ত দেহাত্মবাদ সমর্থক কোন মূল যুক্তিই

৩৩৫। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' ৬।৭।।

উপনিষদ্ সাহিত্যে সংরক্ষিত রয়েছে তাহলে সেই যুক্তির প্রবক্তাকে অন্তত কোন একপ্রকার প্রাচীন দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই সমর্থক হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে—বেদ-বেদান্ত সংক্রান্ত সুপ্রাচীন সংস্কারের তা যতোই বিরুদ্ধ হোক না কেন।

বেদ-বেদান্ত সংক্রান্ত এই সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা অচিরেই বিচার করবো। কিন্তু তার আগে উদ্দালক আরুণি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনার প্রয়োজন।

উদ্দালকের আলোচ্য যুক্তিকে কোন এক প্রকার প্রাচীন দেহাত্মবাদী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচায়ক বলে গ্রহণ করলেও কি তাঁকে লোকায়তিক আখ্যা দেবার কোন কারণ থাকে? উত্তরে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে, পরবর্তী কালের দার্শনিক সাহিত্যে মূলতই পূর্বপক্ষ হিসাবে সংরক্ষিত লোকায়তমতের যে-পরিচয় আমরা পাই তার সঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত উদ্দালক আরুণির সমগ্র উপদেশটির তাদাত্ম্য প্রতিপাদনের প্রয়াস নিষ্ফল হবে। এই অর্থে উদ্দালক আরুণিকে লোকায়ত সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি বিবেচনা করা অবশ্যই ভ্রান্ত হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, লোকায়ত-মতের প্রকৃত আদিরূপ এখনো অনেকাংশেই গবেষণা-ধীন, যদিও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে এই নামে কোন একপ্রকার সুপ্রাচীন বস্তুবাদী মতই উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লোকায়তর সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক মতের—বিশেষত সুপ্রাচীন সাংখ্যমতের—প্রকৃত সম্পর্ক নূতন করে আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা পরে সেই আলোচনা উত্থাপনের প্রয়াস করবো এবং দেখাবো পরবর্তীকালে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের প্রলেপ প্রয়োগের বহু প্রয়াস সত্ত্বেও সাংখ্যর আদিরূপটিকে মূলত বস্তুবাদী বলেই অনুমান করার পর্যাপ্ত কারণ বর্তমান এবং তার সঙ্গে লোকায়তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কর নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, আধুনিক কালের অগ্রণী ভারততত্ত্ববিদ্ হর্মোন জ্যাকবি ছান্দোগ্য বর্ণিত উদ্দালক আরুণির মত সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যথা: উদ্দালক-মত প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদেরই পরিচায়ক এবং তাঁরই মধ্যে সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম সাক্ষ্য বর্তমান। জ্যাকবির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ওয়াল্টার রুবেন্ দাবি করেছেন, গ্রীক ইতিহাসে আদি বিদ্বান থ্যালিস্-র মতোই উদ্দালক আরুণিই ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম দার্শনিক এবং থ্যালিস্-এর মতোই তাঁর দর্শনও এক আদিম বস্তুবাদের পরিচায়ক—সেই আদিম বস্তুবাদকে দর্শনের ঐতিহাসিকেরা 'হাইলোজোইসম্' (*hylozoism*) আখ্যা দিয়ে থাকেন। হাইলোজোইসম্ অনুসারে ভূতপদার্থই পরম সত্য, কিন্তু এই ভূতপদার্থ নিষ্প্রাণ নয়, পক্ষান্তরে তা সজীব। অর্থাৎ, এই পর্যায়ের চিন্তায় জড় ও জীবন, অচেতন ও চেতন—উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণীত

হয়নি; তবুও অচেতন ভূতপদার্থই চরম সত্য বলে স্বীকৃত। রুবেন্ দাবি করেন যে ছান্দোগ্য বর্ণিত উদ্দালকের মতের সঙ্গে বৃহদারণ্যক বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য-মতের তুলনা করলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের প্রথম সংঘর্ষ স্পষ্ট হবে।

প্রচলিত ধারণার বিশেষ বিরুদ্ধ বলেই এখানে ওয়াল্টার রুবেন্ এর বক্তব্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয়:

"১৯৫৪-এ আমি এই সিদ্ধান্ত প্রচার করি যে ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্দালক আরুণি ভারতের প্রথম দার্শনিক। আমার ব্যাখ্যা অনুসারে আদিম বস্তুবাদ অর্থে তাঁর মত হাইলোজোইস্‌ম্ পদবাচ্য। এজাতীয় ব্যাখ্যা অবশ্যই বিতর্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য, কেন না তা আপাত-দৃষ্টিতেই অসম্ভব বলে প্রতীত হয় এবং প্রাচীন উপনিষদ-গ্রন্থে কোন বস্তুবাদীয় মত সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা ভারতীয় ঐতিহ্য সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার বিশেষ বিরোধী। ১৯৫৫-তে আমি ছান্দোগ্য-উপনিষদের এই অধ্যায়টি জার্মান ভাষায় তর্জমা করি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের অংশও—যথা, বৃহদারণ্যক-উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য-মতও—তর্জমা করি। তারপর, ১৯৬১-তে আমি 'ভারতে যুক্তিবাদী চিন্তার সূত্র' প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। সেই প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় লৌহ-যুগের শুরুতে যখন ট্রাইবাল-সমাজ পরিবেষ্টিত অবস্থায় কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটে—যখন দেখা দেয় শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাত, এবং তারই ফলে যখন মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অনিবার্য হয়—তখন, অর্থাৎ এই পটভূমিতে, পরিস্ফুট হয় বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষও এবং সেই সংঘর্ষের প্রথম পরিচয় উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্যর মত সংঘর্ষে পরিস্ফুট। [অধ্যাপক রুবেন্ এখানে সে যুগের মতাদর্শগত সংঘর্ষর আরো নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে সুপ্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডর বিরুদ্ধে সেই যুগে এক নব চেতনার সূচনা দেখা দেয়—এই নবচেতনা মূলতই বিজ্ঞানপ্রবণ বা *scientific*, যদিও সেকালের বিজ্ঞান অনিবার্যভাবেই অপরিণত ছিল।] উদ্দালক আরুণির দর্শনে—প্রমাণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত তাঁর বিচার ও উপমা-প্রয়োগে—সেযুগের বিজ্ঞানপ্রবণ এই নব চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই অর্থে তিনি ছিলেন পরবর্তীকালের অনুমান, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনায় উৎসাহী নৈয়ায়িকদের পথিকৃৎ।

"আমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হলে,—অর্থাৎ উদ্দালককে ভারতের প্রথম দার্শনিক এবং আদিম বস্তুবাদী অর্থে হাইলোজোইস্ট বলে স্বীকার করলে—তাঁর সঙ্গে গ্রীসের প্রথম দার্শনিক থ্যালিস্-এর সাদৃশ্য নিকট বলেই

বিবেচিত হবে.; কেননা উদ্দালকের কিঞ্চিৎ পরবর্তী এই গ্রীক দার্শনিকও হাইলোজোইস্ট ছিলেন।...

"কিন্তু উদ্দালকের মত কি সত্যিই হাইলোজোইস্ট-বস্তুবাদ পদবাচ্য? আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জার্মান জ্যাকবি প্রথম দাবি করেন যে উদ্দালকের উপদেশ একরকম বস্তুবাদের পরিচায়ক ছিল। উদ্দালক-উক্ত 'সৎ' পরবর্তী কালে যে-দ্বিবিধ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারই সংঘাত থেকে জ্যাকবি আলোচনা শুরু করেন, কেননা পরবর্তী কালে দেখা যায়, সাংখ্য-মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা অনুসারে এই 'সৎ' অর্থে অচেতন প্রকৃতি, পক্ষান্তরে বৈদান্তিকদের ব্যাখ্যায় তা চেতন ব্রহ্মবোধক। আরো একটি বিষয়ের উপর জ্যাকবি বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন। তিনি বলেন যে, বৈদিক মনোভাবে তখনো চেতন ও অচেতনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভূত হয়নি, উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখান, উদ্দালকের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে 'সৎ', 'তেজস্' প্রভৃতি প্রসঙ্গে 'ঐক্ষত' (অর্থাৎ, 'সংকল্প করেছিল', 'চিন্তা করেছিল') শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, যদিও উদ্দালকের উপদেশে ভূতপদার্থ সজীব হিসাবেই পরিকল্পিত এবং যদিও সেকালে চেতন ও অচেতনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয়নি, তবুও জ্যাকবি দাবি করেন যে উদ্দালকের মত মূলতই বস্তুবাদী ছিল।...

"১৯৪০-এ এইচ্. ভি. গ্লাসেনপ্ (H. V. Glasenapp) উদ্দালকের দর্শন উদ্ধৃত করে দেখাতে চান যে প্রাচীন ভারতীয়রা চেতন ও অচেতনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। ১৯৪৯-এ তিনি জ্যাকবির মত খণ্ডন করে প্রমাণ করতে চান যে উদ্দালকের দর্শনকে বস্তুবাদী আখ্যা দেওয়া নিরর্থক, কেননা সেই প্রাচীন কালের ধারণায় চেতন ও অচেতনের মধ্যে পার্থক্যই পরিস্ফুট হয়নি।...

"জ্যাকবি ও গ্লাসেনেপ্ যদিও দাবি করেন যে অতীত কালে চেতন ও অচেতনের পার্থক্য সুনির্ণীত হয়নি, তবুও স্বয়ং গ্লাসেনেপ্-ই যাজ্ঞবল্ক্যের মত উদ্ধৃত করে দেখান যে এই মতে আত্মা অন্যান্য সমস্ত পদার্থ থেকে পৃথক হিসাবে চেতন—বিজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানময় পুরুষ—অর্থেই পরিকল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ ভাববাদী হিসাবেই যাজ্ঞবল্ক্য চেতন-অচেতনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছিলেন এবং চেতনকেই চরম সত্য বলেছিলেন। এবং গ্লাসেনপ্-ও স্বীকার করেন যে তাঁর (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের) দর্শনে চেতন ও অচেতনের মধ্যে সম্পর্ক এই যে চেতন থেকেই অচেতনের উৎপত্তি। তবুও গ্লাসেনপ্ তর্ক করেন যে যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত থেকে প্রতীত হয় না যে সেকালে চেতন ও অচেতনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছিল; অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের ভাববাদের সঙ্গে উদ্দালকের বস্তুবাদের কোন বিরোধ বা সংঘাত প্রদর্শনের প্রয়াস ভিত্তিহীন। কিন্তু ভাববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল

চেতনই প্রধান, যেমন বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য হল অচেতনই প্রধান। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উদ্দালকের বস্তুবাদের মতোই যাজ্ঞবল্ক্যর ভাববাদও প্রাথমিক বলেই তাঁর দর্শনে 'মায়া', 'বিবর্ত' প্রভৃতি ধারণার পরিচয় পরিস্ফুট নয়। সেকালে দার্শনিক মতগুলির বিকাশ সবে শুরু হয়েছে; তবুও সে যুগেই বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংঘর্ষও পরিদৃষ্ট হয়।"৩৩৬

এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ওয়াল্টার রুবেন দীর্ঘ ভাবে ছান্দোগ্য-বর্ণিত উদ্দালক-মতের সঙ্গে বৃহদারণ্যক-বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য-মতের তুলনা করেন এবং দেখাতে চান যে 'মৃত্যু', 'নিদ্রা' প্রভৃতি যে-কয়টি বিষয় উভয় দার্শনিকই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সেই বিষয়গুলির প্রতিটি প্রসঙ্গেই একদিকে যেমন যাজ্ঞবল্ক্য ভাববাদী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন অপর দিকে তেমনি উদ্দালক পরিচয় দিয়েছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের। ওয়ালটার রুবেন-এর পুরো নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই। কিন্তু উদ্দালকের একটি যুক্তিকে আমরা বস্তুতপক্ষে কোন একপ্রকার প্রাচীন দেহাত্মবাদেরই পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেছি। বৃদ্ধ-সম্মতি হিসাবে এখানে উক্ত যুক্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক রুবেন্-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে:

This materialism is further expressed in Uddalaka's doctrine that mind is becoming out of food just as breath (life) out of water and speech out of fire. It was common among the old thinkers to identify speech with fire and breath (life) with water. But to claim that mind is food was something stupendous. It was the climax of this text of Uddalaka teaching his son Svetaketu and he felt the necessity to prove this thesis. Therefore, he used the churning of milk as analogy to human digestion: just as milk is separated in three parts, food becomes threefold—its finest parts become mind, the middle ones flesh, the coarsest ones excrements. And finally he made his son undergo the experiment of fasting in order to show that drinking water keeps him alive but avoiding food makes him lose his thinking (rather memory). When he eats again, his knowledge, his mind, comes back. as we would say, or his mind is recreated by food, as Uddalaka taught.

This conception reminds us of the later Samkhya ideas according to which *buddhi* is the first product of *prakrti*[৩৩৭]

সাংখ্য দর্শনের আদিরূপ প্রসঙ্গে আমরা এই আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো।

২৩॥ দেহাত্মবাদ: বেদান্ত ও প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য

আমাদের আধুনিক অধ্যাত্মবাদীরা ওয়াল্টার রুবেন্-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণ করবেন না। এবং দেহাত্মবাদের নিকৃষ্টতা তাঁদের কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সমতুল্য বলেই উপনিষদের মতো বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যে এই মতের কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া তাঁদের বিচারে একান্তই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তাঁদের আপত্তির প্রকৃত কারণ দার্শনিক বিচারও নয়, ঐতিহাসিক তথ্যর নিরপেক্ষ পর্যালোচনাও নয়। পক্ষান্তরে আপত্তিটির আসল কারণ হল, বেদ-বেদান্ত সংক্রান্ত নেহাতই সংস্কারগত এক ধারণা। অথচ দীর্ঘযুগসঞ্চিত হলেও সংস্কারটি বস্তুতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য। অতএব, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় দেহাত্মবাদের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে এখানে আলোচ্য সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধির জন্য দু একটি মন্তব্যর প্রয়োজন আছে।

আমাদের দার্শনিক মহলে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব আজো যে এতো প্রবল, তার একটি প্রধান কারণ হল বেদান্তদর্শনের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা। বেদান্ত মানে বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ—অর্থাৎ, উপনিষদ্, কেননা বেদের শেষভাগ হিসাবেই তা সংরক্ষিত। বৈদান্তিকদের[৩৩৮] মূল দাবি হল, বেদবাক্যর প্রকৃত তাৎপর্যই চরম সত্যের পরিচায়ক; স্বাধীন তর্ক বা বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এই কারণে, বৈদান্তিকেরা বিশেষত উপনিষদ্-বাক্যর তাৎপর্যই বিচার করেন। সংক্ষেপে, বেদান্ত-দর্শন মানে উপনিষদের দর্শন এবং আধুনিক বিদ্বানদের[৩৩৯] ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই উপনিষদ্-সাহিত্যে বস্তুতপক্ষে বিবিধ মতের পরিচয় থাকলেও বৈদান্তিকদের বিশ্বাস সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্যেই মূলত এক দার্শনিক মত ব্যক্ত হয়েছে।

বেদান্ত দর্শনের নামান্তর "শারীরক-মীমাংসা"। শঙ্করাচার্য-কৃত 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্যও "শারীরক-ভাষ্য" নামে খ্যাত? "শারীরক" মানে কী? মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার[৩৪০] বলেছেন, "শরীর শব্দের উত্তর কুৎসার্থে কণ্ প্রত্যয় করিয়া শারীরক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শারীরক শব্দের অর্থ কুৎসিত শরীরবাসী জীবাত্মা।"

৩৩৭। Ruben SAIT 87

৩৩৮। 'ব্রহ্মসূত্র', ২।১।১১—বিশেষত শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৩৯। Bhandarkar VS i, Thibaut in SBE xxxiv Intro. p. ciii. Hume TPU7; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩৪০। তর্কালঙ্কার, 'ফেলোশিপ লেকচার' ১।৬৩।

বেদান্তর এই নামান্তর থেকে বোঝা যায়, বৈদান্তিকদের চোখে শরীর বা দেহ বলে পদার্থটি কতো কুৎসিৎ! পক্ষান্তরে, তাঁদের মতে আত্মাই চরম সত্য বা পরমব্রহ্ম। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাই দেহাত্মবাদের মতো নিন্দিত মতবাদ আর হয় না: দেহকেই যাঁরা আত্মা মনে করেন, বা, আত্মা বলতে যাঁদের কাছে দেহমাত্রই, তাঁরা নাস্তিক, পাষণ্ড, নরকগামী!

বৈদান্তিকের স্বীয় দাবি অনুসারে তিনিই বৈদিক ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অতএব তাঁকে একটি প্রশ্ন করা অসঙ্গত হবে না। এই ঐতিহ্যের প্রাচীনতর পর্যায়েও কি শরীর বা দেহ সত্যিই এতো নিন্দিত? দেহকেই আত্মা বা আত্মাকেই দেহ বিবেচনা কি সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও পাষণ্ড, নাস্তিক ও নরকগামীর লক্ষণ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবতই 'ঋগ্বেদসংহিতা'র সাক্ষ্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কেননা, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রাচীন। শুধু তাই নয়, বেদপন্থী মাত্রই মানবেন, ঋগ্বেদই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রধান, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈদান্তিকেরাও মানবেন, ঋগ্বেদের নজিরের চেয়ে বড়ো নজির আর কিছুই হতে পারে না। ঋগ্বেদে ভক্তিহীন বৈদান্তিক নিশ্চয়ই অলীক।

কিন্তু ঋগ্বেদের প্রতি ভক্তির ভান যতোই গভীর হোক-না-কেন একালের মতোই সেকালের অধ্যাত্মবাদীরাও ঋগ্বেদের প্রকৃত সাক্ষ্য বহুলাংশেই উপেক্ষা করে থাকেন। এই কারণেই ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক বিচারে অগ্রসর হবার সময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৩৪১] বিদ্রূপ করে বলেছেন, "কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান-আদির সংগ্রহমাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি **যাঁহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই**, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।" পরবর্তীকালে বেদ সম্বন্ধে ভয়ভক্তি-সম্বলিত এক প্রবল কিন্তু অন্ধ সংস্কার প্রচারিত হয়েছে বলেই ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করার আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো অগ্রণী ভারততত্ত্ববিদের এই মন্তব্য মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, কেননা নৈর্ব্যক্তিক বিচারে স্পষ্টই দেখা যায় যে বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরা পরবর্তী কালে যে-সব ধ্যানধারণাকে অত্যন্ত ঘৃণিত বলে প্রচার করতে চেয়েছেন বেদমন্ত্রর সরলার্থ বিচারে সে জাতীয় বহু ধ্যানধারণার পরিচয় বাস্তবিকই পাওয়া যায়।

বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক ঋগ্বেদের মাত্র দুটি সাক্ষ্য এখানে উদ্ধৃত করবো। প্রথমটিতে দেখা যাবে যে ঋগ্বেদের ঋষি অবধারিতভাবে "শরীর" বা "দেহ" অর্থেই "আত্মা" শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে

৩৪১। 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', ২।৩৮৯।

দেখা যাবে যে দেহ বা শরীর নামের পদার্থটি অন্তত ঋগ্বেদের ঋষির কাছে কোন ঘৃণার বিষয় বাস্তবিকই ছিলো না।

ঋগ্বেদের[৩৪২] দশম মণ্ডলে যক্ষ্মা-নাশন একটি সূক্ত আছে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে আজো যে-রকম "ঝাড়ফুক" প্রচলিত আছে অনেকটা সেইরকমই। সূক্তটির সরলার্থ হল, শরীরের সমস্ত অবয়ব থেকে যক্ষ্মা দূর করবার প্রয়াস: "তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক বা জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে, আমি তাড়াইয়া দিতেছি"… ইত্যাদি। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, এই সূক্তর শেষ দুটি ঋক-এ অবধারিত ভাবে শরীর বা দেহ অর্থেই "আত্মন্" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে:

মেহনাৎ বনং করণাৎ লোমভ্যঃ তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মম্ সর্বস্মাৎ **আত্মনঃ** তম্ ইদম্ বি বৃহামি তে॥ ১০।১৬৩।৫॥
অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ লোম্নঃ লোম্ন জাতম্ পর্বণি পর্বণি।
যক্ষ্মম্ সর্বস্মাৎ **আত্মনঃ** তম্ ইদম্ বি বৃহামি তে॥ ১০।১৬৩।৬॥

—অর্থাৎ,

প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার "সর্বাঙ্গ শরীর হইতে" (সর্বস্মাৎ আত্মনঃ) আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি॥

এই বেদমন্ত্রে "আত্মন" শব্দকে শরীর বা দেহ ছাড়া আর কোন অর্থে গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। সায়ণাচার্যও এখানে "আত্মন্" শব্দকে নিছক শরীর অর্থেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন; তিনি "সর্বস্মাৎ আত্মনঃ"-র অর্থ করেছেন "কৃৎস্নাদেব শরীরাৎ"—সামগ্রিকভাবে শরীর থেকে।

একথা অবশ্যই সুবিদিত যে ঋগ্বেদের সর্বত্রই আত্মন্ শব্দ এইভাবে শরীর বা দেহবোধক নয়। তবু, উপরোদ্ধৃত বেদমন্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই শরীর অর্থে আত্মন্ শব্দ প্রয়োগের গুরুত্বও উপেক্ষণীয় হতে পারে না। তার সাক্ষ্য থেকে সহজেই অনুমিত হয়, পরবর্তীকালে বৈদিক ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারীরা যতো বিশুদ্ধ বা চরম ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদেই উপনীত হোন-না-কেন, বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্রই সেই অধ্যাত্মবাদের পরিচয় অন্বেষণ নিষ্ফল হবে। অর্থাৎ বৈদিক চিন্তারও একটা ইতিহাস আছে এবং সে-ইতিহাসের তুলনায় প্রাচীনতর

৩৪২। 'ঋগ্বেদ' ১০।১৬৩। সূক্তটির অংশবিশেষ 'অথর্ব বেদ' ২।২৩ এবং ২০।৯৬ এও বর্তমান। কিন্তু এখানে উল্লিখিত সূক্তর ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঋক্ 'অথর্ববেদ'-এ অবর্তমান। উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্র দত্তর॥

পর্যায়ে দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়নি। অতএব, এজাতীয় তুলনায় প্রাচীনতর পর্যায়ের চিন্তাকে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত হবে না এবং সেই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়ের চিন্তার সঙ্গে পরবর্তীকালের সচেতন বস্তুবাদী চিন্তার তাদাত্ম্য প্রতিপন্নর প্রয়াস অতিসারল্যের পরিচায়ক হলেও অধ্যাত্মবাদী কল্পনার অভাব-সূচক অর্থে উক্ত প্রাক্-অধ্যাত্মবাদকে আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ বলে বিবেচনা করার সুযোগও অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক ঐতিহ্যেই দেখা যায়, এই আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের ধ্বংসস্তূপের উপরই পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব হয়েছিল। অতএব মন্তব্য করা যায়, যে-বস্তুবাদের বা দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে উত্তরকালে বৈদান্তিকেরা তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন তারই কোন একপ্রকার আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত পূর্বাভাস দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যেরই তুলনায় প্রাচীনতর অংশে। এই অর্থে দেহাত্মবাদ বা বস্তুবাদমাত্রেরই নিন্দা করে বৈদান্তিকেরা এমনকি প্রাচীন বৈদিক ঋষিদেরও নিন্দা করার উপক্রম করেছেন! হাজার হোক, অন্তত ঋগ্বেদের ঋষিবিশেষ আত্মা বলতে শরীরমাত্রই বুঝেছিলেন, কিংবা যা একই কথা, শরীরাতিরিক্ত কোন আত্মার কল্পনা তাঁর চিন্তায় অনুপস্থিত।

বৈদিক ঐতিহ্যেরই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়ের আলোচনায় পরে প্রত্যাবর্তন করবো। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈদান্তিক দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য-সূচক অন্তত আর একটি নজির এখানে উদ্ধৃত করার বিশেষ প্রলোভন হয়। দেহ বা শরীর বলে পদার্থটির প্রতি বৈদান্তিকদের ঘৃণা যে কতো গভীর তার পরিচয় "শারীরক" শব্দর অর্থ বিচার থেকেই ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে, সুপ্রাচীন বৈদিক ঋষিরা শরীরকে এরকম ঘৃণার বিষয় মনে করতেন না। বহুবিধ এবং একান্তই পার্থিব কামনাই সেই প্রাচীন কবিদের প্রধানতম বিষয়বস্তু এবং তার মধ্যে একটি অন্যতম কামনা হল অন্নপানাদির সাহায্যে শরীরেরই পুষ্টিসাধন। নমুনা হিসাবে এখানে মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি রচিত (বৈদিক পরিভাষায়, "দৃষ্ট") একটি গান বা কবিতা (বৈদিক পরিভাষায়, "সূক্ত") উদ্ধৃত করাই পর্যাপ্ত হবে। ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তরই নির্দিষ্ট দেবতা উল্লিখিত। এই সূক্তটির দেবতা হলেন "পিতু"। পিতু মানে অন্ন[৩৪৩]। অর্থাৎ, সহজ ভাষায়, পুরো গানটিই অন্নর স্তুতি বা প্রশংসা। এবং সেই প্রশংসার প্রধান কারণ হল, অন্ন দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়:

> "…হে স্বাদু পিতু! হে মধুর পিতু! আমরা তোমার সেবা করি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে পিতু! তুমি মঙ্গলময়; তুমি

৩৪৩। 'নিঘণ্টু', ২।৭।

কল্যাণকর আশ্রয়দান দ্বারা আমাদিগের নিকট আগমন করতঃ আমাদিগের সুখ উৎপাদন কর।...হে স্বাদুতম পিতু! যে সকল লোক তোমাকে প্রার্থনা করে তাহারা (ভোক্তা)।...তোমার রসাস্বাদী ব্যক্তিগণের গ্রীবা উন্নত হয়। ...হে পিতু! যখন মেঘগণের প্রসিদ্ধ উদক আগমন করে, তখন হে মধুর পিতু! তুমি আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে ভোজনের জন্য সন্নিহিত হও। যেহেতু আমরা প্রভূত জল ও ওষধি ভক্ষণ করি, অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও। হে সোম! তোমার দুগ্ধাদি মিশ্রিত ও যবাদি মিশ্রিত অংশ ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও। হে করম্ভ ওষধি! তুমি স্থূলতা-সম্পাদক ও রোগনিবারক ইন্দ্রিয়োদ্দীপক হও; হে শরীর! তুমি স্থূল হও।"...৩৪৪

গানের ধুয়াটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক: হে শরীর! তুমি স্থূল হও—"বাতাপে পীব ইৎ ভব"। ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলছেন,

"বাতাপে"। বাতেন প্রাণেন আপ্নোতি স্বনির্বাহমিতি বাতেনাপ্যায়ত ইতি বা বাতাপি শরীরম্। হে শরীর, ত্বং "পীব ইৎ" আপ্যায়িত এব "ভব"। অন্নোদকাভ্যাং শরীরবৃদ্ধি প্রসিদ্ধা।

—অর্থাৎ,

বাতাপে (হে বাতাপি)। বায়ুদ্বারা, অর্থাৎ প্রাণবায়ুদ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে, অথবা, বায়ুর দ্বারা স্ফীত হয়—এই অর্থে বাতাপি, অর্থাৎ শরীর। হে শরীর, তুমি অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। অন্ন ও পানের দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি প্রসিদ্ধই।

সায়ণাচার্য এখানে "বাতাপি" শব্দর যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন তা সকলেই স্বীকার করবেন কিনা—সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তবুও "বাতাপি" মানে যে শরীরই—এ কথায় সন্দেহ নেই এবং এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে অন্নদ্বারা শরীরবৃদ্ধির বা শরীর পুষ্টির কামনাই উদ্ধৃত ধুয়াটির সারমর্ম।

এবারে কল্পনা করা যাক, পরবর্তীকালের কোন বৈদান্তিক ঋগ্বেদের অগস্ত্য ঋষির কাছে প্রস্তাব করেছেন, "হে কবি! হে সত্যদর্শি! চিৎস্বরূপ দেহাতিরিক্ত আত্মাই পরম সত্য। পক্ষান্তরে, বাতাপি বা শরীর নামের বস্তুটি অতীব কুৎসিত। অতএব, শরীর শব্দের উত্তর কুৎসার্থে কণ প্রত্যয় করে আমাদের বৈদিক দর্শনটির নামকরণ করা হোক 'শারীরক'।"

স্বয়ং অগস্ত্যর কাছে এ জাতীয় প্রস্তাব এমন কি বোধগম্য হতো কিনা—মোহমুক্ত ঐতিহাসিকেরা তা বিচার করতে পারেন।

২৪ ॥ আত্মবাদ ও আত্মার প্রমাণ

তাহলে এমন কি বৈদান্তিকের পক্ষেও আত্মবাদের সমর্থনে বেদকেই একমাত্র

৩৪৪। 'ঋগ্বেদ' ১।১৮৭। রমেশচন্দ্র দত্তর অনুবাদ।

প্রমাণ বলা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বৈদিক সাহিত্য আয়তনে বিশাল এবং ঐতিহাসিক ভাবে তা দীর্ঘ যুগ ধরে রচিত। তাতে নানা স্তরের বিচিত্র চিন্তার পরিচয় সংরক্ষিত হয়েছে। ফলে. বৈদিক সাহিত্য থেকেই একদিকে যেমন অবধারিত ভাবে আত্মবাদের পক্ষে নজির দেখানো সম্ভব অপর দিকে তেমনি এমন নজিরও দুর্লভ নয় যার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাও পরবর্তী আত্মবাদের সমর্থক হতে পারে না।

অবশ্য ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী মাত্রই বৈদান্তিক নন। এমন কি বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করেও জৈন দার্শনিকেরা দেহাতিরিক্ত 'আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে পরম উৎসাহী। নৈয়ায়িকেরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে বস্তুতপক্ষে লৌকিক প্রমাণের উপরই বিশেষ নির্ভরশীল। এ কালের পাঠকদের কাছেও বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস বহুলাংশেই ঐতিহাসিক কৌতূহলমাত্রে পরিণত হয়েছে। তাই, অন্তত একালের আলোচনায়, দেহাত্মবাদ-বনাম-আত্মবাদের বিচারে বৈদিক প্রমাণের কথা ছাড়াও বিশেষ করে প্রশ্ন তোলা দরকার: দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে আত্মবাদীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান,, প্রভৃতি যে-সব লৌকিক প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন সেগুলির প্রকৃত গুরুত্ব কতোখানি? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, আত্মবাদীদের পক্ষ থেকে প্রযুক্ত দেহাত্মবাদ খণ্ডনের যুক্তিগুলির সার্থকতা নিঃসন্দিগ্ধ নয়। কিন্তু আত্মবাদীরা যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে বাস্তবিকই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে থাকেন তাহলেও দেহাত্মবাদ স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ, পরপক্ষনিরসনের পক্ষে আত্মবাদীদের যুক্তি সফল না-হলেও স্বপক্ষ স্থাপনে তাঁদের যুক্তি পর্যাপ্ত হলে আত্মবাদই গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, এবারে আত্মবাদীদের স্বপক্ষস্থাপনের প্রয়াস বিচার করা যাক।

কিন্তু এই আলোচনা খুব দীর্ঘবিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ভারতীয় দর্শনে লৌকিক প্রমাণের মধ্যে প্রধান বলতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এ ছাড়াও অবশ্য সম্প্রদায় বিশেষে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামের লৌকিক প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে। তাছাড়া, আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং আত্মবাদীরাও উপমানাদি প্রমাণের উপর বিশেষ নির্ভর করেন না। স্বপক্ষ সাধনের জন্য তাঁরা মূলতই অনুমান—এবং অনেকে অবশ্য প্রত্যক্ষরও—নজির প্রদর্শন করেন।

এই পরিস্থিতিতে যদি দেখা যায়, আত্মার প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করতে গিয়ে আত্মবাদীরা বিবিধ ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নানাভাবে নিজেদের মূল দাবি সংশোধন ও এমন কি পরিবর্জন করতেও বাধ্য হয়েছেন, তাহলে লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের স্বপক্ষস্থাপনের প্রয়াস অন্তত নিঃসন্দিগ্ধ হবে না।

প্রথমে প্রত্যক্ষর আলোচনা করা যাক। ভারতীয় দার্শনিকদের বিবেচনায়, ইন্দ্রিয়র সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ বা সন্নিকর্ষর ফলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। অবশ্যই চক্ষুকর্ণাদি প্রসিদ্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয়র সঙ্গে আত্মার সংযোগ হতে পারে না। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে এই পাঁচটি বহিঃ-ইন্দ্রিয় ছাড়াও অন্তঃকরণ বা মন নামের একটি অন্তঃইন্দ্রিয় বর্তমান। তার সঙ্গে সংযোগ বা সন্নিকর্ষর ফলেও প্রত্যক্ষ হয়; সে-প্রত্যক্ষর নাম মানসপ্রত্যক্ষ। যাঁরা দাবি করেন যে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব তাঁদের বিবেচনায় সে-প্রত্যক্ষ এ জাতীয় মানস প্রত্যক্ষই। অর্থাৎ, তাঁদের মতে মন বা অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু এই মানস প্রত্যক্ষর স্বরূপ কী? উত্তরে তাঁরা বলেন, অহং-জ্ঞান বা অহং প্রত্যয়। কিন্তু এই অহং-জ্ঞান বা অহং-প্রত্যয় দেহাত্মবাদী বা লোকায়তিকদের মতে বস্তুতপক্ষে দেহেরই জ্ঞান, দেহাতিরিক্ত বা দেহাশ্রিত কোন স্বতন্ত্র আত্মার প্রত্যক্ষ নয়। এ বিষয়ে তাঁদের মূল যুক্তি হল, অহং-প্রত্যয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলতে "স্থূলোহহং", "কৃশোহহং", ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি খর্ব, আমি দীর্ঘ ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রতি দৃষ্টান্তেই দেখা যায় "অহং" বলতে বস্তুতপক্ষে "দেহ"-ই বোঝা হয়। দেহাতিরিক্ত কোন আত্মাকে স্থূল, কৃশ, গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ প্রভৃতি বিবেচনা করা অসম্ভব। অর্থাৎ, অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে কতকগুলি শরীরধর্মমাত্রই "অহং"-এর ধর্ম বলে বিবেচিত; অতএব অহং-প্রত্যয়ের দ্বারা "অহং" ও "শরীর"-এর তাদাত্ম্যই প্রতিপন্ন হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে লোকায়তিকদের পক্ষে কোন্ ধরণের যুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব বাচস্পতি মিশ্র ও গুণরত্নর রচনা থেকে ইতিপূর্বেই তা উদ্ধৃত হয়েছে (পৃ. ১৪৪ এবং পৃ. ১৪৬-৭ দ্রষ্টব্য)।

স্বভাবতই আত্মবাদীরা এই অহং-প্রত্যয়টিই বিশ্লেষণ করে দেখাতে চান যে অহং বলতে এখানে দেহ হতে পারে না। পক্ষান্তরে, অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে দেহাতিরিক্ত আত্মারই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু, তাহলে তাঁদের মতে "আমি স্থূল", "আমি কৃশ" প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাখ্যা কী হবে? আত্মবাদী বলেন, এ জাতীয় দৃষ্টান্তে অহং শব্দকে ঔপচারিক বা লাক্ষণিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। যেমন, আমরা কথায় বলি, "কালিদাস পড়েছি"; এখানে "কালিদাস" শব্দকে মুখ্য অর্থে গ্রহণ না-করে ঔপাচারিক বা লাক্ষণিক অর্থে "কালিদাসের রচনা"ই বোঝা হয়। তেমনি, "আমি কৃশ", "আমি স্থূল", ইত্যাদি দৃষ্টান্তে "আমি" বলতে আসলে "আমার দেহ"; অর্থাৎ এখানে "অহং" শব্দকে মুখ্য অর্থে বা আত্মা অর্থে গ্রহণ না করে ঔপচারিক বা লাক্ষণিক অর্থে আত্মাটি যে শরীরে স্থিত সেই শরীরই বোঝা দরকার। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, "স্থূলোহহং", "কৃশোহহং", ইত্যাদি দৃষ্টান্তে "অহং" শব্দকে এই ভাবে ঔপচারিক অর্থেই গ্রহণ কেন করতে হবে? উত্তরে, আত্মবাদীদের যুক্তি এই যে "স্থূলোহহং", "কৃশোহহং" প্রভৃতি অহং-প্রত্যয়গুলি বস্তুতপক্ষে বাধিত হয়, অর্থাৎ অন্য

জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় বা পরিত্যক্ত হয়। যেমন, "অহং জানামি," "অহং স্মরামি",—অর্থাৎ, আমি জানি, বা, আমি স্মরণ করি—ইত্যাদি জ্ঞান "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" ইত্যাদি জ্ঞানকে বাধিত করে। সহজ কথায়, "জ্ঞাতা" অর্থে বা "স্মরণকর্তা" অর্থে "আমি" বলতে দেহমাত্রই উক্ত হতে পারে না। কিন্তু "অহং জানামি", "অহং স্মরামি" প্রভৃতি জ্ঞানের আর কোন বাধক জ্ঞান সম্ভব নয়। "জ্ঞাতা" অর্থে "আমি"-র কোন রকম বাধক জ্ঞান সম্ভবই নয়, কেননা জ্ঞাতার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করতে গেলেও সংশয়কারী অর্থে আবার জ্ঞাতাকেই স্বীকার করতে হবে। অনেকটা এই জাতীয় তর্ক তুলেই গুণরত্ন মন্তব্য করছেন, " 'অহং ন অহং' ইত্যাদি উক্তি 'মাতা মে বন্ধ্যা' ইত্যাদির ন্যায় স্ববচনবিরুদ্ধ।"[৩৪৫]

আত্মবাদীদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত যুক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এখানে জয়ন্তভট্ট-র রচনা উদ্ধৃত করাই পর্যাপ্ত হবে। জয়ন্ত বলেছেন,[৩৪৬]

> "অহংপ্রত্যয় কখনো কখনো শরীরসমানাধিকরণ হতে পারে। যেমন 'স্থূলোঽহং,' 'কৃশোঽহং' ইত্যাদি। কখনো কখনো অহং প্রত্যয়টি জ্ঞাতৃসমানাধিকরণ হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানের কর্তাকে বিষয় করে)। যেমন, 'অহং জানামি', 'অহং স্মরামি' ইত্যাদি। তার মধ্যে স্থূলাদি সমানাধিকরণ অহংপ্রত্যয়গুলির কথা থাকুক। কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমানাধিকরণ যেসব অহংপ্রত্যয় তাতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশিত হয় না।...তা [অর্থাৎ, অহংপ্রত্যয়ের বিষয়] শরীর হতে পারে না। কেননা, বাল্যাদি অবস্থাভেদে শরীর নানা এবং অচেতন। এইভাবে প্রত্যভিজ্ঞা-সহ অহংপ্রত্যয়-গ্রাহ্য জ্ঞাতা সিদ্ধ হলে স্থূলাদি সমানাধিকরণ যে-অহংপ্রত্যয় আত্মার অভেদ-উপচার বশতঃ শরীরকে বিষয় করে তাকে মিথ্যা বলতে হবে। কিন্তু তার দ্বারা জ্ঞানাদি সমানাধিকরণ অহংপ্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ তা অবাধিত জ্ঞান [অর্থাৎ, তা অন্য কোন জ্ঞান দ্বারা বাধিত বা খণ্ডিত হয় না]। 'অহং জানামি'—এই জ্ঞান স্বল্পমাত্র দোষের দ্বারাও দুষ্ট হয় না। অতএব আত্মাই [অহং প্রত্যয়ের] মুখ্য বিষয়, তা ছাড়া সমস্ত বস্তুই লাক্ষণিক [বা ঔপচারিক]। অতএব অহংপ্রত্যয় হয় বলেই আত্মা প্রত্যক্ষ।"

দেহাত্মবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই আপত্তির উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে। তিনি বলবেন, সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত বিচারটিই অবান্তর। কেননা, আত্মবাদী শুরুতেই ধরে নিয়েছেন যে অহংপ্রত্যয় দ্বিবিধ—শরীর-সমানাধিকরণ ও জ্ঞানাদি-

৩৪৫। গুণরত্ন, 'তর্করহস্যদীপিকা' ১৪৭॥
৩৪৬। জয়ন্তভট্ট, 'ন্যায়মঞ্জরী' ২।৩-৪॥

সমানাধিকরণ। যথা: "আমি স্থুল" এবং "আমি জানছি"। এই দ্বিবিধ অহংপ্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করেই আত্মবাদী দেখাতে চেয়েছেন যে প্রথমটি বাধিত হয় ও দ্বিতীয়টি কখনোই বাধিত হয় না। অতএব, মুখ্য তাৎপর্যে প্রথমটি মিথ্যা—শুধুমাত্র ঔপচারিক বা লাক্ষণিক অর্থে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাই জ্ঞানাদি-সমানাধিকরণ অহং প্রত্যয়কেই মুখ্য অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব এবং জ্ঞানাদি যেহেতু আত্মারই ধর্ম সেইহেতু এই অহংপ্রত্যয় থেকে আত্মাই প্রমাণ হয়।

কিন্তু দেহাত্মবাদী বলবেন, ওই তথাকথিত দ্বিবিধ অহংপ্রত্যয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য—অতএব বিরোধ—কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কেননা, স্থুল, কৃষ্ণ, গৌরবর্ণ প্রভৃতির মতো জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতিও বস্তুতপক্ষে দেহধর্মই। স্বয়ং জয়ন্তভট্টই লোকায়ত-বর্ণনায় যেমন বলেছেন, "চৈতন্যখচিতাৎ কায়াৎ ন আত্মা অন্যঃ অস্তি"—চৈতন্যখচিত দেহ ছাড়া আর কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, লোকায়ত-মতে চৈতন্য—অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি—আসলে দেহধর্মই। ফলে, "স্থুলোঽহং", "কৃশোঽহং"-এর মতোই "অহং জানামি", "অহং স্মরামি" প্রভৃতি অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগুলি বস্তুতপক্ষে শরীর-সমানাধিকরণ। আসলে, উপরোক্ত বিচারে, তথাকথিত দ্বিবিধ অহং-প্রত্যয়ের মধ্যে মৌলিক বিরোধ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে জয়ন্তভট্ট ধরেই নিয়েছেন যে শরীর বস্তুতপক্ষে স্বয়ং-অচেতেন পদার্থ। কিন্তু তিনি অবশ্যই জানেন, লোকায়ত-মতে আসলে তা নয়। এই মতে চৈতন্য শরীরেরই গুণ বা ধর্ম, শরীরই চেতনা-যুক্ত বা সচেতন। তাই, লোকায়ত-মত নিঃসন্দেহে নিরসিত না-হলে জয়ন্তভট্টর উপরোক্ত বিচারটি সামগ্রিকভাবেই ব্যর্থ ও অবান্তর বলে বিবেচিত হবে। অন্যান্য আত্মবাদীদের মতো জয়ন্তভট্টও অবশ্যই দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিশেষ প্রয়াস করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই তা পর্যালোচনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আত্মবাদীদের বহুবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের প্রকৃত সার্থকতা অন্তত বিতর্কসাপেক্ষ।

অতএব, আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রদর্শিত অহং-প্রত্যয়ের আলোচ্য বিচার প্রসঙ্গে আমাদের বর্তমান মন্তব্য শুধু এই যে তার গুরুত্ব দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের সার্থকতার উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কিন্তু দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের সার্থকতাই সংশয়-সাপেক্ষ। অতএব, আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রদর্শিত অহং-প্রত্যয়ের উপরোক্ত নজির অন্তত নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না।

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্য থেকে এখানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি আলোচনা উদ্ধৃত করার প্রলোভন হয়। আমরা ইতিপূর্বে বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি অবশ্যই লোকায়তিক ছিলেন না; পক্ষান্তরে লোকায়ত-মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি সুদীর্ঘ বিচারের অবতারণা করেছেন। কিন্তু তিনি নৈয়ায়িকদের মতো জন্মান্তরগামী কোন নিত্য আত্মার

অস্তিত্বও স্বীকার করতেন না। তাই তিনি আত্মা সংক্রান্ত ন্যায়মত খণ্ডনেরও বিশেষ প্রয়াস করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রদর্শিত অহং-প্রত্যয়ের আলোচ্য সাক্ষ্যও বিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। এবং চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে অহং-প্রত্যয়টির বিচারে তিনি যে-যুক্তির অবতারণা করেছেন তার সঙ্গে লোকায়ত-মত হিসাবে প্রদর্শিত যুক্তির অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। শান্তরক্ষিত বলছেন,[৩৪৭]

তদযুক্তমহংকারে তদ্রূপানবভাসনাৎ।
ন হি নিত্যবিভুত্বাদিনির্ভাসস্তত্র লক্ষ্যতে ॥ ২১৩ ॥
গৌরবর্ণাদিনির্ভাসো ব্যক্তং তত্র তু বিদ্যতে।
তৎস্বভাবো ন চাত্মেষ্টো নায়ং তদ্‌বিষয়স্ততঃ ॥ ২১৪ ॥

—অর্থাৎ,

তাতে [অহং-প্রত্যয়ে] আত্মা বিষয় হয় [এই দাবী] অসঙ্গত। কেননা, অহংপ্রত্যয়ে আত্মার আকার বিষয়ীভূত হয় না। নিত্যত্ব-বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলির প্রকাশ তাতে [অহং-প্রত্যয়ে] কখনো দেখা যায় না। [ন্যায়মতে আত্মা নিত্য ও বিভু। কিন্তু অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে এই নিত্যত্ব ও বিভুত্ব কখনোই প্রকাশিত হয় না।] ॥ ২১৩ ॥

বরং সেখানে [অহং-প্রত্যয়ে] গৌরবর্ণ প্রভৃতি [শরীরধর্মই] স্পষ্টতঃ ভান হয়। কিন্তু তাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট [অর্থাৎ গৌরাদিবর্ণযুক্ত] আত্মা [ন্যায়মতে] স্বীকৃত নয়। সুতরাং এই অহংপ্রত্যয় আত্মাকে বিষয় করে না ॥ ২১৪ ॥

'পঞ্জিকা'-য় কমলশীল অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

অহং-প্রত্যয়ে আত্মা বিষয় হয়—এই দাবী অপ্রমাণিত। কেননা, [অহং-প্রত্যয়] আত্মার আকার-রহিত।...নিত্যত্ব, বিভুত্ব, চেতনত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট আত্মা তোমাদের স্বীকৃত। কিন্তু অহং-প্রত্যয়ে নিত্যত্বাদির কোন প্রতিভাস হয় না। বিপরীতপক্ষে, আমি গৌরবর্ণ, ক্ষীণদৃষ্টি, কৃশকায়, তীব্র বেদনায় পীড়িত, ইত্যাদি বিভিন্ন দেহাবস্থার সংস্পর্শেই [অহং-প্রত্যয়] উৎপন্ন হয় বলে [ঐ অহং-প্রত্যয়ে] গৌরবর্ণাদিরূপ প্রতিভাসই দেখা যায়। সুতরাং বিভিন্ন দেহাবস্থার সংস্পর্শে উৎপন্ন অহংপ্রত্যয়ে দেহাদিই বিষয় হয়—এই কথাই বোঝা যায়।..

ফলে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি যে বলেছেন,—"উপভোগের আয়তন (অর্থাৎ, আশ্রয়) শরীরে আত্মার উপচার হয় ; যেমন ভৃত্য অনুকূল হলে রাজা বলেন, 'আমিও যা ভৃত্যও তাইই' "—এই কথা খণ্ডিত হল। [উদ্দ্যোতকর দাবী করেন, অহং শব্দ মুখ্য অর্থ আত্মবোধক হলেও,

৩৪৭। শান্তরক্ষিত, 'তত্ত্বসংগ্রহঃ' ২১৩-২১৪ ॥

গৌরোঽহং প্রভৃতি অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে অহং শব্দকে ঔপচারিক বা লাক্ষণিক অর্থে—অর্থাৎ, আত্মার ভোগের আয়তন শরীর অর্থে—গ্রহণ করতে হবে। কমলশীল বলেছেন, এই দাবী যুক্তিযুক্ত নয়, অর্থাৎ গৌরোঽহং প্রভৃতি অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে অহং শব্দকে ঔপচারিক অর্থে শরীর বলার কোন কারণ নেই, পক্ষান্তরে মুখ্য অর্থেই তা শরীরবোধক এবং এই মুখ্য অর্থ পরিহার করে এখানে অহং শব্দকে গৌণ বা ঔপচারিক অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই।] কেননা, এই [অর্থাৎ গৌরোঽহং প্রভৃতি অহং-প্রত্যয়] যদি গৌণ হোতো তাহলে তা স্খলদ্‌বৃত্তি (অর্থাৎ বাধিত) হোতো। লৌকিক প্রয়োগেও সিংহ ও মানবক এই দুটি মুখ্য ও আরোপিত উভয় অর্থের ক্ষেত্রেই সিংহরূপ যথার্থবৃত্তি হয় না। [উদ্যোতকরের মতে গৌরোঽহং স্থলে অহং শব্দের ঔপচারিক অর্থ কল্পনা করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, উপচারের আশ্রয় গ্রহণ করার সর্ত কী? কোন্ স্থলে আমরা ঔপচারিক অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য? যেখানে শব্দটির মুখ্যার্থ কোনক্রমেই গ্রহণীয় হয় না—অর্থাৎ, মুখ্যার্থ গ্রহণ করলে কোন অসম্ভব-আপত্তি হয়—শুধুমাত্র সেখানেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করার প্রয়োজন। যেমন, 'সিংহঃ মানবকঃ' স্থলে। এখানে সিংহ শব্দর মুখ্যার্থ (অর্থাৎ কেশরলাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ) কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। কেন না, মানবক (বালক) পদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় 'সিংহঃ মানবকঃ' কথাটি তাৎপর্যহীন হয়। এতএব সিংহ পদে এই স্থলে ঔপচারিক অর্থ (সিংহসদৃশ তেজোবীর্যবিশিষ্ট) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'গৌরঃ অহং' স্থলে 'অহং' পদের 'শরীর' অর্থ গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। অহং পদের অর্থ দেহ, গৌরঃ পদের অর্থ গৌরবর্ণ—সমগ্র কথাটির অর্থ 'আমার দেহ গৌরবর্ণ'। এখানে অর্থবোধের বিন্দুমাত্র বাধকও নেই। তাই অহং শব্দকে এখানে ঔপচারিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে—এজাতীয় কল্পনাই অবান্তর। লৌকিক ব্যবহারও তাইই প্রমাণ করে।]

[আপত্তি তুলে।• যদি বলা হয়, "আমার শরীর প্রভৃতি"—এইরূপ ব্যাতিক্রম দেখা যাওয়ায় অহং-প্রত্যয় শরীরাদি অর্থে স্খলদ্‌বৃত্তি হয়। [উত্তরে কমলশীল বলছেন,] না। কেননা, আত্মা অর্থেও স্খলদ্‌বৃত্তি হবার আপত্তি ঘটে। সে-ক্ষেত্রেও "আমার আত্মা"—এইরূপ ব্যতিক্রম

দেখা যায়। [আপত্তি করে] যদি বলা হয়, এখানে ভেদ কল্পিত। [উত্তরে কমলশীল বলছেন,] অন্যত্রও সেইরূপই হোক। [অর্থাৎ, নৈয়ায়িক আপত্তি তুলে বলবেন, শরীর-সমানাধিকরণ অহং-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তে স্খলদ্-বৃত্তি বাস্তবিকই বর্তমান, অতএব সেখানে ঔপচারিক অর্থ গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। যেমন আমরা বলি "আমার শরীর"—এখানে "আমি" ও "শরীর" শব্দের মুখ্য অর্থ সমান নয়। অর্থাৎ, "আমি" ও "শরীর" শব্দের মুখ্যার্থে কোন ভেদ না-থাকলে "আমার শরীর" বলা সম্ভব নয়। উত্তরে কমলশীল বলছেন, নৈয়ায়িকের পক্ষে এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে একই যুক্তি প্রদর্শন করে "অহং" ও "আত্মার" মুখ্য অর্থেও ভেদ প্রতিপন্ন হবে। কেননা, তাঁরাই বলেন, "আমার আত্মা'। নৈয়ায়িকেরা বলবেন, "আমার আত্মা"—এই দৃষ্টান্তে ভেদটি প্রকৃতপক্ষে কল্পিত; আসলে "আমি" ও "আত্মার" মধ্যে এখানে কোন ভেদ নেই। উত্তরে কমলশীল বলছেন, একই যুক্তিতে দাবী করা যাবে যে "আমার শরীর"—এখানেও ভেদটি আসলে কল্পিতই।]

নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের এই বিচার বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং এজাতীয় বিচারের কথা মনে রেখেই আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ১৩১) মন্তব্য করেছি যে স্বয়ং দেহাত্মবাদ-বিরোধীরাই যে ভাবে পরস্পরের মত খণ্ডন করেছেন—বা পরস্পরের পরিকল্পনায় দোষত্রুটি প্রদর্শন করেছেন—তার ফলে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিই পুনরাগমনের পথ প্রস্তুত হবার সম্ভাবনা বর্তমান।

আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে উল্লিখিত "অহং-প্রত্যয়ের" আলোচনা শেষ করার আগে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্যই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যই আমাদের মুখ্য আলোচ্য-বিষয় নয়। তবুও আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকদের বাদ-প্রতিবাদ আলোচনা করা অন্তত কিছুটা অবাস্তব হবে। কেননা, আধুনিক কালের তুলনায় সেকালের দেহাত্মবাদী ও দেহাত্মবাদ-বিরোধী উভয়েরই বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হলেও একালের পাঠক অবশ্যই বিচার করতে চাইবেন, ওই বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে কার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরবর্তীকালে-লব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস বর্তমান ছিলো? তাই এখানে সংক্ষেপে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন: অহং-প্রত্যয় প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য কী?

অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে অহং-প্রত্যয়ের সমস্যা আজো বহুলাংশে বিতর্কসাপেক্ষ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তাঁদের উপর বিবিধ দার্শনিক মতের প্রভাবও সুস্পষ্ট। একালের মনোবিজ্ঞানে অন্তত সম্প্রদায়বিশেষে ভাববাদী ও এমন কি প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব নেই, যদিও সম্প্রদায়ান্তরের মনোবিজ্ঞানীরা সে-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কঠিন সমালোচনাও করে থাকেন। স্বভাবতই, সম্প্রদায়-ভেদে অহং-প্রত্যয়ের বিবিধ ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয়েছে। এখানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের এ জাতীয় নানা মত উল্লেখ ও সমালোচনা করার সুযোগ হবে না। তার পরিবর্তে যে-মতটির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষকের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বলেই বর্তমান লেখকের বিশ্বাস তারই কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করবো :

> …the anatomical substratum of conscious activity is to be sought rather in some system of interconnections through which the sensory data derived from external stimuli are brought into functional relation with those activities of the brain associated with the recognition of the individual self. We can only surmise what the nature of these activities may be, but it has been supposed that the "*sensation of personality" is ultimately determined by the integrated sum of all these vague impressions resulting from impulses which are constantly streaming into the brain from the body itself—from viscera, muscles, joints and so forth*[৩৪৮]

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে লেখক অবশ্যই নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নজির দেখিয়েছেন; উৎসাহী পাঠকেরা তাঁর মূল রচনা পাঠ করবেন।

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির আলোচনাতে প্রত্যাবর্তন করা যাক। জয়ন্তভট্ট প্রমুখ ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্তী প্রবক্তারা যদিও আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস করেছেন, তবুও কণাদ, বাৎস্যায়ন প্রভৃতির মতে আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ[৩৪৯] আত্মার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে প্রাচীন বৈশেষিক আচার্যদের মত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন: "বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের 'তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষে' এই ৮।১।২ সূত্রানুসারে প্রশস্তপাদও আত্মাকে অপ্রত্যক্ষই বলিয়াছেন। সেখানে 'ন্যায়কন্দলী'-কার

৩৪৮। W. E. Le Gros Clark in *New Biology* (Penguin) No. 1, p. 82.

৩৪৯। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।১৭৪-৬, পাদটীকা।

শ্রীধরভট্ট বলিয়াছেন যে, সর্বজীবেই 'অহং-মম' ইত্যাদিরূপে নিজদেহবর্তী আত্মার নিজ মনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই প্রশস্তপাদের ঐ কথার তাৎপর্য। কিন্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, দেহাদিভিন্ন রূপাদিশূন্য আত্মার যে কোন বহিরিন্দ্রিয়র দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। সুতরাং তাহা বলা অনাবশ্যক।" অতএব, প্রাচীন বৈশেষিক মতানুসারে আত্মা বস্তুত অ-প্রত্যক্ষ; আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভবই নয়। প্রৌঢ় নৈয়ায়িকদের মতেও তাইই। বাৎস্যায়ন[৩৫০] স্পষ্টই বলছেন, "তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে, স কিমাপ্তোপদেশ-মাত্রাদেব, প্রতিপদ্যত ইতি? নেত্যুচ্যতে, অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য ইতি।"—অর্থাৎ, তার মধ্যে [প্রমেয়গুলির মধ্যে] আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় না; তাহলে, সেই আত্মা কি কেবল আপ্ত-উপদেশ থেকেই জ্ঞাত হয়? উত্তরে বাৎস্যায়ন বলছেন, তা নয়; অনুমান প্রমাণ থেকেও আত্মা জ্ঞাতব্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে অত্যুৎসাহী হয়ে পরবর্তীকালের ন্যায়-বৈশেষিকেরা প্রাচীনদের উক্তি লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেই আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা দেখলাম, এই অত্যুৎসাহ সত্ত্বেও তাঁদের প্রয়াস সার্থক হয়নি। এবারে দেখা যাক, আত্মার অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করতে গিয়ে সুপ্রাচীন কাল থেকেই নৈয়ায়িকেরা কতো রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং কতো ভাবে নিজেদেরই বক্তব্য পরিশোধন ও পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রথমত, অনুমানের লক্ষণ হিসাবে গৌতম[৩৫১] বলছেন, "তৎপূর্বকম্", অর্থাৎ "প্রত্যক্ষপূর্বকম্"। ব্যাখ্যায় ফণিভূষণ[৩৫২] বলছেন, "প্রত্যক্ষর জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না।" অর্থাৎ, সংক্ষেপে, অনুমান প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল। কিসের প্রত্যক্ষ? এ বিষয়ে ইতিপূর্বে ন্যায়মত আমরা উল্লেখ করেছি (পৃ. ১৫৩-১৫৬ দ্রষ্টব্য)। সেই আলোচনা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে নৈয়ায়িকদের পক্ষে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমান প্রদর্শনের সমস্যা সত্যিই কতো গভীর! অর্থাৎ, আত্মার যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবই না-হয় তাহলে আত্মার লৌকিক অনুমান প্রদর্শন করাও কঠিন।

৩৫০। 'বাৎস্যায়ন-ভাষ্য' ১।১।৯॥

৩৫১। 'ন্যায়সূত্র' ১।১।৫॥

৩৫২। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।১৩১॥

বাৎস্যায়ন বলেছেন, আত্মার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। তবুও তিনি আত্মার অনুমান প্রদর্শন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই নৈয়ায়িকেরা এমন এক প্রকার অনুমান স্বীকার করতে চেয়েছেন যা বস্তুতপক্ষে "তৎপূর্বক" বা "প্রত্যক্ষপূর্বক" নয়, অর্থাৎ যা গৌতমোক্ত অনুমান-লক্ষণের ব্যতিক্রম,—এবং গৌতমের পরিভাষা অবলম্বন করেই তাঁরা এজাতীয় অ-তৎপূর্বক অনুমানকে "সামান্যতো দৃষ্ট" আখ্যা দিয়েছেন[৩৫৩]। তার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হল, আদিত্যের গতি অনুমান। আমরা এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি (পৃঃ ১৫৭-৬০ দ্রষ্টব্য) বাৎস্যায়ন দাবী করেছেন, এই "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের সাহায্যেই আত্মার প্রমাণ হয়। যথা: "ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্‌যদেষাং স্থানং, স আত্মেতি।"[৩৫৪] — অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ-পদার্থ, গুণপদার্থসমূহ দ্রব্যসংস্থান [অর্থাৎ, দ্রব্যপদার্থই গুণপদার্থের স্থান বা আধার], অতএব এগুলির [অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ-পদার্থগুলির] যা স্থান বা আধার [অর্থাৎ, যে-দ্রব্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়] তাইই আত্মা।[৩৫৫]

বর্তমান আলোচনার পক্ষে এই অনুমান প্রসঙ্গে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পর্যাপ্ত হবে।

প্রথমত মনে রাখা দরকার, "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলতে ঠিক কী বোঝায় এ-বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যেই বিস্তর মতপার্থক্য আছে; উদ্দ্যোতকর, জয়ন্তভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা বাৎস্যায়ন-উক্ত "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ স্বীকার করেননি।[৩৫৬]

দ্বিতীয়ত, "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের বাৎস্যায়ন-উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও এই অনুমানের সাহায্যেই আত্মা প্রমাণ হয় কিনা একথাও বিশেষ সংশয়-সাপেক্ষ। না-হয় ধরেই নেওয়া যাক যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থ। কিন্তু তাহলেও উক্ত "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের সাহায্যে শুধুমাত্র প্রমাণ হবে

৩৫৩। স্বয়ং গৌতম "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা এই অনুমানের স্বরূপ সংক্রান্ত বিবিধ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গৌতম অনুমানমাত্রকেই প্রত্যক্ষ-পূর্বক বিবেচনা করেছেন বলেই তাঁর মতে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলতে কোন প্রকার অ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান হওয়া স্বাভাবিক নয়।

৩৫৪। ব্যাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ১।১।৫॥

৩৫৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গৌতমোক্ত আত্মার অনুমাপক প্রখ্যাত সূত্রটির ['ন্যায়-সূত্র' ১।১।১০; "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্"] ভাষ্যে বাৎস্যায়ন এই অনুমান প্রদর্শন করার পরিবর্তে ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডনের নানা প্রয়াস করেছেন এবং বিশ্বনাথের মতে এই সূত্রে আত্মার লক্ষণই গৌতমের বক্তব্য, আত্মার অনুমান প্রদর্শন নয়। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।১৭৮ দ্রষ্টব্য॥

৩৫৬। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।১৪৭-৮ দ্রষ্টব্য।

যে এই গুণ পদার্থগুলির স্থান বা আধার হিসাবে কোন-না-কোন দ্রব্য পদার্থ স্বীকার্য। কিন্তু সেই দ্রব্য পদার্থ বলতে যে দেহাদি ভিন্ন আত্মাই তা ওই "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানটির সাহায্যে কিছুতেই প্রমাণ হয় না। বস্তুত-পক্ষে, নৈয়ায়িকদের মধ্যেই এই আপত্তি উঠেছে: "কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের দ্বারা আত্মাসিদ্ধ হয় না। কেননা, আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত, এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থ মাত্রে পরাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ বিশেষের পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিব্যাদি কোন দ্রব্যাশ্রিত নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে 'শেষবৎ' অনুমানের দ্বারা উহাতে আত্মাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং পরে 'শেষবৎ' অনুমানের দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রত্ব বা পরাশ্রিতত্বের সাধক যে-অনুমান তাহাই 'সামান্যতো দৃষ্ট'। কিন্তু পরে ঐ ইচ্ছাদি গুণের আত্মাশ্রিতত্ব সাধক যে-অনুমান, তাহাই 'শেষবৎ'।"[৩৫৭]

তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আত্মার অনুমান প্রদর্শন করতে গিয়ে পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা জ্যেষ্ঠদের অভিমত নানাভাবে সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র পরবর্তী 'শেষবৎ' অনুমান বলতে কী বোঝাতে চান? এই প্রশ্নর উত্তরে অনেক জটিল আলোচনা তোলবার সুযোগ আছে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য উক্তিতে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র যে-শেষবৎ অনুমান উল্লেখ করতে চান তার সারমর্ম হল, ইচ্ছাদি আত্মা ছাড়া আর কোন দ্রব্যর গুণ হতে পারে না। অর্থাৎ, ইচ্ছাদি গুণ পৃথিব্যাদি কোন দ্রব্যে আশ্রিত হতেই পারে না। বা, আরো সংক্ষেপে, দেহাত্মবাদ বা ভূত-চৈতন্যবাদ বস্তুত অসম্ভব। কেননা, দেহাত্মবাদীর মূল কথা হল ইচ্ছাদি তথাকথিত আত্মধর্মগুলি বস্তুপক্ষে দেহধর্মমাত্রই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য অনুমানের সার্থকতা একান্তভাবেই একটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। সেই সর্ত হল, দেহাত্মবাদের সম্পূর্ণ নিরসন। অর্থাৎ, আত্মবাদীরা স্বতন্ত্র বিচারের সাহায্যে দেহাত্মবাদ-খণ্ডনে নিঃসন্দিগ্ধ হলে পরই আত্মার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে অনুমান প্রমাণের সুযোগ পাবেন। অন্যথা, দেহাত্মবাদীরা অবিচলিত ভাবেই দাবি করবেন, ইচ্ছাদিকে গুণ বলে স্বীকার করলেও আমাদের মতে তা দেহরই গুণ; এগুলির আশ্রয় বা অধিষ্ঠান "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ হলেও আমাদের

৩৫৭। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।১৫৩॥

মতে উক্ত আশ্রয় দেহমাত্রই। আমরা ইতিপূর্বেই এই দেহাত্মাবাদ-খণ্ডনের বিবিধ প্রয়াস বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে তার সার্থকতা অবশ্যই বিতর্কসাপেক্ষ। অতএব আমাদের বর্তমান মন্তব্য শুধু এই যে দেহাত্মবাদ-খণ্ডনের সার্থকতা-সাপেক্ষ আত্মার আলোচ্য অনুমান প্রমাণের সার্থকতাও নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি মন্তব্যর সুযোগ বর্তমান। ইচ্ছাদিকে গুণপদার্থ বলে স্বীকার না করলে আত্মার এই অনুমান সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। সেকালের দার্শনিক রচনায় ইচ্ছাদিকে গুণপদার্থ বলার প্রথা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্যই তা সংশোধন করার পক্ষপাতী হবেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ এখন থাক। আপাতত দেখা যাক, আত্মা অনুমানের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাদিকে গুণপদার্থ বলে বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়া স্বয়ং নৈয়ায়িকদের পক্ষেও নিরাপদ নয়।

উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির বিচারে অনুমানটির সারমর্ম হল, ইচ্ছাদি গুণগুলির পরাশ্রিতত্ব-মাত্র। অর্থাৎ, আলোচ্য অনুমানটির সারমর্ম হল, ইচ্ছাদি গুণপদার্থ বলেই সেগুলি দ্রব্যাশ্রিত হতে বাধ্য। ইচ্ছাদি গুণপদার্থ, অতএব সেগুলি দ্রব্যপদার্থে আশ্রিত। কিন্তু, প্রশ্ন হল, গুণপদার্থর লক্ষণ কী? গুণ বলতে ঠিক কী বোঝায়? এই প্রশ্নর উত্তরে অন্তত নৈয়ায়িকদের উত্তর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দ্রব্যাশ্রিতত্বই হল গুণপদার্থের লক্ষণ। অর্থাৎ, গুণ মানেই হল এমন কিছু যার আশ্রয় দ্রব্য। অতএব, য়ুরোপীয় তর্কবিদ্যার পরিভাষায় আলোচ্য অনুমানটি petitio principii দোষদুষ্ট হতে বাধ্য। ইচ্ছাদিকে গুণপদার্থ বলে উল্লেখ করার অর্থই এই যে সেগুলি কোন-না-কোন দ্রব্যপদার্থে আশ্রিত হতে বাধ্য; অতএব এই স্বীকৃতি থেকে শুরু করে যদি উপসংহার করা হয় যে অতএব ইচ্ছাদি দ্রব্যাশ্রিত, তাহলে অবশ্যই উপসংহারটি পূর্বস্বীকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ বিবেচনা করায় আরো বড়ো বিপত্তির সম্ভাবনা বর্তমান। কেননা, তাঁদেরই মতে এগুলি আত্মার নিত্যগুণ নয়, জন্যগুণ। অর্থাৎ, সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় ইচ্ছাদি গুণ আত্মায় বর্তমান থাকে না; কাল-বিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে এই গুণ আত্মায় উৎপন্ন হয়। যেমন, ন্যায়মতে, অপবর্গ বা মোক্ষদশায় আত্মায় ইচ্ছাদি গুণ অবর্তমান। অতএব ইচ্ছাদিকেই আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ বললে আরো স্বীকার করতে হবে যে মুক্ত আত্মার অনুমান সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট লিঙ্গর অভাবে অনুমিতি-জ্ঞানের প্রসঙ্গ অবশ্যই অবাস্তব। পক্ষান্তরে, মুক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সম্ভাবনাও প্রগল্‌ভতা-মাত্র: কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি দাবি করেন নি যে

তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্ত আত্মার জ্ঞানলাভ করেছেন। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় এবং মুক্ত আত্মার সঙ্গে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষর প্রসঙ্গ অবান্তর—আত্মবাদীদের মতেই মুক্ত আত্মা অতীন্দ্রিয়।

অতএব, অন্তত লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনই অসম্ভব হবে। মুক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। মুক্ত আত্মার অনুমানও সম্ভব নয়, কেননা আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ ইচ্ছাদি গুণ মুক্ত আত্মায় অবর্তমান। এবং মুক্ত আত্মাই যদি প্রমাণগম্য না-হয় তাহলে শুধুমাত্র দেহাশ্রিত আত্মাই স্বীকৃত হবে। এবং দেহাশ্রিতত্বই যদি প্রামাণিক আত্মার পক্ষে অনিবার্য হয় তাহলে দেহাত্মবাদ খণ্ডন করে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন অনেকাংশেই নিরর্থক বিবেচিত হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, অন্তত লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে নৈয়ায়িকেরা যে-আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়াসী তার সঙ্গে লোকায়তমতের পার্থক্য খুব বেশি গভীর হবে না। আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ২২৪-২২৭) দেখেছি, অন্যান্য কারণেও বিশেষত নৈয়ায়িকদের সঙ্গে লোকায়তিকদের পার্থক্য অনেকাংশে অবান্তর এবং আমরা বর্তমানে দেখছি অন্তত লৌকিক প্রমাণের সহায়তায় নৈয়ায়িকদের পক্ষে দেহাতিরিক্ত মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন দুঃসাধ্য বলেই তাঁদের পক্ষে দেহাত্মবাদের মৌলিক বিরোধিতা যুক্তিযুক্ত নয়।

তাহলে কি আত্মবাদের আকর্ষণে নৈয়ায়িকেরা লৌকিক প্রমাণের পথই পরিত্যাগ করতে সম্মত হবেন? বলাই বাহুল্য, নৈয়ায়িকদের পক্ষে তা আত্মনাশেরই সমতুল্য হবে। কেননা, এই লৌকিক প্রমাণই বস্তুতপক্ষে তাঁদের দর্শনের প্রধান উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে প্রথমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

গৌতম ও বাৎস্যায়ন থেকে শুরু করেই নৈয়ায়িকেরা বৈদিক প্রমাণের নানা গুণগান করেছেন এবং তার প্রামান্য-নিশ্চয়ের পক্ষেও বিবিধ বিচার প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু গৌতম ও বাৎস্যায়ন উভয়েই সুস্পষ্টভাবে দাবী করেছেন যে বেদের প্রামাণ্যও শেষ পর্যন্ত লৌকিক প্রমাণেরই মুখাপেক্ষী, এবং এই লৌকিক প্রমাণের দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করেই বৈদিক প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভব হতে পারে। ন্যায়সূত্রে গৌতম [৩৫৮] বলছেন, "মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের মতোই আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্য বশতই তার [অর্থাৎ বেদের] প্রামাণ্য। মনে রাখা দরকার যে এখানে "মন্ত্র" শব্দটি "বেদের মন্ত্রভাগ" এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব, কেননা তারই প্রামাণ্যের নজির দেখিয়ে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অবশ্যই অবান্তর।

৩৫৮। 'ন্যায়সূত্র' ২।১।৬৮।।

অতএব এখানে "মন্ত্র" শব্দকে লৌকিক ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক্ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে এবং স্বয়ং বাৎস্যায়নও তাইই করেছেন: "মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভূতাশনিপ্রতিষেধনার্থং প্রয়োগেঽর্থস্য তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্"—বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্থ, এমন মন্ত্রপদগুলির প্রয়োগে অর্থের সত্যার্থতাই ইহাদিগের প্রামাণ্য।[৩৫৯]

বলাই বাহুল্য, আজো আমাদের গ্রামাঞ্চলে এজাতীয় মন্ত্রের কার্যকারিতা চিকিৎসা-শাস্ত্রর সমগোত্রীয়—এমনকি, চিকিৎসাশাস্ত্রর অন্তর্ভুক্ত—বলেই বিবেচিত। সুপ্রাচীন কালে—স্বয়ং গৌতম ও বাৎস্যায়নের সময়—একথা আরো স্থিরনিশ্চিত বলেই বিবেচিত হওয়া সম্ভব এবং স্পষ্টত এই কারণেই গৌতম আয়ুর্বেদের সঙ্গেই এজাতীয় মন্ত্রর উল্লেখ করেছেন।[৩৬০]

আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল, স্বয়ং গৌতম বেদপ্রামাণ্যর দৃষ্টান্ত হিসাবে এই আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রর প্রামাণ্যকেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে, যে-অর্থে বিষনিবারণার্থ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য বর্তমান, সেই অর্থেই বেদের প্রামাণ্যও বর্তমান। কিংবা যেহেতু আয়ুর্বেদাদির প্রামাণ্য অবিসংবাদিত সেইহেতু বেদের প্রামাণ্যও, অবিসংবাদিত।

অতএব, প্রশ্ন হল, আয়ুর্বেদাদির প্রামাণ্য কেন অবিসংবাদিত? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম ও বাৎস্যায়ন কোনরকম অলৌকিক কারণের ইংগিতমাত্রও করেনি। বাৎস্যায়ন যেমন বলছেন, "[প্রশ্ন] আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য কি? [উত্তর] সেই আয়ুর্বেদ কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, 'ইহা করিয়া ইষ্টলাভ করে, ইহা বর্জন করিয়া অনিষ্ট ত্যাগ করে,'—অনুষ্ঠীয়মান তাহার অর্থাৎ আয়ুর্বেদোক্ত সেই কর্তব্যের করণ ও অকর্তব্যের অকরণ বা বর্জনের তথাভাব—কিনা, সত্যার্থতা, অবিপর্যয়। [অর্থাৎ, আয়ুর্বেদের ঐ সকল উপদেশের সত্যার্থতা বা বিপর্যায়-না-হওয়াই তাহার প্রামাণ্য।]"[৩৬১] সহজ কথায়, আয়ুর্বেদ প্রমাণ; কেননা আয়ুর্বেদে যে-উপদেশ যে-ভাবে উক্ত হয়েছে সেই উপদেশ সেইভাবে পালন করলে বাস্তবিকপক্ষে নির্দিষ্ট ফল-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু, আয়ুর্বেদের এ-জাতীয় প্রামাণ্য কী ভাবে সম্ভব হল? উত্তরে, বাৎস্যায়ন বলছেন, যাঁরা আয়ুর্বেদে

৩৫৯। ফণিভূষণ ('ন্যায়দর্শন' ২।৩৫২) "মন্ত্র" অর্থে "বিষ, ভূত ও বজ্র নিবারণার্থ যে-সকল মন্ত্র আছে" তাইই গ্রহণ করেছেন।

৩৬০। প্রসঙ্গত, সমগ্র 'অথর্ববেদ'-ই এজাতীয় মন্ত্রে ভরপুর এবং—অন্তত বৈদিক ঐতিহ্যে—'অথর্ববেদ'-ই চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিগ্রন্থ বলে বিবেচিত। অবশ্যই, আলোচ্য প্রসঙ্গে গৌতমোক্ত "মন্ত্র" অর্থে 'অথর্ববেদ' নয় এবং—এমনকি বৈদিক ঐতিহ্যেই 'অথর্ববেদ'-এর প্রামাণ্য প্রসঙ্গে দ্বিধা ও সংশয় পরিদৃষ্ট হয়, যদিও বর্তমানে আমাদের পক্ষে সেই আলোচনায় প্রবেশের সুযোগ নেই। প্রসঙ্গত, ফণিভূষণ 'ন্যায়দর্শন' ২।৩৫৪-৫৭ দ্রষ্টব্য।

৩৬১। তর্জমা ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ২।৩৫০॥

এই জাতীয় উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। অর্থাৎ, আয়ুর্বেদকর্তারা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, অমুক ভেষজ সেবন করলে 'অমুক রোগ নিরাময় হয়। এই কারণেই, তাঁদের উপদেশ পালন করলে সাক্ষাৎ ফল পাওয়া যায়। কিংবা, নৈয়ায়িকদের পরিভাষায়, এই কারণেই তাঁদের উক্তিতে "প্রবৃত্তিসামর্থ্য" বর্তমান,—তাঁদের উক্তি সার্থক প্রবৃত্তির জনক।

তাহলে, আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য শেষ পর্যন্ত লৌকিক প্রমাণেরই মুখাপেক্ষী। এবং গৌতম ও বাৎস্যায়নের মতে যেহেতু এই আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যকেই দৃষ্টান্ত করে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করতে হবে—অর্থাৎ, যে-অর্থে আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য বর্তমান সেই অর্থেই বেদের প্রামাণ্যও বর্তমান—সেই হেতু তাঁদের মতে বেদের প্রামাণ্যও শেষ পর্যন্ত লৌকিক প্রমাণেরই মুখাপেক্ষী, লৌকিক প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল।

অতএব, এমনকি বেদের প্রামাণ্য প্রতিপাদন প্রসঙ্গেও ন্যায়দর্শনের প্রবক্তারা লৌকিক প্রমাণের পথ পরিত্যাগ করেননি; এবং সেই লৌকিক প্রমাণই তাঁদের দার্শনিক মতের প্রাণবস্তু। এই লৌকিক প্রমাণের কথা মনে রেখেই তাঁরা নিজেদের সর্বপ্রথম নীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন, "প্রমাণমন্তরেণ নার্থ-প্রতিপত্তিঃ"—[৩৬২] প্রমাণ ছাড়া কোন বিষয়েরই যথার্থবোধ সম্ভব নয়। এবং এই লৌকিক প্রমাণের গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যেই বাৎস্যায়ন কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্র' উদ্ধৃত করে উচ্ছ্বাস করেছেন—

সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা—

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা॥[৩৬৩]

—অর্থাৎ, প্রমাণাদি পদার্থকর্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্‌ক্রিয়মাণ)—অর্থাৎ, প্রমাণাদি পদার্থ যে-বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা থেকে পৃথক করেছে—এই সেই আন্বীক্ষিকী (বা ন্যায়বিদ্যা) সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্বকর্মর উপায় ও সর্বধর্মের আশ্রয় হিসাবে [কৌটিল্যর] বিদ্যা-গণনাস্থলে কীর্তিত হয়েছে।

অথচ, আমরা ইতিপূর্বেই দেখলাম, প্রত্যক্ষ ও অনুমান নামের লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে নৈয়ায়িকদের পক্ষে মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের সুযোগ নেই। সেই সুযোগের অভাবে তাঁদের পক্ষে মুক্তি বা অপবর্গ প্রমাণেরই বা সুযোগ কোথায়? অতএব লৌকিক প্রমাণের পথ পরিত্যাগ না-করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আত্মবাদীদের বা অধ্যাত্মবাদীদের অনুচর হতে পারেন না।

৩৬২। বাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ভূমিকার প্রথম উক্তি।
৩৬৩। বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ১।১।১॥

এতৎসত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে তাঁরা যেন-তেন-প্রকারে আত্মবাদীদেরই অনুচর হবার প্রয়াস করেছেন তাহলে সেই প্রয়াসকে কৃত্রিম আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

অথচ, স্বয়ং বাৎস্যায়নের কাল থেকেই নৈয়ায়িকদের মধ্যে এই কৃত্রিম প্রয়াসের পরিচয় চোখে পড়ে। একদিকে তিনি ঘোষণা করছেন যে ন্যায়-দর্শনের "প্রস্থান" বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়—যে-বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর জন্য ন্যায়দর্শন অন্যান্য বিদ্যা থেকে পৃথক—তা হলো "সংশয়" প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ :

> পৃথক্-প্রস্থান-বিশিষ্ট বা বিভিন্ন প্রতিপাদ্যবিশিষ্ট এই চারটি বিদ্যা [অর্থাৎ, 'ত্রয়ী' বা বেদ, 'দণ্ডনীতি' বা শাসন বিদ্যা, 'বার্তা' বা কৃষি-পশুপালনাদি বিদ্যা এবং আন্বীক্ষিকী বা যুক্তিবিদ্যা] মানবগণকে অনুগ্রহ করার জন্য উপদিষ্ট হয়েছে ; সেই চারটি বিদ্যার মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা হল চতুর্থ। 'সংশয়' থেকে 'নিগ্রহস্থান' (বা তর্কে পরাজয়) পর্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই ন্যায়বিদ্যার পৃথক্-প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতি-পাদ্য বিষয়।[৩৬৪]

কিন্তু এই সঙ্গেই বাৎস্যায়ন একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মন্তব্য সংযোজন করেছেন। তিনি বলছেন, ন্যায়দর্শনের এই বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখ না-করলে "ন্যায়দর্শন উপনিষদের মতো কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হয়ে পড়ে"। এই কথাব তাৎপর্য হল, ন্যায়দর্শনের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু বলতে যদিও 'সংশয়' প্রভৃতিই, তবুও ন্যায়দর্শনকে যেন-তেন-প্রকারে উপ-নিষদের মতো অধ্যাত্মবিদ্যা বলেও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কী করে তা করা যাবে ? অধ্যাত্মবিদ্যা বা উপনিষদ্ প্রকৃতপক্ষে 'ত্রয়ী' বা বেদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার মূল কথা হল, লৌকিক প্রমাণের পথ ত্যাগ করে এক-মাত্র শ্রুতি বা বেদ-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করা—কিংবা, লৌকিক প্রমাণকে বড় জোর সেই পর্যন্ত স্বীকার করা যে-পর্যন্ত তা বেদের বা বৈদিক প্রমাণেরই অনুগামী। প্রকৃত অধ্যাত্মবিদ্যা বা উপনিষদের এই হল মূল কথা এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী বা বৈদান্তিকেরা এই পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের কাছে, লৌকিক প্রমাণ শুধুমাত্র ততোটুকুই সার্থক যতোটুকু কিনা তা বেদ বা শ্রুতি দ্বারা অনুগৃহিত, শ্রুতির আশ্রয়ে স্থিত।[৩৬৫] কিন্তু একথা মানতে গেলে বাৎস্যায়নের পক্ষে ন্যায়দর্শনের বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুকেই পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এতএব, ন্যায়-দর্শন আসলে লৌকিক প্রমাণের বিদ্যা হলেও তা অধ্যাত্মবিদ্যাও—বাৎস্যায়নের এই দাবি স্বীকার করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, অধ্যাত্মবিদ্যা

৩৬৪। বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ১।১।১।

৩৬৫। 'ব্রহ্মসূত্র' ২।১।১১।

বা আত্মবিদ্যার অভিমানটুকু পরিত্যাগ না করলে ন্যায়দর্শনের "প্রস্থান" বা বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর সংরক্ষণই সম্ভব হয় না।

লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড়[৩৬৬] মন্তব্য করেন যে বাৎস্যায়নের উক্ত দাবী সত্ত্বেও ন্যায়দর্শনকে অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা বলে বিবেচনা করার বস্তুত কোন কারণ নেই; তাঁর এই মন্তব্য উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বরস্বতী-ও[৩৬৭] উল্লেখযোগ্য যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন: "উপক্রম ও উপসংহার দেখিলেও মনে হয় ন্যায়শাস্ত্র বেদান্তের ন্যায় মোক্ষশাস্ত্র নহে। বেদান্তদর্শনের উপক্রমের সূত্রে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এবং উপসংহার সূত্র 'অনাবৃত্তি শব্দাদনাবৃত্তি শব্দাদিতি'! এস্থলে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা রক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর। ব্রহ্মাত্মতা-প্রতিপাদনেই বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য; কিন্তু ন্যায়দর্শনের উপক্রম ও উপসংহারে একবাক্যতা নাই। উপক্রমে 'তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি' আরম্ভ করিয়া 'হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ' এইরূপে উপসংহার হইয়াছে। এস্থলে একবাক্যতা সাধিত হয় নাই। যদি মুক্তিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, তাহা হইলে উপক্রম ও উপসংহারের একার্থতা রক্ষিত হইত।" অর্থাৎ সহজ কথায় নৈয়ায়িকেরা যদিও স্বীয় দর্শনকে যেন-তেন-প্রকারে আত্মবিদ্যা ও মোক্ষশাস্ত্র বলে প্রতিপাদন করার প্রয়াস করেছেন, তবুও 'ন্যায়-সূত্র'-র মূল পরিকল্পনা থেকেই প্রমাণ হয় যে এই প্রয়াস অত্যন্ত কৃত্রিম। অতএব, ন্যায়শাস্ত্রকে আত্মবিদ্যা ও মোক্ষতত্ত্ব বলে ঘোষণা করে লোকায়তিক দেহাত্মবাদের সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধ প্রতিপন্ন করার প্রয়াসও সমীচীন নয়। পক্ষান্তরে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ন্যায়মতের আরো নানা বিষয়ে মৌলিক সাদৃশ্য স্বীকারের সুযোগ বর্তমান। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃততর আলোচনা উত্থাপনের প্রয়াস করবো।

৩৬৬। ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' ১।২৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬৭। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' ২।১৩৩।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ. ৯, পাদটীকা ৩৩। অধ্যাপক রুবেন্-এর এই প্রবন্ধটি পরে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছে— **Ruben SAIT 35-46.**

পৃ. ১৪, পংক্তি ১১-২। মুদ্রিত পাঠের পরিবর্তে হবে:
"বায়ু—এগুলিই হল তত্ত্ব। এগুলির মিলনেই উৎপন্ন হয় শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও চৈতন্য।" ইত্যাদি (কথা কি স্বীকারযোগ্য)? তা নয়।

পৃ. ৫২, পাদটীকা ৮১। জাবালি প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য **Ruben SAIT 1-34** দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৮। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণের এই মত—অর্থাৎ, কৌটিল্য উক্ত "যোগ" অর্থে বস্তুত "ন্যায়-বৈশেষিকই" উল্লেখ করেছেন—পরে আমার কাছে অবধারিত সিদ্ধান্ত বলেই প্রতীত হয়েছে। Chattopadhyaya in *Das Kapital Centenary Volume* (New Delhi 1968) pp. 141-157 দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ৮-৯। মুদ্রিত পাঠের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পাঠ হবে—
অর্থাৎ,—পুণ্য পাপ প্রভৃতি পরোক্ষ তত্ত্বগুলিকে ভক্ষণ করে—
এই কারণে তাদের নাম চার্বাক।"

পৃ. ৭৩, পংক্তি ৯-১০। মুদ্রিত পাঠের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পাঠ হবে—
নিন্দিতই হয়েছে[১২৩]। অর্থাৎ বিশেষত আইনকর্তাদের দৃষ্টিতে শুধু বিতণ্ডা বা বৃথা-তর্কই নয়, শাস্ত্র-নিরপেক্ষ অর্থে স্বাধীন তর্ক-মাত্রই অত্যন্ত গর্হিত।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ৭। "বিচারে" শব্দর পরিবর্তে "খণ্ডনে" শব্দ হবে।

পৃ. ১১৩, পাদটীকা ১৯৩। পরে অধ্যাপক লামা চিম্বা ও ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিব্বতী মূল গ্রন্থর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির তাৎপর্য হল "লোকায়ত-র গুহ্য বচনে"—' jig-rten-rgyan-phan-gyi-gsan-tshig। (বারাণসী সংস্করণ, পৃ. ২৭)।

পৃ. ১৩৫, পংক্তি ৫-৬। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকদের এই শ্রুতিপরায়ণতার বৈশিষ্ট্যও প্রণিধানযোগ্য। 'ন্যায়-সূত্র' ২।১।৬৮-তে স্বয়ং গৌতম মন্তব্য করেছেন, যে-অর্থে আয়ুর্বেদ ও ঝাড়ফুঁক জাতীয় মন্ত্রতন্ত্রর

প্রামাণ্য সেই অর্থেই বেদেরও প্রামাণ্য। অর্থাৎ, বৈদিক প্রামাণ্যও শেষ পর্যন্ত লৌকিক প্রামাণ্যরই মুখাপেক্ষী! বর্তমান খণ্ডের পৃ. ২৭৯-৮০ তে এই আলোচনা উত্থাপন করেছি।

পৃ. ২৪৬, পাদটীকা ৩২২। THB-র পরিবর্তে BHB হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

[মূল সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাদি বাদে]

১॥ কোষগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদি

BHB *Book of the Human Body.* (Readers Digest). London 1964.

ERE *Encyclopaedia of Religion and Ethics.* 13 vols. Edinbourgh 1908-18.

HB *The History of Bengal.* Vol. i, Dacca 1943.

IA *Indian Antiquary.*

IHQ *Indian Historical Quarterly.*

ISPP *Indian Studies : Past & Present.*

JAOS *Journal of the American Oriental Society.*

JRAS *Journal of the Royal Asiatic Society.*

NNMRP *Nava Nalanda Mahavihara Research Publication.*

PIPC *Proceedings of the Indian Philosophical Congress.*

SBE *Sacred Books of the East.*

WZOAPI *Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sud-Und Ostasiens Und Arichiv fur Indische Philosophie.*

২॥ অন্যান্য গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, 'ভারতীয় দর্শন,' ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬০

তর্কবাগীশ মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন,' ৫খণ্ড, কলিকাতা ১৩২৪-৩৬

—'ন্যায় পরিচয়,' ২য় সং, যাদবপুর।

তর্কালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত, 'ফেলোসিপ লেকচার,' ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৪-১৯২৪

দত্ত রমেশচন্দ্র, 'ঋগ্বেদ সংহিতা' (বঙ্গানুবাদ)।

ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র, 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান,' কলিকাতা ১৩৫৮।

শাস্ত্রী দক্ষিণারঞ্জন, 'চার্বাক দর্শন,' কলিকাতা

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, 'বৌদ্ধধর্ম,' কলিকাতা ১৩৫৫ সংস্করণ।

Basham A. L., *The Wonder That Was India.* Indian edition, Calcutta 1963

Belvalkar S. K. & Ranade R. D., *History of Indian Philosophy.* Poona 1927.

Beck W. S., *Modern Science and the Nature of Life.* Penguin 1957.

Bernal J.D., *Science in History.* London 1954.

Bhandarkar R.G., *Vaisnavism Saivism and Minor Religious Sects.* Strassburg 1913.

Bykov K.M., *Textbook of Physiology.* Moscow.

Chatterjee S.C., *The Nyaya Theory of Knowledge.* Calcutta 1939.

Chattopadhyaya D., *Indian Philosophy.* New Delhi 1964.

Cowell E.B. & Gough A.E., *Sarvadarsanasamgraha.* (Tr.) London 1924 ed.

Cowell E.B. & Neil R.A., *The Divyavadana.* Cambridge 1886.

Dasgupta S.N. *A History of Indian Philosophy.* 5 vols. Cambridge 1922-55,

Datta D.M., *Six Ways of Knowing.* London 1932.

Deussen P., *The Philosophy of the Upanisads.* Edinburgh 1919.

Freud S., *The Future of an Illusion.* London 1934.

Garbe R., *The Samkhya Pravacana Bhasya.* (HOS 2). Cambridge 1895.

Gough A.E., *Philosophy of the Upanisads.* London 1882.

Hume R.E., *The Thirteen Principal Upanisads.* Oxford 1951 ed.

Hyden H., *Biochemical Aspects of Brain Activity.* University of California Medical School symposium on 'Control of

Jha G., *Sloka-varttika.* (Tr.) Calcutta 1907.

Kane P.V., *History of the Dharmasastra.* Poona, Vol i, 1930 ; Vol, ii 1941.

Kaviraj G., *Gleanings from the History and Bibliography of the Nyaya-Vaisesika Literature.*

Keith A.B., *The Karma-Mimamsa.* London 1921.

Macdonell A.A. & Keith A.B, *Vedic Index*. 2 vols. London 1912.

Monier-Williams M., *Snaskrit-English Dictionary* Oxford 1899.

Mair J., *Original Sanskrit Texts*, 5 vols London 1873.

Nehru J., *The Discovery of India*.

Oparin A.I., *Origin of life*. New York 1953.

Radhakrisnyn S, *Indian Philosophy*. 2 vols. London 1923.

Radhakrishnan S. & Moore C.A., *A Sourcebook of Indian Philosophy*. Princeton 1957.

Rhys Davids T.W.R., *Dialogues of the Buddha*, 3 vols. London 1899-1921

—*American Lectures*. London 1896.

Roth R. & Bohtlingk O., *S Petersburg Dictionary*. St Petersburg 1855-85

Ruben W., *Studies in Ancient Indian* Thought. Calcutta 1966.

Sanghavi S., *Advanced Studies in Indian Logic and Metaphysics*. Calcutta 1961

Saparina Y., *Cybernetics Within Us*. Moscow.

Stcherbatsky T., *The Conception of Buddhist Nirvana*. Leningrad 1927.

—*Buddhist Logic*, 2 vols. Leningrad 1932.

Sastri H.P., *Lokayata*. Dacca 1925.

Thomas F.W., *The Brhaspati-sutra*. Lahore 1921.

Winterniz M., *History of Indian Literature*. Vol. i., Calcutta 1927.